বাংলার ছোটগল্প

বাংলার ছোটগল্প

ষষ্ঠ খণ্ড

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

৯এ নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৯

BANGLAR CHHOTO GALPA
Collection of Bengali Short Stories
6th Volume
Edited by
Dr. Bijit Ghosh

Price Rs. 100/-

প্রচ্ছদ ঃ সুনীল শীল

ISBN 81-7332-378-X

দাম ঃ ১০০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস ১১৪ এন ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।

....

আমার প্রাণের গানের ভাষা
শিখবে তারা ছিল আশা—
উড়ে গেল, সকল কথা কইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।।

....

এত বেদন হয় কি ফাঁকি।
ওরা কি সব ছায়ার পাখি।
আকাশ-পারে কিছুই কি গো বইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।।'

আমার একান্ত স্নেহের ছাত্রী
অপর্ণা-শম্পা-কে

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা ঃ ষষ্ঠ খণ্ড

ষষ্ঠ খণ্ড শুরু হয়েছে এ-কালের বিশিষ্ট কথাশিল্পী প্রফুল্ল রায়ের 'রাজা যায় রাজা আসে'-র মতো অসামান্য গল্প দিয়ে। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ছে তাঁর 'মূকাভিনেতা', 'চর', 'ভোজ', 'মাঝি', 'নিশিগন্ধা', 'বাঁচার জন্যে', 'চারিদিকে কুয়াশা', 'বাঘ', 'মৃত্যুর আগে এবং পরে' গল্পগুলির কথা।

অন্যান্যদের মধ্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'দূরত্ব', 'মুনিয়ার চারদিক', 'প্রিয় মধুবন', 'শেষবেলায়', 'উড়োজাহাজ', 'স্বপ্নের ভেতরে মৃত্যু', 'তোমার উদ্দেশ্যে', 'ভুল', 'প্রতীক্ষার ঘর', 'পটুয়া নিবারণ', 'অমিয়া', 'আমাকে দেখুন' গল্পগুলির কথা তো ভোলার নয়। দেবেশ রায়ের 'কয়েদখানা', 'নিরস্ত্রীকরণ কেন', 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালেবিলে', 'পা', 'উদ্বাস্তু', 'আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা', 'কলকাতা ও গোপাল' গল্পগুলি তো অ-সাধারণ। মনে পড়ছে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি অসামান্য গল্পের কথা ঃ 'তৃতীয় পুরুষ', 'টেবিলল্যাম্প', 'কর্ণেলের মেয়ে', 'সোফা কামবেড' ইত্যাদি। অন্যধারার গল্পকার তপোবিজয় ঘোষের 'কপাটে করাঘাত', 'সীতানাথের বাজার' প্রভৃতি স্মরণযোগ্য গল্প।

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্যের 'রক্ত গোলাপের চাষ', 'লক্ষ্মীর কথা', ভালো গল্প। বুদ্ধদেব গুহের 'প্রথমাদের জন্য', 'আমরা জোনাকি', 'পাখিরা জানে না', 'লাভ বার্ডস', 'দীপান্তর' ভিন্নমাত্রার ভালো গল্প।

মণি মুখোপাধ্যায়ের 'গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার', 'ক্ষেতুবাগ্দীর স্বাধীনতা', 'রতন সান্যালের ব্যাধি ও তার প্রতিকার', 'নিশা সামন্তের বাপের ভূত', 'কুড়োরামের দিব্যজ্ঞান', 'বাদাবাউরীর উপাখ্যান', 'নিজন মুর্মু', 'তদন্ত কমিশন', 'নিয়ান ডার্থাল' প্রভৃতি অসামান্য শক্তিশালী গল্পগুলি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

দিব্যেন্দু পালিতের 'জাতীয় পতাকা', 'ঘুম', 'মানুষের মুখ', 'দুঃসময়', 'মাড়িয়ে যাওয়া', 'দাঁত', 'মুনিয়ার সঙ্গে কিছুক্ষণ' গল্পগুলি এখনো মনের ভেতরে উজ্জ্বল। রমানাথ রায়ের 'ক্ষত', 'ঝাড়লণ্ঠনের তেকোনা কাঁচ', 'হে অরণ্যদেব', 'তোতনের কথা', 'বিশ্রাম', 'বলার আছে' গল্পগুলি অন্য ধরনের। দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাবা মা ও নীলাভর ছবি' গল্পটির কথা মনে পড়ছে। সমীর রক্ষিতের 'বাপটা ছেলেটা', 'খড়্গ', 'বন্যার পরে বাড়ি ফেরা', 'উৎসবের দিকে', 'বেলা অবেলা'; শেখর বসুর 'চোখ', 'গল্প' 'বিবর্তন', 'রূপা কেমন?', 'পাঁচ হাত দূরে', 'মনে হল', 'অন্ধকার থেকে'; বলরাম বসাকের 'সুখটুখ', 'দুঃখ টুঃখ', 'রোপওয়ে', 'সন্দেহশার্দুল', 'বিস্কুটের টিন', 'প্রিয় জিনিস', 'প্রেমিক নাম চরিত', 'কার্পেট' ইত্যাদি ভিন্ন স্বাদের মনে রাখার মতো গল্প।

শঙ্কর সেনগুপ্তের 'অন্যমুখ', 'বিপন্ন বিস্ময়', সমরেশ মজুমদারের 'ইচ্ছে বাড়ি' প্রভৃতি অসামান্য গল্পগুলির কথা অনেকদিন মনে থাকবে। এই খণ্ডের গল্পের সংখ্যা ৩৯। খণ্ডটি শেষ করেছি, এ-কালের বিশেষ জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের গল্প দিয়ে। এই খণ্ডের সময়সীমা ১৯৩৪ থেকে ১৯৪১।

পুনশ্চ ঃ বিশেষ উৎসাহী/আগ্রহী সহৃদয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি কথা। দশ খণ্ডের 'বাংলার ছোটগল্প' গ্রন্থের **কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেই রয়েছে বাইশ পৃষ্ঠার একটি তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা**। সেখানে আছে বাংলা **গদ্যের সূচনা, গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-সাহিত্য, আদি-গল্প, গল্প**, ছোটগল্পের আবির্ভাব ঃ তার জন্ম ও উৎস সন্ধান, সংজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনা।
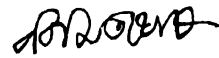
আছে অসংখ্য ছোটগল্পের সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে অপরিহার্য পটভূমি-সমূহের (ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা, সংকট ইত্যাদি) তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামন্বন্তরে ভেঙে পড়া বাংলার সমাজ-অর্থনীতি, **দেশভাগ, খণ্ডিত স্বাধীনতা-প্রাপ্তি. উদ্বাস্তু-স্রোত**; সেই মহা-প্রলয়ের সময়ের জীবন্ত ছবিও (এক-একটি কালজয়ী গল্পের সঙ্গে যে পটভূমির অঙ্গাঙ্গী যোগ) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আগস্ট-আন্দোলন, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা তথা **'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'** আর ঠিক তার পরই **তেভাগা আন্দোলন**; পরবর্তীকালে **'নকশাল আন্দোলন', 'জরুরী অবস্থা'**, বারবার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান,—এ-সব কিছুই বাংলার গল্পকে দিয়েছে নতুন প্রাণ, তারও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সেখানে করেছি আমি।

আবার বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলন (**'কল্লোল', 'শ্রুতি', 'হাংরি জেনারেশন', 'শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন', 'এই দশক', 'নিম সাহিত্য-আন্দোলন', 'নতুন রীতির গল্প আন্দোলন'** ইত্যাদি); লেখক-পাঠক-সম্পাদক-প্রকাশকের ছোটগল্প ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা ও দায়িত্বের কথা; সর্বোপরি পাঠকের কাছে সে-কাল ও এ-কালের ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্ভাব্য কারণগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে সেই ভূমিকায়।

তাই, উৎসুক শ্রদ্ধেয় পাঠক সেটি একবার দেখে/পড়ে নিলে সম্পাদকের শ্রমের ভার কিছুটা লাঘব হবে।

(ড. বিজিত ঘোষ)

সূচীপত্র

রাজা যায় রাজা আসে

প্রফুল্ল রায়

ভোরবেলা পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে গা নাচাচ্ছিল রাজেক। পরনে সবুজ জমির ওপর হলুদ হলুদ রেখ্‌কাটা লুঙ্গি আর জালি গেঞ্জি। এই সাতসকালেই চুলে কাকুই পড়েছে; মাথায় পেখম তুলে টেরি কেটে নিয়েছে সে। তার বুকে এখন সুখের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আজই শুধু? ক'মাস ধরেই সুখের নদীতে বান ডেকে আছে তার।

পুবের ঘর বাদ দিলে উত্তর এবং পশ্চিমের ভিটের বড় বড় পাঁচিশের বন্দের দু'খানা ঘর। সেগুলোর মাথায় ঢেউটিনের নক্সা-করা চাল; গায়ে শালকাঠের খিলান-দেওয়া দেয়াল, বিলিতী মাটির পাকা মেজে।

রাজেক যেখানে বসে আছে, তার তলা থেকে ঢালা উঠোন। উঠোনটার একধারে সারি সারি ধানের ডোল, আরেক ধারে শিউলি গাছ। উঠোনের পর খানিকটা নামাল জমি; পিঠক্ষীরা আর সোনালের ঝোপে জায়গাটা ছেয়ে আছে। তারপর পুকুর। পুকুর পেরিয়ে ধানের খেত। বর্ষায় পুকুর এবং ধানখেত ভেসে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এখনও তেমনটিই রয়েছে, দুয়ের মাঝখানে সীমারেখা নেই কোথাও।

এতগুলো বড় বড় টিনের ঘর, প্রকাণ্ড উঠোন, পুকুর, পুকুরের পর একলপ্তে নব্বুই কানি দো-ফসলা জমি—সমস্ত মিলিয়ে রাজা-বাদশার ঐশ্বর্য। আর এ সবই এখন রাজেকের। অথচ আট মাস আগে? আট মাস আগের কথা এখন নয়।

আশ্বিন মাস যায় যায়। সারা বর্ষার জলে ধুয়ে ভাদ্রের গোড়ায় আকাশ সেই যে আশ্চর্য রকমের নীল হয়ে গিয়েছিল, এখনও তা-ই আছে। তার গায়ে থোকা থোকা ভবঘুরে মেঘ। উঠোনের শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে সেজে রয়েছে। সেই কবে থেকে, শরৎ আসবার আগেই বুঝি, সারা গায়ে ফুল ফোটাতে শুরু করেছিল গাছটা, এখনও ফুটিয়েই যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে সূর্য উঠে গেল। গলানো সোনার মতো রোদের ঢল নামল চারদিকে। কোত্থেকে দুটো মোহনচূড়া পাখি উত্তরের ঘরের চালে উড়ে এসে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে খুনসুটি জুড়ে দিল। সামনে-পেছনে, পুবে-পশ্চিমে—যেদিকেই চোখ ফেরানো যায়, শরৎকাল যেন জাদুকরের বেশে দাঁড়িয়ে।

পা নাচাতে নাচাতে অন্যমনস্কের মতো ধানখেতের দিকে তাকিয়ে ছিল রাজেক। ক'মাস ধরে রোজ সকালবেলা এমনিভাবে পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে অলস চোখে তাকিয়ে থাকছে সে। এটা যেন বিলাসের মতো, কিংবা তার মনেরই কোন প্রিয় খেলা।

দূরে, অনেক দূরে ধানখেত চিরে চিরে একটা নৌকো আসছিল। নৌকোটা ঠিক দেখা যাচ্ছিল না। ধানবনের ওপর গোল ছই, একটা কালো কুচকুচে মাঝি আর উঁচু লগির ওঠানামা চোখে পড়ছিল।

রোজ সকালে কত নৌকোই তো ধানখেত ভেঙে কত দিকে চলে যায়। ওই নৌকোটা কোথায় কোনদিকে চলেছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই রাজেকের। চারধারে আশ্বিনের নরম রোদের ছড়াছড়ি, মোহনচূড়া পাখি দুটোর নাচানাচি কিংবা আকাশের ভাসমান মেঘ—কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে। রাজেক ভাবছিল—নিজের কথা, নিজের তিরিশ বছরের একটানা দীর্ঘ জীবনটার কথা।

হায় রে, কী জীবন ছিল তার! আজ এই জালি গেঞ্জিটি গায়ে দিয়ে মাথায় শৌখিন টেরিটি কেটে, সুখের নদীতে গা ভাসিয়ে রাজেক পা নাচাচ্ছে, আট মাস আগে তা ছিল অসম্ভব। দেশখানা যদি দু ভাগ না হত, বৈকুণ্ঠ সাহারা যদি এই ছিপতিপুর গ্রাম ছেড়ে চলে না যেত, এত সুখ কপালে ছিল না।

ভাবনাটা পুরো হল না। তার আগেই কি আশ্চর্য, ধানখেতের সেই নৌকোটা পুকুর পাড়ি দিয়ে ঘাটে এসে ভিড়ল।

ভুরু কুঁচকে খাড়া হয়ে বসল রাজেক। ভেবেই পেল না, সকালবেলায় তার কাছে কে আসতে পারে। সে জন্য অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরে নৌকো থেকে যে নামল সে আর কেউ না, স্বয়ং তোরাব আলী—ছিপতিপুর গ্রামের সব চাইতে বড় ধনী গৃহস্থ।

দুশো কানি তেফসলা জমি তোরাব আলীর, হাল-হালুটি অগুনতি, গরু আর বলদ পঞ্চাশ-ষাটটা, নৌকো গোটা চল্লিশেক। পঁচিশ-তিরিশটা কামলা বারো মাসই খাটছে। ধান-পাট-মুগ-মুসুর সব মিলিয়ে এলাহী কাণ্ড। মাস আষ্টেক আগেও তার বাড়ি কামলা খেটেছে রাজেক। এই ছিপতিপুর গ্রামের সে মাথা; সব চাইতে গণ্যমান্য ব্যক্তি।

বড় গৃহস্থই শুধু না, তোরাব আলী মানুষটি ভারি শৌখিনও। এই সকাল-বেলাতেই পরিপাটি সাজসজ্জা করে বেরিয়েছে। পরনে সিল্কের লুঙ্গি, কলিদার পাঞ্জাবি, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা, চুলে-দাড়িতে কলপ; রাজেক জানে, কাছে গেলে তার চোখে সুর্মার টান দেখতে পাবে, আতরের ভুরভুরে গন্ধ নাকে এসে লাগবে।

তোরাব আলী কি তার কাছেই এসেছে? প্রথমটা বুঝতে পারল না রাজেক। তোরাব আলীর মতো মানুষ তার কাছে আসতে পারে, এর চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা জগতে আর বোধহয় কিছু নেই। বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ একভাবে বসে থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল রাজেক; তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে পুকুরঘাটে চলে এল। হাত কচলাতে কচলাতে খুব সম্ভ্রমের গলায় বলল, 'আপনে!'

দু-হাতে দাড়ি তোয়াজ করতে করতে সামান্য হাসল তোরাব আলী। বলল, 'হ, আমিই তর কাছে আইলাম—'

হায় আল্লা! শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না রাজেক। প্রতিধ্বনির মতো করে বলল, 'আমার কাছে!'

'হ—হ, তরই কাছে।'

কী উত্তর দেবে, রাজেক ভেবে পেল না।

খুব তরল গলায় তোরাব আলী এবার বলল, পুকৈর (পুকুর) ঘাটেই খাড়া করাইয়া রাখবি নিকি? ঘরে নিয়া যাবি না?'

সুরটা অন্তরঙ্গ। সেই ছোটকাল থেকে তোরাব আলীকে দেখছে রাজেক; এভাবে তাকে কথা বলতে আগে আর কখনও শোনে নি।

যাই হোক, রাজেক খুব লজ্জা পেয়ে গেল। ব্যস্তভাবে বলল, 'আসেন-আসেন—'

বাড়ি এনে তোরাব আলীকে কোথায় বসাবে, কিভাবে আপ্যায়ন করবে, ঠিক করে উঠতে পারল না রাজেক। প্রথমে ছুটে গিয়ে একটা পাটি এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দিল। কিন্তু নিজের কাছেই তা মনঃপূত হল না। তক্ষুনি সেটা গুটিয়ে একটা জলচৌকি নিয়ে এল।

তোরাব আলী কিন্তু বসল না। তার সমাদরের জন্য রাজেকের ছোটাছুটি ব্যস্ততা দেখে সে খুব সন্তুষ্ট। প্রসন্ন গলায় বলল, 'আমার লেইগা অস্থির হইস না রাজেক। বসুম পরে। আগে তর ঘরদুয়ার দেখা—'

চমকে সংশয়ের চোখে তোরাব আলীকে একবার দেখে নিল রাজেক। তার বাড়িঘর দেখার জনাই কি সক্কালবেলা ছুটে এসেছে লোকটা? তোরাব আলীর মনে কী আছে, কে জানে!

রাজেকের মুখচোখের সন্দিগ্ধ চেহারা দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে নিল তোরাব আলী। মৃদু কৌতুকের সুরে বলল, 'ডর নাই, তর বাড়িঘর আমি কাইড়া নিমু না। তর জিনিস তরই থাকব।'

মুখ ফুটে তোরাব আলী একবার যখন দেখতে চেয়েছে তখন আর 'না' বলা যাবে না। মনের ভেতর স্তূপাকার সন্দেহ নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাল রাজেক।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত দেখে জলচৌকির ওপর জাঁকিয়ে বসল তোরাব আলী। বলল, 'তামুক আছে রে?'

খেয়াল করে তামাক-টামাক নিজেরই দেওয়া উচিত ছিল। রাজেক দিতও। কিন্তু সন্দেহে মনটা হঠাৎ মেঘলা হয়ে যাওয়ায় ভুলে গিয়েছিল।

যাই হোক, ছুটে গিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এল রাজেক। আয়েশ করে হুঁকো টানতে টানতে তোরাব আলী বলল, 'বৈকুণ্ঠ সা বাড়িঘর তরে দেখাশুনা করতে দিয়া গেছে, না?'

লোকটার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। প্রায় দম বন্ধ করে রাজেক উত্তর দিল, 'হ'।

সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তোরাব আলী বলল, 'ঐ পুকৈরও তো বৈকুণ্ঠ সা'র?'

'হ।'

'পুকৈরের ওই পারের জমিন?'

'হেয়াও (তাও) সা' কত্তার।'

'কত জমিন আছে?'

'নব্বই কানি।'

'হগলই (সবই) অখন তর হ্যাফাজতে (হেপাজতে)?'

আবছা গলায় রাজেক বলল, 'হ।'

একটু নীরবতা। দ্রুত বারকতক হুঁকো টেনে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ল তোরাব আলী। তারপর বলল, 'বৈকুণ্ঠ সা'রা আট মাস আগে গেরাম ছাইড়া গেছে না?'

লোকটা দেখা যাচ্ছে, অনেক খবর রাখে। আগের সুরেই রাজেক বলল, 'হ।'

'কই গেছে জানস?'

'শুনছিলাম কইলকাতার দিকে যাইব।'

'খোঁজখপর কিছু পাইছস?'

'না।'

'এইর ভিত্‌রে তরে চিঠিপত্তর দিছে?'

'না।'

একটু চুপ করে থেকে কপাল কুঁচকে কি ভাবল তোরাব আলী। তারপর বলল, 'তর কী মনে হয়?'

প্রশ্নটা বুঝতে পারল না রাজেক। জিজ্ঞেস করল, 'কোন ব্যাপারে?'

'বৈকুণ্ঠ সা'রা আর ফিরব?'

'কেম্‌নে কমু?'

রাজেকের কথা যেন শুনতে পেল না তোরাব আলী। অনেকটা আপন মনেই বলে উঠল, 'আমার মনে লয় অরা (ওরা) ফিরব না।'

রাজেক উত্তর দিল না।

তোরাব আলী আবার বলল, 'বৈকুণ্ঠ সা'রা না ফিরলে তার জমিন, বাড়িঘর পুকৈর—সগল তর হইয়া যাইব। হইয়া যাইব কি, হইয়া গেছেই।'

রাজেক এবারও চুপ।

বৈকুণ্ঠ সাহা এবং তার বিপুল সম্পত্তি সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো কিছুক্ষণ খবর-টবর নিল তোরাব আলী। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'এইবার কামের কথাখান সাইরা লই।'

দম বন্ধ করেই ছিল রাজেক। আবছা গলায় বলল, 'কী কাম?'

'আমার ইচ্ছা, কাইল দুফারে (দুপুরে) আমাগো বাড়িত্ চাউরগা (চাট্টি) ডাইল-ভাত খাবি।'

সামনে বাজ পড়লেও এতখানি চমকাত না রাজেক। ছিপতিপুর গ্রামের সব চাইতে বড়, সব চাইতে সম্মানিত, সবচাইতে মর্যাদাসম্পন্ন গৃহস্থ—যার বাড়ি ক'দিন আগেও সে কামলা খেটেছে, সেই তোরাব আলী কিনা নিজে এসে তাকে নেমন্তন্ন করছে। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল রাজেক, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

এদিকে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে পড়েছে তোরাব আলী। বলল, 'তাহলে ঐ কথাই রইল। কাইল দুফারে আসবি কইলাম।'

সজ্ঞানে না, অনেকটা ঘোরের মধ্যেই যেন ঘাড় কাত করল রাজেক।

তোরাব আলী বলল, 'আবার ভুইলা যাইস না। আমরা কিন্তুক তর লেইগা বইসা থাকুম।' বলে আর দাঁড়াল না। সামনের ঢালা উঠোন, তারপরের সোনাল আর পিঠক্ষীরা গাছের জঙ্গল পেরিয়ে পুকুরঘাটে চলে গেল। একটু পর তার নৌকো দূর ধানখেতের ভেতরে অদৃশ্য হল।

তোরাব আলী চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ একইভাবে বসে থাকল রাজেক। পুকুরঘাট পর্যন্ত যে তাকে এগিয়ে দিয়ে আসা উচিত ছিল, এই কথাটা রাজেকের একবারও মনে পড়ে নি। আসলে এত বিস্মিত, এত স্তম্ভিত, এত বিহ্বল আগে আর কখনও হয় নি সে। এমন ভয়ও কখনও পায় নি।

তোরাব আলী তার কাছে এসেছিল, কাল দুপুরবেলা খাবার জন্য নেমন্তন্ন করে গেছে—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য। তোরাব আলীর মতো মানুষ তার কাছে আসতে পারে, শুধু আসাই না, এত খাতির করতে পারে—এমন ঘটনা ভাবাই যায় না। আজ না হয় বৈকুণ্ঠ সাহারা দেশ ছেড়ে যাবার পর একটু সুখের মুখ দেখেছে। নইলে আট মাস আগেও তার দিন যে কিভাবে চলত।

আশ্বিনের এই সকালে বিমূঢ়ের মতো পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ সময়ের উজান ঠেলে পেছন ফিরে গেল রাজেক।

হায় রে, কী জীবন ছিল রাজেকের। ছোটকালেই তো বাপ-মা খেয়ে বসেছে। তারপর থেকে দু গরাস ভাতের জন্য কুকুরছানার মতো ছিপতিপুরের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াত। কখনও যেত মৃধাদের বাড়ি, কখনও সর্দারদের, কখনও বা খাঁয়েদের। তবে সব চাইতে বেশি যেত হিন্দু পাড়ায়। কোথাও কিছু জুটত, কোথাও আবার কিছুই না। খিদে ছাড়া সে সময় আর কোন অনুভূতি ছিল না; সর্বক্ষণ খিদেটা তার পায়ে পায়ে ফিরত।

একটু বড় হবার পর রাজেকের মনে হয়েছিল, অন্যের করুণার ওপর চিরকাল বাঁচা যায় না; আর তা সম্মানজনকও না। কাজেই খানিকটা টোন সুতো আর বঁড়শি যোগাড় করেছিল সে। লোকের বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে এনেছিল খানদুই মুলি বাঁশ। বাঁশ চিরে চিরে 'পোলো' এবং 'চাই' বানিয়েছিল আর বুনে নিয়েছিল একখানা 'ধর্মজাল'। তখন থেকে কঠিন জীবন-সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল তার।

এ দেশে সারা বছরই জল। খাল শুকোয় তো বিল্ আছে, বিল শুকোয় তো গাঙ তার বুক ভরে রেখেছে। বঁড়শি নিয়ে, ধর্মজাল নিয়ে, পোলো নিয়ে খাল-বিল কি দু-মাইল দূরের বড় নদীতে চলে যেত রাজেক। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটানা পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ যে মাছ মিলত তাই নিয়ে সে ছুটত সুনামগঞ্জের হাটে। মাছ বেচে সন্ধ্যের পর ছিপতিপুরের এক কোণে যে গরীব মুসলমান পল্লীটা আছে সেখানে চলে যেত। ওদের রান্নাবান্না হয়ে গেলে কারো উনুনে চাট্টি ফুটিয়ে নিত। তারপর খেয়েদেয়ে তাদেরই ঘরের দাওয়ায় টান হয়ে শুয়ে পড়ত।

সারাটা বছর জলে-জলেই কেটে যেত রাজেকের। ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলে লোকের বাড়ি কামলা খাটত। এর ধান কেটে দিত, ওর পাট 'তুলে' দিত। বেশির ভাগ সময় সে খাটত তোরাব আলীর কাছে। পৌষ মাঘ মাসে ধান উঠে গেলে মাঠে যে শস্যের দানাগুলো কৃষাণদের চোখ এড়িয়ে পড়ে থাকত সেগুলো খুঁটে খুঁটে তুলে আনত রাজেক, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ইঁদুরের গর্ত থেকে ধান বের করত। কুড়নো ফসল থেকে এক-আধটা মাস ভালই কেটে যেত।

জলে-স্থলে সারা বছরই তার নিদারুণ জীবন-সংগ্রাম। ডাঙায় অবশ্য বেশিদিন থাকতে পেত না রাজেক। প্রায় বারো মাস জলে ভিজে ভিজে চামড়া ফেটে ফেটে গিয়েছিল; গা থেকে সর্বক্ষণ খই উড়ত। চুল-দাড়িতে জট পাকিয়ে গিয়েছিল; চোখ দুটো থাকত ঘোলাটে হয়ে। নখের কোণে পাঁক ঢুকে 'কুনি' হয়েছিল। হেজে হেজে আঙুলের ফাঁকে থকথকে ঘা। রাজেকের চোখের সামনে দিনরাতের একটাই মোটে রঙ তখন। তার নাম দুঃখ, অসীম অন্তহীন দুঃখ।

হায় রে, কী জীবন ছিল রাজেকের।

শীত-গ্রীষ্ম, শরৎ-হেমন্ত—ঋতুর চাকায় পাক খেয়ে খেয়ে তিরিশটা বছর কিভাবে কেটে গেছে, রাজেক জানে না।

একদিন সকালবেলা এক কোমর স্রোতে নেমে ধর্মজাল বাইতে বাইতে হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল, স্কুলবাড়ির সামনের বড় মাঠটায় কাতারে কাতারে মানুষ গিয়ে জমা হয়েছে। চিত্রবিচিত্র পোশাক-পরা একদল লোক বিলিতী বাজনা বাজাল; কারা যেন গলার শির ফুলিয়ে ফুলিয়ে, প্রচুর মাথা নেড়ে বক্তৃতা করল; সিল্কের নতুন পতাকা উঠল আকাশের দিকে।

সকালবেলা বর্ণশূন্য ধূসর চোখে স্কুলবাড়ির মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল রাজেক। সন্ধ্যের পর ওখানেই যখন বাজি পোড়াবার ধূম পড়ে গেল তখন আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে শুধিয়েছিল, 'এত রং-তামাশা ক্যান? বাজি ফুটানের হইল কী?'

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন ধিক্কারের গলায় বলে উঠেছিল, 'আরে আহাম্মক, তুই আলি (এলি) কইথন (কোথা থেকে)? দেখি, দেখি তর চোপাখান (মুখখানা)।' পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখে নিয়ে লোকটা এবার বলেছিল, 'তাই কই, আমাগো রাজেইকা ছাড়া এমুন কথা আর কার মুখ দিয়া বাইর হইব! জলে থাইকা থাইকা বুদ্ধিসুদ্ধি তর গেছে। কোন খবরই রাখস না—'

'প্যাচাল না পাইড়া কী হইছে হেই কথাটা কও—'

লোকটা এবার বুঝিয়ে দিয়েছিল। সে একটা দিনের মতো দিন। সেদিন দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনই শুধু না, কোটি কোটি মানুষ যার স্বপ্ন দেখেছে, যার জন্য মৃত্যুপণে সংগ্রাম করেছে, সেই পাকিস্তানেরও প্রতিষ্ঠা সেই দিনটিতে। এমন একটা দিন বছরের, এক-আধ বছরের কেন, বহু বহু বছরের বহু লক্ষ ম্যাড়মেড়ে আটপৌরে দিন থেকে আলাদা। তাকে তো অন্যমনস্কের মতো উদাসীনভাবে হাত পেতে নেওয়া যায় না; বিপুল সমাদরে রাজকীয় সমারোহে বরণ করে নিতে হয়। তাই এত লোকজন, এত বাজি পোড়াবার ধূম, এত উদ্দীপনা।

মনে আছে, অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন স্কুলবাড়ির মাঠে ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল রাজেক। এত আলো, এত হৈ-চৈ, এত উত্তেজনা, এত রোশনাই, এত রঙ—সবই ভাল লেগেছিল তার, নতুন নতুন মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাল লাগার আয়ু মোটে একটা রাত। পরের দিনই 'পোলো' নিয়ে খালে গিয়ে নামতে হয়েছিল তাকে।

সেই চমকপ্রদ বিশেষ দিনটির পর বছরখানেক কাটল। হঠাৎ একদিন কার্তিক মাসের পচা জলে 'চাই' পাততে পাততে রাজেক খবর পেল, ছিপতিপুর গ্রামে ভাঙন লেগেছে। গোঁসাই বাড়ির লোকেরা নাকি জমিজমা ঘরদুয়ার বেচে কলকাতায় চলে গেছে। গোঁসাইদের পর গেল ভুঁইমালীরা, তারপর একে একে বারুইরা, কুমোররা, যুগীরা। দেখতে দেখতে ছিপতিপুর একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

বারো মাস জলে থেকে থেকে অনুভূতিগুলো প্রায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল রাজেকের। গ্রামে কারা থাকল, কারা গেল—তা নিয়ে আদৌ দুর্ভাবনা নেই। তার দিনরাতের একমাত্র চিন্তা—জলের তলা থেকে কেমন করে জীবন্ত রুপোলী ফসলগুলোকে তুলে আনবে।

দেশভাগ, স্বাধীনতা দিবসের জমকালো উৎসব কিংবা গ্রামের ভাঙন—সমস্ত কিছুই রাজেককে আলতোভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল। সে সব নিয়ে বসে থাকার মতো যথেষ্ট সময় তার নেই। কেন না, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য তাকে এত খাটতে হত যে তারপর আর কোন ব্যাপারে মেতে ওঠার মতো উৎসাহ থাকত না।

কিন্তু খুব বেশি দিন চারপাশের জগতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকা গেল না। মাঘ মাসের এক শীতল দুপুরে মাঠে মাঠে ফেলে-যাওয়া শস্যের দানা কুড়োচ্ছিল রাজেক। হঠাৎ বুড়ো বৈকুণ্ঠ সাহা তার সামনে এসে দাঁড়াল।

রাজেক শুধিয়েছিল, 'আমারে কিছু কইবেন সা-মশয়?'

'হ—' বৈকুণ্ঠ সাহা মাথা নেড়েছিল।

'ক'ন (বলুন)—'

'আমরা তো গেরাম ছাইড়া চললাম—'

'কই চললেন?'

'কইলকাতা।'

'ফিরবেন কবে?'

'ফিরনের ঠিক নাই।'
রাজেক আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি।
বৈকুণ্ঠ সাহা আবার বলেছিল, 'তর লগে একখানা কামের কথা আছে।'
'কী?'
'আমরা কইলকাতা গেলে আমাগো ঘরদুয়ার জমিন-পুকৈর সগল তুই দেখবি। এমনে এমনে দেখতে কই না; ধান পাট যা হয় সব তুই পাবি। যদি কুনোদিন ফিরি তখন বাড়িঘর ফিরাইয়া দিস। না ফিরলে বেবাক তরই হইয়া যাইব।'
বৈকুণ্ঠ সাহারা সত্যিই চলে গেল। তার বিপুল সম্পত্তি, বিশাল ঐশ্বর্য এসে পড়ল রাজেকের হাতে। আট মাস ধরে জীবনধারণের জন্য জলে-স্থলে উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়াতে হচ্ছে না তাকে। এ ব্যাপারে এখন সে নিশ্চিন্ত। আরামে আর সুখে থেকে থেকে পায়ের হাজা, নখের কুনি-টুনি সেরে গেছে রাজেকের। খই-ওড়া চামড়ায় চকচকে মসৃণতা এসেছে, মাথায় ঢেউখেলানো টেরি দেখা গিয়েছে। মেজাজটিও হয়ে উঠেছে শৌখিন। আজকাল সিল্কের লুঙ্গি, জালি গেঞ্জি, কলিদার পাঞ্জাবি ছাড়া চলে না। গন্ধতেলটি না হলে মন খুঁতখুঁত করে।
ইদানীং সব সময় রাজেকের মনে হয়, ভাগ্যে দেশখানা দু ভাগ হয়েছিল, ভাগ্যে বৈকুণ্ঠ সাহারা চলে গিয়েছিল। না হলে তার কপাল কি খুলত! এত সুখের মুখ কি সে দেখতে পেত!
দিনগুলো ভালই কাটছিল। কিন্তু ছিপতিপুর গ্রামে এত মানুষ থাকতে আজ তোরাব আলী কেন যে বেছে বেছে হঠাৎ তার কাছেই আসতে গেল! শুধু আসা না, দাওয়াতও করে গেল! লোকটার মনে কী আছে, কে জানে।

•

তোরাব আলী নেমন্তন্ন করে গেছে। না গেলেও নয়, আবার যেতেও ভরসা হয় না। পরের দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে ভাবল রাজেক; ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার তোরাব আলীর উদ্দেশ্যটাকে বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর নিজের অজান্তেই এক সময় চানটান সেরে, রঙচঙে লুঙ্গি আর পাঞ্জাবিটি পরে, কাঁচা চামড়ার নাগরা পায়ে দিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠল।
ছিপতিপুর গ্রামের শেষ মাথায় একটা দ্বীপের মতো জায়গায় তোরাব আলীর বাড়ি। যেমন তেমন বাড়ি না, রীতিমত পাকা দালান। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়িটা, অসংখ্য ঘর। মানুষজনও প্রচুর।
ধানবন ঠেলে ঠেলে রাজেক যখন সেখানে পৌঁছল, আশ্বিনের বেলা অনেকখানি হেলে গেছে। রোদে হলুদ আভা লাগতে শুরু করেছে।
ঘাটে নৌকো ভিড়তে না ভিড়তেই তোরাব আলী ছুটে এল। সমাদরের গলায় বলল, 'আইছ মেঞা! আমি তো ভাবছিলাম, তুমি ভুইলাই গেছ—'
উত্তর দেবে কি, রাজেক স্তম্ভিত। এই সেদিনও অবজ্ঞার সুরে তাকে 'তুই' বলত তোরাব আলী, সম্ভাষণের ভাষাটা ছিল 'রাজেইকা'। বেশি দূর পিছিয়ে যেতে হবে কেন, কালও তাকে 'তুই তোকারি' করে এসেছে তোরাব আলী। রাতারাতি হঠাৎ এমন কি ঘটে গেল যাতে সে এত সম্মানিত হয়ে উঠেছে। 'তুই' থেকে 'তুমি', 'রাজেইকা' থেকে 'মেঞা'—এতখানি বিস্ময় রাজেক সহ্য করতে পারছে না।
তোরাব আলী বলল, 'আসো—আসো—'
নিঃশব্দে নৌকা থেকে পাড়ে নামল রাজেক। তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে তোরাব আলী বলতে লাগল, 'এত দেরি হইল ক্যান?'

জড়ানো গলায় রাজেক কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার এক বর্ণও বোঝা গেল না।

তোরাব আলী বলল, 'আরেট্টু (আরেকটু) দেখতাম। হে'র (তার) পরও যদি না আইতা, তোমার বাড়িত্ লোক পাঠাইতাম।'

অনেক কষ্টে স্বরটাকে গলার ভেতর থেকে এবার মুক্ত করে-আনল রাজেক, 'আপনে কাইল কইয়া আইলেন। না আইসা কি পারি, ঘেটিতে (ঘাড়ে) আমার কয়টা মাথা?'

তোরাব আলী কিছু না বলে হাসল।

বাড়ির ভেতরে এনে ধবধবে ফরাসের ওপর খুব যত্ন করে রাজেককে বসানো হল। তক্ষুনি সরবত এল, পান-তামাক এল। বাড়ির যত বয়স্ক মেয়ে-পুরুষ সবাই এসে রাজেককে ঘিরে বসল। বাচ্চাগুলো দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়াল।

রাজেক ঘামতে শুরু করেছিল। আট মাস আগেও সে এ বাড়িতে কামলা খেটেছে, মাঠ থেকে ধান কেটে এনেছে, পাট 'জাগ' দিয়েছে—এই কথাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তোরাব আলীরা কিন্তু সে-সব ভুলে গেছে। অন্তত তাদের আদর-যত্ন এবং খাতিরের ঘটা দেখে তাই মনে হয়। সে যেন এ বাড়ির অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি।

তোরাব আলী বলল, 'খাও মেঞা, সরবত খাও। রান্ধনের (রান্নার) দেরি আছে। দুই-একখানা পদ অখনও বাকি।'

বাড়ির অন্য লোকেরাও সায় দিল, 'হ-হ, খাও—'

কাঁপা কাঁপা হাতে সরবতের গেলাস তুলে নিল রাজেক।

সরবতের পর তামাক সাজা হল। তোরাব আলী হুঁকোয় দু-চারটে টান দিয়ে রাজেকের দিকে এগিয়ে দিল।

সঙ্কোচে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল রাজেক। দু হাত এবং মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'না-না, না-না—'

তোরাব আলী হুঁকোটা প্রায় তার হাতে গুঁজেই দিল, 'আরে মেঞা, ধর ধর। মাইয়া মাইনষের লাখান (মতো) অত সরম ক্যান!'

মুখ নীচু করে আবছা গলায় রাজেক বলল, 'আপনের সুমখে (সামনে) নিশা (নেশা) করুম! না-না—'

'আমার সুমখে বইলা কী? খাও-খাও—'

অনেক বলার পর তোরাব আলীর দিকে পেছন ফিরে বার কয়েক দ্রুত হুঁকো টানল রাজেক। তারপর কাছে যাকে পেল তার হাতে হুঁকোটা দিয়ে আবার ঘুরে বসল।

সরবত আর তামাকের পর গল্প শুরু হল। দেশভাগের গল্প, গ্রামে ভাঙন লাগার গল্প। ধান-পাট, এ বারের বর্ষা—কিছুই বাদ গেল না। তবে বেশির ভাগ কথাই হল বৈকুণ্ঠ সাহা আর তার বিষয়-আশয় নিয়ে।

কথায় কথায় বেলা আরো হেলে গেল। পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে সূর্যটা যখন অনেকখানি নেমে গেছে সেই সময় ভেতরবাড়ি থেকে খবর এল রান্নাবান্না শেষ।

তোরাব আলী ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ইস, বেইল (বেলা) যায়! তোমার বড় কষ্ট হইল মেঞা।'

রাজেক বলল, 'না, কষ্ট কিসের!'

'লও লও, খাইতে যাইবা।'

খাবার ব্যবস্থা ভেতর-বাড়িতে। তোরাব আলী আয়োজনও করেছে প্রচুর। পাঁচ-ছ রকমের মাছ, মাংস, পায়েস, পাতক্ষীর, বড় বড় মোহনবাঁশি কলা, পুরু সরওলা হলুদবর্ণ ঘন দুধ।

একা রাজেক না, তার সঙ্গে তোরাব আলী এবং এ বাড়ির বর্ষীয়ান ক'টি মানুষও খেতে বসল। খেতে খেতে আবার বৈকুণ্ঠ সাহাদের কথা উঠল, তাদের ফেরার সম্ভাবনা আছে কিনা তাই নিয়ে আলোচনা হল।

রাজেক অবশ্য বিশেষ কথা বলছিল না। সে এত বিস্মিত এত স্তম্ভিত হয়ে আছে যে তোরাব আলীর প্রশ্নের উত্তরে খুব সংক্ষেপে এক-আধটা 'হুঁ' 'হ্যাঁ'র বেশি তার মুখ থেকে বেরুচ্ছিল না।

মাথা নীচু করেই খাচ্ছিল রাজেক। হঠাৎ তোরাব আলীর এক বুড়ো চাচার কথায় মুখ তুলে পাশের দিকে তাকাতে গিয়েই ওধারের এক জানালায় তার চোখ আটকে গেল। সেখানে কামরণ দাঁড়িয়ে আছে; তোরাব আলীর মেয়ে কামরণ। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রঙ, দীঘল টান দেওয়া নাক-চোখ চিবুক। মুখখানা পানপাতার মতো। ছোট কপালের ওপর থেকে থাক থাক কোঁচকানো চুল; ফুরফুরে পাতলা ঠোঁট। পরস্তাবে (রূপকথায়) সেই যে গুলেবাখালী রাজকন্যার কথা আছে, কামরণ যেন তাই।

মেয়েটা খুব সম্ভব একদৃষ্টে পলকহীন তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতেই সলজ্জ মধুর হেসে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

কামরণকে অবশ্যই এই প্রথম দেখল না রাজেক। কামলা খাটতে এসে কতবার দেখেছে। কী দেমাক ঐ মেয়ের! রূপের দেমাক, বড়মানুষির দেমাক। দুনিয়াখানাকে যেন পায়ের তলায় রেখে দিয়েছে। মানুষকে মানুষ বলেই সে ভাবত না।

সেই কামরণ যে এমন হাসতে পারে, তা যেন এক অভাবনীয় ব্যাপার।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের ঘরের ফরাসে এসে বসতে না বসতেই সন্ধ্যে নেমে গেল। রাজেক বলল, 'অখন আমি যাই।'

তোরাব আলী আর তাকে আটকাল না, 'আইচ্ছা যাও, আবার আইসো।' ঘাট পর্যন্ত গিয়ে রাজেককে নৌকোয় তুলে দিয়ে এল সে।

যতদূর চোখ যায় এখন গাঢ় অন্ধকার। সমস্ত চরাচর জুড়ে লক্ষ লক্ষ জোনাকি জ্বলছে। আশ্বিনের এলোমেলো ঝিরঝিরে হাওয়া ছুটছে দিগ্বিদিকে।

ধানখেতের ওপর দিয়ে নৌকো চালিয়ে যেতে যেতে রাজেক সেই পুরনো কথাটাই ভাবছিল। তোরাব আলীর এত খাতির, এত সমাদর—এ সবের উদ্দেশ্য কী? এগুলো ফাঁদ নয় তো? ভুলিয়ে-ভালিয়ে বৈকুণ্ঠ সাহার জমিজমা বাড়িঘর সে গ্রাস করতে চায় কি?

সেই যে নেমন্তন্ন খাওয়া শুরু হল, কার্তিকের শেষাশেষি পর্যন্ত একটানা তার জের চলল। দু-চারদিন পর পরই একটা না একটা উপলক্ষে তোরাব আলীর বাড়ি যেতে হয়েছে রাজেককে।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে রাজেক, ইদানীং কামরণ তার সামনে আসে না। খেতে বসে কিংবা গল্প করতে করতে জানালার ফাঁকে চকিতের জন্য এক-আধবার তাকে দেখা যায়। অথচ আট-দশ মাস আগেও বাড়িতে সে কামলা খাটতে আসত, সর্বাঙ্গে রূপ আর গর্বের ঝিলিক দিয়ে গরবিনী মেয়েটা তাদের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াত। সেই কামরণের এজাতীয় আচরণের কোন কারণ খুঁজে পায় না রাজেক। ভেবে ভেবে কূলকিনারা চোখে পড়ে না তার।

শেষ পর্যন্ত রহস্যটা পরিষ্কার হল। অঘ্রান মাসের গোড়ায় একদিন সকালবেলা তোরাব আলী রাজেকের কাছে এল, 'তোমার লগে কামের কথা আছে মেঞা—'

এতদিন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নেমন্তন্নই খাইয়েছে তোরাব আলী আর প্রচুর খাতির-যত্ন করেছে। এলোমেলো গল্প ছাড়া বিশেষ কোন কথা বলেনি। তবে সে যে বলবে, নিদারুণ উদ্দেশ্যপূর্ণ কিছু তার মুখ দিয়ে বেরুবে, তা আন্দাজ করতে পারছিল রাজেক। সে জন্য রাজেকের ঘুম নেই, একটা ধারাল কাঁটা বুকের ভেতরে সবসময় যেন আড় হয়ে বিঁধে আছে।

তোরাব আলীর কাজের কথাটা কী, কে বলবে। নিশ্বাস বন্ধ করে রাজেক তাকিয়ে থাকল। তোরাব আলী বলল, 'আমার মাইয়া কামরণরে দেখছ তো?'

লোকটা কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো মাথা নাড়ল রাজেক, 'হু—'

'আমার ইচ্ছা, কামরণের লগে তোমার শাদি দিমু—'

ভীষণভাবে চমকে উঠল রাজেক, 'এ আপনে কী ক'ন বড় মেঞা—'

তোরাব আলী শুধলো, 'ক্যান, কী কই?'

'আপনে কত বড় মানুষ, কত বড় ঘর আপনেগো! আপনের কাছে হেই দিনও কামলা খাইটা গেছি। হেই মাইনষের মাইয়ারে শাদি! না-না—'

'কামলা খাটার কথা ভুইলা যাও মেঞা। আর বড় মানুষ, বড় ঘরের কথা যখন তুললা তখন কই তুমিও ছোট না। বৈকুণ্ঠসা'র অত জমিন পাইছ, ঘর-দুয়ার হাল হালুটি পাইছ। তুমি কম কিসে? জাতে উইঠা গেছ মেঞা—'

দ্বিধান্বিত সুরে রাজেক বলল, 'কিন্তুক—'

'আবার কী?'

'আমার লগে মাইয়ার শাদি দিলে মাইনষে আপনেরে কী কইব?'

'কোন হালায় (শালায়) কিছু কইব না। সুমুখা-সুমুখি (সামনা-সামনি) কওনের সাহস কারো নাই। হেয়া (তা) ছাড়া—'

'কী'?

'আমার দেখতে হইব মাইয়া কোনখানে বেশি সুখে থাকব। তুমি ছাড়া আর কোন হালার নব্বই কানি জমিজেরাত আছে, এমুন সোন্দর ঘরদুয়ার আছে? লোক না পোক। মাইনষের কথায় আমি কান দেই না।'

এ একেবারে আশাতীত, অকল্পনীয়। জামাই করবে বলেই তবে তোরাব আলীর এত ছোটাছুটি, এত সমাদর, এত মেজবান খাওয়াবার ঘটা। সুখের নদীতে ভাসতে ভাসতে রাজেক বলল, 'তাইলে আমি আর কী কমু, আপনে যা ভাল বোঝেন—'

একটু ভেবে তোরাব আলী বলল, 'ভাবছি, ধান টান উইঠা গেলে তোমাগো শাদিটা সারুম—'

রাজেক উত্তর দিল না, মুখ নীচু করে বসে থাকল।

তোরাব আলী বলল, 'তাহলে ঐ কথাই রইল। অখন আমি যাই—'

তোরাব আলী চলে যাবার পরও উঠল না রাজেক। বসে বসে ভাবতে লাগল, ভাগ্যি দেশখান দু'ভাগ হয়েছিল, ভাগ্যি বৈকুণ্ঠ সাহারা চলে গিয়েছিল, নইলে এত সুখ কি তার কপালে ছিল।

অঘ্রানের মাঝামাঝি ধান কাটার মরসুম শুরু হল। মাঠ থেকে ধান তুলে এনে সেই ধান ঝেড়ে শুকিয়ে ডোলের ভেতর সেঁতে রাখতে মাঘ মাস পেরিয়ে গেল। তারপর আবার এল তোরাব আলী। বলল 'ফসল টসল তো উঠল, এইবার মোল্লা-মুচ্ছুল্লিগো খবর দেই—'

নখ খুঁটতে খুঁটতে রাজেক বলল, 'আপনার যা ইচ্ছা—'

খানিক চিন্তা করে তোরাব আলী বলল, 'আইজ কী বার?'

'বুদ (বুধ)—'
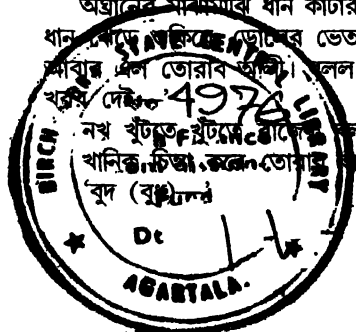
'শনিবার দুফারে নাও পাঠাইয়া দিমু, তুমি আমাগো বাড়িত যাইও। মোল্লামুচ্ছুল্লিগো খবর দিয়া রাখুম, তারাও আইব। হেইদিন শাদির কথা, দেন-মোহরের কথা পাকা হইব।'

রাজেক বলল, 'নাও পাঠাইতে হইব না, আমি এমনেই যামু গা—'

তোরাব আলী শুনল না। জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলল, 'এট্টা ভাল কামে যাইবা, নাও না পাঠাইলে হয়। তোমার সোম্মান নাই?'

বুধবার তোরাব আলী চলে যাবার পর দিন যেন আর কাটতেই চায় না। শিরায় শিরায় সীমাহীন উত্তেজনা নিয়ে সর্বক্ষণ অস্থির হয়ে থাকল রাজেক।

তবু একে একে বেস্পতি গেল, শুক্র গেল। শনিবার সকাল থেকে সময় যেন একেবারে থেমেই গেছে। সূর্যটা অন্যদিনের চাইতে অনেক দেরী করেই বুঝি আজ উঠেছে; আর চলছে দেখ না! এক ঘণ্টার রাস্তা পাড়ি দিতে আজ দশ ঘণ্টা লেগে যাচ্ছে তার।

রাজেক ঘুরছে ফিরছে আর দূর মাঠের দিকে তাকাচ্ছে। সকাল থেকে কত বার যে পুকুরের ওধারের মাঠটার দিকে সে তাকিয়েছে তার হিসেব নেই।

এই ফাল্গুনে মাঠে অবশ্য জল নেই। কিন্তু তার পাশ দিয়ে একটা বড় খাল আছে; খালটা সোজা এসে বৈকুণ্ঠ সাহার পুকুরে থেমেছে। তোরাব আলীর নৌকো ঐ খাল দিয়েই আসবে।

যত ধীরেই যাক, এক সময় দুপুর হল। আর তখনই অনেক দূরে নৌকোর গোল ছই চোখে পড়ল রাজেকের। সঙ্গে সঙ্গে দোতারায় এলোপাথাড়ি ছড় টানার মতো বুকের ভেতর ঝড় বইতে লাগল তার। এটা যেন সাধারণ দু-মাল্লাই নৌকো না, পরস্তাবের মনোহারিণী রাজকন্যা তার জন্য একখানা ময়ূরপঙ্খীই পাঠিয়ে দিয়েছে।

দেখতে দেখতে নৌকোটা পুকুরঘাটে এসে ভিড়ল। নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিল রাজেক; ভাবছিল ঘাটে যাবে কিনা।

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই নৌকো থেকে যে নামল, এই মুহূর্তে—এই মুহূর্তে কেন, দু-দিন মাসের ভেতর তার কথা স্বপ্নেও ভাবে নি। রাজেক চমকে উঠল; সামনে বাজ পড়লেও মানুষ এত চমকায় না। হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোতের মতো সিরসিরিয়ে কী যেন বয়ে গেল তার।

একা বৈকুণ্ঠ সাহাই না, তার সঙ্গে আর একজনও নেমেছে। পোশাক-আশাক এবং চেহারা-টেহারা দেখে মুসলমান বলেই মনে হয়, বয়েস ষাটের কাছাকাছি।

পুকুরঘাট থেকে সঙ্গীকে নিয়ে সোজা বাড়িতে চলে এল বৈকুণ্ঠ সাহা। রাজেককে দেখে ভারি খুশী সে। বলল, 'ভালই হইল রাজেক, বাড়িতে পা-ও দিয়াই তরে পাইয়া গেলাম। ভাবছিলাম, পামু না। তা আছস কেমুন? শরীল-গতিক ভাল তো?'

বাজ-পড়া অসাড় মানুষের মতো দাঁড়িয়ে ছিল রাজেক। কোন রকমে বলতে পারল, 'আপনে সা-মশয়!'

বৈকুণ্ঠ সাহা বলল, 'হ, আমিই। তরে খবর দিয়া আইতে পারি নাই। হঠাৎ সুযগ হইল, আইসা পড়লাম।'

'এ্যাদ্দিন আছিলেন কই?'

'মেলা জায়গায়। কইলকাতা, বনগাঁ, দত্তপুকৈর—কতখানের নাম কমু? শ্যাষম্যাষ মুর্শিদাবাদে থিতু হইছি।' বলতে বলতে সঙ্গী সম্বন্ধে সচেতন হল বৈকুণ্ঠ সাহা। তার উদ্দেশে বলল, 'বসেন বসেন আমিন সাহেব। দে রে রাজেক, একখানা জলচৌকি বাইর কইরা দে। তামুক-টামুক থাকলে সাজ—'

জলচৌকি এলে আমিন সাহেব বসল। বৈকুণ্ঠ সাহাও বারান্দার একধারে বসল। তারপর গল্প-সল্প শুরু হল। দেশের হালচাল, গ্রামে কারা কারা আছে, কারা কারা গেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা। বৈকুণ্ঠ সাহাই এক তরফা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেল। রাজেক মনে মনে অবসন্ন বোধ করছিল; নির্জীব গলায় উত্তর দিয়ে যেতে লাগল।

এলোমেলো অনেক রকম কথার পর আসল কথা পাড়ল বৈকুণ্ঠ সাহা, 'তারপর ঘর দুয়ার ভাল কইরা রাখছস তো?'

এতকাল পরে হঠাৎ বৈকুণ্ঠ সাহা গ্রামে ফিরে এল, বোঝা যাচ্ছে না, আর এল এমন দিনে যেদিন শাদির কথা পাকা হবে। অন্যমনস্কের মতো রাজেক বলল, 'দ্যাখেন না, কেমুন কইরা রাখছি—'

বৈকুণ্ঠ সাহা তক্ষুনি উঠে পড়ল। আমিন সাহেবকে ডেকে বলল, 'আসেন, আসেন। নায়ে কইরা আসনের সময় আমার জমিন দেখাইছিলাম। অখন আমার বাড়িঘর দ্যাখেন—'

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমিন সাহেবকে চারদিক দেখাতে লাগল বৈকুণ্ঠ সাহা। রাজেক কিন্তু তাদের সঙ্গে গেল না; আকণ্ঠ দুর্ভাবনা আর উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকল। বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল তার।

বৈকুণ্ঠ সাহা এতদিন পর বউ-ছেলে-মেয়ে, সংসারের কাউকে নিয়েই আসেনি সত্যি কিন্তু আমিন সাহেবকে সঙ্গে এনেছে। আমিন সাহেব এদিককার লোক না। হলে রাজেক নিশ্চয়ই চিনতে পারত। এই মুসলমান ভদ্রলোকটির সঙ্গে বৈকুণ্ঠ সাহার সম্পর্ক কী? আসবার সময় তাকে ধান জমি দেখিয়েছে বৈকুণ্ঠ; এখন বাড়িঘর দেখাচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটাই রাজেকের কাছে রহস্যময় লাগছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

কিছুক্ষণ পর আমিন সাহেবরা ফিরে এল। দাওয়ায় বসতে বসতে বৈকুণ্ঠ সাহা শুধলো, 'বাড়িঘর কেমুন দেখলেন?'

আমিন সাহেব বলল, 'ভাল।'

'পছন্দ হইছে তো?'

'হ্যাঁ।'

আমিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল বৈকুণ্ঠ সাহার। তাড়াতাড়ি রাজেকের দিকে ফিরে বলল, 'ভাল কথা, তর লগে তো আমিন সাহেবের আলাপ-সালাপই কইরা দেই নাই। উনি মুর্শিদাবাদের মানুষ, আমার বন্ধু। আমিন সাহেবকে বলল, 'আর ও হইল রাজেক মেঞা, বড় বিশ্বাসী মানুষ। আমরা যখন দ্যাশ ছাইড়া যাই অর উপুর বাড়িঘর জমিজিরাতের ভার দিয়া গেছিলাম। দ্যাখেন কেমুন সোন্দর পরি (পাহারা) দিয়া রাখছে।'

আমিন সাহেব কিছু বলল না; মাথা নাড়ল শুধু।

আলাপ-পরিচয়ের পর বৈকুণ্ঠ সাহা বলল, 'বুঝলি রাজেক, দ্যাশে আমরা আর ফিরুম না। হেইর লেইগা আমিন সাহেবরে লইয়া আইলাম। কেন আনছি বুঝছস?''

রাজেক মাথা নাড়ল। অর্থাৎ বোঝেনি।

চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে চাপা গলায় এবার বৈকুণ্ঠ সাহা বলল, 'আমার সকল সম্পত্তি আমিন সাহেবরে দানপত্তর কইরা দিমু। আসলে ব্যাপারটা কী জানস?'

'কী?'

'আমিন সাহেব ইন্ডিয়ায় থাকব না। মুর্শিদাবাদে তেনার ঘরদুয়ার খ্যাত-খামার যা আছে, আমারে দানপত্তর কইরা দিব। পাকিস্তানে আমার যা আছে, তেনারে দিমু। ব্যাপারটা অইল 'এচেঞ্জ' (এক্সচেঞ্জ); বাঙলায় কয় বিনিময়—'

রাজেক কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সেইসময় তোরাব আলীর দুই মাঝি এসে দাঁড়াল সামনে। বলল, 'লন মেঞাসাব, তরাতরি লন। আমাগো আইতে এট্টু দেরি হইয়া গেল—'

আমিন সাহেবকে সব সম্পত্তি দানপত্র করে দেবে বৈকুণ্ঠ সাহা। এ কথা শুনবার পরও তোরাব আলীর বাড়ি যাবার আর প্রয়োজন আছে কিনা রাজেক বুঝতে পারছে না। মোট কথা, গুছিয়ে কিছুই ভাবতে পারছিল না সে।

এদিকে মাঝি দুটো সমানে তাগাদা দিতে শুরু করেছে। হঠাৎ তোরাব আলীর সহৃদয় ব্যবহারের কথা মনে পড়ল রাজেকের। খাতির-যত্নের কথা মনে পড়ল। রাজেক ভাবল, শাদির ব্যাপারে এতদূর এগিয়ে এখন আর না-ও পিছোতে পারে তোরাব আলী।

একরকম ঘোরের মধ্যেই উঠে দাঁড়াল রাজেক। বৈকুণ্ঠ সাহাদের বলল, 'আপনেরা এট্টু বসেন সা-মশয়। আমি এট্টু ঘুইরা আসি—' বলে মাঝি দুটোর সঙ্গে গিয়ে নৌকোয় উঠল।

তোরাব আলীর বাড়ি আসতেই দেখা গেল বার-বাড়ির আসর একেবারে জমজমাট। মোল্লামুছুল্লিরা ইতিমধ্যেই এসে গেছে। সর্দারদের বাড়ি থেকে, খাঁয়েদের বাড়ি থেকে, মৃধাদের বাড়ি থেকে—ছিপতিপুর গ্রামের হেন বাড়ি নেই যেখান থেকে মান্যগণ্য লোকেরা এসে হাজির হয়নি।

রাজেক ঢুকতেই সাড়া পড়ে গেল। পিচকিরি দিয়ে প্রচুর গোলাপ জল ছিটানো হল। পান এল, তামাক এল, মিঠাই এল, ভুরভুরে আতর এল। ফাঁকে ফাঁকে ঠাট্টা-ঠিসারা চলল। রঙের কথায়, রসের কথায় হাসি উথলে উথলে উঠতে লাগল।

কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিল না রাজেক, দেখতে পাচ্ছিল না। নির্জীবের মতো বিহ্বলের মতো বসে ছিল সে।

তোরাব আলী লক্ষ্য করেছিল। মেজাজখানা আজ তার খুবই ভাল; মনে গোলাপী আভা লেগেছে। ভাবী জামাইকে একটু ঠাট্টা করার লোভ কিছুতেই সে সামলাতে পারল না। রাজেকের কাছে ঘন হয়ে বসে বলল, 'আইজের দিনে এমুন মনমরা ক্যান মেঞা? ব্যাপারখানা কী?'

ফস করে নিজের অজান্তেই রাজেক বলে ফেলল, 'আইজ বৈকুণ্ঠ সা' আইছে।'

তোরাব আলী চকিত হয়ে উঠল, 'বৈকুণ্ঠ সা' আইছে!'

'হ। লগে আমিন সাহেব বইলা একজনেরে আনছে। তারে নিকি জমিন-জিরাত বাড়িঘর লেইখা দিয়া যাইব।'

মুহূর্তে সমস্ত ঘরখানায় স্তব্ধতা নেমে এল। অনেকক্ষণ পর তোরাব আলী বলল, 'তাইলে শাদির কথার দরকার কী? খোদা যা করে ভালর লেইগাই করে। ভাগ্যি আইজই বৈকুণ্ঠ সা আইছে—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল এবং বড় বড় পা ফেলে ভেতরবাড়ির দিকে চলে গেল।

একটু পর একে একে মোল্লামুছুল্লিরা, গ্রামের গণ্যমান্য লোকেরা চলে গেল। ফাঁকা ঘরে একা একা অনেকক্ষণ বসে থেকে একসময় বাইরে চলে এল রাজেক।

তারপর দিন যায়, দিন আসে।

আবার পোলো নিয়ে, ধর্মজাল নিয়ে টোন সুতোর বঁড়শি নিয়ে খালে-বিলে-নদীতে নামল রাজেক, আবার হেমন্তের মাঠে শস্য কুড়োতে শুরু করল। দেখতে দেখতে তার পা ফেটে গেল, আঙুলের ফাঁকে থকথকে হাজা হল, চামড়া থেকে খই উড়তে শুরু করল।

মাছ আর শস্যকণার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে আজকাল রাজেক নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে আপনমনে বলে, 'দেশখান দু ভাগ হয়, সাহারা-ভুঁইমালীরা-যুগীরা গ্রাম ছাইড়া যায়, দ্যাশের এক রাজা যায়, আরেক রাজা আসে, তাতে তর কী রে, তর কী?'

দুর্গা এল বাপের বাড়ি

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

বড়ো রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে মোড় নিয়ে দুর্গার রিকশটা আটকে গেল। এগোনোর উপায় নেই। সামনে রাস্তা জুড়ে পুজোর মণ্ডপ বাঁধা হচ্ছে।

দুর্গা নেমে পড়ল রিকশ থেকে। ভাগ্যিস শুধু একটা ছোট সুটকেস এনেছে। মাত্র পুজোর এই কটা দিনের জন্যে এসেছে। কতই বা জিনিস লাগবে।

রিকশর ভাড়া মিটিয়ে মণ্ডপের পাশ দিয়ে দুর্গা এগোল।

'এই দুর্গা!' কে যেন ডাকল।

ফিরে তাকাল দুর্গা। মণ্ডপের পেছনে ছায়াতে বসে রানা আর নিখিল—বোধহয় ডেকরেটরদের বাঁধাবাঁধি তদারক করছে।

পুরোনো বন্ধুদের দেখে হাসি ফুটল দুর্গার মুখে। 'তোরা? কেমন আছিস?'

'যে তিমিরে সেই তিমিরে।' রানা কয়েক পা এগিয়ে এল। 'তোর কি খবর? বিয়ে করে বেশ রগরগে হয়েছিস দেখছি।'

খুশী হলো দুর্গা—লজ্জাও পেল। চট করে উত্তর দিতে পরল না।

'বরকে কোথায় রেখে এলি?' না নড়ে ওখান থেকেই প্রশ্ন করল নিখিল।

'কী করব বল? জানিস. তো এ-ই অসিতের সীজন—একবেলাও দোকান বন্ধ রাখার জো নেই' বলে সুটকেস হাতে পা বাড়াল দুর্গা।

বাড়িতেও সেই একই প্রশ্ন বারবার মুখে মুখে ফিরে আসে। একা কেন? বৌকে একবারটিও রেখে যেতে পারল না? নিতে আসবে তো? নিতে না হয় আসবে, তা বলে একা একা বৌকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে? কেউ কখনও দেয়? এ যেন রাগ করে মেয়ের বাপের বাড়ি চলে আসা। কাশীপুর থেকে যাদবপুর কী এমন দূর? আসতে-যেতে কতক্ষণ সময় নষ্ট হতো?

প্রশ্নের চোটে কান ঝালাপালা হওয়ার দাখিল। কেন? আমি কচি খুকী নাকি? কখনও কোথাও যাইনি একা একা? আরও কিছু বলতে গিয়ে দুর্গা থেমে গেল। এতদিন পর মা-বাবার কাছে এসেছে। সম্পর্ক তো প্রায় চুকিয়েই গিয়েছিল। বাড়িতে পা দিয়েই পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটার কোনও মানে হয় না।

বলল না, কিন্তু বলতে পারত। বিয়েটা তো একা একাই করেছিল। বাড়ির মত ছিল না। বরং বেশ জোরালো বাধা-ই ছিল। থাকবেই তো। অসিতের মধ্যে ওরা যে কিছুই দেখতে পায়নি। না ছিল কোন চাকরি, না রোজগারপাতি করার দিকে কোনরকম মতিগতি। সত্যি বলতে একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল হিসেবেই অসিত এ বাড়িতে প্রথম এসেছিল।

নিজে আসেনি, দুর্গাই নিয়ে এসেছিল। পাড়ার বন্ধুরা বললে, 'দুর্গা, তোদের বাড়িতে আমাদের একজন থাকবে—বেশি দিন না, এই শুধু কটা দিনের মামলা। কাশীপুরের

ছেলে—ওদিকে তো ভীষণ ধরপাকড় হচ্ছে।' একটু থেমে আবার যোগ করেছিল, 'রিক্স্ একটু আছে—'

'রিক্স্ না রে গাধা, রিস্ক' হেসে বলেছিল দুর্গা, 'তা বাপু রিস্ক্ টিস্ক্ না থাকলে আমি কোনও কিছুতে নেই।'

'সাবাস, দুর্গা, এ-ই তো চাই।'

কিন্তু মা কথাটা শুনেই খ্যাঁক করে উঠেছিল। 'ভেবেছ কী। ধরমশালা নাকি এটা? আসুন উনি—' ডেকচির কানায় হাতা ঠোকার শব্দে মায়ের বাকি কথাগুলো শোনা যায়নি।

'আসুক বাবা' বলে দুর্গাও উঠে গিয়েছিল পিঁড়ি ছেড়ে।

বাবা আপত্তি করেনি। সব শুনে ভাবার সময় নিয়েছিল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। আসতে দাও—বলেছে যখন—তা না হলে আবার—'

'তা না হলে আবার কী?'

'আবার কী হবে না হ'বে কে জানে? জলে বাঘ ডাঙায় কুমীর। কোন্ দিকে যাবে?' ভয় জড়ানো গলায় কথা বলতে বলতে বাবার হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল তিনিই বাড়ির কর্তা। চড়া গলায় বললেন, 'দিনকাল বুঝে চলতে হবে তো।'

সত্যি, কী ছিল সেসব দিনকাল। যখন তখন ফটাফট শুরু হয়ে যেত। জানলা দরজা বন্ধ। তবু বারুদের গন্ধ ভেসে আসত বাতাসে। চারদিক ফাঁকা ধূ ধূ—একটা কুকুরও নেই রাস্তায়। শুধু মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে সামনের গাছের গুঁড়ির গা ঘেঁসে ও বাড়ির আড়াল থেকে, ওদিকে পাঁচিলের পাশে কয়েক জোড়া জ্বলন্ত চোখ। সেই সঙ্গে মুহূর্তের জন্যে মাথার উপরে ঝাঁকড়া চুলগুলো দপদপ করে উঠত উড়ন্ত কালো আগুনের মতো।

খবর আসত কে কোথায় জখম হয়েছে, কোথায় কার লাশ পড়েছে। কিছু কিছু অবশ্য ভয়ের হাওয়াতে উড়ো খবর এক-একদিন রাত্তিরে সাপের জিবের মতো হেডলাইট লকলকিয়ে কালো ভ্যান এসে দাঁড়াত রাস্তার মোড়ে।

সেই সময়টাতেই সবচেয়ে তটস্থ হয়ে পড়ত। দুর্গার বাবা মা। এ বাড়িতে জোয়ান বয়সের ছেলে নেই। দুর্গা-ই বড়ো, তার পরে সুধা, সব ছোট দীপুকের বয়স আট। তবু ভয়। বাড়ির মধ্যে যে সবচেয়ে বিপজ্জনক বয়স নিয়ে বেপাড়ার অনাত্মীয় ছেলে অসিত লুকিয়ে আছে। কখন দরজায় ঘা পড়ে কে জানে।

শুধু দুর্গার মুখে বেপরোয়া হাসি। 'ভয়েই যে তোমরা আধমরা। এলে বলে দেবে, মেয়ে-জামাই আছে ও ঘরে— দেখতে চাও, দ্যাখো।'

সব ভয়-ভাবনা শেষ করে দিতেই বোধহয় ওরা একদিন এল। ফিরে গেল মেয়ে-জামাই দেখে। মিটমিটে আলোতে খেয়াল করেনি যে মেয়ের মাথায় সিঁদুর নেই।

তারপর যখন দিনকাল পালটে গেল, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে অসিতকে পাশে নিয়ে যখন দুর্গা প্রণাম করল বাবা-মাকে, তখন কিন্তু বাবা হঠাৎ ভীষণ রেগে গেল। তখন মা যদি না থামাত বাবাকে তাহলে নির্ঘাৎ একটা কাণ্ড হয়ে যেত। সারাক্ষণ কাছে কাছে দেখে অসিতের প্রতি মায়ের কেমন যেন একটা টান এসে গিয়েছিল ততদিনে। সেই যে অসিতের সঙ্গে চলে গিয়েছিল দুর্গা, তার পরে এই প্রথম এল। এসে শুনল, জামাই আসবে বলে বাবা শেয়ালদা থেকে বাজার করতে গেছেন। বাড়ি ফিরে মেয়ে একা এসেছে দেখে বাবা হতাশ হলেন কিনা বোঝা গেল না। বাবা কিন্তু একবারও বলল না, জামাই আসেনি কেন। বরং দুর্গার মনে হলো, কথা যেন একটু স্বস্তিই বোধ করল।

এতদিন পরে দুর্গা এসেছে বাড়িতে। আজ সবাই এক সঙ্গে খাওয়া, খেতে খেতে গল্প, খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া। 'ওর কারবার কেমন চলছে?' জানতে চাইল বাবা। 'শুনছি নাকি এবারে কেনাকাটার অবস্থা খুব খারাপ।'

'খারাপ বলে খারাপ।' বলল দুর্গা, 'ব্যাঙ্ক থেকে শর্ট টাইম লোন নিল, মাল তুলল ঘরে—তা ঘরের মাল ঘরেই পড়ে আছে। কী করে যে কী হবে বুঝছি না।' তার মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল।

'জিনিসপত্রের যা দাম কিনবে কে?' বাবার গলায় সহানুভূতি।

'কিন্তু ব্যাঙ্ক কি শুনবে?'

'দ্যাখো, এর মধ্যে যদি—'

'এই দুদিনে আর কী হবে?' একটু থেমে বলল, 'ভাবলে ভয় করে।' পাতে অন্যমনস্ক ভাবে ভাত নাড়াচাড়া করতে লাগল দুর্গা।

হঠাৎ সুধা বলল, 'তুই অনেক বদলে গেছিস দিদি।'

মা সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'বিয়ের পরে তুইও বদলে যাবি।'

ওরা ওইরকমই ভাবে—মুখ ধুতে ধুতে দুর্গার মনে হলো মেয়েদের জীবনের সমস্ত যেন বিয়ে বলে একটা ঘটনাকে ঘিরে।

কিন্তু সুধা? বিয়ে না করেই তো সুধা কত বদলে গেছে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে—আগে ছিল ভীষণ ছেলেমানুষ —খলখলে—এখন কেমন চুপচাপ আর গম্ভীর। আসার আগে দুর্গা ভেবেছিল এতদিন পরে দিদিকে পেয়ে কথার তোড়ে কানের পোকা বের করে দেবে। কিন্তু ও কাছেই ঘেঁসছে না। এ যেন তার সেই বোন সুধা নয়, ইস্কুলের ছাত্রী সুধা চক্রবর্তী। মায়ের বিছানাতে গড়াগড়ি খেতে খেতে ঘুমে চোখ জুড়ে এল দুর্গার।

'কীরে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

দুর্গা কোনমতে চোখ খুলে দেখল, মা এসে দাঁড়িয়েছে। বিছানার পাশে। এতক্ষণে রান্নাঘর তুলে পেড়ে আসার ছুটি পেল বোধহয়। 'মা, এস না এখানে', বলে এক ধারে সরে শুয়ে মাকে জায়গা ছেড়ে দিল অর্ধেকটা।

'এখানে শুলি?' বিছানাতে উঠতে উঠতে মা বলল, 'সুধাকে বলেছি : ও আমার কাছে শোবে, তুই ওর ঘরে।'

দুর্গার কানে খট করে লাগল কথাটা—ওর ঘরে। তার অনুপস্থিতির ফাঁকে ওই ঘরটা কখন সুধার ঘর হয়ে গেছে। চোখ বুজেই দুর্গা বলল, 'ওকে নাড়ানাড়ি কেন?'

'বা জামাই এলে তো সেই করতে হবে। তার চেয়ে—এ্যাদ্দিন পরে এলি—কষ্ট করে শুবি কেন? মেয়ের একখানি হাত কোলের উপর টেনে নিয়ে মা বলল, 'হ্যাঁ রে, এরকম খালি হাত-গলা কেন? 'কিছু দেয়নি নাকি?'

'দেবে না কেন?'

'পরিসনি যে?'

'ভালো লাগে না', বলে দুর্গা পাশ ফিরে শুল।

মেয়ের পাশে শুয়ে পড়ল মা। 'শ্বশুর শাশুড়ি মানুষ কেমন?'

'টাকাওয়ালা মানুষ যেমন হয় আর কি।' কী যেন ভেবে মা সাহস করে প্রশ্ন করল, 'বনিবনা আছে তোর সঙ্গে?'

'কে জানে!' পাছে আরও কিছুক্ষণ এভাবে মায়ের জেরা চলে তাই কৌতূহল মেটাবার জন্যেই তাড়াতাড়ি দুর্গা বলল, 'টাকা আছে তো আছে, তাতে আমাদের কী?

আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। ব্যস চুকে গেল।' দুর্গা ভেবেছিল, বন্ধুরা নিজে থেকেই আসবে। সকালে আসার সময় রানাদের সঙ্গে দেখা। খবরটা একান-ওকান হয়ে বিকেলের আগেই গোটা পাড়াতে ছড়িয়ে পড়ার কথা।

পাঁচটা বেজে গেল। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বেশি দূর যেতে হলো না। যা ভেবেছিল তা-ই। প্যান্ডেলেই পেয়ে গেল ওদের। 'এই যে দুর্গা—এসে পড়েছিস।' রানাই বলল। এতক্ষণ যেন দুর্গার জন্যে ওরা অপেক্ষা করছিল।

'বিকেলে এলি না যে বড়ো?

'আর বলিস না', কৈফিয়ত দিল রানা, 'এই তো সবে ঠাকুর এল।' ওদিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'শিবু, এই শিবু—দেখে যা কে এসেছে!' তারপর আবার দুর্গার উদ্দেশে রানা বলল, 'যাব কখন? আমার উপর ডেকোরেশনের ভার কিনা।'

'এ-ই করছিস আজকাল?'

'এ-ই মানে? আর কী ধরব। ছিনতাই? কাঁচিচালাই, চামচাবাজি?' পরপর জিজ্ঞেস করল রানা?

'আমি কি তা-ই বলেছি?' দুর্গা জিজ্ঞেস করল, 'ওসব ছাড়া দুনিয়াতে আর কোনও কাজ নেই করার?'

'কী আছে বল-না?'

দুর্গা হেসে বলল, 'কেন? প্রেম আছে—সেটাও তো একটা কাজ—প্রেম করতে পারিস না?

'প্রেম?' হেসে ফেলল রানা, 'মেয়ে কোথায়? তুই তো ড্যাংডেঙিয়ে অসিতের সঙ্গে চলে গেলি—একদম হিরোইন।'

'মারব এক চড়?' হেসেই হাত তুলল দুর্গা।

ততক্ষণে শিবু ভোলা আর গৌতম এসে পড়েছে।

'কী ব্যাপার দুর্গা? আসতে না আসতেই হাতাহাতি কি জন্যে? অসুর মারছিস নাকি?' বাধা দেওয়ার ভঙ্গিতে এগিয়ে এল ভোলা।

'দ্যাখ-না এই রানা শালা—ইয়ে সব বলছে', বলেই হাসল দুর্গা।

'ও, আমার বেলাতেই যত দোষ' রানা বলল, 'আর ওদিকে যে নিখিল সেই তোর চলে যাওয়ার পর থেকে মন-মরা হয়ে আছে। তার বেলা?'

দুর্গা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'আমি তার কী করব?'

'যেতে দে, যেতে দে', বলে উড়িয়ে দিল শিবু, যাক বাবা, তুই যখন এসে পড়েছিস, আর ভাবনা নেই। তোর জন্যে অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'কী কাজ?'

'আসামাত্র কাজের কথা কী আবার?'

ব্যাপারটা যেন গৌতম জানে, তাই চাপা দেওয়ার ভাব করে বলল, 'ওসব কাজ ফাজ পরে হবে। আগে তোর খবর বল।'

'আমার আবার খবর কী? ইস্কুল-বাড়ি আবার বাড়ি-ইস্কুল, ঘর-সংসার আর অভাব-অনটন—সংসারের টানাটানি' বলতে বলতে দুর্গা নিজেই হেসে উঠল। 'যাক গে, কাজের কথা কী বলছিলি, বল—শুনে রাখি।'

'কাজ মানে—' ইতস্তত করে শিবু বলল, 'এই পুজোর কিছু কাজ আর-কি!'

'ও, পুজোর কাজ?' দুর্গা শুনেই বলল, 'তা সে পরে হবে খন। কিন্তু আমায় কেন? আর কেউ নেই? গৌতম, ছায়ার খবর কী? ও নেই?'

'তুই জানিস না? ছায়া তো তোর মতোই কায়া ধরে পালিয়েছে,' খুশী-খুশী গলায় খবরটা দিল রানা।

'আর অরুণা?'

এবার গৌতম বলল, 'ডালহৌসিতে যা—গেলেই দেখতে পাবি!'

'কী চাকরি?'

'চাকরি কিসের? ফুটপাথে দোকান সাজিয়ে লটারির টিকিট বেচে', বলল শিবু।

'নিজের এদিকে পাথর-চাপা কপাল', গৌতম বলল, 'দিদি ওদিকে সবার কপাল সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিচ্ছে।'

ওরা কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলল মণ্ডপের আধো অন্ধকারের দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে দুর্গা জিজ্ঞেস করল, 'তোরা কেউ কিছু করছিস না?'

'চাকরি-বাকরি? আমরা? ছেলেদের কে দেবে? দেখছিস না এটা নারীমুক্তির বছর? এই দ্যাখ-না শিবুকে—দিদির ঘাড়ে বসে বসে খাচ্ছে', গড়গড় করে বলে গেল রানা।

'চন্দনের খবর জানিস?' অন্যের ঘাড়ে প্রসঙ্গটা চাপাতে চাইল শিবু।

'একদিন দেখা হয়েছিল শেয়ালদায়,' দুর্গা বলল, 'শেয়ালদার মোড়ে। কী একটা বিজনেস করছে বলল।'

'তোর মাথা', বলল ভোলা।

থমকে দাঁড়িয়ে দুর্গা প্রশ্ন করল, 'তার মানে?'

'চন্দন বিয়ে করেছে জানিস?'

'সে কী!' দুর্গা অবাক। 'কিছু বলল না তো!'

রানা শিবু ভোলা গৌতমের চোখে চোখে কী যেন একটা কথা হয়ে গেল।

এমন সময় ওদিক থেকে কেউ চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'রানা, এই শালা রানা, এদিকে আয়—অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে—আর কখন লাইটের কানেকশন দিবি?'

'তোরা কথা বল, আমি আসছি', বলে রানা চলে গেল।

দুর্গারা আবার উঠানে প্যায়চারি শুরু করল।

'কী ব্যাপার রে চন্দনের?' দুর্গা কৌতূহল চাপতে পারল না।

'ব্যাপার আর কি?' শিবু বলল, 'ওর বিয়েটাই ওর বিজনেস।'

ভোলা যোগ করল, 'বিয়ে করেছে মায়ের বয়সী একজনকে—কলেজের এক প্রফেসরকে। খাওয়া-পরার নো ভাবনা।'

'আশ্চর্য!' দুর্গা বলল, 'আমাদের দলের যারা—কেউ কিছু করছিস না?'

'শুধু দীপু—'

'কী কাজ?'

শিবু বলল, 'কাজ আবার কী! আই এ পাশ করে একটা পেট্রল পাম্পে—সোজা কথায় বড়ো লোকদের গাড়িতে তেল দিচ্ছে।'

'সে কী রে? বলিস কী!' অবাকের পরে দুর্গা অবাক।

'সবার কি তোর মতো কপাল হয় রে দুগ্‌গা', গৌতম দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বিয়ে করলি। বর পেলি। আবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ইস্কুল মাষ্টারীও জুটিয়ে ফেললি।'

'ও শুধু নামেই মাস্টারী—মাইনে যা পাই—'

'তবু তো একটা চাকরি। আর আমাদের?' গৌতম বলল, 'রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথা আবার ওমাথা থেকে এমাথা চষে ফেলা—এই আমাদের চাকরি।'

'সি এম ডি এ-র হয়ে সরেজমিনে তদন্ত', টিপ্পনী কাটল ভোলা।

হেসে উঠল দুর্গা, 'তাহলে বল বিনি মাইনের চাকরি।'

'চাকরি চাকরি। মাইনে আছে কি নেই, থাকলে কত এসব ফালতু বাত।'

অন্ধকার হয়ে গেছে। আলো জ্বলে উঠেছে দু পাশের জানলাতে জানলাতে। রাস্তার পোস্টে পোস্টে ঝুলছে বিদ্যুতের গলাকাটা লাশ। মধ্যে মধ্যে লোকজন, সঙ্গে স্ত্রী, কাচ্চাবাচ্চা রাস্তা জুড়ে আসা-যাওয়া করছে। বড়োদের ভঙ্গিতে পুজোর শেষ বাজারের অবসন্নতা, ছোটদের অস্থিরতা। ওবাড়ির রেডিয়োতে বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান ভেসে আসছে—আওয়াজটা কলিং-বেলের মতো সরে গেছে ঠিক জায়গা থেকে।

আর এরা তিনজন যুবক একজন যুবতী পুরোনো খবরের কাগজের খাড়াই পাতার মতো পঞ্চমীর বাতাসে আস্তে আস্তে দুলে দুলে খানিকটা ভেসে গিয়ে পাক খেয়ে আবার ভেসে গিয়ে পাক খেয়ে আবার ভেসে চলল রাস্তার ভাঁটিতে।

সবাই চুপচাপ, যেন সবার সব কথা ফুরিয়ে গেছে।

ওরা এগোতে এগোতে দেখল, মণ্ডপের দু'ধার দিয়ে হঠাৎ আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ল, চমকে উঠল মোড়ের মাথার কালোজাম গাছটার উঁচু পাতাগুলো।

'ওই আলো এসে গেছে' শিবু লাফিয়ে উঠল, 'চল দুর্গা, আমাদের ঠাকুর দেখবি না? গোষ্ঠ মালাকরের ঠাকুর।'

কে গোষ্ঠ মালাকর জানে না দুর্গা। তবু উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'তাই নাকি? চল তো, দেখিগে।'

ওরা প্যান্ডেলের সামনের দিকে এগোল। সেখানে তিন-চারজন এক বয়সী ছেলের জটলা। সকলের মুখই কম-বেশি চেনা। ওদের মধ্যে নিখিলকেও দেখতে পেল দুর্গা। একটু আগে শিবুর কথাটা মনে পড়ল, তাই এগোল না নিখিলের দিকে। আর নিখিলটাও আচ্ছা অভিমানী ছেলে! একবারও সামনে এসে দাঁড়াল না।

প্ল্যাটফর্মের উপর খাটো দুটো তার লাগানো বালব নিয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে কী যেন করছে রানা। ঠাকুরের কাজ এখনও অনেক বাকি—শাড়িই পরানো হয়নি। শুধু চালির উপর থেকে খুব জোরালো একটা বাল্ব জ্বেলে দেওয়া হয়েছে।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে দুর্গা বলল, 'বাঃ, খুব সুন্দর মুখখানি।'

'এরপর যখন রানার ডেকোরেশন পড়বে না', পাশ থেকে ভোলা বলল, 'দেখবি কী একখানা প্রতিমা।'

'সামনে একটা কিছু ঢাকা-ফাকা দিবি না?' প্রতিমার দিকে তাকিয়ে দুর্গার কীরকম অস্বস্তি করতে লাগল।

অমনই শিবু হেঁকে উঠল, 'এই রানা, সামনে টাঙাবার স্ক্রিনটা আনিসনি?'

ঘরঞ্চির ধাপ বেয়ে বেয়ে উঠছিল রানা—বোধহয় আর একটা পয়েন্ট-এ বাল্‌ব্ ঝোলাবার মতলব—ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'দাঁড়া, দাঁড়া, সব হবে—আগে আলোগুলো জ্বেলে নিই।'

রানাটা যেন কী। সামনে একটা স্ক্রিন টাঙিয়ে বাল্‌ব্‌গুলো জ্বালতে পারত না! দুর্গা জামগাছটার পাতায় আলোর ঝিকিমিকির দিকে তাকিয়ে বন্ধুদের বলল, 'চল, যাই।'

ঠিক তখনই দুর্গা ঘুরে দাঁড়াবার আগেই—জটলার থেকে সিগারেট টানতে টানতে নিখিল এসে দাঁড়াল সামনে, 'কী দুর্গা, নিজেকে দেখতে এলি?'

দুর্গা বলল, 'খুব সুন্দর ঠাকুর হয়েছে তোদের।'

'কোন্ দুর্গা বেশি সুন্দর?' নিখিলের পেছন পেছন যারা এসে দাঁড়িয়েছে তাদেরই কেউ একজন করল প্রশ্নটা।

'যে যেমন চোখে দেখে' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল নিখিল। বলেই সিগারেটটা ফেলে দিয়ে নিখিল বড়ো রাস্তার দিকে পা বাড়াল। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের উদ্দেশে বলল, 'একটা কাজ আছে, চলি। পরে দেখা হবে।'

ছেলেরা এর ওর দিকে চোখ টেপাটেপি করল। দুর্গা দেখেও দেখল না।

ভোলা বলল, 'চল দুগ্‌গা—আজ তুই আমাদের চা খাওয়াবি।'

'বারে, আমি কেন?' আকাশ থেকে পড়ল দুর্গা। 'কেন? তোদের পুজো ফান্ড নেই?'

'তুই রোজগার করিস—খাওয়াবি না মানে?' চোপা করল শিবু।

'সে যখন বাড়িতে আসবি, তখন।' দুর্গা গায়ে আঁচল টেনে কয়েক পা এগিয়ে বলল, 'এখানে চা খেতে হলে পুজো ফান্ড থেকে খা।'

'তাহলে হেড-টেল কর।'

'হেড-টেলই কর আর টেল-হেডই কর, আমি এখানে চা খাওয়াব না,' সাফ জানিয়ে দিল দুর্গা। আবার বলল, 'তার চেয়ে চল—যেমন পায়চারি করছিলাম, পায়চারি করি গে চল—স্বাস্থ্য ভালো হবে।'

'তুই অনেক বদলে গেছিস রে দুর্গা', বলল গৌতম।

ঠিক এই কথাটাই দুপুরে বলেছিল সুধা। কিন্তু সে এমন কী বদলে গেছে যে বারবার কথাটা শুনতে হবে তাকে? নাকি সে একাই বদলে গেছে? ওর কথার পিঠে দুর্গা জিজ্ঞেস করল, 'আর তোরা বদলাসনি?'

'আমরা আবার কী বদলেছি?' গৌতম বলল, 'যা ছিলাম তাই আছি।'

'তাই আছিস কিনা ভালো করে নিজেকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ।'

'তুই বল-না।'

দুর্গা বলল, 'আমি না হয় বিয়ে করেছি, অন্য পাড়ায় চলে গেছি, এক পদবী ছেড়ে অন্য পদবী নিয়েছি—আর তোরা? ক'বছর আগে কি তোরা এই ছিলি? এই পুজো, এই প্যান্ডেল, এই ডেকোরেশন, এইসব—'

থামিয়ে দিয়ে শিবু বলল, 'রাখ তোর লেকচারি। আমরা যে টিকে আছি এই ঢের।'

'তাহলে শুধু আমি বদলে গেছি বলার মানে কী?' দুর্গার গলায় একটা চাপা উত্তেজনা। 'যেন তোরা সবাই ঠিক আছিস, শুধু আমিই বদলে গিয়ে ভয়ানক অপরাধ করে ফেলেছি।'

'তোর বদলানো আর আমাদের বদলানো অন্যরকম', বলল শিবু।

'অন্যরকম?' দাঁড়িয়ে পড়ল দুর্গা। 'কী রকম শুনি?'

'আঃ, চটছিস কেন দুগ্‌গা?' ভোলা বলল, 'তোকে খ্যাপাবার জন্যে বলছে, বুঝছিস না? আসলে আমরা সবাই বদলে গেছি। তুইও জানিস, আমরাও জানি—মুখে মানি বা না মানি। তার চেয়ে চল—যেমন আড্ডা হচ্ছিল হাঁটতে হাঁটতে—কতদিন পর এরকম আড্ডা হচ্ছে বল?'

প্যান্ডেলের পেছনের দিক দিয়ে দুর্গাদের বাড়ির রাস্তা ধরে ওরা এগোল।

পাশাপাশি হাঁটছে তিনজন যুবক একজন যুবতী। আস্তে আস্তে হাঁটছে। কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না। হাঁটছে আর ভাবছে। ভাবছে কোন্ কথা বলা যায়। কথা খুঁজছে আর হাঁটছে। যেন ছেঁড়া পকেট গলে এই রাস্তায় কথাগুলো পড়ে গেছে।

দুর্গার বাড়ির সামনে পৌঁছে ওরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে। ভাবছে আবার কথা খুঁজতে খুঁজতে পিছু ফিরে যাবে কিনা, সেই পুজোর মণ্ডপ পর্যন্ত।

কাউকে ঠিক লক্ষ করে নয় কিংবা রাস্তার আলোতে আবছা অন্ধকারকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল দুর্গা, 'আসবি নাকি তোরা? এক রাউন্ড চা—'

'না, থাক আজকে', বলল কেউ একজন। কাঠের ফটক ঠেলে দুর্গা ঢুকল ভিতরে। রান্নাঘরে এসে মাকে বলল, 'একটু চা হবে নাকি মা?' অথচ খুব একটা চা খাওয়ার ইচ্ছেও করছিল না।

সংসারের এটা-ওটা টুকরো-টাকরা কথায় কথায় রাত্তিরের খাওয়ার সময় হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পরে আবার সবাই মিলে কিছুক্ষণ খুঁড়ে খুঁড়ে কথা বের করার চেষ্টা। তারপরে যখন হুসহাস করে হাই উঠতে লাগল, দুর্গা এ ঘরে এসে আলো জ্বালল। দেখল, মশারিটা আগেই টাঙানো আছে। সুইচ টিপে, আলো নিভিয়ে মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকল—ঘরের অন্ধকারে।

এ ঘর এখন সুধার। এক সময় এটা দুর্গার ছিল, এই ঘরের সবকিছুই—পুবের ওই জানালাটা, জানলাতে রোজ ঘুম-ভাঙানো কিশোর সকাল, গলিতে জেগে-ওঠা, আসা-যাওয়ার শব্দ, আপিস-বাজারের গল্পকথা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলল রক্তে। শুরু হলো জানলার নিচে ছায়ামূর্তিদের আনাগোনা, অন্ধকারে ফিসফিস করে নাম ধরে ডাকা, আগুনের ফুল ফোটার শব্দ, এদিকে ওদিকে চারদিকে, দূর থেকে গলি ধরে ছুটে-আসা অনেকগুলো পায়ের শব্দ, একটুক্ষণের জন্যে জানলার বাইরে থেমে আবার ছুটে ছুটে মিলিয়ে যেত, আর দুর্গা বিছানার নিচে খুব যত্ন করে লুকিয়ে রাখত দধীচির হাড়গুলো।

মশারি ফাঁক করে বিছানাতে ঢুকল দুর্গা। খুব সাবধানে ঢুকল যাতে আবার ফাঁক পেয়ে মশা না ঢুকে পড়ে। একটা ছোট্ট মশারও ঘুম তাড়াবার কী যে অসীম ক্ষমতা থাকে!

এই বিছানা এখন সুধার।

কেমন নরম মোলায়েম সমান।

দুর্গা জানে না, একেবারেই জানে না, এই বিছানার নিচে এখন সবুজ ঠাণ্ডা ঘাস আছে নাকি চাদর-তোষকে ঢাকা আছে নাম-না-জানা কোনও আগুন-নিবে-যাওয়া ছাই!

উত্তরের ব্যালকনি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ব্যালকনিতে দাঁড়ালে লোকটাকে দেখা যায়। উল্টোদিকের ফুটপাতে বকুলগাছটায় অনেক ফুল এসেছে এ-বার। ফুলে-ছাওয়া গাছতলা। সেইখানে নিবিড় ধুলোমাখা ফুলের মাঝখানে লোকটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, জামার রং ঘন নীল। পরনে একটা খাকি রঙের ফুলপ্যান্ট—লজ্জাকর জায়গাগুলিতে প্যান্টটা ছিঁড়ে হাঁ হয়ে আছে, মাথায় একটা ময়লা কাপড়ের ফগ্‌গে জড়ানো। পিঙ্গল দীর্ঘ চুলগুলি আস্তে-আস্তে জটা বাঁধছে। গালে দাড়ি বেড়ে গেছে অনেক, তাতে দু-চারটে সাদা চুল। গায়ে চিট ময়লা, কনুইয়ে ঘা, তাতে নীল মাছি উড়ে-উড়ে বসে। এই হচ্ছে লোকটা। দু-পা ছড়িয়ে নির্বিকার বসে আছে, দুই চোখে অবিরল ক্লান্তিহীন তাকিয়ে থাকে। ঘা থেকে উড়ে মাছিগুলি চোখের কোণে এসে বসে। লোকটা দু-হাত তুলে চেঁচিয়ে বলে—সরে যা, সরে যা, মেল ট্রেন আসছে।

পাগল।

সকালে ভাত খেয়ে একটা পান মুখে দেয় তুষার। সুগন্ধী জর্দা খায়। তারপর পিক ফেলতে আসে ব্যালকনিতে। ফুটপাতের ধারে কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার একটা ড্রাম আছে। অভ্যাসে লক্ষ্য স্থির হয়। তুষার একটু ঝুঁকে দোতলার ব্যালকনি থেকে সাবধানে পিক ফ্যালে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। পিকটা ঠিক গিয়ে পড়ে সেই ড্রামটায়। এদিক-ওদিক হয় না। অনেক দিনের অভ্যাস।

পিক ফেলে তুষার বকুলগাছের তলার সেই লোকটাকে একটু দ্যাখে। পাগল। তবু এখনও চেনা যায় অরুণকে। চেনা যায়? তুষার একটু ভাবে। কিন্তু অরুণের আগের চেহারাটা কিছুতেই সে মনে করতে পারে না। ফর্সা রং, ভোঁত নাক, বড় চোখ— এইরকম কতগুলি বিশেষণ মনে পড়ে, কিন্তু সব মিলিয়ে চেহারার যে যোগফল— সেই যোগফলটাই একটা মানুষ— সেই মানুষটার নাম ছিল অরুণ—সেই অরুণকে কিছুতেই সব মিলিয়ে মনে পড়ে না। তবু, তুষারের মনে হয়, এখনও অরুণকে চেনা যায়। কিন্তু আসলে বোধহয় তা নয়। অরুণকে আর চেনা যায় না বোধহয়। তবু, তুষারের যে অরুণকে চেনা মনে হয় তার কারণ, গত পাঁচবছর ধরে অরুণ ওই গাছতলায় বসে আছে। ওইখানে বসে থেকে-থেকেই তার চুল জট পাকাল, গালে দড়ি বাড়ল, গায়ে ময়লা বসল—এইসব পরিবর্তন হল অরুণের। রোজ দেখে দেখে সেই পরিবর্তনটা অভ্যস্ত লাগে তুষারের। তাই অনেক পরিবর্তনের ভিতরেও আজও অরুণকে চেনা লাগে তার।

পাগলটা মুখ তুলে তুষারের দিকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগল। তার চারদিকে শোষক নীল মাছি উড়ছে। পাগলটার চোখে এখন আর কিছু নেই। প্রথম প্রথম তুষার ওই চোখে ঘৃণা আক্রোশ প্রতিশোধ—এইসব কল্পনা করত। ব্যালকনি

থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসত ঘরে, পারতপক্ষে ব্যালকনির দরজা খুলত না। কিন্তু আস্তে-আস্তে তুষার বুঝে গেছে, পাগলটার চোখে কিছু নেই। কেবল অবিন্যস্ত চিন্তারাশি বয়ে যায় মাথার ভিতর দিয়ে, ওর চোখ কেবল সেই প্রবহমানতাকে লক্ষ করে অসহায় শূন্যতায় ভরে ওঠে। তুষার এখন তাই পাগলটার দিকে নির্ভয়ে চেয়ে থাকতে পারে। কোনও ভয় নেই।

পাগল মাতাল আর ভূত— অনেক ভয়ের মধ্যে এই তিনটের ভয় সবচেয়ে বেশি ছিল কল্যাণীর। তার বিশ্বাস ছিল, বাসার বাইরে যে বিস্তৃত অচেনা পৃথিবী, সেখানে গিজ গিজ করছে পাগল আর মাতাল। আর চারপাশে যে অদৃশ্য আবহমণ্ডল, তাতে বাস করে ভূতেরা, অন্ধকারে একা-ঘরে দ্যাখা দেয়।

কোনও পাগলের চোখের দিকে কল্যাণী কখনও তাকায়নি। এখন তাকায়। ভয় করে না কি? করে। তবু অভ্যাসে সব পারে।

পান খাওয়ার পর অভ্যাসমতো বাথরুমে গিয়ে মুখ কুলকুচো করে আসে তুষার। তারপর একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খায়। পানে খয়ের খায় না বলে ওর ঠোঁট লাল হয় না। তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে সাবধানে ঠোঁট মোছে তুষার। প্যান্ট-শার্ট পরে। তারপর অফিসে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময়ে অভ্যাসমতো বলে—সদরের দরজাটা বন্ধ করে দাও।

কল্যাণী সদর বন্ধ করে।

শোওয়ার ঘরের মেঝেতে বসে জলের গ্লাস, রঙের বাক্স ছড়িয়ে কাগজে ছবি আঁকছে তাদের পাঁচবছর বয়সের মেয়ে। সোমা এখনও কেবল গাছ, লতাপাতা আঁকে। আর আঁকে খোঁপাসুদ্ধু মেয়েদের মুখ। বয়সের তুলনায় সোমার আঁকার হাত ভালই। আর আঁকা গাছপালা, মুখ সব প্রায় একইরকমের হয়, তবু মেয়েটা বিভোর হয়ে আঁকে। সারাদিন।

আজও লম্বা নিমপাতার মতো পাতাওয়ালা একটা গাছ আঁকছে সোমা। একটু দাঁড়িয়ে সেটা দেখল কল্যাণী। তারপর বলল, স্নান করতে যাবি না?

—যাচ্ছি মা, আর একটু—

মেয়ের ওই এক জবাব।

— বড্ড অনিয়ম হচ্ছে তোমার। ওই সব আজেবাজে এঁকে কী হয়?

—এই তো মা, হয়ে এল— বিভোর সোমা জবাব দেয়।

—সামনের বছর স্কুলে ভর্তি হবে যখন, তখন দেখবে। সময়মতো স্নান-খাওয়া, সময়মতো সবকিছু। এইসব তখন চলবে না।

বলতে-বলতে কল্যাণী অলস পায়ে তুষারের স্নান-করা ভেজা ধুতিটা হাতে নিয়ে ব্যালকনিতে আসে।

যখন তুষার থাকে, তখন কখনও কল্যাণী ব্যালকনিতে আসে না। সারা সকাল রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট যায় খুব, তুষারকে খাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে কল্যাণী অবসর পায়। স্নানের আগে বাঁধা চুল খুলতে-খুলতে অলস পায়ে এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। তাকায়।

আকীর্ণ ধুলোমাখা ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। বসে আছে অরুণ।

ব্যালকনিটা উত্তরে। গ্রীষ্মের রোদ আছে। কল্যাণীর গায়ে রোদ লাগল, সেই রোদ বোধহয় কল্যাণীর গায়ের আভা নিয়ে ছুটে গেল চরাচরে। পাগলটা বকুলগাছের নিবিড় থেকে মুখ তুলে তাকাল।

এখন কল্যাণী পাগলের চোখে চোখ রাখতে পারে। ভয় করে না কি? করে। তবু, অভ্যাস। পাঁচবছর ধরে পাগলটা বসে আছে ওই বকুলগাছের তলায়। পাঁচবছর ধরে উত্তরের এই ব্যালকনিটাকে লক্ষ করছে ও। ভয় করলে কি চলে?

কল্যাণী গ্রীষ্মের রোদে ব্যালকনির রেলিং থেকে তুষারের ভেজা ধুতিটা মেলে দেয়। তারপর দাঁড়িয়ে চুল খোলে, অলস আঙুলে ভাঙে চুলের জট।

পাগলটা তাকিয়ে আছে।

এখান থেকেই দেখা যায়, ওর ফাঁক-হয়ে-থাকা মুখের ভিতরে নোংরা হলদে দাঁত, পুরু ছাতলা পড়েছে। ঘুমের সময়ে নাল গড়িয়ে পড়েছিল বুঝি, গালে শুকিয়ে আছে সেই দাগ। দুর্গন্ধী মুখের কাছে উড়ে উড়ে বসছে নীল মাছি।

ওই ঠোঁট-জোড়া ছ-সাতবছর আগে কল্যাণীকে চুমু খেয়েছিল একবার। একবার মাত্র। জীবনে ও-ই একবার। তাও জোর করে। এখন ওই নোংরা দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই কথা ভাবলে বড় ঘেন্না করে।

দুপুর একটু গড়িয়ে গেলে ঠিকে-ঝি মঙ্গলা এসে কড়া নাড়ে। তখন ভাত-ঘুমে থাকে কল্যাণী। ঘুম-চোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। মঙ্গলা যখন রান্না ঘরের এঁটোকাটা মুক্ত করতে থাকে, তখন কল্যাণী রোজকার মতোই ঘুম-গলায় বলে— ভাতটা দিয়ে এসো।

নিয়ম। প্রথম যখন পাগলটা ওই গাছতলায় এল, তখন এই নিয়ম ছিল না। পাগল চিৎকার করত, আকাশ-বাতাসকে গাল দিত। চিৎকার করে হাত তুলে বলত, টেলিগ্রাম........ টেলিগ্রাম......... তখন ঘরের মধ্যে তুষার আর কল্যাণী থাকত কাঁটা হয়ে। পাগলটা যদি ঘরে আসে! যদি আক্রমণ করে! তারা পাপবোধে কষ্ট পেত। অকারণে ভাবত অরুণের প্রতি তারা বড় অবিচার করছে। কিন্তু আসলে তা নয়। অরুণকে কখনও ভালবাসেনি কল্যাণী, সে ভালবাসত তুষারকে। অরুণের সঙ্গে তুষারের তাই কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। তুষারের ছিল সহজ জয়। অরুণের ছিল পৃথিবী হারানোর দুঃখ। সেই দুঃখ তার দুর্বল মাথা বহন করতে পারেনি। তাই লোভ, ক্ষোভ, আক্রোশবশত সে এসে বসল, তুষার-কল্যাণীর সংসারের দোরগোড়ায় চৌকি দিতে লাগল, চিৎকার করতে লাগল। সংসারের ভিতরে তুষার আর কল্যাণী ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, দরজা-জানলা খুলত না।

—চলো, অন্য কোথাও চলে যাই। কল্যাণী বলত।

—গিয়ে লাভ কী? ও ঠিক সন্ধান করে সেখানেও যাবে।

আস্তে-আস্তে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল। অরুণ গাছতলা পর্যন্ত এল। তুষার-কল্যাণীর সংসারে দোরগোড়ায় বসে রইল। কিন্তু তার বেশি এগোল না। চিৎকার করত, কিন্তু কল্যাণীর নাম উচ্চারণ করত না, তুষারেরও না। লোকে তাই বুঝতে পারল না, পাগলটা ঠিক এখানেই কেন থানা গেড়েছে।

ভয় কেটে গেলে মানুষের মমতা জন্মায়।

তুষার একদিন বলল, ওকে কিছু খেতে দিয়ো। সারাদিন বসে থাকে।

—কেন?

—দিয়ো। ওতো কোনও ক্ষতি করছে না। বরং ওর ক্ষতি হয়েছে অনেক। আমরা একথালা ভাতের ক্ষতি স্বীকার করি না কেন।

সেই থেকে নিয়ম। কল্যাণী দু-বেলা ভাত বেড়ে রাখে। ঠিকে-ঝি দুপুর গড়িয়ে আসে। অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত, অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে জল দিয়ে আসে। পাগলটা খিদে বোঝে। তাই গোগ্রাসে খায়, জল পান করে। অবশ্য খেতে খেতে কিছু ভাত ছড়িয়ে দেয়, কাকেরা উড়ে উড়ে নামে, চেঁচায়, নীলমাছির ভিড় জমে যায়। খাওয়ার শেষে পাগলটা এঁটো হাত নিশ্চিন্ত মনে জামায় মোছে। গাছের গুঁড়িতে মাথা হেলিয়ে ঘুমোয়।

ঘুমোয়! না, ঠিক ঘুম নয়। একধরনের ঝিমুনি আসে তার। আর সেই ঝিমুনির মধ্যে অবিরল বিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোত কুল-কুল করে তার মাথার ভিতর দিয়ে বয়ে যায়। চোখ বুজে সে সেই আশ্চর্য স্রোতস্বিনীকে প্রত্যক্ষ করে।

মঙ্গলা আপত্তি করত, আমি ভিখিরির এঁটো মাজতে পারব না, মা।

মাইনের ওপর তাকে তাই উপরি তিনটে টাকা দিতে হয়।

মঙ্গলা ভাত দিয়ে নিয়ে পাগলটার সামনে ধরে দেয়। তারপর একটু দূরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় গাল পাড়ে—হাভাতে, পাগল, রোজ ভাতের লোভে বসে থাকা। কপালও বটে তোর, এমন বাসার সামনে আস্তানা গাড়লি যে তারা তোকে সোনার চোক্ষে দেখল।

ভাতঘুমে রোজই কল্যাণী মঙ্গলার গাল শুনতে পায়।

আগে আলাদা ভাত যত্ন করে বেড়ে দিত কল্যাণী। ক্রমে সেইসব যত্ন কমে এসেছে। এখন তুষারের পাতের ভাত, সোমার ফেলে-দেওয়া মাছের টুকরো, নিজের ভুক্তাবশেষ সবই অ্যালুমিনিয়ামের থালাটায় ঢেলে দেয়। পাগলটা সব খায়।

গতবছর একটা প্রমোশন হয়েছে তুষারের। জুনিয়র থেকে এখন সে সিনিয়র একজিকিউটিভ। নিজের কোম্পানির দশটা শেয়ার কিনেছে সে। ফলে সারাদিন তার দম ফেলার সময়ই নেই।

বিকেলের আলো জানালার শার্সিতে ঘরে আসে। তখন এয়ারকন্ডিশন-করা ঘরখানায় সিগারেটের ধোঁয়া জমে ওঠে। কুয়াশার মতো আবছা দ্যাখায় ঘরখানা। তখন খুব মাথা ধরে তুষারের। ঘাড়ের একটা রগ টিকটিক করে নাড়ে। অবসন্ন লাগে শরীর। সিগারেটে-সিগারেটে বিস্বাদ, তেতো হয়ে যায় জিব। চেয়ার ছেড়ে উঠবার সময়ে প্রায়ই টের পায়, দুই পায়ে খিল ধরে আছে। চোখে একটা আঁশ-আঁশ ভাব।

অফিসের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেবল বেকায়দায়-আটকে থাকা তার ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটি তাড়াতাড়ি তার কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। ঘর ঝাঁট দিচ্ছে জমাদার। চাবির গোছা হাতে দারোয়ান এ-ঘর ও-ঘর তালা দিচ্ছে।

দীর্ঘ জনশূন্য করিডোর বেয়ে তুষার হাঁটতে থাকে। নরম আলোয় সুন্দর করিডোরটিকে তখন তার কলকাতার ভূগর্ভের ড্রেন বলে মনে হয়।

বাইরে সুবাতাস বইছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে এই প্রথম ফুসফুস ভরে বাতাস টানে সে। কোন-কোনওদিন এইখানে দাঁড়িয়েই ট্যাক্সি পেয়ে যায়। আবার কোন-কোনওদিন খানিকটা হাঁটতে হয়।

আজ ট্যাক্সি পেল না তুষার। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপরে হাঁটতে লাগল।

একটা বিশাল বাড়ির কাঠামো উঠছে। দশ কি বারোতলা উঁচু লোহার খাঁচা। ইট কাঠ বালি আর নুড়ি-পাথরের স্তূপ ছড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে কংক্রিট-মিক্সার, ক্রেন-হ্যামার উটের মতো গ্রীবা তুলে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা প্রায় জনশূন্য, কুলিদের একটা বাচ্চাছেলে পাথর কুড়িয়ে ক্রমান্বয়ে একটা লোহার বিমের গায়ে টং-টং করে ছুঁড়ে মারছে। ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দটা শোনে তুষার। শুনতে-শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ওই তুচ্ছ শব্দটি—ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম—তার মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সে আবার ফিরে তাকায়। লোহার প্রকাণ্ড, ভয়ঙ্কর সেই কাঠামোর ভিতরে-ভিতরে দিনশেষের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। চারদিকে আকীর্ণ আবর্জনার মতো ইট-কাঠ-পাথরের স্তূপ। ঘণ্টাধ্বনিপ্রতিম শব্দটি সেই অন্ধকার কাঠামোয় প্রতিধ্বনিত হয়ে ছুটে আসছে।

ওই শব্দ যেন কখনও শোনেনি তুষার। তার শরীরের অভ্যন্তরে অবদমিত কতগুলি অনুভূতি দ্রুত জেগে ওঠে। তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে; ছুটি চাই, ছুটি চাই। মুক্তি দাও, অবসর দাও।

কীসের ছুটি! কেন অবসর! পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে। কিন্তু উত্তর পায় না। প্রতিদিন নিরবচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে ডুবে থাকা—এ তার ভালই লাগে। ছুটি নিলে তার সময় কাটে না। বেড়াতে গেলে তার অফিসের জন্য দুশ্চিন্তা হতে থাকে। কাজের মানুষদের যা হয়।

তবু সে বুঝতে পারে, তার মধ্যে এক তীব্র অনুভূতি তাকে বুঝিয়ে দ্যায়, কী রহস্যময় বন্ধন থেকে তার সমস্ত অস্তিত্ব মুক্তি চাইছে। ছুটি চাইছে। চাইছে অবসর। সে তন্ন-তন্ন করে নিজের ভিতরটা খুঁজতে থাকে। কিছুই খুঁজে পায় না। কিন্তু তীব্র অজানা ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষায় তার মন মুচড়ে ওঠে।

আবার সে পিছন ফিরে সেই লোহার কাঠামো দূর থেকে দেখে। সেখানে অন্ধকার জমে উঠেছে। একটা বাচ্চা ছেলে অদৃশ্য এখনও পাথর ছুঁড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে।

চৌরঙ্গীর ওপরে তুষার ট্যাক্সি পায়।

—কোথায় যাবেন?

ঠিক বুঝতে পারে না তুষার, কোথায় সে যেতে চায়। একটু ভাবে, তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে—সোজা চলুন।

গাড়ি সোজা চলতে থাকে দক্ষিণের দিকে, যেদিকে তুষারের বাসা। সেদিকে যেতে তুষারের ইচ্ছে করে না। বাড়ি ফেরা—সেই একঘেয়ে বাড়ি ফেরার কোনও মানে হয় না!

সে ঝুঁকে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে—সামনের বাঁ-দিকের রাস্তা।

এলগিন রোড ধরে ট্যাক্সি ঘুরে যায়।

কোথায় যাব? কোথায়? তুষার তাড়াতাড়ি ভাবতে থাকে। ভাবতে-ভাবতে মোড়ে এসে যায়। এবার? ভিতরে সেই তীব্র ইচ্ছা এখনও কাজ করছে। অন্ধকারময় একটা বাড়ির কাঠামো—লোহার বিমে নুড়ি ছুঁড়ে মারার শব্দ—তুষারের বুক ব্যথিয়ে ওঠে। মনে হয়—কেবলই মনে হয়— কী একটা সাধ তার পূরণ হয়নি। এক রহস্যময় অস্পষ্ট মুক্তি বিনা বৃথা চলে গেল জীবন।

সে আবার বলে—বাঁয়ে চলুন।

ট্যাক্সি দক্ষিণ থেকে আবার উত্তর মুখে এগোতে থাকে। আবার সার্কুলার রোড। গাড়ি এগোয়। ভিতরে-ভিতরে ছটফট করতে থাকে তুষার।

একটা বিশাল পুরনো বাড়ি পেরিয়ে যচ্ছিল গাড়ি। তুষার সেই বাড়িটাকে দেখল। কী একটা মনে-পড়ি-পড়ি করেও পড়ল-না। আবার বাড়িটা দেখল। হঠাৎ পাঁচ-সাতবছর আগেকার কয়েকটা দুরন্ত দিনের কথা মনে পড়ল। নিনি। নিনিই তো মেয়েটির নাম।

গাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল, তুষার গাড়ি ঘোরাতে বলল।

সেই বিশাল পুরনো বাড়িটার তলায় এসে থামে গাড়ি।

হাতে সদ্য-কেনা এক-প্যাকেট দামি সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে সেই পুরনো বাড়ির তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে তুষার ভাবে—এখনও নিনি আছে কি এখানে? আছে তো।

বাড়িটায় অসংখ্য ঘর আর ফ্ল্যাট। ঠিক ঘর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তার ওপর পাঁচ-সাতবছর আগেকার সেই নিনি এখনও এখানে আছে কি না সন্দেহ যদি না-থেকে থাকে তবে ভুল করে ঢুকে বিপদে পড়বে না তো তুষার?

একটু দাঁড়িয়ে, ভেবে, একটু ঘুরে-ফিরে দেখে, তুষার ঘরটা চিনতে পারল। দরজা বন্ধ, বুক কাঁপছিল, তবু দরজায় টোকা দিল তুষার।

দরজা খুললে দেখা গেল, নিনিই। অবিকল সেইরকম আছে। চিনতে পারল না, ভ্রূ তুলে ইংরেজিতে বলল—কাকে চাই?

তুষার হাসল—চিনতে পারছ না?

নিনি ওপরের দাঁতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু ভাবল। তুষার দেখল ডানদিকের একটা দাঁত নেই। সেই দাঁতটা বাঁধানো, দাঁতের রং মেলেনি। পাঁচবছরে অন্তত এইটুকু পাল্টেছে নিনি।

—আমি তুষার।

নিনির মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এবার বাংলায়—আঃ, তুমি কি সেইরকম দুষ্টু আছ। বুড়ো হওনি?

আগে বলো, তুমি সেই নিনি আছ কি না। তোমার স্বামী-পুত্র হয়নি তো। হয়ে থাকলে দোরগোড়া থেকেই বিদায় দাও।

নিনি ঠোঁট উল্টে বলল—আমার ওসব নেই। এসো।

ঘরে সেই রঙিন-কাগজে-ছাওয়া দেওয়াল। ভাড়া-করা ওয়ার্ডরোব, মেয়েলি আসবাবপত্র। এখন সেন্ট-পাউডার ফুলের গন্ধ ঘরময়। বিছানার মাথার কাছে গ্রামোফোন, টেবিলে রেডিয়ো আর গিটার।

নিনি কয়েক পলক তাকিয়ে বলল— তুমি একটুও বদলাওনি।

—তুমিও।

কিন্তু তুষারের ভিতরে তীব্র ইচ্ছাটা এখনও অস্থির অন্ধের মত বেরোবার পথ খুঁজছে। সে কি এইখানে তৃপ্ত হবে? হবে তো? উত্তেজনায় অস্থিরতায় সে কাঁপতে থাকে।

ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলে সাবধানে গুপ্ত জায়গা থেকে একটা দামি মদের বোতল বের করে নিনি, তারপর হেসে বলে—এই মদ কেবল আমার বিশেষ অতিথিদের জন্য।

এই সবই তুষারের জানা ব্যাপার। ওই যে গোপনতার ভান করে দামি বোতল বের করা, ওটুকু নিনির জীবিকা। তুষারের মনে আছে, নিনি বার-বার তাকে এই বলে সাবধান করে দিত— মনে রেখো, এটা ভদ্র জায়গা। আর আমি বেশ্যা নই। মাতাল হোয়ো না, হুল্লোড় কোরো না।

তুষার হাসল। সে বার-বার নিনির কাছে মাতাল হয়ে হুল্লোড় করেছে।

তুষার আজ মাতাল হওয়ার জন্য উগ্র আগ্রহে প্রস্তুত ছিল। একটুতেই হয়ে গেল। তখন তীব্র মাদকাময় একটা গৎ গিটারে বাজাচ্ছিল নিনি। ওত পেতে অপেক্ষা করছিল তুষার। বাজনার সময় নিনিকে ছোঁয়া বারণ। বাজনা থামলে তারপর—

ভিতরের তীব্র ইচ্ছেটা গিটারের শব্দে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

মুক্তি। সামনেই সেই মুক্তি। চোখের সামনে আবার সেই খাড়া বিশাল লোহার কাঠামোতে ঘনায়মান অন্ধকার, লোহার বিমে নুড়ির শব্দ।

বাজনা থামতেই বাঘের মতো লাফ দিল তুষার।

তীব্র আশ্লেষ, ইচ্ছা, আনন্দময় আবরণ-উন্মোচন; তারই মাঝখানে হঠাৎ ব্যথায় ককিয়ে ওঠে নিনি—থামো থামো, আমার বড় ব্যথা—

তুষার থামে —কী বলছ?

নিনি ঘর্মাক্ত মুখে ব্যথায় নীল মুখ তুলে বলে—এইখানে বড় ব্যথা—

পেটের ডান-ধার দেখিয়ে বলে—গতবছর আমার একটা অপারেশন হয়েছিল। অ্যাপেন্ডিসাইটিস—

তুষারের স্খলিত হাত পড়ে যায়। পাঁচবছরে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সবকিছু কি আর ফিরে পাওয়া যায়?

সময় পেরিয়ে গেল, তুষার ফিরল না।

বিকেলে চুল বেঁধেছে কল্যাণী। সেজেছে। চায়ের জল চড়িয়েছিল, ফুটেফুটে সেই জল শুকিয়ে এসেছে। গ্যাসের উনোন নিভিয়ে কল্যাণী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। উত্তরের ব্যালকনি, উল্টোদিকে ফুটপাতে সেই বকুলগাছ, গাছতলায় ধুলো-মাখা আকীর্ণ ফুলের মধ্যে বসে আছে পাগলটা। একটু দূরে বসে একটা রাস্তার কুকুর পাগলটাকে দেখছে।

দৃশ্যটাকে করুণ বলা যায়। আবার বলা যায়ও না। অরুণকে নিয়ে এখন আর ভাববার কিছু নেই। এখন সে রাস্তার পাগল। মুক্ত পুরুষ।

এখন ব্যালকনিটা অন্ধকার। পিছনে ঘরের আলো। তাই রাস্তা থেকে কল্যাণীকে ছায়ার মতো দেখায়। পাগলটা মুখ তুলে ছায়াময়ী কল্যাণীকে দেখে। টুপটাপ বকুল ঝরে পড়ে। অবিরল। পাগলটা হাত বাড়িয়ে ফুল তুলে নেয়। লম্বা নোংরা নখে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে ফুল। পুরনো বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে অনেকক্ষণ হল রাস্তায় নেমে এসেছে তুষার। তখনও নির্জন শেক্সপিয়র সরণি, চলাচলকারী মানুষের মধ্যে চৌরঙ্গী রোড ধরে বহুক্ষণ ধরে হাঁটল সে। এখনও মাঝে মাঝে উঁচু বাড়ির লোহার কাঠামোর ভিতরে ঘনায়মান অন্ধকার তার মনে পড়ছে, মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছে নেপথ্যে কে যেন নুড়ি ছুঁড়ে মারছে লোহার বিমের গায়ে। তার মন বলছে এখানে নয়, এখানে নয়। চলো সমুদ্রে যাই। কিংবা চলো পাহাড়ে. ছুটি নাও। মুক্তি নাও। বৃথা বয়ে যাচ্ছে সময়।

কেন যে এই ভুতুড়ে মুক্তির ইচ্ছা? সে কি চাকরি করতে-করতে ক্লান্ত? সে কি সংসারের একঘেয়েমি আর পছন্দ করছে না? কল্যাণীর আকর্ষণ সব কি নষ্ট হয়ে গেল?

বেশ রাত করে সে বাড়ি ফিরল।

সোমা ঘুমিয়ে পড়েছে। কল্যাণী দরজা খুলে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—মদ খেয়েছ?

—খেয়েছি।

—আর কোথায় গিয়েছিলে?

—কোথায় আবার?

কল্যাণী বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে।

ভারি বিরক্ত হয় তুষার—কাঁদছ কেন? মদ তো আমি প্রথম খাচ্ছি না। আমাদের যা স্ট্রেইন হয় তাতে না-খেলে চলে না—

কাঁদতে-কাঁদতেই হঠাৎ তীব্র মুখ তোলে কল্যাণী—শুধু মদ! মেয়েমানুষের কাছে যাওনি? তোমার ঠোঁটে-গালে-শার্টে লিপিস্টিকের দাগ—তোমার গায়ে সেন্টের গন্ধ— যা তুমি জন্মে মাখো না—

তুষার অপেক্ষা করতে লাগল। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

অনেক রাত হল আরও। বেশ পরিশ্রম করতে হল তুষারকে। তারপর রাগ ভাঙল কল্যাণীর। উঠে ভাত দিল।

বাইরে বকুলগাছের তলায় তখন পাগলটা অনেকগুলো ফুল নখে ছিঁড়ে স্তূপ করেছে। উগ্র চোখে সে চেয়ে আছে ব্যালকনিটার দিকে। ঘরের দরজা বন্ধ। তার খিদে পেয়েছে। মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে বলছে—অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার! কোই হ্যায়?

সেই ডাক শুনতে পেল তুষার। খেতে-খেতে জিগ্যেস করল—পাগলটাকে রাতের খাবার দাওনি?

—কী করে দেব? মঙ্গলা রোজ রাতে আসে খাবারটা দিয়ে আসতো। আজ আসেনি, ওর ছেলের অসুখ।

—আমার কাছে দাও, দিয়ে আসছি।

—তুমি দেবে? অবাক হয় কল্যাণী।

—নয় কেন?

—শুধু দিয়ে আসা তো নয়! বাবুর খাওয়া হলে এঁটো বাসন নিয়ে আসতে হবে। পাগলের এঁটো তুমি ছোঁবে?

তুষার হাসল—তোমার জন্য ও অনেক দিয়েছে, ওর জন্য আমরা কিছু দিই—

থালায় নয়, একটা খবরের কাগজে ভাত বেড়ে দিল কল্যাণী। তুষার সেই খবরের কাগজের পোঁটলা নিয়ে বকুলগাছটার তলায় এল।

পাগলটা তুষারের দিকে তাকালও না। হাত বাড়িয়ে পোঁটলাটা নিল। খুলে খেতে লাগল গোগ্রাসে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা সিগারেট খেতে-খেতে দেখতে লাগল তুষার।

—খাওয়া ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝ না অরুণ?

পাগলটা মুখ তুলল না। তার খিদে পেয়েছে। সে খেতে লাগল।

—ওইখানে, ওই ব্যালকনিতে মাঝে-মাঝে কল্যাণী এসে দাঁড়ায়। তাকে দ্যাখো না? তার বাঁ-গালে সেই সুন্দর কালো আঁচিলটা এখনও মাছির মতো বসে থাকে, দ্যাখো না? এখনও আগের মতোই ভারী তার চোখের পাতা, দীর্ঘ গ্রীবা, এখনও তেমনি উজ্জ্বল রং। চেয়ে দ্যাখো না, অরুণ?

পাগল গ্রাহ্যও করে না। তার খিদে পেয়েছে। সে খাচ্ছে।

আকাশে মেঘ করেছে খুব। তুষার মুখ তুলে দেখল। পিঙ্গল আকাশ, বাতাস থম ধরে আছে। ঝড় উঠবে। এই ঝড়-বৃষ্টির রাতেও বাইরেই থাকবে পাগল। হয়তো কোনও গাড়ি-বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াবে। ঝড় খাবে। আর অবিরল নিজের মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্ন চিন্তার এক স্রোতস্বিনীকে প্রত্যক্ষ করবে।

—তোমার কোন নিয়ম না মানলেও চলে, তবু কেমন নিয়মে বাঁধা পড়ে গেছ, অরুণ? তোমার মুক্তি নেই?

ডাল-তরকারিতে মাখা কাগজটা ছিঁড়ে গেছে। ফুটপাতের ধুলোয় পড়েছে ভাত। পাগল তার নোংরা হাতে, নখে খুঁটে খাচ্ছে। একটা রাস্তার কুকুর বসে আছে অদূরে, আর দুটো দাঁড়িয়ে আছে। তুষার চোখ ফিরিয়ে নিল।

ঘর অন্ধকার হতেই সেই লোহার বিমের গায়ে নুড়ি-পাথরের টুং-টুং শব্দ। অবিরল, অবিশ্রাম। বুকে খামচে ধরে মুক্তির তীব্র সাধ। কীসের মুক্তি? কেমন মুক্তি? কে জানে! কিন্তু তার ইচ্ছা উত্তপ্ত পারদের মতো লাফিয়ে ওঠে।

আকুল আগ্রহে সে আবার বাতি জ্বালে। কল্যাণী বলে—কী হল?

উত্তেজিত গলায় তুষার ডাকে—এসো তো, এসো তো, কল্যাণী।

তারপর সে নিজেই হাত বাড়িয়ে মশারির ভিতর থেকে টেনে আনে কল্যাণীকে। আনে নিজের বিছানায়। কল্যাণী ঘেমে ওঠে। উজ্জ্বল আলোয় কল্যাণীকে পাগলের মতো দ্যাখে তুষার, চুমু খায়, তীব্র আগ্রহে, রিরংসায় তাকে মন্থন করে। বিড়বিড় করে বলে—কেন তোমার জন্যে ও পাগল? কী আছে তোমার মধ্যে? কী সেই মহামূল্যবান? আমাকে দিতে পারো না?

বৃথা।

অবশেষে ঘোরতর ক্লান্তি নামে।

এইটুকু, আর-কিছু নয়!

ওরা ঘুমোয়। বাইরে ঝড়ের প্রথম বাতাসটি বয়ে যায়। প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটি পোকার মত উড়ে এসে বসে পাগলটার ঠোঁটে। বসে-বসে ঝিমোয় পাগল। তার রক্তবর্ণ চুলগুলি নিয়ে খেলা করে বাতাস। বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত করে তার মুখ। তার মাথায় অবিরল বকুল ঝরিয়ে দিতে থাকে গাছ।

বহু উঁচু থেকে ক্রেন-হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। চমকে উঠে বসে তুষার। বুকের ভেতরটা ধক্-ধক্ করতে থাকে। এত জোরে বুক কাঁপতে থাকে যে দু-হাতে বুক চেপে ধরে কাতরতার একটা অস্ফুট শব্দ করে সে।

কীসের শব্দ ওটা? অন্ধকার, উঁচু উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধ ক্রেন-হ্যামারটা সে কোথায় দেখেছে? কবে? বাইরে ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দ বাড়ি-বাড়ি কড়া নেড়ে ফিরছে। একা-একা উল্লাসে ফেটে পড়ছে ঝড়। সেই শব্দে মাঝরাতে ঘুম-ভাঙা তুষার চেয়ে থাকে বেভুল মানুষের মতো। বুক কাঁপে। আস্তে-আস্তে মনে পড়ে একটা বিশাল লোহার কাঠামো, তাতে ঘনায়মান অন্ধকার, উঁচু ক্রেন-হ্যামার। অমনি ব্যথিয়ে ওঠে বুক। তীব্র মুক্তির ইচ্ছায় ছটফট করতে থাকে সে। তার মন বলে : চলো সমুদ্রে! চলো পাহাড়ে! চলো ছড়িয়ে পড়ি।

বুক চেপে ধরে তুষার। আস্তে-আস্তে হাঁপায়।

বাইরে খর বিদ্যুৎ দিয়ে মেঘ স্পর্শ করে মাটিকে।

এই ঝড়ের রাতে তুষারের খুব ইচ্ছে হয়, একবার উঠে গিয়ে পাগলটাকে দেখে আসে।

কিন্তু ওঠে না। নিরাপদ ঘরে ভীরু গৃহস্থের মতো সে বসে থাকে। বাইরে ভিখিরি, পাগলদের ঘরে ঝড় ফেটে পড়ে। তাদের ঘিরে নেমে আসে অঝোর বৃষ্টির ধারা।

পরদিন আবার বকুলতলায় পাগলকে দেখা যায়। অফিস যাওয়ার আগে পানের পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে দেখে তুষার। একটু বেলায় কল্যাণী আসে। দ্যাখে। অভ্যাস।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে তুষার মাঝে-মাঝে অস্বস্তি বোধ করে। অফিসের পর বাদুড়ের পাখার মতো অন্ধকার ক্লান্তি নামে চারধারে। অনেক দূরে হেঁটে যায় তুষার। ট্যাক্সিতে ওঠে, কোনওদিন ওঠে না। হেঁটে-হেঁটে চলে যায় বহুদূর। কী-একটা কাজ বাকি রয়ে গেল জীবনে। করা হল না। এক রোমাঞ্চকর আনন্দময় মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল আমার। পেলাম না। অস্থিরতা বেড়ালের থাবার মতো বুক আঁচড়ায়।

মাঝে-মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যায় তার! উঠে বসে, সিগারেট খায়। জল পান করে। কখনও-বা উত্তরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। মোমবাতির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে সাদা বাতিস্তম্ভ, তার নিচে বকুলগাছ, তার ছায়া। অন্ধকারে একটা পুঁটলির মত পড়ে আছে পাগল।

আবার ফিরে আসে ঘরে। বাতি জ্বালে। পাতলা নেটের মশারির ভেতর দিয়ে তৃষিত চোখে ঘুমন্ত কল্যাণীকে দেখে। তার বুক ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে বাচ্চা সোমা। সোমার মাথার কাছে দুটো কাগজ, তাতে ছবি আঁকা। একটাতে নদী, নৌকো, গাছপালা। অন্যটিতে খোঁপাসুদ্ধু একটা মেয়ের মুখ, নীচে লেখা : সোমা। অনেকক্ষণ ছবি দুটোর দিকে চেয়ে রইল তুষার। একটা শ্বাস ফেলল।

কল্যাণী শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। মুখে নিশ্চিত কমনীয়তা। চেয়ে থাকে তুষার। আস্তে-আস্তে বলে—কী করে ঘুমোও?

—চলো, যাই বাইরে যাই। কিছুদিন ঘুরে আসি।—এক সকালে চায়ের টেবিলে কল্যাণীকে এই কথা বলল অবসন্ন তুষার।

—চলো। কোথায় যাবে?

—কোথাও। দূরে। সমুদ্রে বা পাহাড়ে।

—পুরীর সমুদ্দুর তো দেখেছি। দার্জিলিং শিলং-ও দেখা।

—অন্য কোথাও—অচেনা নির্জন জায়গায়। বলে তুষার। কিন্তু সে জানে—মনে-মনে ঠিক জানে—যাওয়া বৃথা। সে কতবার গেছে বাইরে, সমুদ্রে, পাহাড়ে। তার মধ্যে মুক্তি নেই, জানে। মুক্তি এখানেই আছে। আছে দুর্লভ ইচ্ছাপূরণ। খুঁজে দেখতে হবে।

তবু তারা বাইরে গেল। একমাস ধরে তারা ঘুরল নানা জায়গায়। পাহাড়ে, সমুদ্রেও। ফিরে এল একদিন।

পাগলটা ঠিক বসে আছে। উত্তরের ব্যালকনিটার দিকে চেয়ে।

মাঝে-মাঝে কাজের মধ্যেও তুষার বলে ওঠে—ন্‌নাঃ! বলেই চমকায়। কীসের না? কেন না?

ছোকরা স্টেনোগ্রাফারটিকে জরুরি ডিক্‌টেশন দিতে-দিতে বলে ওঠে—ন্‌নাঃ! স্টেনোগ্রাফারটি বিনীত ভাবে থেমে থাকে।

তুষার চারিদিকে চায়। অদৃশ্য মশারির মতো কী-একটা ঘিরে আছে চারিদিকে। ওটা কী! ওটা কেন। কী আছে ওর বাইরে?

নির্জন শেক্সপিয়র সরণি ধরে হাঁটে তুষার, হাঁটে নির্জন ময়দানে, হাঁটে ভিড়ের মধ্যে। বহু দূরে-দূরে চলে যায়। কিন্তু সেই অলীক মশারির বাইরে কিছুতেই যেতে পারে না। ট্যাক্সিতে উঠে বলে—জোরে চালাও ভাই। আরও জোরে......... আরও জোরে............

ট্যাক্সি উড়ে যায়। তবু চারদিকে অলীক সূক্ষ্ম জাল।

হতাশ হয়ে ভাবে—আছে কোথাও বাইরে যাওয়ার পথ। খুঁজে দেখতে হবে। চোখ বুজে ভাবে। উটের মত একটা ক্রেন-হ্যামার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে বিশাল লোহার কাঠামো, সেইখানে একটা লোহার বিমে নুড়ি ছুঁড়ে শব্দ তুলছে বাচ্চা একটা ছেলে।

এক-একদিন রাতে ভাত দিতে নেমে আসে তুষার। ভাত রেখে একটু দূরে দাঁড়ায়, সিগারেট খায়।

—অরুণ, তোমার কি ইচ্ছে করে না আমার ঘরে যেতে?

পাগল খায়। উত্তর দ্যায় না।

—ইচ্ছে করে না কল্যাণীকে একবার কাছ থেকে দেখতে?

পাগল খায়। কথা বলে না।

—জানতে চাও না সে কেমন আছে?

ফিরেও তাকায় না পাগল। খেয়ে যায়।

—একদিন তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের ঘরে। যাবে, অরুণ?

একজন প্রতিবেশী পথ চলতে-চলতে দাঁড়ায়। হঠাৎ বলে—আপনার বড় দয়া। রোজ দেখি দুবেলা পাগলটাকে আপনারা ভাত দ্যান। আজকাল কেউ এতটা করে না কারও জন্য। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে আপনার কথা বলি।

কৌতূহলে প্রশ্ন করে তুষার—কী বলেন?

—বলি, ওইরকম মহাপ্রাণ হয়ে ওঠো। আমরা তো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দ্বারা কিছু হল না পৃথিবীর। কাছাকাছি আপনি আছেন—এটাই আমাদের বড় লাভ।

তুষার মূক হয়ে যায়। এ কেমন মিথ্যা প্রচার! দয়া! দয়া কথাটা কেমন অদ্ভুত! এমন কথা সে তো ভাবেওনি!

কিন্তু ভাবে তুষার। ভাবতে থাকে। কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে তেমনি বলে ওঠে—ন্‌নাঃ! চমকায়। জাল-বদ্ধ এক অস্থিরতায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে এখনও মাঝে-মাঝে ক্রেন-হ্যামারটা ধম করে নেমে আসে। জেগে উঠে যন্ত্রণায় বুক চেপে কাতরতার শব্দ করে সে।

এক-রাতে তুষার কল্যাণীকে ভাত বাড়তে বলে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। রাস্তা পার হয়ে এল বকুলগাছটার তলায়।

—চলো অরুণ। একবার আমার ঘরে চলো। কোনওদিন তুমি যেতে চাওনি। আজ চলো। আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। আজ তোমার নিমন্ত্রণ।

বলে হাত ধরল পাগলের। পরিষ্কার সুন্দর হাতে ধরল নোংরা হাতখানা।

কে জানে, কী বুঝল পাগল, কিন্তু উঠল।

সাবধানে তার হাত ধরে রাস্তা পার করল তুষার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। দাঁড়াল এসে খাবার-ঘরের দরজায়।

—কল্যাণী, দ্যাখো কাকে এনেছি।

কল্যাণীর হাত থেকে পড়ে গেল চামচ। ভয়ঙ্কর ঠিন-ঠিন শব্দ হল। কেঁপে উঠল কল্যাণীর বুক। শরীর কাঁপতে লাগল। ভয়ে সাদা হয়ে গেল তার ঠোঁট।

—মা গো! চিৎকার করল সে।

নরম গলায় তুষার বলল—ভয় নেই, ভয় নেই কল্যাণী। তুমি খাবার সাজিয়ে দাও। অরুণ আজ আমার অতিথি।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কল্যাণী। জলে তার চোখ ভরে গেল।

তুষারের হাতে-ধরা পাগল নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

এত কাছ থেকে অরুণকে অনেকদিন দ্যাখেনি কল্যাণী। কী বিপুল দারিদ্র্যের চেহারা! খালাসিদের যে নীল জামাটা ওর গায়ে তা বিবর্ণ হয়ে ছিঁড়ে ফালা-ফালা। খাকি প্যান্টের রং পাল্টে ধূসর হয়ে এসেছে। কী পিঙ্গল ওর ভয়ঙ্কর রাঙা চুল। পৃথিবীর সব ধুলো আর নোংরা ওর গায়ে লেগে আছে। কেবল তখনও অকৃপণ সুন্দর, সুগন্ধী বকুলফুল চেয়ে আছে ওর মাথায়, জটায়, ঘাড়ে।

কাঁপা-হাতে খাবার সাজিয়ে দিল কল্যাণী। তার চোখ দিয়ে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছে। পাগল তার দিকে তাকালই না। চোখ নীচু রেখে খেতে লাগল।

মাঝে-মাঝে বিড়-বিড় করে তুষার বলছিল—খাও, অরুণ খাও।

খাওয়া শেষ হলে তাকে আবার হাত ধরে তুলল তুষার! নিয়ে এল ঘরে।

—এই দ্যাখো, আমার ঘরদোর। ওই যে মশারির নিচে শুয়ে আছে, ও আমার মেয়ে সোমা। এই দ্যাখো ওর হাতে আঁকা ছবি। এই দ্যাখো ওয়ার্ডরোব, ফ্রিজিডেয়ার। ওই ড্রেসিং টিবিল। এই দ্যাখো আরও কত-কী........

ঘুরে-ঘুরে অরুণকে সব দ্যাখায় তুষার।

মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করে—এখানে, এই সুন্দর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না, অরুণ? ইচ্ছে করে না এইসব জিনিসপত্রের মালিক হতে? তুমি আর চাও না কল্যাণীর মতো সুন্দর বউ? সোমার মত মেয়ে?

অরুণের হাতে জোর ঝাঁকুনি দেয় তুষার—বলো, অরুণ, ইচ্ছে করে না?

—অন্ধকার! ভীষণ অন্ধকার! পাগল বলে।

—কোথায়—কোথায় অন্ধকার?

—এইখানে?

বলে চারদিকে চায় পাগল।

—আর কোথায়?

—চারদিকে।

—থাকবে না, অরুণ? থাকো থাকো। থেকে দ্যাখো।

পাগল কিছু বলে না।

হতাশ হয়ে তার হাত ছেড়ে দেয় তুষার।

পাগলটা আস্তে আস্তে সদর পার হয়। সিঁড়ি ভাঙে। রাস্তা পেরিয়ে চলে যায় বকুলগাছটার তলায়। পা ছড়িয়ে বসে। গুঁড়িতে হেলান দেয়। কুলকুল করে বয়ে চলে তার অন্য-লগ্ন চিন্তার স্রোতস্বিনী। চোখ বুজে অনাবিল আনন্দে সে সেই স্রোত প্রত্যক্ষ করে।

উত্তরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায় তুষার। চেয়ে দ্যাখে, নিশ্চিন্তে বকুলগাছের ছায়ায় আবার বসেছে পাগল। টুপটাপ বকুল ঝরছে তার মাথায়।

উত্তরের ব্যালকনি থেকে দৃশ্যটা দ্যাখে তুষার। তার দুই চোখ ভরে আসে জলে।

—কিছুই চাও না, অরুণ? বকুলগাছের তলায় তোমার হৃদয় জুড়িয়ে গেছে! হায় পাগল, ভালবাসা নয়, এখন কেবল ভাতের জন্য তোমার বসে-থাকা।

এখন আর কল্যাণীর কোন সন্দেহ নেই। সে কাছ থেকে অরুণকে দেখেছে। সে কেঁপেছিল থর-থর করে। দুঃখে ভয়ে উৎকণ্ঠায়। কিন্তু অরুণের মুখে সে দেখেছে বিস্মৃতি। তাকে আর মনে নেই অরুণের।

বড় শীত পড়েছে এবার। বকুলগাছ থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ছে পাগলের গায়ে। ছেঁড়া জামা দিয়ে হু-হু করে উত্তরে হাওয়া লাগছে শরীরে। বড় দয়া হয়। মঙ্গলার হাত দিয়ে একটা পুরনো কম্বল পাঠিয়ে দ্যায় কল্যাণী। পাগল সেই কম্বল মুড়ি দিয়ে নির্বিকার বসে থাকে।

মাঝে-মাঝে কল্যাণীরও বুক ব্যথিয়ে ওঠে। ভালবাসার কথা মনে পড়ে। তুষার কি তাকে ভালবাসে এখনও! কে জানে! মাঝে মাঝে উগ্র রিরংসায় তাকে মন্থন করে তুষার। কখনও দিনের পর দিন থাকে নিস্পৃহ। আর ওই যে ভালবাসার জন্য পাগল অরুণ—ও বসে আছে ভাতের প্রত্যাশায়। কল্যাণীকে চেনেও না।

তাহলে কী করে বাঁচবে কল্যাণী? বুক খামচে ধরে এক ভয়।

আবার বেঁচেও থাকে কল্যাণী। বাঁচতে হয় বলে।

মাথার ওপর সবসময় উদ্যত নিস্তব্ধ ক্রেন-হ্যামারটাকে টের পায় তুষার। অস্বস্তি। কখন যে ধম করে নেমে আসে। অকারণে বুক কাঁপে। ব্যথায় ককিয়ে ওঠে তুষার।

ঠিক সকাল নটায় পিক ফেলতে এসে উত্তরের ব্যালকনি থেকে বকুলগাছটার গোড়ায় পাগলকে দ্যাখে। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে।

কোম্পানি এবার উনিশ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। ক্লান্তি বাড়ে। দিন-শেষে তার শরীর জুড়ে নেমে আসে বাদুড়ের ডানার মতো অন্ধকার ক্লান্তি। তার ডালপালা ধরে কেবলই নাড়া দ্যায় এক তীব্র ইচ্ছা। নাড়া দ্যায়, দিতে থাকে। অলীক ছুটি, মিথ্যা অবসর, অবিশ্বাস্য মুক্তির জন্য খামোখা আকুল হয় সে। পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে সময়। বয়স বাড়ছে। তুষার অস্থির হয়। অস্থিরতা নিয়ে বেঁচে থাকে।

ঠিক যেন এক নদীর পাড়ে বসে আছে পাগল। কী সুন্দর আবছায়া নদীটি। চারিদিকে আধো-আলো, আধো-অন্ধকার। অনন্ত সন্ধ্যা। নদীটি বয়ে যায় অবিরল। স্মৃতি, স্মৃতিময় তার স্রোত। পাগল প্রত্যক্ষ করে। ক্লান্তি আসে না। বকুলের গাছ থেকে পাতা খসে পড়ে, কখনও ফুল, বৃষ্টি আসে, ঝড় বয়ে যায়, আবার দ্যাখা দ্যায় রোদ। তবু আবছায়ায় নদীটি বয়ে যায়। পাগল বসে থাকে

গোপালের মা স্নেহলতা

উদয়ন ঘোষ

গোপালের মা ছাড়া এ দুনিয়ায় এখন কে আর বিশ্বাস করবে, গোপালের মার সত্যিই গোপাল নামে এক পুত্র ছিল।

তেমনি গোপালের মা ছাড়া এ দুনিয়ায় কেউ এও বিশ্বাস করবে না যে গোপালের মার একদা নাম ছিল স্নেহলতা।

সে-সব কী আজকের কথা!

আজ সবাই তার পেতলের গোপাল মাত্র দেখে। কিন্তু বাস্তবিক একদিন তার রক্তমাংসের গোপাল ছিল। সে গোপাল বেঁচে থাকলে এতদিনে তার বয়স ৫০ হয়ে যেত। গোপাল বেঁচে থাকলে তাকে আজ এমন বিপদে পড়তে হত না। তার প্রকৃত নাম প্রমাণ করার জন্য লোক ডাকতে হত না। ছেলেই প্রমাণ করতে পারত। এ-সব কি আর পেতলের গোপাল পারে?

গোপাল রক্তমাংসে জন্মেছিল বুধবারে। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। যে সনে প্রথম আকালের ছায়া পড়ল, সে সনে তার জন্ম। তার ঠিক চার বছরের মাথায় যুদ্ধ লাগল। মহাযুদ্ধ। ঐরকম মহাযুদ্ধ নাকি আরেকবার হয়েছিল। গোপালের বাবার বয়স তখন ছিল ১২। এটা দ্বিতীয়। বছর ঘুরতেই এক লাফে চালের মণ ৮ টাকা থেকে ৪০ টাকা হয়েছিল। পরের বছর করাল দুর্ভিক্ষ হল। গোপাল স্কুল থেকে লাফাতে লাফাতে এসে ভাত চাইত। ভাত পেলে গান ধরত : সা রে গা মা পা ধা নি/ বোম ফেলেছে জাপানী/ বোমের মধ্যে কেউটে সাপ/ বৃটিশ বলে বাপরে বাপ। গান শুনে গোপালের বাবা হাসতো। ঐ কেউটে সাপে হাসতো। তখন তারা 'কেশনগরে'। চাপড়া থেকে এসেছে আকালের তাড়া খেয়ে। গোপালের বাবা বড় গান ভালোবাসত। নিজেও গান গাইতে পারত। গানের গলাও ছিল। স্বভাবে বাউল ছিল।

আঁকতেও পারত ভালো। কত কিছু ছিল মানুষটার। হাতের লেখা ছিল মুক্তার মতো। ঐ হাতের লেখার দৌলতেই কৃষ্ণনগরের এক মিশনারী প্রাইমারী স্কুলে হাতের লেখার মাস্টার হয়েছিল। গীর্জায় যেতে ভালোবাসতো খুব। এক রবিবার বিকালে গীর্জার সামনের মাঠে বসে গেয়েছিল : 'পরমাত্মা পরমেশ্বর। যীশুকৃষ্ণ নাম চরাচর।। শাস্তরেতে নয় পরাপর। শুনি যীশু ভক্তের মুখে'।। গানটা পাদরী সাহেবের কানে গিয়েছিল। পাদরী সাহেব ছিলেন নদের ঘোষপাড়ার মানুষ। ঐ গান মনে ধরে গিয়েছিল। মানুষটাকে গানের মাস্টারও করেছিল তারা। খৃষ্ট গান। ভাবা যায়?

গোপালের বাবা বলত, যে প্রকৃত ভক্ত, সে আসলে মানুষ ভক্ত। গোপালের বাবা অন্তত মানুষভক্ত ছিল খুব। তাকে কখনো পুজো-আর্চা করতে দেখেনি গোপালের মা। কেবল রোজ সন্ধ্যায় এক মনে বসে গান গাইত। একটা গান রোজ করত। সেটা বোধহয় তার পুজো ছিল। গানটার প্রথমটা মনে আছে গোপালের মার। গানটার প্রথম

দিকটা হল: 'মানুষ হয়ে মানুষ মানো /মানুষ হয়ে মানুষ জানো/ মানুষ হয়ে মানুষ চেনো/মানুষ বড় ধন'।

গোপাল রক্তে-মাংসে আসছে শুনে তার সে কী আনন্দ! কেবল গড় করে। কেবল গড় করে। দুহাত পিছিয়ে গিয়েছিল গোপালের মা। এমন করছিল যে মনে হচ্ছিল তাকেই গড় করবে। নেচে নেচে গেয়েছিল সেই গান— যা সে গোপাল হতে রোজ গাইত: মানুষের মা স্নেহলতা/বলব কি সেই প্রেমের কথা/কাম হল সেই প্রেমের লতা।"

যে শয্যায় তাদের কাম হয়েছিল ও গোপাল হয়েছিল, সে শয্যাকে সে গড় করত। সেই শয্যার মাথায় দেয়াল জুড়ে সে একটি আশ্চর্য লতা এঁকেছিল। ময়ূরের গলার মতো নীল তার রঙ। পাতাগুলি ময়ূরের পেখম। পেখমে চোখের মত দেখতে মেয়েমানুষের লজ্জাস্থান। গোপালের বাবা বলত, পৃথিবী। নিচে লিখেছিল, দেহলতা-স্নেহলতা।

গোপাল জন্মালে গোপালের বাবা তাকে 'স্নেহ' বলে ডাকত। ডাকলে কি হবে, স্নেহ কি পারল গোপালকে ধরে রাখতে!

পারলে আজ আর তার এই দুর্দশা হত না।

দুদিনের পেট খারাপে গোপাল মারা গেল। যে বছর যুদ্ধ বন্ধ হল, সে বছর। গোপালের একমাত্র মিলিটারী মামাও সে বছর মারা গিয়েছিল। তবে সে যুদ্ধে মারা গিয়েছিল। গোপাল যুদ্ধে মারা যায়নি বটে, তবে ঐ যুদ্ধেই, কেননা গোপাল স্কুলে যুদ্ধজয়ের মিষ্টি খেয়ে মারা গিয়েছিল। স্কুল থেকে সেদিন সে আনন্দে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরেছিল। সে নাকি চারজনের মিষ্টি খেয়েছে চারবার লাইনে দাঁড়িয়ে। রাত্রে পেটব্যথা সুরু হল ও মাঝরাতে জলের মত পায়খানা করল বারকয়েক। দুদিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল। তিনরাত্রি পেরুল না।

গোপাল বেঁচে থাকতে তার নাম কিন্তু গোপালের মা হয়নি। গোপাল মারা যাবার পর তার কোনো নামই থাকেনি আর। গোপালের বাবা যে 'স্নেহ' ডাকত, সে ডাকও তার রইল না।

তারা কৃষ্ণনগর ছাড়ল পরের বছর। যে বছর দেশ ভাগ হল। প্রচুর মানুষ এল দর্শনা-রাণাঘাট হয়ে। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল কেশনগর। তাদের মধ্যে কিছু খৃষ্টান উদ্বাস্তু ছিল, যারা মেরী-ভজনা করত বলে পাকিস্তানে ঠাঁই হয়নি। তাদের একটি দল কৃষ্ণনগর হয়ে আসানসোলে পাড়ি দিলে গোপালের বাবাও তাদের পিছু নিয়েছিল। যেহেতু কৃষ্ণনগরে আর গোপাল নেই। পাদরী সাহেবই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। গোপালের বাপ বড় কান্নাকাটি করত।

সেই থেকে তারা আসানসোলে। তারা প্রথমে আসানসোলের চাঁদমারীতে উঠেছিল দিনকয়েক মাত্র রেলকলোনীতে থেকে। ঐ চাঁদমারিতে হঠাৎ গোপালের বাবা মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে মারা গেলেন। যাদের সঙ্গে তারা আসানসোলে এসেছিল, তারাই জোর করে গোপালের বাবাকে কবর দিল। গোপালের মার দাহ করার বা শ্রাদ্ধ করার টাকা ছিল না বলেই— গোপালের বাবা নাকি খৃষ্টান হয়েছিলেন, ওদের বইতে নাকি লেখা আছে। গোপালের মা টু শব্দটি করেনি।

এমনিতে গোপালের বাবার ধর্মাধর্ম বলে কিছু যে ছিল মনে হত না গোপালের মার। তাদের কোনো ঠাকুরের আসন ছিল না তখন পর্যন্ত। গোপালের বাবার ঠাকুর কিছু ছিল না। বলত, মানুষই ঠাকুর। আর ঐ গান গাইত: 'মানুষ রতন ধন'।

গোপালের বাবার মৃত্যুসংবাদ ওরাই দিয়েছিল কৃষ্ণনগরে। সেখান থেকে নাকি চাপড়াতেও পৌঁছেছিল খবর।

সেই খবর পেয়ে গোপালের বাবার এক ভাগ্নে, নিতাই, এসেছিল। দুদিন পরে তার নাকি আসানসোলে আসার কথাই ছিল— খবর পেয়ে দুদিন আগেই চলে এসেছে। সে নাকি তাদের সব খবর রাখত। কৃষ্ণনগরের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল।

গোপালের বাবার ঐ খৃষ্টানী পারলৌকিক ক্রিয়া নিয়ে সে কিছু হৈ-চৈ করল। বই দেখতে চাইল। জোর করে খৃষ্টান করার অভিযোগ তুল্ল। পাড়ার লোককে ধরল। পুরুত ডেকে প্রায়শ্চিত্ত করল। তারপর ঠাকুরের আসন বসালো। একটা পেতলের নাড়ুগোপাল মূর্তি কিনল। সেই থেকে ক্রমে গোপালের মা গোপালের মা হন।

—এত সব করছিস কেন?

গোপালের মা জিজ্ঞেস করল।

—আছে কারণ, বুঝতে পারবে পরে।

দুদিনেই বুঝেছিল গোপালের মা।

তুখোর ছেলে ঐ নিতাই। ম্যাট্রিকে জলপানি পেয়েছিল। অনেক কাণ্ড করে নিচু জাতে নাম লিখিয়ে আরও জলপানির ব্যবস্থা করেছিল। তারা যে প্রকৃতই নিচু জাত মানে ঐ জলপানি পাবার মত নিচু জাত (সিডিউল্ড কাস্ট)— নয়। তারা দাস মাত্র। তবু ঐ দাসের জোরে সে যা করার করেছিল— সেই ভিত্তিতে সে এই আসানসোলে কয়লাখনির কাজ করার জন্য পড়াশুনো করতে এসেছিল। কিন্তু এসে সাত-পাঁচ জেনে নাকি এখানেরই কোনো স্কুলে সে অন্য কিছু পড়ে (পলিটেকনিক)—ঐ নিচু জাতের দৌলতে মস্ত চাকরির লেজ নাকি ধরবার ব্যবস্থা করছিল।

ব্যবস্থা পাকাও করে ফেলেছিল। কিন্তু মামা যদি খৃষ্টান হয়, কোথায় কোন ঝুট-ঝামেলা হয় আর তার নিচু জাত (হিন্দু)-এর জলপানি ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার বারোটা বাজে, এটা চায় না নিতাই।

গোপালের মার ব্যবস্থাও পাকা করেছিল কেননা চাঁদমারীতে তাদের বাসা বড় জীর্ণ ও মাত্র একখানা ঘর ছিল। তার ভাড়াও কম না। গোপালের বাবা তো কিছু রেখে যায়নি। গোপালের মারও তো রোজগার নেই। তাই ব্যবস্থা।

—কি ব্যবস্থা করবি আমার?

—তুমি উদ্বাস্তু হবে।

—উদ্বাস্তু হব?

—হ্যাঁ, উদ্বাস্তু মানে রিফিউজি হবে— জমি পাবে, বাড়ি করার টাকা পাবে— সেই বাড়ি ভাড়া দিয়ে সংসার চালাবে।

—ও সেই উদ্বাস্তু। তোর মামা বলত, আমরা জন্ম-উদ্বাস্তু। আমাদের দেশ নাকি ওপারে যশোরে ছিল। বাহাত্ত সালে (১২৭২ বঙ্গাব্দ) নাকি আমরা চলে এসেছিলাম চাপড়ায়। সেবার নাকি খুব খরা হয়েছিল নদে—যশোরে। তোর মামা গানও গাইত ঐ বাহাত্ত নিয়ে। গান এখনো কানে লেগে আছে—কীর্তনে গাইত তোর মামা—''ভুট করেছে গত সনের ঝড়ে/আবার এই বাহাত্ত সলে/ ঘোর আকালে/লক্ষ্মী গেছে ছেড়ে।'' আবার দ্যাখ ঐ

চাপড়াতেও থাকতে পারলাম না। আকাল হল। কেশনগরে চলে এলাম। তোর মামা বলত, আমরা জন্ম-উদ্বাস্তু। খুঁজি তারে দেশদেশান্তরে —যদি পাইরে তারে—অন্দরে অন্তরে।

—না, না, সে উদ্বাস্তু না—ওতো মামার গানের কথা। আসলে আমি যে উদ্বাস্তুর কথা বলছি সেটা পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু। যাকে রিফিউজি বলে।

—আমরা তো পাকিস্তানে ছিলাম না।

—ছিলে না তবে প্রমাণ করব ছিলে।

—সে কিরে, মিথ্যে বলবি?

—মিথ্যে কেন বলব, তোমার এক দেওর, আমার ছোটমামা—এখনো যশোরে থাকে। তাঁর ঠিকানা যোগাড় করেছি। তাঁর যুদ্ধের সময়কার কয়েকটা চিঠি ছিল চাপড়ায়। সেগুলি যোগাড় করেই ঠিকানা পেয়েছি। সেই চিঠির মধ্যে একটা চিঠিতে আছে, যশোরে তোমাদের জমি-জমা বিষয়ের কথা। সেটাই আমার চাবিকাঠি।

মানে?

—মানে, তাতেই প্রমাণ হয়, তোমরা যশোরে ছিলে। ....এখন মাত্র একটি চিঠির মামলা। ছোটমামা লিখবেন, আর চালাতে পারছি না, তোর মামীকে পাঠাচ্ছি তোর কাছে। ব্যাস, তুমি উদ্বাস্তু হয়ে গেলে।

—সে কিরে! আমি জন্মে যশোরের শ্বশুরের ভিটেয় পা দিলাম না— আর সেখান থেকে তোর কাছে চলে আসব?

—হ্যাঁ আসবে, না হলে তুমি উদ্বাস্তু হবে কি করে? উদ্বাস্তু মানে ঐ রিফিউজি হলে কত লাভ জানো?

— কি লাভ?

—ঐ যে বল্লাম, জমি পাবে, ঘর করার টাকা পাবে। ঐ চিঠির জোরে তোমার সার্টিফিকেট হবে। তারপর দু পয়সার মামলা। দু পয়সার কালি খরচ দিয়ে একটা টিপসই—ব্যাস্, হাতে-হাতে জমি ও টাকা। তবে কলোনীতে থাকতে হবে, এই যা।

— এসব কি বলছিস তুই!

—ঠিকই বলছি। এখন দুদিন মুখ বুজে থাকো তো।

সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

একদিন কোর্টের কাছে গেল গোপালের মা। টিপসই দিল। ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। তারা ৬ কাঠা জমি পেল কলোনীতে। টাকা পেয়েছিল আট হাজার আর পায়খানা করার জন্য আলাদা দেড় হাজার।

তাতেই তুখোড় নিতাই ৬ কাঠা জমিতে ঐ সাড়ে ন হাজার টাকায় অসাধ্য সাধন করল।

দুটো বড়বড় ঘর করল। দুঘরের দুপাশে দুটো বাথরুম করল। একই সিসটেমে রুম-এরিয়ার বাইরে একই সেফটি ট্যাংকের উপর পাশাপাশি দুটো পায়খানা করল। বাড়ির সামনে-পিছনে জমি রাখল। পিছনের জমিতে শাক-সব্জী লাগালো, আর সামনে ফুলের বাগান করল। রান্নাঘরের প্রভিসান আপাতত করতে পারল না। কেবল ঐ পাশাপাশি দু ঘরের পিছনে, পিছনের উঠানের দিকে টানা বারান্দা করল। সেখানেই রান্নার ব্যবস্থা রাখল। বারান্দা ঢাকতে পারল না। তার জন্য অসুবিধে থেকে গেল। এই আসানসোলের উগ্র আবহাওয়ায় ঐ খোলা বারান্দা যথেষ্ট কষ্ট দিল গোপালের মাকে। গ্রীষ্মকালে তাকে সকাল ৮টার মধ্যে রান্না সারতে হত, কেননা তারপর থেকে 'লু' বইত বারান্দায়। আর শীতকালে রাত্রে রান্না হত না, তখন বারান্দা বরফ। তবে ঐ টাকাতেই সে যে কূয়ো করেছিল তাতে ভাগ্যের জোরে অল্প খুঁড়তেই জল পেয়েছিল ভালো। এই খরা দেশে অমনটি হয় না তেমন।

এ-সব নিয়েও ভেলকি দেখালো তুখোড় নিতাই।

গৃহ-প্রবেশের পর মাসখানেক ঘুরতে না ঘুরতেই এক দম্পতিকে ভাড়া দিল ১টি ঘর, পাশের বাথরুম, ঘরের সংলগ্ন বারান্দা ও একটি পায়খানা—৬০ টাকায়।

আর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সামনের বাগানে জবা ফুটল, স্থলপদ্ম ফুটল, সন্ধ্যামণি-দোপাটি-গাঁদাও ফুটল, এমনকি ২/৪ সারি রজনীগন্ধা পর্যন্ত। সে-সব যে কেবল বাহারই না তা গোপালের মা কিছু দেরিতে বুঝল। একটি ছেলে এসে বাগানের ফুল নিয়ে যায় রোজ—এক টাকা দেয়। তাতে মাসে ৩০ টাকা রোজগার হল।

—তুই কি সব্‌জিও বিক্রি করবি নাকি?

গোপালের মা থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল নিতাইকে। কেননা তার গোপালের ফুল হিসেবে নির্দিষ্ট হল কেবল সন্ধ্যামণি ও দোপাটি—সে চেয়ে-চিন্তেও কোনোদিন জবা বা স্থলপদ্ম পেল না। শীতে অবশ্য গাঁদা কিছু জুটল। কিন্তু রজনীগন্ধায় সে হাত পর্যন্ত দিতে পারল না। সেই ক্ষোভে সে যখন দেখল পিছনের বাগানে সব্‌জী হচ্ছে পেঁপে, সজনে, কপি, মূলো পালংশাক—তখন ঐ প্রশ্ন করল।

—না, কেন, সবজি বিক্রি করব কেন? সবজি তো খাব।

এই হল নিতাই অথবা তুখোড় নিতাই।

বল্লে বিশ্বাস যাবে না, তখনো সে চাকরি পায়নি, তখনো সে ছাত্র, টিউশুনি করে মাত্র, আর সিডি়উলড কাস্ট স্কলারশিপ—তাতেই সে মামীকে নিয়ে স্বচ্ছল সংসার করতে পারছে—তাতে যদি মামী তাকে 'তুখোড় ছেলে' বলেই ডাকে—তাহলে ছেলে উত্তর দিক।

—তোমাকে কিচ্ছু নজর করতে হবে না—তুমি তোমার গোপাল নিয়ে থাক। মাঝে মাঝে উঠতে থাকে কথা, আর গোপালের মা চমকায়। গোপাল নিয়েই তো আছে। সেই কেশনগরে সেই দুপুর ভুলবার নয়—গোপাল আস্তে আস্তে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিল—তারপর আর কিছু নেই। তারপর থেকে শুধু গোপাল নিয়েই আছে।

কিন্তু কথাটা তো তা নয়। কথাটা হল তুমি তোমার গোপাল নিয়ে থাক। ক'দিন কথাটা খুব উঠল—যেমন, "নাও, তোমার গোপালের জন্য নারকেল-নাড়ু বানিয়ে ভোজ দাও, আমিও খাই!"..... কিংবা "নাও, আজকে রজনীগন্ধার ১টি স্টিক নাও, তোমার গোপালের জন্য।" নয়ত "আচ্ছা, তোমার গোপাল যে ননী খায়—সে কি মাখন না চিজ?..... যদি চিজ হয়, তাহলে এই নাও ১টি চিজের টুকরো, আজ দিও তোমার গোপালকে।" ইত্যাদি। ফলে কেবল গোপাল নয়, গোপালের মা-ও ক্রমে গোপালের মা হল। যেমন, "আমার গোপালের জন্য আজ একটু সন্দেশ আনিস তো—ক্ষীরের সন্দেশ আনিস্—গোপাল ক্ষীর ভালোবাসে।" .... কিংবা, জন্মাষ্টমীর দিন ভাবছি গোপালকে ভোগ দেব—খিচুড়ি ভোগ — একটু ক্ষীরও করব—দুধের ব্যবস্থা করতে পারবি?" ....."শীত আসছে রে আমার গোপালের গায়ে মোটা জামা চাই... আর আসনেও ঢাকাঢুকি দেবার জন্য কাপড় চাই—আনবি সময় করে?"

এইভাবে ক্রমে গোপালের মা গোপালের মা হয়ে গেল। কিন্তু কেউ যখন তাকে গোপালের মা ডাকে সে চমকে ওঠে। ওরা কি সেই গোপাল দেখেছে, যে সোজা হয়ে দাঁড়াতো, হাসতো, কাঁদতো, গান গাইত, রোজ একটু একটু করে বাড়তো—ওরা কি সেই গোপাল দেখেছে? আর এই গোপালের নাড়ু চাওয়া পেতলের বাড়ানো হাত তো কবে থেকে ঐরকম বাড়ানোই আছে। একটুও হেরফের হয় নি। রোজ স্নান করানোর সময় গোপালের মার মতিভ্রম হয়, একটু বোধহয় বেড়েছে গোপাল—রোজই টের পায়, একটুও বাড়েনি। শেষে গোপালকে আসনে বসিয়ে রোজই ভাবে, এই ভালো। বাড়লেই তো মরবে।

গোপাল না বাড়লেও গোপালের অনেক বায়না আছে টের পায় গোপালের মা।

নিতাই বুদ্ধি করে চৌকিতেই তার মাথায় পায়ে সামান্য রেলিং দিয়ে কিছুটা খাট বানিয়েছিল। ঐরকম এক খাটে গোপালের মা ঘরের একধারে—অন্যধারে নিতাইও ঐরকম। ঐ খাটের বালিশের ওয়ার, বিছানার চাদর—সবই নিতাই নীলরঙের করেছিল দেখে বড় ভালো লেগেছিল।

রাত্রে ঐরকম খাট ও বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখেছিল: গোপাল হামাগুড়ি দিয়ে ঐ নাড়ুর জন্য তার চিরকালের স্বভাবে ডানহাত তুলে তার দিকে আসছে—আমি কি বসেই থাকব, শোবো না? .... তাহলে কৈ; আমার জন্য খাট কৈ? ...... আর যদি আমার চোখের সামনে ঐরকম নীল চাদর নীল বালিশ থাকে, তাহলে কিন্তু আমি একা শোবো না, আমার রাধাকে এনে দিতে হবে।

স্বপ্ন ভেঙ্গে গোপালের মা অবাক। পাশেই গোপালের আসন মাথার দিকে। এবং গোপালের মুখে দুষ্টু হাসি, পেতলের হলেও স্পষ্ট।

—গোপালের জন্য একটা ছোট্ট কাঠের খাট দেখিস তো। আর একটা রাধা।

—সেকি! পেতলের সিংহাসনই তো আছে। শোয়া বসা যার সকলি সমান—তার জন্য খাট আবার রাধাও? .... হাসালে মামী!

— না, তবু তুই আনবি, আজই আনবি।

খাট এলো বটে খেলনার দোকান থেকে কিন্তু রাধা এল না। রাধা নাকি একলা পাওয়া যায় না, সঙ্গে কৃষ্ণ থাকেই আর গোপালের পাশে নাকি রাধা কোথাও পাওয়া যাবে না।

গোপালের মা তা মেনে নিল। খাট আসার পর থেকে রোজ গোপালের শয়ন হত ঐ খাটে। তারপর গোপালের মা শুতো এই খাটে।

কিন্তু তাতেও গোপালের সন্তুষ্টি নেই। এক রাত্রে মুখ ভার করে বল্ল, আমি একলা শোবো না।

সেই থেকে গোপালের মা কাউকে না জানিয়ে রাত্রে গোপালকে তুলে নেয় তার শয়নাসন থেকে। নিয়ে নিজের বুকের মধ্যে করে গোপালকে নিয়ে শোয় । আর ভাবে, যদি বুকে আজ দুধ থাকত!

গোপালের মার বুক বেশ বড়। এতটুকু গোপাল তাতে ডুবে থাকতে পারে। এই বুক সে নিজে বড় করেছে, তারপর বড় করেছে এই বুক গোপালের বাবা। ভাবলে লজ্জায় গা কাঁটা দেয়। কিন্তু বড় হল বলেই না এই বুকে গোপালকে ডুবিয়ে রাখা গেল।

এই বুক নিয়ে কত কি করেছে গোপালের মা। যখন তার প্রথম ঋতু হল, তখন ঠাকুমা বলেছিলেন, রোজ বুকে তেল মাখাবি—নিচ থেকে ওপরের দিকে ঠেলে দিবি বুক—তাই করেছিল গোপালের মা। রোজ যেন একটু-একটু করে বুক বাড়ত। ভালো করে বাড়ার আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সে কি লজ্জা! বাসর ঘরেই গোপালের বাবা তার বুকে হাত দিয়েছিল—আর সেই যে বুক ধরা সুরু হল, গোপাল পাঁচ বছর হওয়া পর্যন্ত চলেছিল। গোপালও বুকের দুধ খাওয়া ছাড়ল আর গোপালের বাবাও হাত দেয়া ছাড়ল। এই বুক নিয়ে কতকিছু বলত গোপালের বাবা। ঋতুকালীন নিমপাতা সেদ্ধ জলে ঋতুউৎসের স্থান যতটা পারা যায় ধুলে বুক উন্নত হয়। বুক উন্নত হলে বুকে দুধ বাড়ে। কলমি শাকের ঝোল খেলে বুকে দুধ বাড়ে। ফলিমাছ খেলেও তাই। পালং শাকের কাঁচা রস খেলে সন্তান ফর্সা হয়। সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ালে জরায়ু ভালো থাকে। কোলে সন্তান থাকলে আর সন্তান হওয়া উচিত নয়।

মানুষেরই কেবল দুটো বুক আছে। প্রাণীদের তার চেয়ে বেশি। শুয়োরের সবচেয়ে বেশি বুক (বাঁট) আছে। তার মানে অনেক সন্তান তারা প্রতিপালন করতে পারে। মানুষ অতো পারে না। একই সন্তানকে ডাইনে-বাঁয়ে খাওয়াতে হয়। মায়ের পেট ভরা থাকলে বাঁ কাত চেপে ডান বুকের দুধ খাওয়াতে হয়। পরিশ্রমের পরই দুধ খাওয়াতে নেই। ছেলের বাপকেও দুধ খাওয়াতে হয় সঙ্গমকালে যখন ছেলে কোলে। তাহলে সহসা আর সন্তান হয় না, এক সন্তান দুধ ছাড়লে তবে গিয়ে আরেক সন্তান হবার আয়োজন করতে হয়।

সমস্তই মেনে চলত গোপালের মা। তবু গোপাল থাকল না। আর এই গোপাল এল যখন তখন তার বুক শুকনো। এই গোপাল তার বুকে ডুবে থাকে, তবু সে দুধ পায় না।

একদিন স্বপ্নে তার বুকে দুধ এসেছিল। দুধে সেদিন ভরে গিয়েছিল তার বুক। গোপাল ডুবে গিয়েছিল দুধে। বুক বড় টনটন করে উঠেছিল। পরদিন ভোরে সে তার নাড়ুগোপালের মুখে ও বাড়ানো হাতে রক্ত দেখেছিল।

দুধই তো রক্ত। গোপালের বাবা বলতো। মায়ের বুকের দুধ জ্বাল দিলে নাকি রক্তবর্ণ হয়। পরখ করে দেখে নি কোনোদিন। ভয় করেছে।

এখন ঐ রক্তই ভরসা।

না হলে গোপালের মন ওঠে না। প্রত্যুষে মুখ ভার করে।

পাড়ার লোক এতসব টের পায় না। নিতাইও পায় না। কেবল সকলে এখন তাকে গোপালের মা ডাকে।

এমনকি পাড়ার লোক তাদের বাগানের ফলমূল দেয় কখনো-সখনো—কখনো পেয়ারা, কখনো কুল—আর কিছু হয় না এই আসানসোলে—দেয় আর বলে,"তোমার গোপালকে দিও।"

মাঝেমধ্যে নিতাই আনে এটা-সেটা আর বলে,"তোমার গোপালকে দিও"।

কিন্তু নিতাই-এর অবস্থা ফিরে যায় বার্ণপুরে চাকরি পেয়ে, ভালো চাকরিই পায়। সাহেব চাকরি।

চাকরির প্রথম মাইনে এনে নিতাই মামীর হাতে ২৫ টাকা দেয়।

—ভালোই হল; তোর চাকরির মাইনে থেকে ভেবেছিলাম গোপালকে অন্নভোগ দেব।

—এই তো সেদিন দিলে। আবার?

—তুই রোজ অন্ন খাস না?

—আমি আর ঐ পেতলের গোপাল এক হল!

ঐ সুরু।

নিতাই সকাল সাড়ে সাতটায় কাজে যায়। প্রথম দিন থেকেই তাই। সাত সকালে এমনিতেই উঠত গোপালের মা। এখন আরও একঘণ্টা আগে ওঠে। স্নান সেরে গোপালকে স্নান করিয়ে আসন দিয়ে তবে গিয়ে সে রান্নাঘরে ঢোকে। প্রথম প্রথম কুলিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু গোল বাধলো যখন কিছু টিফিন চাইল নিতাই।

ক্যান্টিনের টিফিনে নাকি তার অম্বল হচ্ছে রোজ।

সে কি যে-সে টিফিন নিতাই চাইল? চাইল সাহেব টিফিন। পাউরুটি মাখন ও ডিম। ঐ টিফিন তৈরি নিয়ে লেগে গেল। পাঁউরুটি সেঁকা সে এক ব্যাপার, যা বাপের জন্মে দেখেনি গোপালের মা। পুড়বে না অথচ কড়কড়ে হবে। কিছুতেই পেরে উঠল না গোপালের মা। যদি বা পারত, দেরি হয়ে যেত নিতাই-এর।

—তুমি আমারটা আগে ঠিক কর, তারপর স্নান-টান করে গোপালকে দেখো।

—তাই হয়! গোপালকে আসন না দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকব! গোপাল অভুক্ত থাকবে আর তুই খাবি!

একটা ইংরেজি গালাগাল দিয়েছিল নিতাই। গোপালের মা যা বুঝেছিল তাহল এই যে, গোপাল আর নিতাই এক হল? একজন পেতলের আরেকজন রক্তমাংসের।

—আজ আমার রক্তমাংসের গোপাল যদি বেঁচে থাকত।

—তাহলে ভালোই হত। আমরা একসঙ্গে খেতাম।

ঘটনা আরও চূড়ান্তে গেল। জন্মাষ্টমীর দিন। সেদিন গোপালকে নিয়েই পড়ল। আগের রাত্রে কথা হয়নি। স্নান সেরে নিতাই এসে দেখল, তখনো গোপালের মা গোপালকে নিয়ে আছে।

—সে কি, তুমি এখনো রান্নাঘরে যাওনি?

—কেন তোর অফিস নাকি?

—অফিস হবে না?

—জন্মাষ্টমীর দিন অফিস?

নিতাই রেগে না খেয়ে অফিসে গেল।

কদিন বাদেই আবার ঐ একই ঘটনা ঘটল। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। সেদিনও ঐ অর্থাৎ নিতাই না খেয়ে অফিস গেল।

সে দিন অফিস থেকে ফিরে নিতাই মামীর সঙ্গে কোনো কথা বলল না। রাত্রে খেতে দিয়ে গোপালের মা জিজ্ঞেস করল, মুখ ভার করে খাচ্ছিস কেন? অফিস থেকে ফিরে এসে একটাও যে কথা বল্লি না !

—আমি বার্ণপুরে কোয়ার্টার্স পাচ্ছি। এই মাসেই যাব।

—সে কি?

—এখান থেকে দেরি হয়ে যাচ্ছে—তাই আমাকে কোয়ার্টার্স দেয়া হচ্ছে।

—আমি?

—তুমি এখানেই থাকবে। ভাড়াটেরা আছে। তাছাড়া তোমার গোপাল আছে।

তাছাড়া তোমার গোপাল আছে। কথাটার মধ্যে কটাক্ষ ছিল! তাই চুপ করে গেল গোপালের মা।

পরের দিন গোপালের মা নিজেই আবার কথা তুল্ল, 'তুই তাহলে আলাদা হয়ে যাবি?'

জবাব দিল না নিতাই।

—আমাকে তাহলে কে দেখবে?

—কেন তোমার গোপাল।

আর একদিনও গোপালের মা কোনো কথা তোলে নি। নিতাই চলে যাওয়া পর্যন্ত একেবারে চুপ।

নিতাই কেবল বাড়িই ছাড়ল না। ক'মাস বাদে আসানসোলও ছাড়ল। কোলকাতা গেল পাতাল-রেলের কাজ পেয়ে।

একেবারে চলে যাবার দিনও ছাড়ল না নিতাই।

—আমার ঠিকানা এখন দিতে পারলাম না। সব ঠিকঠাক হলে ঠিকানা দিয়ে চিঠি দেব। ভাড়াটেদের বলে গেলাম। ওরা ঐ মাস থেকে ৭৫ টাকা করে মাসে দেবে। বাগানের ফুল থেকে ৩০ টাকা পাবে। তাতে চলে যাবে তোমার। আর তোমার গোপাল তো রইলই। তোমার সব—দেখো সে তোমাকে কতটা দেখে এখন!

ছাড়ল না নিতাই। যাবার আগে গোপালকে খোটা দিয়ে একপ্রকার শাসিয়েই গেল।

পাতাল রেলে কাজ পেয়ে কি যে হল— গোপালের মাকেও ছাড়ল আর তাদের বাড়ির কুয়োর জলও পাতালে চলে গেল। ফাল্গুনেই শুকিয়ে গেল কুয়ো। শ্রাবণেও ভালো এল না। ভাড়াটেদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগল।

ভোরবেলা ওঠে গোপালের মা। যা কিছু জল ঐ ভোরেই জমে। গোপালের জন্যও জল লাগে বলে সে সাত ভোরে উঠে জল তোলে। কিছু বেশিই তোলে। নিঃসন্তান দম্পতি ভাড়াটে ওঠে দেরি করে। কুয়োর আর জল পায় না। এই নিয়ে ঠোকাঠুকি।

যত বলে বর তার চেয়ে বেশি বলে বৌ।

একদিন পাড়ার লোক অব্দি এসে গেল বৌ-এর ঝগড়ায়। পাড়ার লোক ঠিক করে দিল। একদিন ভোরের জল তুলবে গোপালের মা আর পরের দিন ভাড়াটে তুলবে।

গোপালের মা বলতে গিয়েছিল গোপালের জলটুকু অন্তত সে রোজ তুলবে। কেউ সে কথায় কান দিল না।

শেষ অব্দি সেদিনই গোপালকেই নিবেদন করল কথাটা। বল্ল একদিন, যেদিন তার জল তোলার পালা এল প্রথম, স্নান করাতে করাতে বলল, "কাল তোর স্নান হবে না। কি করবি? শুকনো থাকবি? নাকি নিজের জলের ব্যবস্থা নিজে করবি?"

পরের দিন ভাড়াটে জল তোলার পর বেলা দশটা অব্দি করেও জল পেল না গোপালের মা। বালতিই ডুবল না জলে। এক-দু আঙুল জল ছিল কুয়োয় কিন্তু বালতি তুলতে পারল না।

নিজে ও গোপাল সেদিন অস্নাত রইল দুপুরে। রাত্রে জল জমল। রাত্রে দুজনে স্নান করল।

গোপালের এই অবস্থা ভালো লাগল না তার। কিন্তু করার কি! যে নিজে কিছু পারে না—তাকে কে করে দেবে?

গোপাল পারল না সারা গ্রীষ্ম নিজের ও তার মার জলের ব্যবস্থা করতে। সারা গ্রীষ্ম গোপাল ও তার মা একদিন পর পর ঠা ঠা দুপুরে অস্নাত থেকে রাত্রে স্নান সারল কেবল।

ক্রমে সয়ে এল।

কিন্তু বর্ষা নামলে সেবার নতুন বিপত্তি দেখা দিল।

বর্ষায় ছাদ দিয়ে জল পড়ল। ঠিক গোপালের আসনের উপর ছাদ দিয়ে জল পড়ে। গোপালের মাথার উপর জল ঝরল সারা দুপুর। গোপালকে বুকে নিয়ে সেদিন কোনোমতে কূল পেলেও পরে আর পেল না। দুদিন বাদে সমগ্র ছাদ দিয়েই জল পড়ল। ঘরে আর কোথাও জায়গা রইল না মাথা গোঁজার। সর্বত্র জল পড়তে লাগল।

ওদিকে ভাড়াটেদের ছাদ প্রায় ঠিক আছে। ছাদ (সিলিং) ঘেমে গেলেও জল পড়ে না।

গোপালের মা পাড়ার পরামর্শ নিল। একজন এক ঠোঙা সিমেন্ট দিল। বলল, গোবরে-সিমেন্টে জল গুলে ঝাঁটা দিয়ে লেপে দিতে।

পাড়ার একটি ছেলে একদিন রোদের দুপুরে লেপে দিল। কাজ হল দুদিন। কিন্তু অতিবর্ষণে সেও ধুয়ে মুছে গেল।

এদিকে নিতাই-এর কোনো খবর নেই। তার ঠিকানা-দেয়া চিঠি আর এল না। এমতসময়ে একদিন নিতাই-এর এক চেনা লোক তার সঙ্গে দেখা করতে এলে তার সঙ্গে ছাদ নিয়ে পড়ল গোপালের মা।

সে জানালো, নিতাই-এর ঠিকানার ঠিক নেই, তাই চিঠি দিচ্ছে না— তবে ছাদের কথা সে নিতাই-এর সঙ্গে দেখা হলেই বলবে।

সে কি বলেছিল জানা যায় নি কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই পিওন এসেছিল।
সেই প্রথম এ বাড়িতে তার কাছে পিওন।

পিওন এসে জানালো, স্নেহলতা নামে কেউ থাকে কিনা এ বাড়িতে, তার নামে খামে টাকা এসেছে ২ হাজার। এই পাড়ার নাম আছে ঠিকানায় কিন্তু পাড়ায় ঐ স্নেহলতা পাল নামে কেউ নেই।

প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল গোপালের মা। সে ভুলেই গিয়েছিল তার নাম স্নেহলতা। এমনকি ঐ পালও ভুলে গিয়েছিল। সে প্রথমে কিছু আমতা আমতা করে শেষ পর্যন্ত বলল, "আমারই নাম স্নেহলতা।"

— কেউ আইডেনটিফাই করতে পারবে?

— কি?

— প্রমাণ করতে পারবেন, আপনি স্নেহলতা?

— প্রমাণ!

— হ্যাঁ প্রমাণ।

— আমি তো জানি আমার নাম স্নেহলতা।

— আর কেউ কি জানে? এই পাড়ার?

— সে তো জানি না।

— আমি কাল আবার আসব। এর মধ্যে খোঁজ নিয়ে রাখবেন। কাউকে পেলে তাকে নিয়ে পোস্টাপিস যাবেন। যাকে নিয়ে যাবেন তারও পরিচয় জানা চাই পোস্টমাস্টারের।

প্রথমেই গোপালের মা গেল ভাড়াটেদের কাছে।

— আচ্ছা, আমার নাম আপনারা জানেন?

— আপনার নাম? কেন?

— আমার নামে টাকা এসেছে কিন্তু পিওন আমার নাম জানে না। আমার নামে তো চিঠি আসেনা কখনো—তাই।

— আপনার নাম তো ঐ জানি শুধু, আপনি গোপালের মা— আর তো কিছু জানি না। নিতাইবাবু তো কিছু বলে যাননি— তাছাড়া নিতাইবাবু রসিদ দেন না— মুখে কেবল বলেন— আমার মামীর বাড়ি— তা আপনার বাড়ির দলিল আছে? তাতে আপনার নাম থাকতে পারে।

— দলিল? না, তা তো কিছু জানি না।

— তাহলে আমাদের পক্ষে কিছু বলা মুস্কিল।

আরো কয়েক বাড়ি গেল গোপালের মা, সেদিনই। কেউ জানে না, তার নাম। সকলেই জানে কেবল গোপালের মা।

গোপালের মা দিশেহারা হল।

সে পিওনের কাছেই জেনেছিল, টাকা পাঠিয়েছে কোনো এক নিতাই দাস। সে যা ঠিকানা দিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, সে টালিগঞ্জে থাকে। কিন্তু ঠিকানায় কেবল গলফ গ্রিন আছে— আর কিছু নেই। কোনো নম্বর নেই।

তবু ভাড়াটের পরামর্শে ঐ ঠিকানায় চিঠি দেওয়া হল। টেলিগ্রামও হল **Come Identify Snehalata.**

কেউ এল না। চিঠির উত্তরও এল না।

এদিকে পিওন জানাচ্ছে, আর বেশি দিন আটকে রাখা যাবে না ইনসিওরড খাম।

গোপালের মা বিপদে পড়ল। সে বুঝতে পারল, ঐ টাকা নিতাই পাঠিয়েছে ছাদ সারানোর জন্য। তবু কিছু করা গেল না।

একদিন পিওন এসে জানালো, সে স্বয়ং আইডেনটিফাই করতে পারে—বা কাউকে যোগাড় করে আনতে পারে আইডেনটিফাই করার জন্য কিন্তু টাকা লাগবে।

— অন্তত ৫০০ টাকা লাগবেই। আর এটা লোক-জানাজানি হলে চলবে না।

— ৫০০ টাকা? কত টাকা আছে ঐখানে? দু হাজার?

— তাই তো লেখা। দুহাজার টাকার ইনসিওরড। তার চেয়ে বেশিও থাকতে পারে। আবার কমও থাকতে পারে। সে তো খাম না খুললে জানা যাবে না।

— যদি ৫০০ টাকাই থাকে!

— কিছু করার নেই। সবাইকে দিয়ে থুয়ে তবে না মামলার ফয়সালা হবে।

— আচ্ছা খোলা হোক — দেখা যাক কত টাকা আছে।

— যাই থাক, ঐ ৫০০ টাকাই লাগবে। আপনি ভাবুন, কাল আবার আসব।

এতদিন গোপালের কাছে কোনো আবেদন করেনি গোপালের মা। ভেবেছিল টাকা যখন তার নামে এসেছে, সেই-ই পাবে। কিন্তু এখন ঐ টাকা দেয়ার প্রশ্নে তার খটকা লাগল। যদি সবটাই চলে যায়—তাহলে অতো হুজ্জত করে লাভ কি! সে আপনাকে নিবেদন করল। গোপাল কিছুই বলল না। কেবল তার পেতল মুখে দুষ্টু হাসি রাখল।

ভাড়াটেরা অতো সব না জেনেও একদিন পরামর্শ দিল, আপনি মেট্রো রেলের ঠিকানায় চিঠি দিন। বেশি কিছু লিখবেন না, কেবল আসতে লিখবেন। বলা তো যায় না। পুরো ঠিকানা না দেবার কারণ আছে। হয়ত টাকা কালো টাকা।

কিছু বুঝল না গোপালের মা।

কিন্তু পরের দিনই পিওন এসে গেল। সে আরও এক সাংঘাতিক কথা বলল। বলল, পাড়ার ছেলেরা জেনে গেছে। তারা কোনো ঝুট-ঝামেলা করবে না, যদি তারাও ৫০০ টাকা পায়।

তার মানে হাজার টাকার মামলা।

আরও বিপদে পড়ল গোপালের মা।

কাউকে বলতে পারল না পুরো কথা। পিওনের নিষেধ আছে। তাই দিশেহারা হল আরো।

এদিকে ছাদ না সারালেই নয়। সমানে জল পড়ছে। বৃষ্টিও ছাড়ছে না। পুজো এসে গেল প্রায়। তবু না।

সে আবার গোপালের কাছে নিবেদন করল। বল্ গোপাল, আমি কি করব! তোর মাথায় জল পড়ছে। তিল ধারণের স্থান নেই ঘরে যেখানে তোকে শুকনো রাখি। তুই যদি নিজের বুঝ না বুঝিস তাহলে আমি কি করি। গোপাল তবু নিরুত্তর। সে তার পেতল মুখে তবু ভাবলেশহীন। সারারাত ঘুমাতে পারল না গোপালের মা।

শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখল, রক্তমাংসের গোপালকে। সে নাচতে নাচতে এল, গান গাইতে গাইতে, সা রে গা মা পা ধা নি / বোম ফেলেছে জাপানী/ বোমের মধ্যে কেউটে সাপ / বৃটিশ বলে বাপরে বাপ।

সে কি নাচ! গোপালের মা ধরতে যায় আর সে নেচে গেয়ে তার নাগালের বাইরে চলে যায়।

ব্যর্থ হয়ে সে ঘুম ভেঙে সোজা গোপালের কাছে গেল।

— কিরে গোপাল, কিছু বলবি না? আমি কি করব, বল! তুই পেতলের; রক্ত মাংসের হলে কি আজ এমন চুপ থাকতে পারতিস? ঘটা করে নিয়ে নিলি তো আমার রক্তমাংসের গোপালকে। গোপাল তবু কিছু বলল না।

পরের দিন সাতসকালে তাদের মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড-কমিশনার এসে গেল।

— শুনলাম, আপনি নাকি নিজের নাম প্রমাণ করতে পারছেন না। আপনি নিজে সিওর তো যে আপনার নাম স্নেহলতা?

— বাপ-মা তো সেই নামই রেখেছিলেন।

— কোনো গোল হত না যদি আপনার নাম ভোটার-লিস্টে থাকত। .... যাক এবার ভোটার লিস্টে আপনার নাম ঢুকিয়ে দেব—আপনার শুনেছি রেশন কার্ডও নেই। তাহলেও এতসব ঝামেলা হত না। অন্তত রেশন কার্ডও করা উচিত ছিল এতদিনে। —স্ট্যাটিউটারি এলাকা এই আসানসোল—রেশনকার্ড ছাড়া কিছুই চলে না এখানে—আর ভোটার লিস্ট। তবে আমি আজ আপনার কাছে এসেছি, ঐ আপনার নাম প্রমাণ করতে—একটা কাগজের সন্ধানে—আপনার তো এই জমি রিফিউজি কার্ডে পাওয়া— সেই কাগজ যদি দেখাতে পারেন—তাহলে প্রমাণ হয়ে যায়— আপনার নাম স্নেহলতা— শুনেছি আপনার নামেই জমি। কী, নেই? কিন্তু এই কলোনীর রেজিস্ট্রারেও আপনার নাম পেলাম না। আপনি কি ১৯৫১ সালের পর এসেছেন? ও আচ্ছা। ...আসলে আমাদের রেকর্ডে ঐ ১৯৫১ সাল পর্যন্ত আছে। এখন তো রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট উঠে গেছে — জে এল আর ও ডিপার্টমেন্টেও আপনার নাম পেলাম না— ঠিক আছে, আমি আইডেনটিফাই করে দেব—আপনি কেবল বন্যাত্রাণে আমাদের পার্টিকে কিছু দেবেন।

কিন্তু পিওন—পাড়ার ছেলেরা যে কিছু চায়।

—জানি। তাদেরও কিছু দেবেন। কথা হয়েছে। ঐ সবাইকে খুশি করতে হবে তো! নাম বলে কথা! আর তাছাড়া টাকা বলে কথা! আর তাছাড়া পরিচয় বলে কথা! দেখছি, সবাই আপনাকে গোপালের মা বলে জানেন। আর গোপালকেও তো পাওয়া যাচ্ছে না—তাই না?

গোপালের মা যেন আরও বিপাকে পড়ল। তার ভাগিদার এসে বাড়ছে।

—দেখো, তুমিই ভরসা। দেখো বিধবা মা যেন বিপদে না পড়ে। তুমি যা করবে তাই আমি মেনে নেব। তোমার কথা অনেক শুনেছি। তুমি এ পাড়ায় জলের পাইপ আনছ শুনছি—তোমাকে ভার দিলাম। তুমি যা করো—তাই মেনে নেব।

—তাহলে ঐ কথাই রইল। কালই আপনি টাকা পেয়ে যাবেন।

পরের দিনই টাকা পেয়ে গেল গোপালের মা। দুপুরে টিপ সই করল। সাক্ষী হল কমিশনার। সে নিজে হাতে খাম নিল। কেবল বলল, খাম পরে খোলা হবে।

সবাই তা মেনে নিল। সবাই মানে পিওন, দুজন পাড়ার ছেলে আর ওয়ার্ড কমিশনার।

সন্ধ্যায় এসে টাকা দিয়ে গেল ওয়ার্ড কমিশনার স্বয়ং। বলল দুহাজার ছিল। পিওন বা পোস্টাপিস ২৫০ টাকা, পাড়ার ছেলেরা ২৫০, আর বন্যাত্রাণে ৫০০ টাকা; দু হাজারের এক হাজার গেল। থাকল অক্ষত এক হাজার টাকা।

খামের চিঠিতেও লেখা আছে, ছাদ সারাতে হাজার টাকা আর হাজার বারান্দা ঢাকতে।

তা আপাতত বারান্দা থাক। ছাদই সারানো হোক। বারান্দার কথা কমিশনার মনে রাখবেন। আপাতত তাঁর হেফাজতে একটি ত্রিপল আছে বিশাল। সেটা লাগিয়ে দেবে বারান্দায়। জলের ছাঁট আসা বন্ধ হবে। গুণে গুণে ১০টা নোট দিল্ কমিশনার। সব কটি নাকি একশ টাকার। খামে সেভাবেই ছিল।

কি আর করে গোপালের মা, তাই মেনে নিল। তবু তো ছাদ সারানো হবে। রাত্রে গোপালের আসনে টাকার খামটা রেখে বলল, এই তোর ইচ্ছা ছিল বুঝি! তবে তাই হোক! তুই অন্তত মাথায় জল পড়া থেকে বেঁচে ওঠ।

ভাড়াটের পরামর্শে, চিঠিতেও তাই নির্দেশ ছিল, ছাদের মিস্ত্রি ডাকা হল। সে হাজার টাকাতেই রাজি হল। কিন্তু টাকাটা সে পুরো চায় কাজ আরম্ভ করার আগে। কেননা সে তো জিনিস কিনবে।

ভাড়াটের সামনে খামটা তুলে দিল গোপালের মা।

খামটা নেড়ে-চেড়ে দেখল মিস্ত্রি। খাম খোলাই ছিল। ভেতর থেকে টাকা বার করল। দশটা নোট।

কিন্তু একি!

মিস্ত্রির হাত কাঁপল। সে ভাড়াটে পুরুষকে নোটগুলো দিল। দশটাই নোট।

কিন্তু সবগুলো কড়কড়ে ৫০ টাকার।

হত্যা দিয়ে পড়ল গোপালের মা। গোপালের আসন থেকে গোপালকে তুলে হাতের মুঠোয় নিয়ে শক্ত করে গোপালকে চেপে তাকে বুকে নিয়ে সে কাঁদল ঢের।

সারারাত চলল কান্না। তারপর ভোরের দিকে গোপালের মা দেখল, সে মেঝেতে শুয়ে। রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে খুব। গোপাল সমেত সে ভিজে গেছে। বুকের মধ্যে ধরা ভেজা গোপাল।

চোখ শুকনো।

সে পারল না। গোপালকে হাতের মুঠোয় নিয়ে সে গোপালকে একবার দেখল। তারপর তার চোখে আগুন ছুটল। সে ছুঁড়ে ফেলে দিল গোপালকে জানালা গলিয়ে বাইরে।

ডুমুর

নিখিলচন্দ্র সরকার

অমিতোষরা যখন ট্রেন থেকে নামল, তখন সকাল সাড়ে আটটা। বেলা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। মেঘলা আকাশ। ধূসর, পিঙ্গল কিছু মেঘের টুকরো উড়ে যাচ্ছে। আউলা-ঝাউলা বাতাস। একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা নরম-নরম শ্যামল চেহারা।

আজ রবিবার। ট্রেন একেবারে ফাঁকা এসেছে। তারা যে কামরায় ছিল, সেখানে মাত্তর পনের-কুড়ি জনের মতন যাত্রী। হাত-পা ছড়িয়ে বেশ আরামেই এসেছে, কোন অসুবিধা হয়নি, পুষ্পাকে নিয়েই ছিল বিপদ। ও ভিড়ভাট্টা একেবারেই সইতে পারে না। কলকাতা থেকে এখানে আসতে পাক্কা পৌনে দুঘণ্টা সময় লাগল। বাড়ি যেতে আরো প্রায় ঘণ্টাখানেক। খানিকটা রিকশা, খানিকটা হাঁটা। এখন জায়গাটা অমিতোষের কাছে অনেক দূর, অপরিচিত মনে হয়। আগে তা হতো না। তবু মাঝে মধ্যে এখানে এলে, সে গোপনে গোপনে এক ধরনের কষ্ট অনুভব করে। কিন্তু পুষ্পাকে কিছু বুঝতে দেয় না।

সাকুল্যে এখানে ছ-সাত জন যাত্রী নেমেছে। উঠলও অল্প ক'জন। কিন্তু চিৎকার চেঁচামেচিতে অস্থির। ট্রেন চলে গেল। আবার ফাঁকা। ছোট্ট স্টেশন। অমিতোষ ভাল করে জায়গাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। সেই একই রকম আছে সব। সেই সিগন্যাল কেবিন। সেই পয়েন্টস্-ম্যান রামচরণ তেওয়ারী। সেই গুমটি ঘর। গেট-ম্যান শিউচরণ পাঁড়ে। এখন ওর বয়েস হয়েছে। এখনো কি ও খাটিয়ার ওপর বসে দুলে দুলে সুর করে তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করে? আজো কি ওর রামায়ণ পড়া শেষ হলো না? উত্তর দিকের প্ল্যাটফর্মের দুপাশে এখনো দুটো কৃষ্ণচূড়া গাছ। এখন আরো অনেক ডালপালা ছড়িয়েছে। গাছ ভরতি লাল ফুল। হাওয়ায় ডালগুলি নুয়ে নুয়ে পড়ছে। পাতা কাঁপছে। ফুলের পাপড়ি ঝরে ঝরে পড়ছে। একেবারে কোণার দিকে দুটো বড় বড় কাঁঠাল গাছ। কাঁঠাল গাছের ডালে ডালে সিরসির একটা শব্দ। শব্দটা পাক খেতে খেতে চলে যাচ্ছে। ওপাশে একটা টিউবওয়েল। কাঠের কটা বেঞ্চ। দুপাশে গ্যাসবাতির দুটো পোস্ট। কাচের গায়ে লাল অক্ষরে স্টেশনের নাম লেখা। কটা কাক আর শালিখ চোখে পড়ল। মুহূর্তে পুরনো দিনের একটা গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। টেনে টেনে সেই ঘ্রাণ নিল অমিতোষ। ক পা হাঁটলেই একটা চায়ের স্টল।

এবার ওরা এখানে অনেকদিন পরে এল। না এসে কোনো উপায় ছিল না। অমিতোষের বাবার পুরনো হাঁপানী, দেখাশুনো করার মত কেউ নেই এখানে। বাড়িতে শুধু ওর বাবা আর মা। দুজনেরই বয়েস হয়েছে। বয়েসের নানা উপসর্গ। এ বাড়ি ছেড়ে ওর বাবা-মা কোথাও যাবে না। সেও তা চায় না। পুষ্পার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না আসার। কিন্তু কি ভেবে আবার রাজি হয়ে গেল।

পুষ্পা শাড়ি ঠিক করতে করতেই হয়রান, 'কি অসভ্য হাওয়া রে বাবা!'

অমিতোষ তাকাল ওর দিকে। হাসল সামান্য, বলল 'আঁচলটা সামান্য গিট দিয়ে নাও না।'

'হয়েছে, তোমাকে আর এর মধ্যে নাক গলাতে হবে না।' ও ততক্ষণে শাড়ির আঁচলটা পিঠের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে পেটের কাছে গুঁজে নিয়েছে।

অমিতোষ সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আগে একটু চা খেয়ে নিই চল'।

'তাই চল, আমারও বড্ড মাথা ধরেছে।'

অমিতোষ ভুরু কুঁচকে এক পলক তাকাল। সিগারেটে ঘন ঘন টান মেরে বলে, 'এই সাত সকালে তোমার মাথা ধরল?' গলায় কেমন একটু অবিশ্বাস।

পুষ্পা নাক ফুলোয়। চোখ-মুখে একরাশ বিরক্তি। সামান্য কুপিত, উদ্ধত ভঙ্গি। বড় বড় চোখ করে ও পালটা প্রশ্ন করল,'তোমার কি ধারণা আমি মিছে কথা বলছি?' ওর বলার মধ্যে রুক্ষতা, ঝাঁজ ছিল।

অমিতোষ এর কোন জবাব দিল না। এসব ক্ষেত্রে সে চুপ করেই থাকে। কথায় কথায় আরো কত কি এসে পড়বে। শেষে আরো অশান্তি। কেন যে ওর এই বিরক্তি, সেও খানিকটা তা অনুমান করতে পারে। সে লক্ষ্য করেছে, এখানে এলেই পুষ্পার মেজাজ ঠিক থাকে না। আজো ওর মেজাজ ঠিক ছিল না। অথচ কলকাতায় ও অন্যরকম। যখন তখন ও বাপের বাড়ি, মাসির বাড়ি, বোনের বাড়ি চলে যাচ্ছে। ওরাও আসে। আরো কত বন্ধুবান্ধবের নিত্য আসা-যাওয়া। বেড়ানো-খেলানো, সিনেমা-থিয়েটার সবই ঠিক আছে। অমিতোষের বাবা-মা গাঁয়েই থাকে। এখানকার ওপর পুষ্পার কোনো টান নেই। অমিতোষও এর মধ্যে অনেক বদলে গেছে। এদের সঙ্গে তার সম্পর্কও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। আগের মতন আর তেমন কোন উত্তাপ সে অনুভব করে না। সময়, পরিবেশ বুঝি মানুষকে দ্রুত পাল্টে দেয়। এখন ছ-মাসে ন-মাসে আসে, তাও কর্তব্যের খাতিরে। পুষ্পাকে সে আর আসতে বলে না। এ নিয়ে সে কোন অশান্তি, ঝামেলা চায় না। এবার কি ভেবে এল, ওই জানে। সিগারেটের টুকরোটা দু আঙুলের ফাঁকে পুড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার খেয়াল হল। টুকরোটায় জোরে একটা টান মেরে বলল, 'মাথা ধরার কোনো ট্যাবলেট আননি সঙ্গে?'

পুষ্পা চুপ করে থাকল।

সকালের চা-টা খেয়েই অমিতোষরা তাড়াতাড়ি করে স্টেশনে এসেছিল। ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট খানেক বাকি। এরকম দৌড়াতে দৌড়াতেই এসে ওরা ট্রেনটা ধরেছিল। ওরা মাত্র তিনজন এসেছে। অমিতোষ, পুষ্পা আর বুবাই। ছেলের বয়স এগার-বার। ওদের মাত্র দুটিই সন্তান। মেয়ে বড়। টিমুর বয়স এখন পনের-টনের। সামনের বার ও ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। অমিতোষ ওকেও আসতে বলেছিল। ও রাজী হয়নি। আদুরে আদুরে গলায় ও বলেছে, 'না বাপী, তোমরা যাও'।

তার ছেলেমেয়েগুলোও যেন কি রকম হয়েছে। সে এতে অখুশিই হয়েছে। একটু চুপ করে থেকে সে ফের একবার মেয়েকে বলল,'তোমার দাদুর খুব অসুখ, তোমাকে একবার দেখতে চেয়েছেন।'

টিমু বাপের গলা জড়িয়ে ধরল। আহ্লাদে গলে যেতে যেতে টেনে টেনে বলল, 'বাপী, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না।'

অমিতোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সত্যিই সে আজকাল অনেক কিছু বুঝতে পারে না।

পুষ্পা কাছে ছিল, বলল, 'দল বেঁধে যাওয়ার কি হলো? আমরা তো আর নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি না! যাব, দেখে চলে আসব। না-না, ওর গিয়ে কাজ নেই। এমনিতেই

ওর শরীর-টরীর ভাল থাকে না, তার ওপর আবার জল-কাদা লাগিয়ে একটা বড় কিছু বাধিয়ে বসুক আর কি।'

অমিতোষ চুপসে গেল; আমতা আমতা করে বলল, 'ঠিক আছে।' পরে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে ম্লান একটু হাসল, 'তাহলে সাবধানে থেকো।'

'আচ্ছা।' খুশি হয়ে ও ঘাড় কাত করে বাপের গলা ছেড়ে দিল। এক দৌড়ে অন্য ঘরে পালিয়ে গেল।

এসব ভাবতে ভাবতে অমিতোষ চা-এর স্টলের কাছে এসে দাঁড়াল। ঘড়ি দেখল একবার। এখানেই অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। স্টলের ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি করে দু কাপ চা দিতে বলল। পরে বুবাইয়ের দিকে চেয়ে শুধলো, 'তুই কি খাবি?'

'ওমলেট।' বেশ কায়দা করে বুবাই শব্দটা উচ্চারণ করল।

অমিতোষ চা-ঘরের ওই ছেলেটাকে একটা ওমলেটের অর্ডার দিল। কি মনে করে সে হেসে ফেলল। বুবাই এ বয়েসেই বেশ চালাক চতুর। পাকা পাকা কথা বলতে পারে। খুব চটপটে ও। মিশনারী স্কুলে পড়ে। এ বয়েসেই অনেক কায়দা-টায়দা শিখে ফেলেছে। চলনে বলনে কোনরকম ওর আড়ষ্টতা নেই। অমিতোষ কিন্তু ছেলেবেলায় কখনও এরকম ছিল না। কেমন বোকা-বোকা, আড়ষ্ট ভঙ্গি। চেহারায় কথাবার্তায় গ্রাম্য ঢং। ছেলেবেলায় সে মামলেট বলত। বড় হয়েও বলেছে। এখন আর বলে না। তার মুখে একদিন এই মামলেট শব্দটা শুনে পুষ্পা তো হেসে কুটিকুটি। সে রীতিমতন অপ্রস্তুত। এসব নাকি গ্রাম্য উচ্চারণ। পুষ্পা কনভেন্টে পড়া বড়লোকের মেয়ে। চাল-চলন, আদব-কায়দাই আলাদা। হাসতে হাসতে ওকে বলেছিল, 'তুমি আর ওসব মামলেট-টামলেট বলবে না তো, বলবে ওমলেট।' বলেই খিল খিল হাসি, যেন কি এক মজার ব্যাপার।

ছেলেবেলায় এসব অভ্যেস পাল্টাতে তার আরো খানিকটা সময় লেগেছিল। পুষ্পা এমন করেই তার আরো কিছু কিছু গলদ, যা ওর কাছে গলদ বলে মনে হতো, তা সারিয়ে দিয়েছিল। আসলে, পুষ্পা ধীরে ধীরে তাকে তার নিজের মতন করে তৈরি করে নিতে চেয়েছে। তবু কি সে ওর মনের মানুষ হতে পারল?

তাড়াতাড়ি করে ওরা চা খাওয়া শেষ করল। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে একসময় স্টেশনের বাইরে এল। রিকশায় উঠল। এখনো অনেকটা পথ। স্টেশনের গায়ে গায়ে কিছু দোকানপাট। লোকজনের ভিড়, কোলাহল। স্টেশনের রাস্তা, গুঞ্জন সব পেছনে ফেলে ওরা ডান পাশের ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের সড়ক ধরল। রাস্তার দুপাশে বড় বড় তেঁতুল বট আর নিমগাছ। খানিকটা গিয়েই বাজার। আজ হাটবার। হাটুরেরা এরই মধ্যে আসতে শুরু করেছে। কারো মাথায় ঝিঙের ঝুড়ি, ঢ্যাড়স। কেউ ধামায় করে কুমড়ো নিয়ে চলেছে। কেউ লতাপাতা, পুঁইশাক, ডাঁটা শাক। আরো সব নানা জাতের শাক-সব্জি। সবাই ওদের বড় বড় চোখ করে দেখছে। বাজারের একেবারে কোণায় হারু মণ্ডলের মিঠাইয়ের দোকান। রিকশা এগিয়ে চলেছে। হারুর দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অমিতোষ তাকাল একবার। হ্যাঁ, সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই। গরম গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে। অমিতোষের লোভ হলো। হঠাৎ সে কিরকম ছেলেমানুষ হয়ে গেল। কি একটা ভর করেছে তার মাথায়। সে রিকশা থামাতে বলল। গতি একটু মন্থর হতেই রিকশা থেকে সে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল। বুবাইয়ের দিকে চেয়ে সে শুধু একবার জিজ্ঞেস করল, 'কি রে, গরম গরম জিলিপি খাবি নাকি?'

বুবাই হকচকিয়ে যায়। সে কি যে বলবে, ভেবে পেল না।

পুষ্পা কাণ্ড দেখে অবাক। লোকগুলো ওদের হাঁ করে দেখছে। ওর চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। মানুষটার কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে যদি! তাদের বসিয়ে রেখে ছুটল জিলিপি খেতে! গেঁয়ো আর কাকে বলে!

অমিতোষ এগিয়ে গেল। হারুদা জিলিপি ভাজছে। ওর বয়েস হয়েছে। মাথা ভরতি পাকা চুল। হাতটা শুধু ক পাক ঘুরে যাচ্ছে। ওকে দেখে হারু খুশির গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কখন এলে গো?'

'এই তো সকালের ট্রেনে'।

'তোমরা তো এখন এদিকের পথ ভুলেই গেলে।' ওর গলায় আন্তরিক এক দুঃখ।

অমিতোষ এসব কথায় আমল দিল না। হাসি-মুখ করে সে বলল, 'আগে গরম-গরম জিলিপি খাওয়াও তো হারুদা।'

হারু একটা ছেলেকে ডেকে কড়াই থেকে জিলিপি দিতে বলল।

অমিতোষের তর সয় না। জিলিপির ঠোঙাটা হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে খেতে শুরু করে দিল। খেতে খেতেই বলল, 'আগের সেই স্বাদ আর নেই হারুদা।'

'থাকবে আর কোত্থেকে, আগের দিন কি আর আছে? নেই। সবেতেই তো এখন ভেজাল'।

'তা মিথ্যে বলনি হারুদা।'

অমিতোষের চোখের সামনে ছেলেবেলার দিনগুলো উঁকি ঝুঁকি মারে। এখানে এসে কত জিলিপি, বালুসাই, জিবে-গজা খেয়েছে। হাটবারের দিনে তো কথাই নেই। হাতে কিছু পয়সা হলেই ওরা বন্ধুরা মিলে এখানে চলে আসত। সে সব দিন বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল।

একটু পরে আবার রিকশায় এসে উঠল অমিতোষ, হাতে জিলিপির ঠোঙা।

ঠোঙাটা বুবাইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নে খা।'

পুষ্পা ফোঁস করে উঠল, 'না, ও খাবে না। তুমিই খাও'।

অমিতোষ এখন আর রাগ করল না। হি হি করে হাসল। চারপাশের এই গাছগাছালি মাটি আকাশ দেখে ওর খুব ভাল লাগছিল। কলকাতায় এসব চোখে পড়ে না। চোখে পড়ার মতন ফুরসতও নেই তার। সারাক্ষণ কি এক প্রতিযোগিতা আর কোলাহল নিয়ে মেতে থাকা। একটু খোলামেলা, নিজের সঙ্গে নিজের মুখোমুখি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই যেন। একটার পর একটা প্রয়োজন চারপাশ থেকে কেবলই ঘিরে থাকে। এর শেষ নেই। ওখানে তার পেশা, সামাজিক মর্যাদা, প্রতিপত্তির সঙ্গে তাল রেখে তাকে চলতে হয়। তার পদমর্যাদার কথাটা সবসময় মগজের মধ্যে পাক খাচ্ছে। ভুলে যাওয়ার কোন উপায় নেই। তাছাড়া সে যদি কখনো-সখনো ভুলেও যায়, পুষ্পা ভোলে না। সময় মতন ঠিক মনে করিয়ে দেয় ও। সে একজন এঞ্জিনীয়র। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সে দেখেছে, তার নামের পাশের এই তকমাটা তার গৌরব বাড়িয়েছে। সমাজে একধরনের মর্যাদাও এনে দিয়েছে। এটাই এখন তার মুখ্য পরিচয়। আড়ালের সোজা সরল অকপট মানুষটা কখন একদিন গৌণ হয়ে গেছে। পুষ্পার কাছেও তার বাইরের পরিচয়টাই আজ বড়। বরং, এই পরিচয়টা তার ছিল বলেই পুষ্পার মতন মেয়ে আজ তার ঘরণী। পুষ্পা কথায় কথায় তাকে এ কথাটা অনেকবারই মনে করিয়ে দিয়েছে। সে ছিল গাঁয়ের ছেলে। যতই লেখাপড়া শিখুক, ভাল চাকরি করুক, পুষ্পার সঙ্গে তার আলাপ না হলে, সে ওই রকমই থেকে যেত। এতে তার লাভ হয়েছে কি লোকসান; এখন তা খতিয়ে দেখার আর ইচ্ছে হয় না। কেমন

নিস্পৃহ, উদাসীন। একটার পর একটা অভিজ্ঞতা। সে নিজেও বুঝতে পারে, তার ভেতরে এখন অন্য এক অমিতোষ।

আসলে, পুষ্পা শুধু তার বাইরের পরিচয় নিয়েই তুষ্ট থাকেনি। এক এক করে ও পরিচয়ের এই চৌহদ্দিটা আরো বাড়িয়ে নিয়েছে। যেমন, প্রথমেই কলকাতার খুব কাছে বনেদী, অভিজাত পাড়ায় একটা বাড়ি করেছে ওরা। একটা বাড়ি না থাকলে সমাজে ঠিক মাথা উঁচু করে বাঁচা যায় না। আবার যেমন-তেমন বাড়ি হলেও চলবে না। মোজাইক, গ্রিল, একটু ব্যালকনি থাকবে, পুব-দক্ষিণ খোলা। সামনে ফুলের বাগিচা, সবুজ ঘাসের গালিচা-মোড়া ছোট একটা লন, এই সব আর কি! একেবারে আধুনিক কায়দায় বাড়ি। দেখলে যেন প্রথমেই লোকের চোখ আটকে যায়। যেন বিস্ময়ে বলতে পারে, হ্যাঁ, এঞ্জিনীয়ারেরই বাড়ি বটে। তার ওপর জানলায় বাহারে পর্দা। মোট কথা, পয়সার দেমাক এবং রুচি, দুই-ই যেন ফুটে বেরোয়। এখানেই শেষ নয়। বাড়িতে একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর না হলে কি চলে? তা না হলে আর বাড়ির সৌন্দর্য কি! অমিতোষ একদিন এক বন্ধুর বাড়ি থেকে একটা কুকুর-বাচ্ছা নিয়ে এসেছিল। ওটারও এখন বয়স হয়ে গেছে। তারপর ছেলেমেয়ের এডুকেশন। তার মধ্যেও যেন একটা গর্ব থাকে। কেউ জিজ্ঞেস করলে যেন একগাল হেসে বলতে পারে: হ্যাঁ, ছেলেটাকে মিশনারী স্কুলে দিয়েছি। মেয়েটাও কনভেন্টে পড়ে। যাই বলুন, বাংলা স্কুলে আজকাল আর তেমন পড়াশুনো হয় না। ওসব জায়গায় এখন ন্যাস্টি পলিটিক্স।

অমিতোষের ষ্ট্যাটাস এখন একেবারে আলাদা। এরকম জীবন-যাপনের জন্যে যে যে উপকরণ থাকা দরকার তার সবই আছে। যেমন, টেলিফোনটা খুবই প্রয়োজন। রেডিও পুরনো হয়ে গেছে। স্টিরিও, রেকর্ড-প্লেয়ার, সেও বাসীর পর্যায়ে। ফ্রিজ, টেলিভিশন? হ্যাঁ, তাও এসে গেছে। ঘরে মদের বোতল সাজানো থাকে। মাঝে মাঝে শরীর-টরীর একটু ম্যাজ ম্যাজ করলে, বা কাজের চাপে মাথাটা গরম থাকলে, ঘরের নীলচে ঝিম-ঝিম আলোয় ও আর পুষ্পা এক সঙ্গে মদ খায়। ছেলেমেয়ের সামনেই। ওরা কিছু মনে করে না এতে। পুষ্পার কোন সঙ্কোচ নেই। বরং এক ধরনের ফূর্তিতে মত্ত হয়ে ওঠে। পোশাক-আশাকেও হাল ফ্যাশনের চমক। একে একে অমিতোষ এ সবই সংগ্রহ করেছে। কিন্তু এত করেও তার কোথায় একটা অভাব, অতৃপ্তি থেকে গেল। কোন কোন নিভৃত, নিঃসঙ্গ মুহূর্তে তার মনে হয়েছে, এগুলোই কি তার আসল পরিচয়পত্র? সে গায়ের কথা ভুলে গেছে। ওখানে তার মা-বাবা থাকে। গাঁয়ে তার টিনের বাড়ি। ওদের কথা মনে পড়ে। ওরা কি নিয়ে বেঁচে আছে? কি নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল? এসব ভাবতে গেলেই তার বুকের ভেতর মেঘ জমে। গুরগুর করে ওঠে।

বিয়ের পর পুষ্পা এখানে বার পাঁচেক এসেছে। টিমু একবার কি দুবার, বুবাই এ নিয়ে তিনবার। হঠাৎ অমিতোষের মনটা কি এক খুশিতে ভরে উঠছে। মনের ওপর থেকে এই মুহূর্তে কি একটা ভার সরে গেল। আজ অনেকদিন পর আবার কেমন ছেলেমানুষ হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। মুখের ওপর এখন আর তার সেই গাম্ভীর্য নেই। পুষ্পার রাগ এখন তার গায়ে লাগছে না। হাসতে হাসতে সে সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া গিলতে গিলতে বলল,'তুমি জান না পুষ্পা, হারুদা খুব ভাল মিষ্টি তৈরী করে।'

'আমার জেনে কাজ নেই, ও তুমিই জানতে থাক'।

'তুমি তো আর হারুদার মিষ্টি খাওনি, তাই, একবার খেলে আর ভুলতেই পারতে না।'

অমিতোষ কথা বলতে বলতে কি ভাবল। কত কথা এই মুহূর্তে তার মনে পড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সে হা হা করে হাসতে লাগল। হাসি আর থামতেই চায় না যেন। রাস্তার

লোকজন তাদের দিকে আবাক হয়ে চেয়ে আছে। বুবাইও ওর মুখের দিকে চেয়ে খিল খিল করে হাসল।

পুষ্পা বিরক্ত হলো। ওর অস্বস্তি হচ্ছিল। ও ঘাড়টা সামান্য বেঁকিয়ে বড়-বড় চোখ করে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এত হাসির আবার কি হলো তোমার?'

অমিতোষ কি একটা বলতে গেল। হাসির চোটে বলতে পারল না। একটু পরে সামলে নিয়ে খুশি খুশি গলায় বলল, 'জান ছেলেবেলায় একবার বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে এই হারুদার দোকানে দু সের জিলিপি খেয়ে ফেলেছিলাম। ভাবলে এখনো আমার হাসি পায়?'

বুবাই অবাক, 'দু সের জিলিপি, বল কি বাপী?'

'হ্যাঁ রে, এরকম আরো কত মজার মজার সব কাণ্ড!' অমিতোষ যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে।

পুষ্পা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'ও তোমাকে দেখেই বোঝা যায়, জিলিপি খাওয়ারই চেহারা তোমার।'

'দেখলি তো বুবাই, তোর মা আমাকে ঠাট্টা করছে।' করুক! সে আরো জোরে জোরে হেসে ওঠে।

বাজার পেছনে ফেলে রিকশা চলছে। অমিতোষ সিগারেট টানতে টানতে সতৃষ্ণ চোখে চারপাশে তাকাচ্ছিল। এখানকার ঘাস মাটির গন্ধই আলাদা। দুপাশে ক্ষেত। চাষীরা মাঠে নেমে পড়েছে। ফসল বোনার কাজ চলছে। আকাশ মেঘের ভারে নুয়ে পড়েছে। এলোমেলো হাওয়া বইছে। যে-কোন সময় মুষলধারে বৃষ্টি নামতে পারে।

অমিতোষকে আজ কথায় ভর করেছে। তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। হালকা উচ্ছল ভঙ্গি। সে দু পাশে তাকাতে তাকাতে এক সময় বুবাইকে বলল, 'ওই দেখ বুবাই।'

বুবাই তাকাল। কতকগুলো লোক কোমর জলে দাঁড়িয়ে পাতা সরিয়ে সরিয়ে কি তুলছে। ওদের সঙ্গে বড় বড় মাটির হাঁড়ি। তুলে তুলে হাঁড়িতে রাখছে।

অমিতোষ হালকা গলায় প্রশ্ন করল, 'ওরা কি তুলছে বল তো'?

বুবাই নিরুত্তর।

অমিতোষ হেসে ফেলল, 'তুই আর কি করে বলবি, কখনো দেখিস নি তো! ওরা পানিফল তুলছে রে, পানিফল।'

বুবাই অবাক হয়ে ওদের দেখল খানিকক্ষণ।

রিকশা বাঁই বাঁই করে ছুটছে। একটার পর একটা দৃশ্য পেছনে পড়ছে। কেউ সাপলা তুলছে। একটা মেয়ে কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে কলমি-শাক তুলছে। ঘাস-ফড়িং তিড়িং তিড়িং করে উড়ছে। প্রজাপতি উড়ে উড়ে লতাপাতায় বসছে। কোথাও কোথাও চোরকাঁটা, ভেরেণ্ডা গাছে ছেয়ে আছে। কোথাও শেওড়া, বনতুলসীর মাথায় ফড়িং, পোকামাকড়। ঘন ঝোপ। ঝোপের মধ্যে ডাহুক ডাকছে। অমিতোষ অন্যমনস্ক।

বুবাই অবাক। এরকমটা এর আগে আর কখনো ও দেখেনি। কত রকমের সব ছবি। অতগুলো লোক জলে ডুবে ডুবে কি করছে। হঠাৎ ও বাবার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওই লোকগুলো কি করছে বাপী?'

অমিতোষের ঘোর কাটে। ছেলের দিকে তাকায়। বলে, 'ওরা? ওরা মাছ ধরছে, সিঙি মাগুর ট্যাংরা কই-টই হবে।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। পুষ্পা একটাও কথা বলছে না। মুখ গোমড়া করে ও অন্যদিকে চেয়ে আছে। ছোট একটা ছেলে তখন জলের কিনারে কিনারে কি খুঁজছে। নিচু হয়ে

কুড়িয়ে কুড়িয়ে ছেলেটা কিছু তুলছে মনে হলো। বুবাই আবার প্রশ্ন করল, 'ওই ছেলেটা কি মাছ ধরছে বাপী?'

অমিতোষ হেসে ফেলল, বলল, 'না রে, ও গেঁড়ি তুলছে।'

বুবাই এ শব্দটা আগে কখনো শুনেছে বলে মনে হল না। সে বাপের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকল।

অমিতোষ ছেলের দিকে চেয়ে আবার খিলখিল হাসল, হ্যাঁ রে গেঁড়ি, মানে ছোট ছোট শামুক। ওগুলো ওরা খায়, হাটে বিক্রি করে। ওগুলো নাকি পেটের পক্ষে খুব ভালো।'

পুষ্পা চোখ-মুখ কুঁচকে ঘেন্না ঘেন্না গলায় বলল, 'মা গো, এ আবার লোকে খায় নাকি?'

অমিতোষ ওর চোখে চোখে তাকাল একবার। যেন বলতে ইচ্ছে হলোঃ তুমি আর মানুষের কতটুকু খবর রাখ পুষ্পা! জানই বা কি! মানুষের দুঃখ তুমি বুঝবে না! সে মনই তোমার নেই। আর হবেও না কোনদিন। আমিও এখন কিছু বুঝি না। বুঝতে চাই না। আমরা বড় স্বার্থপর হয়ে গেছি। আমার আরামের জন্যেই আমি এখন সারাক্ষণ ব্যস্ত অথচ গাঁয়ের বেশীর ভাগ মানুষই এভাবে বেঁচে থাকে পুষ্পা, এভাবেই বেঁচে থাকে।

বুবাই একসময় হাততালি দিয়ে উঠল, 'ওই দেখ বাপী, কত বক।'

অমিতোষ ওদিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, 'বক দেখেই এত খুশি?'

এমন সময় জলের ওপর ঝুপঝুপ করে কতগুলো পাখি ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাঁসের মতন দেখতে অনেকটা। গায়ের রঙ ঘন কালো। গলাটা লম্বা ধরনের। পাখনাগুলো বড় বড়। বুবাই কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, 'ওই দেখ বুবাই, কত পানকৌড়ি! নে নে চিনে রাখ। গাঁয়ের কিছুই তো আর দেখলি না, চিনলি না! আমি এই গাঁয়েই বড় হয়েছি রে!'

পুষ্পা টিপ্পনি কাটল, 'ওসব ওর না চিনলেও কিছু হবে না।'

অমিতোষ চুপ করে গেল। অন্যদিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সেও তো একদিন একটু একটু করে এখানকার সবই চিনেছিল! কিন্তু কি হলো? আজ সে তার এই পরিচিত, অন্তরঙ্গ ক্রীড়াভূমি থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছে। এ-জন্মের মতন তার সব বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। তবু তো সে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না! এসব বন-বাদাড়ে, ঝোপেঝাড়ে, খালে-বিলে, ঘাসপাতার আনাচে কানাচে তার ছেলেবেলার দিনগুলো টুকরোটুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বড় মায়া, বড় কষ্ট। বুবাইটা এসব কিছুই দেখল না, জানল না। ও কি নিয়ে সংসারে বড় হবে? মনের সব জানলা দরজা বন্ধ করে দিয়ে কি কেউ কখন পুরো মানুষ হয়? পুষ্পার মতের সঙ্গে তার মত মেলে না। মনের ঐশ্বর্য কি এত সহজে সংগ্রহ করা যায়? পুষ্পা তাকে বুঝল না! ছেলেমেয়েরাও কেউ তাকে বুঝতে চায় না! আজো কেন এখানকার এই মাটি, এই ঘাস তাকে পিছু ডাকে? হাতছানি দেয়?

অমিতোষ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তার খেয়াল হলো। একটা আমলকী গাছের ডালে বসে দোয়েল শিস দিচ্ছে। উঁচু ঢিবির মতন একটা জায়গা। ভাঙা একটা মসজিদ। সামনে অনেকটা ফাঁকা জমি। পাশেই একটা দীঘি। পদ্মপাতায় ছেয়ে আছে। কাঁঠাল, আম গাছে জায়গাটা ঘেরা। ওদিকে চেয়ে চেয়ে সে বলল, 'বুঝলি বুবাই, এটা একটা পীরের দরগা।'

বুবাই কিছুই বুঝল না। সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল।

অমিতোষ তখনো বলে চলে, 'এখানে একজন মুসলমান ফকির থাকতেন। এখন বেঁচে নেই। বড় ভাল দয়ালু মানুষ ছিলেন রে! কত লোক আসত ফকির সাহেবের কাছে। দূর-দূর গাঁ থেকে ওঁর কাছে কঠিন রোগ-টোগ সারাতে আসত। ভালও হয়ে যেত অনেকে। ওঁর ঝাড়ফুঁক, মন্তরের গুণই ছিল অন্যরকম। শীতের সময় আজো এখানে মস্ত মেলা বসে।'

রিকশা এবার বাঁয়ে ঘুরল। খানিকটা গিয়েই মরাখলা। গাঁয়ের কাছাকাছি চলে এসেছে। আর খানিকটা গিয়ে একটা বাঁক ঘুরলেই রিকশার-রাস্তা শেষ। মরাখলার কাছে আসতেই বুকের ভেতরটা কেন তার এমন করে গুরগুর করে ওঠে! রাস্তার পাশ থেকে ঢালু হয়ে মরা খালটা নেমে গেছে। আশেপাশের গাঁয়ের কেউ মরলেই এখানে এনে পোড়ানো হয়। ভাঙা কলসীর কানা, কিছু তুলসী গাছ চোখে পড়ল। পাশেই বড় একটা বিল। আসশেওড়া, তেঁতুল গাছ। কেমন নিঝুম, গা-ছমছম-করা ভাব। গাঁয়ের অনেকেই এখন আর বেঁচে নেই। হঠাৎ তার বাবার কথা মনে পড়ল। বাবার অসুখ হয়েছে। তার বাবা মা, তারাও তো একদিন চলে যাবে। বুকের ভেতরটা টাটায়। কেউ থাকবে না, থাকবে না। হঠাৎ তার চোখের সামনে বুড়ীর মুখটা ভাসতে থাকে। কানাইয়ের বোন। কানাই তার বন্ধু। দেখতে ভারী সুন্দর ছিল। বড় বড় টানা টানা চোখ, ঘন ভুরু, গায়ের রঙ কালো। যখন তখন ও তাদের বাড়ি আসত। মার সঙ্গে কত গল্প-টল্প করত। মাও খুব ভালবাসত ওকে। কত হাসি-ঠাট্টা। আড়ালে ও মুখ ভেংচাত। মার খুব ইচ্ছা ছিল ওকে বউ করে ঘরে আনে। অমিতোষ তখন ভালভাবে পাশ করে কলকাতায় শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। সুযোগ বুঝে বুড়ী একবার তাকে বলেছিল, 'আজকাল তুমি আমাদের ভুলে যাচ্ছ অমিতদা।'

'না না ভুলব কেন?'

বুড়ী ঠোঁট বেঁকিয়ে ফের বলেছিল, 'আমার মন বলছে।' আবার অন্য একদিন তার হাত ধরে ও বলেছিল, 'তুমি আমাকে একবার কলকাতায় নিয়ে যাবে?'

অমিতোষ হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছে, 'হুঁ, আগে পাসটাস করি, চাকরি করি, তারপর।' তার আর সুযোগ এল না। কবে সে পাস করবে, চাকরি করবে, তারপর বিয়ে! বুড়ীর বাপ এতদিন সবুর সইতে পারল না। পাশের গাঁয়ের হারাণ ঘোষের ছেলের সঙ্গে একদিন বুড়ীর বিয়ে দিয়ে দিল। ওদের জমিজিরেত অনেক। খাওয়া পরার অভাব হবে না। অমিতোষ তখন কলকাতায়। বুড়ী নাকি তার মায়ের গলা জড়িয়ে খুব কেঁদেছিল। সেও তো মনে মনে ওকে খুব পছন্দ করত। সব শুনে সে খুব কষ্ট পেয়েছিল। বুড়ী কি এতে সুখী হয়েছে! জানার খুব ইচ্ছা হতো তার। একদিন সুযোগও এল। অমিতোষ তখন ছুটিতে বাড়ি আছে। বুড়ীও বাপের বাড়ি এসেছে। মার কাছে সে শুনেছিল, বুড়ীর বরটা নাকি মদটদ খায়, ওকে মারধর করে। শুনে তার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এরমধ্যে একদিন বিকেলে বুড়ী তাদের বাড়ি এসেছিল। ও সেদিন বেজায় হাসি-খুশি। খুব সাজগোজ করেছে। অমিতোষ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'কি ব্যাপার বুড়ী?' বুড়ী উচ্ছল ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তোমাকে দেখতে এলাম, তুমি নাকি কালই চলে যাচ্ছ?' অমিতোষ চুপ করে থাকে। কি ভাবে। ওর দিকে চেয়ে থেকে একসময় অস্ফুটে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি সুখী হয়েছ তো বুড়ী?' ও তার চোখের দিকে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ। তারপর খল খল করে ওর কি হাসি! আর দাঁড়াল না ও। দৌড়ে পালিয়ে গেল। সেদিনই ভর সন্ধ্যেটার সময় ও গলায় দড়ি দিল। অমিতোষও সেদিন শ্মশানে গিয়েছিল। কলকাতায় ফিরতে সেবার তার আরো ক'দিন দেরি হয়েছিল।

বুকের ভেতরটা তার আজো কেন এমন টনটন করে? কেন এসব কথা আজো তার মনে পড়ে? সে তো ভুলেই গিয়েছিল। ভুলতেই চায়। বুড়ী বড় অসময়ে চলে গেল! ওর অভিমানটা কার ওপর? বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে সব। যা হারাল, নিয়তই হারিয়ে যাচ্ছে, আর কি কখনো সে এ-জীবনে তা ফিরে পাবে? জীবন কি এতই ছোট? দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। বুকের ভেতরে হাহাকার। ভাবতে ভাবতে কোন্ গভীরে সে তলিয়ে গেল। কখন এসে রিকশা দাঁড়িয়ে পড়েছে তা টেরও পেল না সে। মুখের ওপর চাপা এক কষ্ট। তার বুকের অতলে বুড়ী যে আজো ঘুমিয়ে আছে।

পুষ্পা তেরছা চোখে ওকে দেখল। পরে উপহাসের গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এমন করে কার এত ধ্যান করছ?'

অমিতোষের এতক্ষণে খেয়াল হলো। এরপর রিকশা আর যাবে না। এখান থেকে কাঁচা, সরু রাস্তার শুরু। ভাড়া মিটিয়ে রিকশাঅলাকে সে বলল, 'আমরা আবার পাঁচটার ট্রেন ধরব কিন্তু। পৌনে-চারটে নাগাদ এখানে চলে এসো।'

আকাশ এখন কুচকুচে কালো। ঠাণ্ডা বাতাস। কোথাও নিশ্চয়ই বৃষ্টি হয়েছে। আর খানিকটা হাঁটতে হবে। এসব রাস্তায় হাঁটার অভ্যেস নেই পুষ্পার। ওর অসুবিধে হচ্ছিল। বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে একফালি পথ। হঠাৎ পাতার ওপর দিয়ে সর সর করে কি একটা চলে গেল। 'পুষ্পা, সাপ'! অমিতোষ ওর হাত ধরে জোরে টান মারল।

'মা·গো'! পুষ্পার বুকটা ধক করে উঠল। ভয়ে প্রায় কেঁদেই ফেলে আর কি! পরে রাগে ফেটে পড়তে পড়তে বলল, 'এসব জায়গায় আবার কেউ আসে নাকি? এখন দেখছি না এলেই ভাল হতো।

অমিতোষ চুপ করে থাকল।

এমনি করেই ওরা কখনো পুকুর পাড়, কখনো লেবুতলা, কখনো বা কারো বাড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে একসময় নিজের বাড়ি এল। বাড়ির সামনেই দুটো বকুল গাছ।

দূর থেকেই উমাতারা ওদের দেখতে পেয়েছেন। তিনি ছুটে এলেন দরজার কাছে। ওরা এসে প্রণাম করল। অমিতোষ মার মুখের দিকে চেয়ে গভীর এক কষ্ট অনুভব করল। একি চেহারা হয়েছে তার মার! চেনাই যায় না। শরীর ভেঙে পড়েছে। মুখের ওপর দুঃখের ছোট ছোট কত দাগ। সেই মলিন মুখেও এখন হাসি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অমিতোষ শুধোয়, 'বাবা এখন কেমন আছে মা?'

'এখন একটু ভাল'। পরে তিনি পুষ্পার দিকে চেয়ে বললেন, 'ঘরে এসো বৌমা! আমার দাদুভাইটা এত চুপচাপ কেন?'

ওরা উঠোন পেরিয়ে তুলসী-মঞ্চ, বাতাবী লেবুর গাছটা ডান দিকে রেখে ঘরে এল।

মেঝেটা মাটির। দরমার বেড়া। ওপরে টিন। বাড়ির ভেতরে অনেক আগাছা, জঙ্গল হয়েছে। বাড়ির এ দশা দেখে অমিতোষের কষ্ট হলো। জুতো খুলে সে সোজা বাবার কাছে চলে এল। প্রণাম করল।

হরনাথবাবু পুরনো কাগজ পড়ছিলেন। ওদের দেখে তিনি খুশি হলেন। কাগজটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন। পরে নাতির দিকে চেয়ে একগাল হেসে বললেন, 'এদিকে আয় দাদুভাই; ইস কি রোগা, লিকলিকে চেহারা রে! এ বয়েসে তো এরকম স্বাস্থ্য থাকা উচিত নয়।'

বুবাই গটগট করে এগিয়ে গেল। হরনাথবাবু নাতিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। শেষে বললেন, 'শরীর আর ভাল হবে কি করে, ওর পেটে তো ভরতি কৃমি।'

পুষ্পা বলল, 'ঠিকই বলেছেন আপনি। সবসময়ই ওদের পেছনে ডাক্তার আছে।'

'ওই তো তোমাদের দোষ বউমা। কিছু হলেই ডাক্তার, ওষুধ। ওসব ওষুধ খাইয়ে কোন লাভ নেই। সাময়িক রোগটা চাপা থাকে মাত্র, একেবারে কখনো সারে না। কদিন পর আবার উপদ্রব বাড়ে।'

উমাতারা কাছেই ছিলেন, বললেন, 'তুমিও তো বউমা মাঝে মাঝে ওদের একটু চুনের জল, শিউলি পাতা বা মটকিলা পাতা থেতো করে খানিকটা রস করে খাইয়ে দিতে পার। ওতে পেট ভাল থাকে, বাড়তি কৃমিটিমি মরে যায়। অমিকে কি এসব কম খাইয়েছি! কচি আনারস পাতার রসও খাওয়াতে পার।'

পুষ্পা চুপ করে থাকে। অমিতোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাকে একবার দেখল।

উমাতারা সরল মনে আবার বলতে লাগলেন, 'অমিটা ছেলেবেলায় কি কম ভুগিয়েছে আমায়!'

প্রায়ই তো ওর জ্বর, সর্দি-টর্দি লেগে থাকত। এখানে আর যখন তখন ওষুধ পাব কোথায়! সর্দি হলে মধু দিয়ে তুলসী পাতা বা বাসক পাতার রস খাওয়াতাম। পেটের জন্য থানকুনি পাতা, কালমেঘের পাতা, ডুমুর খুব উপকারী। এসব কি ও কম খেয়েছে!'

'কলকাতায় আর ওসব পাব কোথায়?' পুষ্পা ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল। কোনরকম আগ্রহও দেখাল না।

অমিতোষ কি ভেবে হাসল। এটা পুষ্পার চালাকির কথা। ও কি এসব গাছ-গাছড়ার কখনো নাম শুনেছে? এগুলো তো ও চেনেই না। কিছু মানেও না। কে বলেছে, কলকাতায় ওসব পাওয়া যায় না! পুষ্পার ধারণা এসব লতাপাতা ব্যবহারের মধ্যে কোনো কৌলিন্য নেই। এগুলো এক ধরনের গ্রাম্যতা। দামী দামী ওষুধ না কিনলে আর মান থাকে কোথায়! ওসব গাছগাছড়া গরীবের জন্যে। পয়সা দিয়ে যারা ওষুধ কিনতে পারবে না, ওসব বিধান তাদের জন্যে।

উমাতারা অমিতোষের দিকে চেয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। পরে সস্নেহ গলায় বললেন, 'তোরও তো শরীর খুব ভেঙে গেছে রে?'

অমিতোষ হাসল সামান্য। মার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'কিছু খেয়ে এখন আর হজম করতে পারি না মা, খালি চোঁয়া ঢেকুর ওঠে, একটা বমি-বমি ভাব।'

'ইস, চেহারাটার দিকে আর তাকানো যায় না।'

হরনাথবাবু তাকালেন স্ত্রীর দিকে। বললেন, 'তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না, ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা কর গে'। তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। খুশি-খুশি মুখ।

'যাই'। উমাতারা পুষ্পাকে নিয়ে চলে গেলেন। বুবাইও ওদের পেছন পেছন গেল।

হরনাথবাবু ছেলের চোখে চোখে চাইলেন এবার। শুধোলেন, 'টিমুকে আনলি না?'

'ওর শরীরটা ভাল নেই।' সেও বাবার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ।

হরনাথবাবুকে খুব কাহিল, দুর্বল দেখাচ্ছিল। চোখমুখ একটু ফ্যাকাসে। শ্বাস-প্রশ্বাসে এখনো কষ্ট। তবু বাইরে থেকে তিনি তা বুঝতে দিতে চান না। কেন, অভিমান?

অমিতোষ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটু পরে কি ভেবে সে শুধলো, 'আপনার শরীর এখন কেমন?'

'এখন অনেক ভাল আছি আমি। অনাদি কবিরাজ ওষুধ দিচ্ছে। তা ছাড়া হাঁপানী তো একেবারে সারেও না।' একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি। দম ফেলতে কষ্ট। কী ভেবে আবার বলতে শুরু করলেন, 'বুকে শ্লেষ্মা জমে গিয়েছিল। গাছগাছড়ার গুণই আলাদা। অর্জুন গাছের ছাল সেদ্ধ করে জলটা খেতে বলেছিল অনাদি। পিপুল গুঁড়ো করে আখের গুড় দিয়ে খেতে দিল। আরো কি সব শেকড়-বাকড় রস করে খেতে

দিয়েছিল। এখন বেশ ভালো আছি।' এতগুলো কথা বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তবু তিনি তা গায়ে মাখলেন না।

অমিতোষ কি একটা ভাবল। আমতা আমতা করল বারকয়েক। শেষে বলেই ফেলল, 'একবার কলকাতায় চলুন। বড় কোন ডাক্তার দেখিয়ে নিলে ভাল।'

হরনাথবাবু গম্ভীর হলেন। বালিশের তলা থেকে একটা ছোট মতন কৌটো বের করলেন। কৌটোর ভেতরে বিড়ি। একটা বিড়ি ধরালেন তিনি। ধোঁয়া ছেড়ে ম্লান একটু হাসলেন। বললেন, 'না, এখানেই খুব ভালো আছি রে, বেশ আছি! বাঁচবই বা আর কটা দিন। সব তো হয়ে এল!' একটু যেন উদাস, বিষণ্ণ।

অমিতোষ জানত, তার বাবা এরকমই কিছু একটা বলবেন। একবার মাত্র সে তার বাবাকে জোর করে কলকাতার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়ি দেখে খুব খুশি। কিন্তু কদিন থেকেই তিনি চলে এসেছিলেন। ওখানে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি। পুষ্পা তার বাবার এই ঘনঘন বিড়ি খাওয়া, লুঙ্গি পরে গায়ে ফতুয়া চড়িয়ে ঘোরাফেরা করা পছন্দ করত না। আকারে-প্রকারে ওর অসন্তোষ, বিরক্তিটা প্রকাশ করে ফেলেছিল। তার অসাক্ষাতে পুষ্পা কি বাবাকে রূঢ়, অবাঞ্ছিত কিছু বলেছিল? পুষ্পার আরো বেশী রাগ হয়েছিল, তিনি নাকি ওর বাবার সামনে একটার পর একটা বিড়ি খেয়েছিলেন। এতে লজ্জায় ওর মাথা কাটা গিয়েছিল। এটা ওর ভাল লাগেনি। কেন, সিগারেট খেলে কি হতো? অমিতোষ কি করে বোঝাবে যে ওটা ওর বাবাকে অসম্মান করা নয়, যার যে নেশা। এটা তো একটা দিক। অন্য কারণেও বাবা তার উপর বিরক্ত, ক্ষুব্ধ। এ বিয়েতে বাবার একেবারে মত ছিল না। বাবার অমতেই সে পুষ্পাকে বিয়ে করেছে। পুষ্পার দাদা অবনী তার সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ত। অবনীর সঙ্গেই সে প্রথম ওদের বাড়ি যায়। সেখানেই পুষ্পার সঙ্গে আলাপ। দিনে দিনে ঘনিষ্ঠতা। পুষ্পার তখন দুরন্ত যৌবন। আকর্ষণ দুর্নিবার। উদ্ধত বেপরোয়া ভঙ্গি । একে উপেক্ষা করার সাধ্য ছিল না অমিতোষের। সে যেন আজ অপরাধী। মুখের ওপর তার বিষণ্ণ ছায়া। শেষে বিনম্র গলায় ধীরে ধীরে সে বলল, 'তবু একটু সাবধানে থাকবেন। বেশী ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগাবেন না।'

হরনাথবাবু অন্যমনস্ক। তিনি বুঝতে পারছেন, তাঁর সময় এগিয়ে আসছে। যাওয়ার আগে সবাইকে তিনি ক্ষমা করে যেতে চান। তাঁরও মুখের ওপর কি এক বেদনা তিরতির করে। ছেলের ওপর আর কোনো রাগ নেই তার। তিনি ওকে অনেক আগেই ক্ষমা করেছেন। তিনি ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটু সময়। পরে মায়া জড়ানো গলায় বললেন, 'যা অমি, এবার জামা-প্যান্ট ছাড়'।

এমন সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। টিনের চালে তার শব্দ। কত কাল এ শব্দ সে শোনেনি। একদিন এ শব্দটা তার কাছে নেশার মতন ছিল। আহা, কতকাল পরে আবার তা ফিরে পেয়েছে। বুকের ভেতর তোলপাড় করে। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। জামা প্যান্ট ছাড়ল। অন্য কাপড় পরল। গায়ে গামছা জড়িয়ে নিল। তেল মাখল বুকে। খুঁজে-পেতে খেপলা একটা জাল বের করল। ডোলা নিল, তারপর এই মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই ভিজতে ভিজতে বেরিয়ে পড়ল।

উমাতারা সাবধান করলেন, 'জলে ভিজিস না অমি, সর্দি-টর্দি লাগবে। কি পাগল ছেলে রে'।

অমিতোষ শুনলে তো! আজ আর সে কারো কথা শুনবে না। জলে ভিজতে আজ তার কি মজাটাই না লাগছে। কতকাল পরে আবার সে এ রকম বেপরোয়া হতে পারল। একা একাই সে খালে বিলে জাল ফেলল। মাছ ধরল। জলে কাদায় মাখামাখি

হয়ে একসময় ঘরে ফিরে এল। ছেলেমানুষের মতন খুশিতে সে চিৎকার করে উঠল, 'দেখ, দেখ বুবাই, কত মাছ'। বলেই ডোলাটা উপুড় করে দিল।

অমিতোষের গা বেয়ে জল ঝরছে। উমাতারা তাড়াতাড়ি করে ঘর থেকে একটা গামছা নিয়ে এলেন। ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শঙ্কিত গলায় বললেন, 'আগে গা-মাথা মুছে নে অমি।'

'আমি বরং চানটা সেরেই ফেলি।' বলেই সে ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। ঝপাৎ করে জলে পড়ল। সাঁতার কাটল।

উমাতারা মাছ কুটতে বসলেন। অন্য রান্নাটান্না হয়ে গেছে। মাছগুলো শুধু রাঁধবেন। পুষ্পা পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে তিনি বললেন,'আজকাল আর চোখে ভাল দেখি না। বয়েস তো হয়েছে। শরীরও আর চলে না।'

পুষ্পা কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না। সে চুপ করে থাকে। অস্বস্তি বোধ করে।

উমাতারা কি মনে করে শুধোলেন, 'তুমি চান করবে না বউমা?'

'না, আমি চান করে এসেছি।'

খেতে খেতে বেলা হলো। সময় যে কি করে চলে যায়। অনেকদিন পরে অমিতোষ আজ বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছে। মার হাতের রান্নার স্বাদই আলাদা। সে যা যা একদিন পছন্দ করত, তাই রেঁধেছে মা। ডুমুরের সুক্ত, আলু-পোস্ত, মাছের টক। বড় তৃপ্তি, বড় স্বাদ। আহা, মা বড় স্নেহময়ী, মমতাময়ী।

উমাতারার খেতে খেতে আরো দেরী হলো। খাওয়া দাওয়া সেরে তিনি এ ঘরে এলেন। হাতে দুখিলি পান। নিজের হাতে সেজেছেন। পুষ্পাকে একটা দিলেন, আর একটা অমিতোষকে। তিনি মোড়া টেনে নিলেন। নানান গল্প।

বুবাই ঠাম্মির গা ঘেঁষে বসল।

পুষ্পা পান চিবোতে চিবোতে একসময় বলল, 'ঘড়িটা দেখেছ?'

'তোমরা কি আজই চলে যাবে বৌমা?' তিনি আহত হলেন। মুহূর্তে তাঁর মুখটা কালো হয়ে গেল।

'থাকার কোন উপায় নেই। বুবাইয়ের কাল স্কুল। টিমু বাড়িতে একা।'

'তোমরা তো আর আসই না। এসেও থাকতে চাও না একদিন।' গলায় গভীর কষ্ট। সুর কেটে গেল।

বৃষ্টি থেমেছে। আকাশে তখনো মেঘ। আবার হয়ত নামবে। দেখতে দেখতে আড়াইটে বেজে গেল। সোয়া-তিনটেয় বেরোতেই হবে। অমিতোষ পুষ্পার দিকে চেয়ে বলল, 'গেলে তৈরি হয়ে নাও, আর দেরি করছ কেন?'

'ওমা, এ আবার কি কথা, আমি কোথায় দেরি করলাম?'

উমাতারা কেমন দুঃখীর গলায় বললেন, 'আজ না গেলেই কি নয় অমি?'

অমিতোষেরও কষ্ট হচ্ছে। তারও মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করে এখানে এসে কদিন থাকে। কিন্তু পারে না। পুষ্পা এখানে কিছুতেই থাকবে না। এখানে বাথরুম-টাথরুম নেই। অনেক অসুবিধে। আস্তে আস্তে বলল, 'আজ যাই মা, পরে এসে একদিন থাকব।'

'এখন তো আর আসিস-টাসিস না রে'। ভাঙা ভাঙা শোনাল গলার স্বর। ঠোঁট কাঁপল।

'খুব কাজের চাপ মা।'

উমাতারা চুপ করে থাকলেন। কি ভেবে একসময় তিনি উঠে পড়লেন। ভেতরে ভেতরে তিনি তখন পুড়ছেন।

পুষ্পা তৈরি হয়ে নিয়েছে। অমিতোষও জামা-প্যান্ট পরে নিল। বাবার ঘরে গেল একবার। প্রণাম করল। তিনি ওদের আশীর্বাদ করলেন, 'সুখে থাক তোমরা। আমাদের জন্য এত ভেবো না। আমাদের দিন তো শেষই হয়ে এল। আর তো কদিন!' তিনি অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

অমিতোষ কোন কথা বলল না। তারও বুকের ভেতরটা খচ করে ওঠে। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। মাকে প্রণাম করল।

উমাতারার হাতে কাগজের একটা মোড়ক। তিনি ওটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আড়ষ্ট গলায় বললেন, 'এটা নিয়ে যা অমি।'

'এতে কি আছে মা?'

'গিয়েই দেখতে পাবি।' তাঁর গলা ধরা-ধরা। চোখ ঝাপসা। তিনি ফের কি একটা কথা বলতে গেলেন। ঠোঁট কাঁপল। শেষে অনেক কষ্টে বললেন, 'আমিও তো পেটে ধরেছিলাম রে!' শব্দগুলো ভেঙে ভেঙে গেল। চোখে আঁচল চেপে ধরলেন। তিনি ওদের পেছন পেছন অনেকটা পথ গেলেন।

অমিতোষের বুকটাও গুমরে গুমরে উঠছে। সে বলল, 'তুমি এবার চলে যাও মা। সাবধানে থেকো।'

উমাতারা একটা সজনে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ওদের পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলেন। চোখ ফেটে তাঁর জল বেরিয়ে এল। উদাস দৃষ্টি, বড় মায়া।

হাঁটা পথ পেরিয়ে ওরা আবার রিকশোয় উঠল। প্যাকেটটা অমিতোষ বুবাইয়ের হাতে দিল। সে গম্ভীর। রিকশা ছুটছে। হাটুরেরা তখন ঘরে ফিরছে। অমিতোষরাও ফিরে যাচ্ছে। যার যে ঘর। একে একে সব পেছনে পড়ছে। বুবাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তখন বলে যাচ্ছে, 'এই পীরের দরগা পেরিয়ে গেল বাপী, এই পানকৌড়ি, এগুলো পানিফল, ঠিক বলছি না বাপী?'

অমিতোষ ছেলেটাকে দেখল একবার। পরে গম্ভীর গলায় বলল, 'ওসব না জানলেও তোমার চলবে বুবাই।'

পুষ্পা আড়চোখে একবার দেখল ওকে।

ওরা ঠিক সময়ই পাঁচটার ট্রেন ধরল। দিন দেখতে দেখতে শেষ হয়ে আসে। সন্ধ্যে হয়-হয়। অমিতোষ গম্ভীর।

ওই কাগজের প্যাকেটটার ওপর তখন থেকেই পুষ্পার চোখ। ওটার মধ্যে কি আছে, জানবার খুব লোভ হচ্ছিল ওর। কৌতুকের গলায় ও বলল, 'ওতে তোমার মা কি এমন মূল্যবান সামগ্রী দিয়েছে দেখি।'

বুবাইয়েরও খুব উৎসাহ। বলল, 'খুলব বাপী?'

'খোল।'

বুবাই তাড়াতাড়ি করে ওটা খুলে ফেলল, 'ওমা, এ আবার কি?'

অমিতোষও অবাক। মার জন্যে তার এই মুহূর্তে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তার শরীর খারাপ হয়েছে শুনে এগুলো দিয়ে দিয়েছে মা। এসব আবার কেন দিতে গেল মা। কি দরকার ছিল এর! একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে সে বলল, 'এগুলো ডুমুর বুবাই, ডুমুর। এ পেটের পক্ষে খুব ভাল। লিভার ভাল থাকে, রক্ত হয়।'

পুষ্পা মুখ বিকৃত করল, 'এ দিয়ে কি হবে?'

অমিতোষ চুপ। পুষ্পার চোখে তাচ্ছিল্যের ঝিলিক। বিরক্তি। ওর এই উপহাস তার ভাল লাগছিল না। ভেতরে ভেতরে সে জ্বলে যাচ্ছে। তার বলতে ইচ্ছে হয়: এ তুমি বুঝবে না পুষ্পা, বুঝবে না।

'যত্ত সব।' বলেই পুষ্পা ঝট করে প্যাকেটটা টেনে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

অমিতোষ অপলকে শুধু সেদিকে চেয়ে থাকল। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। একটা কথাও সে বলতে পারল না।

শীতবিকেল

সৈয়দ সামসুল হক

সকাল বেলার লাল আলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে । আর ছোট্ট শহরটির নির্জন পথে এখনও অন্ধকার এখানে ওখানে লেগে রয়েছে।

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার পিঠোপিঠি বড় বোন সালু আপা আমার দুচোখে ফোঁটা ফোঁটা পানি দিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল। চোখ মেলে বিরক্ত হয়ে জিগ্যেস করি, কি?

সালু আপা খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, ফুল কুড়াতে যাবি নে? দেখতো বেলা কত হয়েছে।

আরে তাইতো। ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে বসে চোখ কচলে জানালা দিয়ে তাকাই। আমগাছটার নিচে, রান্নাঘরের পেছনে বিরাট লাল সূর্য আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে আকাশে। অভিমান হলো সালু আপার উপর, তুমিই তো বেলা করলে। আমাকে আরো আগে ডাকলে না কেন? ঠিক ও-বাড়ির খোকা এসে স-ব ফুল এতক্ষণে নিয়ে গেছে।

তবু ঘর থেকে বেরোই ওর সাথে। মনটা কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করে উঠল। আর একটু সকালে উঠলেই কেমন তাজা শিউলি পাওয়া যেত। শিশির-ভেজা ঘাসে পা ডুবিয়ে ফুল কুড়োতে যা মজা। এত. বেলা করে গিয়ে শুধু শুধু বাসি ফুল কুড়োন বইতো আর কিছু নয়।

পথে বেরিয়ে ভারি ভাল লাগল শীত-সকালের আমেজভরা শহরটিকে। আমরা মাত্র কয়েক মাস হলো এসেছি। এটা নাকি মহকুমা সদর। কিন্তু হলে হবে কি, নামেই যা। বর্ষাকালে কাদায় যদি ঘর থেকে এক পা বেরুনো যায়। যেদিকে তাকাও শুধু জল আর কাদা। আবার যখন গরম পড়ে তখন পথে এত ধুলো ওঠে যে আমাদের কোয়ার্টার থেকে বাবার আপিস থানা এক মিনিটের পথ, এইটুকু হেঁটে যেতেই হাঁটু ভর্তি ধুলো হয়ে যায়। শুধু ভাল লাগে আমার এই শীতকাল। লেপ মুড়ি দিয়ে মিটমিট চোখ খুলে জানালা দিয়ে পথটাকে দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। কেমন পাথরগুলো ভিজে গিয়েছে শিশিরে। লালমাটি বিছিয়ে রয়েছে পুরু কাঁথার মত। আর থানার পেছনে বড় শিউলি গাছটা অ্যাতোগুলো ফুল ছড়িয়ে রেখেছে ঘাসের ওপর। সালু আপার সাথে ফুল কুড়োতে গিয়ে প্রত্যেকদিন আমি তাকিয়ে থাকতাম গাছটার দিকে। কেন যেন আমার ভাল লাগত। সালু আপা ধমক দিত, হাঁ করে গাছ দেখলে কি আর ফুল কুড়োন যায়? নিশ্চয়ই খোকা এখুনি এসে পড়বে, তখন নিসগে ফুল।

আবার দুহাতে ফুল কুড়োতে শুরু করতাম। ও আবার বলে, আনু, গাছে উঠতে পারবি?

একবার গাছটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিই, বলি, হুঁ।

তবে ওঠ। উঠে ডানদিকে বড় ডাল ধরে ঝাঁকালে কিন্তু মেলা ফুল ঝরবে। তুই ওঠ।

তারপর ঝুরঝুর করে ডাল থেকে নাড়া পেয়ে আরো কত শিউলি যে ছড়িয়ে পড়ত তার আর হিসেব নেই।

এক-একদিন বাবা আমাদের সাথে আসতেন। আমরা ফুল কুড়িয়ে সব তাঁর কাছে জমা করতাম। তারপর তিনজন এক সঙ্গে বাসায় ফিরে চা-মুড়ি খেতে খেতে মালা গাঁথতাম। বাবা কিন্তু আমাদের অনেক আগেই শিউলি গাছের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেখানে গিয়ে পায়চারি করতেন আর আনতস্বরে সুর করে সুরা পড়তেন। ভারি মিষ্টি গলা বাবার।

কোন কোন ভোর-সকালে ঘুমের ঘোরে শুনতে পেতাম বাবা নামাজ পড়ছেন। দীর্ঘ কোনো এক সুর তাঁর মুখে শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতাম।

আজকেও তাড়াতাড়ি শিউলিতলায় গিয়ে দেখি বাবা সেই কখন থেকে সেখানে পায়চারি করছেন। পথের দুধারে নিবিড় গাছপালা আর বড় বড় আমগাছ, আর তারি মাঝে দাঁড়িয়ে বাবা। চোখ দুটো তাঁর প্রায় বুজে এসেছে। আমাদের দেখে তিনি একটু হাসলেন, কিরে এতক্ষণে তোদের ঘুম ভাঙ্গল? আরো সকাল করে উঠবি। খুব সকাল করে উঠবি। শুধু ফুল কুড়োনোর জন্য কি এত ভোরে ওঠা?—তারপর বিশেষ করে তিনি আমাকেই যেন বললেন—বড়বড় লোক স-ব খুব ভোরে উঠতেন। একেবারে ভোরে। কাকপাখির নামগন্ধ পর্যন্ত নেই তখন।

সালু আপা আমার হাত ধরে টানে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে। ক্রমেই থালার মত সূর্য ভেসে উঠছে আকাশে। আর তারই লাল আলোয় বাবার মুখখানা রাঙ্গা হয়ে উঠছে। তিনি বলছেন, আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ, মেকস ম্যান হ্যাপি এন্ড ওয়াইজ। ঠিক বুঝতে পারলাম না কথাটির অর্থ। বাবা বুঝিয়ে দিলেন। তারপর একটু বাদেই তিনি হেসে বললেন, যাও, ফুল কুড়োও তাড়াতাড়ি। নইলে বাসায় আবার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ফুল কুড়োতে কুড়োতে ভাবতাম—বাবা কত ভোরে ওঠেন। নিশ্চয়ই বাবা বড়লোক। বাবার মত বড় আর কেউ নেই।

বাসায় ফিরে দেখি বড় আপা আর মেজ আপা চায়ের জোগাড়ে ব্যস্ত। ছোট আপা রাতের বিছানাগুলো ঝাড়লেন। লেপগুলো ভাঁজ করে তুলে রাখলেন। এখুনি হয়ত ঘরদোর ঝাঁট দিতে উঠে যাবেন। আর মিনু আপার শুধু শুধু শয়তানি মতলব। কাজকর্ম কিচ্ছু করবে না, কিন্তু এমন ভাব যেন কি রাজকার্যে ব্যস্ত। আমি গিয়ে বড় আপার আঁচল ঘেঁসে বসে পড়লাম। আপা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখেছ, আনু এখনো মুখ ধোয়নি, চা খেতে এসেছে। যা শিগগির মুখ ধুয়ে আয়।

কি আর করি। গুটি গুটি পায়ে কুয়োর পাড়ে যাই। গিয়ে দেখি মা কাপড়ে সাবান দিয়ে রাখছেন। এতে নাকি দুপুর বেলায় যখন ধোয়া হয়, তখন ময়লা কাটে ভাল। আমি পানি চাইতে মা বললেন, ফুল কুড়োন হয়ে গেল এরই মধ্যে? ধন্যি ছেলে, নিত্যি নিত্যি ফুল কুড়োন চাই-ই চাই। কি হয় এত শিউলি এনে?

আমি অভিমানাহত স্বরে বলি, কেন, সালুআপাই তো বলেছে শিউলির বোঁটা দিয়ে রঙ হয়। সেই রঙে তুমি নাকি জরদা করবে।

মা-র দীর্ঘশ্বাস পড়ে। একটু চুপ করে থেকে তিনি পানি তুলে দিলেন। মা যে কেন চুপ করলেন বুঝতে পারলাম না।

আমরা সবাই গোল হয়ে বসেছি চা খেতে। হঠাৎ আমার নজরে পড়ায় আমি চিৎকার করে উঠি, দেখেছ বাবা, মিনু আপা কতগুলো দুধ ঢালল ওর কাপে। দেখেছ?

আহা নিক।—বাবা মিষ্টি করে বললেন। তারপর মাকে বললেন, আমার কাপড়গুলো গুছান হয়েছে তো সুটকেসে? হয়নি?

কেন?—আমি প্রশ্ন করি।

সেজআপা উত্তর দিলেন, বাবা আজ মফঃস্বল যাবেন, আনু।

সত্যি। আমার যেন বিশ্বাস হতে চাইল না।

হ্যাঁ।—বাবা বললেন।

তাহলে কবে তুমি আসবে?

তার কি ঠিক আছে, যদ্দিন হয়। এই দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরব আমি।

হঠাৎ কেন যেন আমার মন খারাপ হয়ে গেল ভারি। আনমনে চায়ের কাপে চুমুক দিই।

বাবা যে কেন ওই পোড়া থানায় কাজ করেন কিছু বুঝে পাই নে। একদিনের জন্যেও সুস্থির নেই। আজ এখানে, কাল সেখানে, এমনি করে প্রায় সারাটা মাসই বাবা বাইরে বাইরে কাটান। আর যখন তিনি থানার আপিসে টেবিলের সামনে চেয়ারের ওপর একগাদা কাগজপত্রের সামনে বসে থাকেন, তখন কেমন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠে মন। মনে হয়, তিনি বুঝি আমার সেই বাবা নন। কেমন গম্ভীর আর দৃঢ় মুখখানা। আমি থানার বিরাট হালকা লাল দালানের সাথে বাবার একটা সাদৃশ্য খুঁজে পেতাম। বাবাকে দেখে আমার ভয় করত তখন। তাই পারতপক্ষে কোনোদিন আমি বাবার আপিসের পথ মাড়াইনে। খুব ভোরে যাঁরা ওঠেন তাঁরা নাকি বড়লোক। বাবাও তো বড়লোক। বাবা কেন তবে এমন বিশ্রী বিদঘুটে আপিসে কাজ করেন?

বাবা চলে গেলেন সকাল দশটা নাগাদ। যাবার সময়ে আমার হাতে একটা আস্ত সিকি দিয়েছেন। অন্যদিন হলে বাসার সবাইকে একবার করে সিকিটা না দেখিয়ে ছাড়তাম না। আর আজ একলা আনমনে সিকিটা হাতে নিয়ে কাছের এক চকোলেটের দোকানে গিয়ে দুটো চকোলেট কিনলাম।

বাসায় ফিরে এসে বসে রইলাম এক কোণে মুখ ভার করে। কিন্তু কেউ আমায় আদর করতে এগিয়েও এলো না। বড়আপা কতবার আমার সমুখ দিয়ে চলে গেলেন। কোনো কথাই জিগ্যেস করলেন না।

ভাইবোনদের ভেতরে আমি সবচে বেশি ভালবাসতাম বড়আপাকে। আমার মনে হয় কেউ আর তাকে এমন করে ভালবাসেনি। শুনেছি, আমি যখন কোলে তখন নাকি বড়আপার ইস্কুলের পড়া শেষ হয়ে গেছে। তারপর কত জায়গা থেকে বড়আপার বিয়ে এসেছে, কিন্তু কোনটাই বাবার পছন্দ হয়নি। মনের মত কাউকেই তিনি খুঁজে পাননি। তাই আজ অবধি বিয়ে হয়নি তার। আমি বুঝে উঠি না, মা-বাবা কেন যে ওর বিয়ের জন্য এত অস্থির হয়ে ওঠেন। বিয়ে হলেই তো বড়আপা পর হয়ে যাবে। আর কোনোদিন আসবে না। বড়আপা চলে গেলে আর কাকে আমি বড়আপা বলে ডাকব? তাই ওর বিয়ের কথা যখনই শুনতাম তখনই মন আমার কেমন খারাপ হয়ে যেত।

একদিন অনেক রাত্রে কি করে যেন আমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। চারদিক অন্ধকারে থইথই করছে। প্রথমে ভয় পেয়ে আঁতকে উঠেছিলাম, কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। একটু পরেই বাবার গলা শুনতে পাই ওপাশের চৌকিতে। মাকেই তিনি বলছেন, না, তা হয় না। ও তোমার চার মেয়ে পানিতে ফেলে দেয়ার চেয়ে ঘরে রাখা ঢের ভাল বুঝেছ।

কিন্তু পানিতে ফেলতে বললাম কখন?— মা আর্তস্বরে বললেন।

ও তোমার একই কথা। ওদের হাতে মেয়েকে দেয়া মানেই নিজ হাতে তাকে গলা টিপে মারা।

বাবার এমন কঠিন কণ্ঠস্বর কোনোদিন শুনেছি বলে আমার মনে পড়ল না। মা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর এক সময় বললেন, কেন, এতগুলো সম্বন্ধ এলো, তোমার পছন্দ হলো না? কোন জজ ম্যাজিস্টর এসে তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে?

জজ ম্যাজিস্টর না হোক, ওদের অন্তত ভাল ঘরে বিয়ে দিতে হবে তো?—বাবার কণ্ঠস্বর অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে।

সে কবে শুনি?

যেদিনই হোক, বিয়ে কারো আটকে থাকে না।

মা যেন মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর করলেন, যেদিনই হোক। বিয়ে যদি আটকে নাই থাকে, তবে এ কবছর কি চোখে দেখনি? তারপর বুঝি মা কেঁদেই ফেললেন—তুমিতো আর বাসায় থাক না। দিনরাত্তির পাড়া-পড়শীর কথা শুনতে যে কেমন লাগে, তা তুমি বুঝবে কি করে?

ভাল করে কিছু না বুঝেও মন আমার হু হু করে উঠল। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা আমি নিজেও বলতে পারব না। ঘুম থেকে উঠে দেখি বেলা তখন অনেক। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে পেলাম সবাইকে। মা-বাবা বড়আপা মেজআপা সেজআপা আর সকলেই তো রয়েছেন। কেমন অচেনা মনে হলো আমার সবাইকে। কাউকে যেন আমি কোনোদিনই চিনতাম না।

বাবা নেই। বাসাটা তাই বড্ড খালি খালি ঠেকছে। 'দুধ নেবে গো'—সেই কখন হেঁকে গেছে, আকাশে গড়িয়ে পড়েছে দুপুর, আর ক্রমেই যেন বাসাটা একলা হয়ে পড়েছে। বাসার কাছেই থানা বলে প্রায় দুপুর বেলাতেই বাবা আসতেন একটু চোখ বুঁজতে। কিন্তু আজ তো বাবা নেই। মা আপারা শোবার ঘরে মেঝেয় বসে গল্প করছে, উল বুনছে।

আমি বাইরের ঘরে এসে ঢুকতেই মাস্টার সাহেব বিছানা ছেড়ে উঠে বসে বললেন, আনু, তোমাদের একখানা চিঠি এসেছে এইমাত্র। ওইতো টেবিলের ওপর রয়েছে।

আমি চিঠিখানা হাতে নিয়ে জিগ্যেস করি, কার চিঠি মাস্টার সাহেব?

তোমার পানুভাই লিখেছেন ঢাকা থেকে।

পানুভাই মানে আমার বড়ভাই। একদৌড়ে চিঠিখানা নিয়ে ভেতরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, মা, মা, বড়আপা, পানু ভাইয়ের চিঠি এসেছে।

বড় আপা তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বের করলেন। আর আমরা সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলাম কখন আপার চিঠিপড়া শেষ হবে। আর কারই বা এমন না হয়? বাড়ির বড় ছেলের চিঠি এসেছে কদ্দিনবাদে, খুশি হবার কথাই তো।

বড়ভাই লিখেছেন, চাকুরি পেয়েছেন তিনি রেলওয়েতে। অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশান মাস্টার। মাইনে ভাল। মা-বাবাকে সালাম আর সবাইকে স্নেহাশীষ। ছোট্ট একটুকুন চিঠি। তবু খুশি হয়ে উঠল সবাই। সকলেই একবার করে পড়ল চিঠিখানা। মাতো দুবার পড়েও কোনো অর্থ উদ্ধার করতে পারলেন না, এত খুশি হয়েছেন তিনি। আর আমি এত খুশি হয়েছি যে, বলবার মত নয়। কেন হব না, বড়ভাই চাকরী পেল, তা যে সে চাকুরি নয়, স্টেশনের চাকুরী। বুক আমার ভরে উঠল আনন্দে। স্টেশনের সাথে পরিচয় আমার অনেকদিনের। জ্ঞান হয়েছে অবধি বাবার সাথে সাথে কত শহর যে ঘুরেছি তার আর লেখাজোখা নেই। এখানে এঁসেও প্রায় প্রত্যেকদিনই আমি স্টেশানে যাই গাড়ি দেখতে। কত লোক এসে ভিড় জমায় প্ল্যাটফরমে। কুলিদের ছোটাছুটি,

সিগন্যাল ডাউন দেয়া আর গাড়ি আসবার সময় বুক তোলপাড় করা মিহি সুরের ঘণ্টা। সব মিলিয়ে রহস্যময় মনে হয় আমার। তারপর এক সময়ে গাড়ি এসে চলে যায়, আর আস্তে আস্তে গোটা স্টেশান কেমন ফাঁকা হয়ে আসে। কুলিরা ছাউনিতে ফেরে আর বেলা প্রায় হয়ে আসে সন্ধ্যে। এমনি এক স্টেশানে তিনি চাকুরী পেয়েছেন, খুশি হয়ে উঠব না?

ঘরে ঝোলান একটা ছবি ছিল বড়ভাইয়ের। মা সেদিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। আর বড়আপা সেজআপা ছোটআপাও হাসলেন।

বাবা মফঃস্বল থেকে ফিরে এসে চিঠিখানা পড়লেন। পড়ে তিনিও কিছু কম খুশি হলেন না। বললেন, যাক, পানুর এবার একটা হিল্লে হলো, কি বলিস? আনু, তুমিও লেখাপড়া শিখে বড় চাকুরী করবে। অনেক মাইনের। তাই না?

আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠি। বাবা বলে চলেন, হ্যাঁ তাইতো, মিছে কথা কি বলছি! আনু তখন মস্ত বড়লোক, কত টাকা, কত কি।

বাবা ঠিক কথা বলেছেন, বড় হলে আমি বড় চাকুরী করব। বাবা মা আপারা সবাই বলবে, আনু আমাদের সরকারী আপিসে কাজ করে।

ঈদের ছুটিতে বড়ভাই এলেন। শেষবার যখন তাঁকে দেখেছি, কেমন রোগা আর ফ্যাকাশে মনে হয়েছিল। এবারে কিন্তু একেবারেই বদলে গেছেন। ধরতে গেলে চেনাই যায় না এক রকম। কেমন কথায় কথায় হাসি আর উল্লাস। এত নতুন কথা যে বড় ভাই জানেন, তাতো আগে জানতাম না। এবারে কত কথা শোনালেন তিনি সবাইকে। তারপর চারদিন, মাত্র চারদিন থাকবার পর মা-বাবাকে সালাম করে, আমার চিবুক নেড়ে চলে গেলেন। সাথে সাথে গিয়েছিলাম স্টেশানে। গাড়ি ছেড়ে দেবার পর যতদূর দেখা গেছে তাকিয়ে দেখেছি। বড়ভাই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছিলেন। ধীরে ধীরে ট্রেন দূরের বাঁকে মিলিয়ে গেল। অনেকদিন অবধি তাঁর সেই হাসিখুশিভরা মুখখানা আমার মনে পড়ত।

বড়ভাই চলে যাওয়ার পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। শীত আর নেই। জোর গরম পড়তে শুরু করেছে। শিগগিরই হয়ত বর্ষা নামবে।

এমনি সময়ে একদিন ইস্কুল ময়দানে ফুটবল খেলা দেখে ফিরছি সন্ধ্যের একটু আগে। এখনো সন্ধ্যে নামেনি, তবুও পথ দিয়ে ফিরতে ফিরতে গা কেমন ছমছম করে উঠল আমার। বার বার পেছনে তাকাই, তারপর ডাইনে বাঁয়ে। এমনি করে বাসার কাছে এসে যখন পৌঁছেছি তখন সন্ধ্যে।

বাসার ভেতরে পা দিয়ে আমি বোকা হয়ে গেলাম। আমার মাথা ঘুরতে লাগল আর কি এক অমঙ্গল আশংকায় আমার মুখখানা যেন খালি হয়ে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বড়আপা ছোটআপা ওরা। মা ডুকরে কাঁদছেন। এত কাঁদছেন যে, চোখ ফুলে লাল হয়ে গেছে। এমনকি বাবা অবধি অন্ধকার ঘরে চেয়ারের ওপর গা এলিয়ে বসে ছেলেমানুষের মত কাঁদছেন। কি হয়েছে? আমার গলা যেন বুজে এলো। এক মুহূর্তে শুনতে আমার বাকী রইল না, টেলিগ্রাম এসেছে বড়ভাই রেলের নীচে কাটা পড়েছেন। শুনে আমিও চোখের পানি আটকে রাখতে পারলাম না। মা আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আমার মাথার ওপর তার গাল রেখে ফুঁপিয়ে উঠলেন। সেদিন সারাটা রাত আমি কেঁদেছি।

তারপর থেকে গোটা বাসাটা কেমন যেন বদলে গেল। দেখেছি মাঝে মাঝেই মা একেলা এক কোণে বসে ভীষণ ভাবে কাঁদেন। কিন্তু বাবাকে আর কোনেদিন কাঁদতে

দেখিনি। আমার চোখেও এড়ায়নি যে, বাবার ভেতরে এক বিরাট পরিবর্তন এসে গেছে। আর কোনোদিন ভোরে তাঁকে সেই হাসিভরা উজ্জ্বল মুখ নিয়ে শিউলিতলার পথে পায়চারি করতে দেখিনি। কতকাল ভোরে বাবার মিষ্টি গলার সুর শুনতে কান পেতেছি। কিন্তু শুনতে পাই নি। যা শুনেছি, তা আমার কাছে এত করুণ আর কান্না কান্না ঠেকেছে যে, আমি পালিয়ে বেঁচেছি।

মাস্টার সাহেব যে আমাদের বাড়ির কেউ নন, জায়গীর থেকে ট্রেনে করে রোজ কলেজে পড়তে যান, তিনিও কম কষ্ট পাননি বড়ভাইয়ের এন্তেকালে।

ট্রেনের কামরা থেকে বড় ভাইয়ের সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। ভুলতে পারব না তাঁর সেই আমার চিবুক নেড়ে আদর করা। জীবনের অনেক আনন্দ পেয়েছিলাম বড়ভাইয়ের কাছ থেকে। জীবনের প্রথম দুঃখও পেলাম তাঁরই কাছ থেকে। তাই তিনি চিরদিনের মত অমর হয়ে রইলেন আমার মনে।

পুরো এক বছর হতে চলল আমরা এই শহরে বদলি হয়ে এসেছি। আবার শীত পড়ছে মন্থর গতিতে। ভোর রাতে গায়ে কাঁথা না দিলে গা কেমন শিরশির করে ওঠে। হালকা কুয়াশা চাঁদের মত জড়িয়ে ধরে গাছগুলো। আর আমগাছের ফাঁক দিয়ে একটু পরে যেটুকু রোদ এসে ছিটিয়ে পড়ে তাতে বসে থাকতে বেশ ভাল লাগে। গাছে গাছে পাতা ঝরছে। পাতা পড়ছে। কেমন উদাসীন এবারের এই শীত।

এক সকালে বাবা আমাকে বললেন, ভাবছি, আনু, তোকে সামনের বছর বড় ইস্কুলে ভর্তি করে দেব। বোর্ডিংয়ে থাকবি।

কথাটা শুনেই মা প্রতিবাদ করে ওঠেন, হ্যাঁ, অতটুকুন ছেলে বাবা মা ছেড়ে বিদেশে বিভুঁয়ে থাকবে!

কেন তাতে হয়েছে কি? বারবার ইস্কুল বদলাতে হয় আমার সাথে সাথে, তাতে লেখাপড়া কিছুই হয় না। তার চেয়ে বোর্ডিংয়ে দেয়া ঢের ভাল।

বোর্ডিংয়ে থাকা তো ঢের খরচ। এদিকে শুনেছি বাবার হাতে নাকি এখন খুব টানাটানি। কে জানে। একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল আমার বুকের ভেতর থেকে। বাবা একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। তার পরমুহূর্তেই চোখ নামিয়ে নিলেন। মা বললেন, তোমার চায়ে একটু দুধ দেব?

হ্যাঁ দাও।—বাবা যেন আনমনে উত্তর করলেন। তারপর আস্তে আস্তে চা-টুকু খেয়ে বেরিয়ে গেলেন একটি কথাও না বলে।

মা আমার চুলে হাত বুলিয়ে মিষ্টি করে জিগ্যেস করলেন, তুই বোর্ডিংয়ে থাকবি, আনু?

কিছু বললাম না এ কথার জবাবে; কিছুই বলতে পারলাম না। ছোট্ট একটু হাসলাম শুধু।

শীতকালে আকাশ আয়নার মত পরিষ্কার। কখনো কখনো বা এক আধ টুকরো শাদা মেঘ ভাসতে দেখা যায় মাত্র। আর মাঝে মাঝে উত্তুরে বাতাসের ঝাপটা ধোঁয়াটে মেঘে আকাশ ভরে তোলে। শুকনো হিম হিম বাতাস হু হু করে বয়।

পড়তি বিকেল বেলার দিকে বাইরের ঘরে বসে একটা ছেঁড়া কাগজ থেকে ছবি কাটছিলাম আমি। আজ আর কোথাও বেরোইনি। এমন সময় দমকা এক হাওয়া ঘরের ভেতর ঢুকে আমার হাত থেকে কাটা ছবিটা উড়িয়ে নিয়ে গেল আচমকা। ছবিটার পেছনে ধাওয়া করে বাইরে এসে দেখি আকাশ-জুড়ে কালো মেঘ। মেঘের উপর মেঘ জমেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে দিনের আলো। বাতাস বইছে এলোমেলো। আর এক্ষুনি বোধ হয় ঝড় উঠবে।

ঝড় উঠবে কি, ঝড় উঠেছে ততক্ষণে। আকাশ চিরে ঝলক দিয়ে উঠল বিদ্যুৎ-এর আগুন। আবার। একটা কিছু ভাবার আগেই পেছন দিকের খোলা দরোজাটা দড়াম করে আছড়ে বন্ধ হয়ে গেল আমার বুকের ধুকধুকুনিকে হঠাৎ স্তব্ধ করে দিয়ে। দৌড়ে গিয়ে দরোজাটা যখন বন্ধ করেছি, তখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এলো।

শোবার ঘরে মা একেলা রয়েছেন। ভাবতেই বুক আমার হিম হয়ে এলো। ঝড় বৃষ্টিকে মা-র যা ভয়! সামান্য বৃষ্টি নামলেই সারাটা শরীর তাঁর থরথর করে কাঁপতে থাকে। আমাদের সবাইকে বুকের কাছে নিয়ে ঘরের এক কোণ ঘেঁষে বসে থাকেন। বিড়বিড় করে আল্লাকে ডাকেন। আল্লা, বৃষ্টি থামিয়ে দাও। ভয়, এখনি হয়ত ঘরদোর ভেঙ্গে পড়বে মাথার ওপর। সয়লাব হয়ে যাবে দুনিয়া। আর আজ যা ঝড় নেমে এসেছে, না জানি একেলা অন্ধকার ঘরে বসে মা কেমন করছেন।

একবার যেন শুনতেও পেলাম, মা ডাকছেন, আনু, বাবা আনু। কিন্তু এমন মিহি সে স্বর যে, বাতাসের আওয়াজে তা ডুবে গেল। ভাল করে ঠাহর করা গেল না। কান পাতি, আবার ডাকছেন বুঝি। বাতাস ভরে শুধু যেন মা-র ডাকই শুনতে পাচ্ছি। আনু! আনু, মা ডাকছেন। না কি ও ঝড়ের গোঙানি?

এমন সময় শোবার ঘরে ভারি কি যেন একটা পড়ে গেল শুনতে পেলাম। ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেময়। আর সাথে সাথে রক্ত জমানো চিৎকার। এক দৌড়ে শোবার ঘরে ছুটে যাই। এইটুকুতেই সারাটা শরীর ভিজে গেছে। তাকিয়ে দেখি মা চৌকির এক কোণে বসে গোঙাচ্ছেন। নিঃশ্বাস ফেলছেন জোরে জোরে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ডাকি, মা, ও মা, মা।

মা কোনো কথা বলছেন না। হাঁপাচ্ছেন। কাঁদছেন। পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখি মেঝের ওপর একরাশ ছোট বড় ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে আছে। আর এক কোণে দড়ি ছিঁড়ে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে সেই বড় ছবিটা, আমাদের সব্বাইয়ের গ্রুপ ফটো— আমি তখন কোলে, মিনু আপা তখন হাফ প্যান্ট পরে। আর দেয়ালের যে জায়গায় ছবিটা ঝোলান ছিল সে জায়গাটা বিশ্রী রকমে ফাঁকা। দু একটা ছেঁড়া মাকড়শার জাল হাওয়ায় কাঁপছে। আমি চোখ ফিরিয়ে আনি। দুহাতে মাকে ঝাঁকি দিয়ে ডাকি, মাগো। মা তখনও হাঁপাচ্ছেন। আমার ভয় হলো, ভীষণ ভয় হলো। মনে হলো, হয়ত মা এখুনি মরে যাবেন।

কি করব ভেবে না পেয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াই। বৃষ্টি মাথায় করে ছুটে চলি প্রাণপণে থানার দিকে, বাবার কাছে। তীরের মত বৃষ্টির ফলা বিঁধছে শরীরে, মাথায়, মুখে। জামাটা বুকে পিঠে লেপটে গেছে, চোখ আবছা হয়ে আসছে জলের ঝাপটায়। আমি পাগলের মত দৌড়াই। একবার পা পিছলে পড়ে যেতে যেতে সামলে নেই। এমনি করে থানার সামনে গিয়ে যখন পৌছেছি, তখন আমি আর আমাতে নেই।

বাবা কার সাথে যেন কথা কইছিলেন। আমাকে দেখে চমকে উঠলেন যেন, আনু!

তাড়াতাড়ি বাসায় চল, মা কেমন করছে।

কেন, কি হয়েছে? বাবা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।

কিন্তু আমি কি উত্তর দিব? কি জবাব দেব এর। মা-র কি হয়েছে, কি করে বোঝাব। কিছু বলতে পারলাম না। কথা যেন আমার জড়িয়ে এলো। বিড়বিড় করে বললাম, বৃষ্টিতে মা ভয় পেয়েছে।

সাথে সাথেই বাবা চিৎকার করে উঠলেন, আর তুমি বাসা ছেড়ে এসেছ। বৃষ্টিতে ভিজেছ।

আমি ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। বাবার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস হলো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে কাঁপছি, হয়ত হিমে।

ভারি রাগ হলো আমার বাবার ওপর। এত রাগ হলো যে আর কোনো কথা না বলে বেরিয়ে এলাম। নিমেষে বাবার ওপর কেমন ঘৃণা হলো। ইচ্ছে হলো, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে অনর্থ করি।

পেছনে কার পায়ের আওয়াজ পেলাম। চোখ নামিয়ে আনি। বাবা আমার হাত ধরে টান দিয়ে বললেন, এই বৃষ্টিতে ভিজে আবার চলেছ কোথায়? দিন দিন বখাটে হয়ে যাচ্ছো না?

বাঁ পায়ের ওপর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল চাপিয়ে খুঁটতে থাকি আমি।

এক গা পানি কাদা নিয়ে দৌড়ে আপিসে ঢোকো এই তোমার আক্কেল। বৃষ্টিতে ভয় পেলে আমি কি করব? আমি কি করতে পারি? ইয়াসিন। —থানার একজন সেপাইকে ডাকেন বাবা। যাও, একে বাসায় ছাতা করে দিয়ে এসো।

বাসার ভেতরে ঢুকেছি এক মিনিটও হবে না, বাবা এসে উপস্থিত। আমাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলেন তিনি। বৃষ্টি এখন অনেকটা কমে এসেছে। পাশের বাড়িতে আপারা আটকে ছিলেন, ওরাও এসে গেলেন একটু পরেই। আমি একলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাপড় বদলাচ্ছি।

ছবিটা, ছবিটা ভেঙ্গেছে কে? —বাবা প্রশ্ন করেন অবাক হয়ে।

মা-র গলা শোনা যায়, বাতাসে ছিঁড়ে পড়ে গেছে।

ঝড়? ও। —বাবা আর কোনো কথা বলেন না। ধীরে ধীরে ছবিটা হাতে তুলে আলমিরার উঁচু তাকে উঠিয়ে রাখেন। বাইরে আকাশ শান্ত। আর ঘরের ভেতরটা চুপচাপ। কারু কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না।

একটু আগেই বাবার ওপর যে রাগ করেছিলাম, এখন তা অনেকটা কমে এলো। লজ্জা হলো, অনুশোচনায় ভরে এলো মন। যেন ভারি একটা পাপ করেছি। আর সাথে সাথেই কেমন কৌতূহল হলো, ইচ্ছে হলো বাবাকে দেখবার জন্য। দরোজার কাছাকাছি সরে এসে আড়চোখে ভেতরের দিকে তাকাই। বাবা একমনে বসে জুতোর ফিতে খুলছেন।

রাত এখন কত জানিনে। ভারি তিয়াস পেয়েছে। চোখ খুলে দেখি পায়ের কাছে চৌকির নিচে হ্যারিকেন জ্বলছে ছোট হয়ে। আমি বিছানা হাতড়ে উঠে দাঁড়াই। ঘুম-জড়ানো চোখে দু-এক পা এগিয়েছি, এমন সময় কি যেন চোখে পড়ে। ঘরের ওপাশটার খানিকটা জায়গা নিকষ অন্ধকার। একটা কুকুর বাইরে হঠাৎ ডেকে উঠল। শুকনো গলায় জিগ্যেস করি, কে?

অন্ধকারটা নড়ে চড়ে উঠল।

আমি, আনু, আমি।

বাবা যেন থমমত খেয়ে গেলেন।

আমি এক পা এগিয়ে আসি, পানি খাব।

হুঁ।

পানি খেয়ে এসে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ি। বাবা তো এত রাত অবধি কোনোদিন জাগেন না। আর নির্জন অন্ধকারে বসে বাবা কি ভাবছেন? সারাটা শরীর কাঁটা দিয়ে এলো আমার। বুকের ভেতরটা যেন পাথরের মত ভার হয়ে এলো। আমি চোখ বুঁজে ভাবছি, বাবার কথাই ভাবছি।

বেশ খানিকক্ষণ পরে আওয়াজ পেলাম, বাবা উঠে দাঁড়িয়েছেন। হ্যারিকেনটা উঁচু করে আমার বিছানার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি নিঃসাড় পড়ে রইলাম। বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন আমার পাশে অনেকক্ষণ। তারপর গায়ের কাঁথাটা ভাল করে গলা অবধি টেনে দিলেন।

ঘুমে জড়ান গলায় মা ওপাশের চৌকি থেকে শুধোন, তুমি শোওনি এখনো?

এইতো যাচ্ছি।

তারপর শুতে শুতে বাবা বললেন, ছেলেটাকে হঠাৎ কেন যেন তখন বকেছি, মেজাজটা ভাল ছিল না। ভারি রাগ করেছে দেখছি।

মা কোনো কথা বলেন না।

সন্ধ্যে থেকে মুখ ভার করে আছে। খারাপ লাগছে এখন নিজেরই। অমন করে নাইবা বকলে পারতাম।

ইচ্ছে হলো উঠে গিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলি, আমি রাগ করিনি।

মা বলছেন, তুমি কদিন হলো অমন ছটফট করছো কেন?

কই নাতো।

তুমি না বললে কি হবে, আমার কি আর চোখে পড়ে না?

বাবা হাসলেন। ঢেউ ভাঙ্গার মত খানিকটা শব্দ হলো।

ও তোমার চোখের ভুল।

এত রাত জেগে থাকলে, কি থাকবে তোমার শরীরে?

মা-র কণ্ঠস্বরে শঙ্কার ছায়া। বাবা একটু পরে বললেন, আবার বৃষ্টি আসবে বোধ হয়। বাতাস বইছে।

এরপরে দুদিনও যায়নি। বাবা কি এক জরুরী কেসের তদারকে বাইরে যাবেন। আমি ইস্কুল থেকে সবে ফিরেছি তখন। কাপড় চোপড় সব গোছান হয়েছে। ইয়াসিন সাইকেল পাম্প করছে।

বাবা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাইকেল হাতে নিলেন। পেছনে মা দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাবা একবার তাকালেন শুধু। তারপর ধীরে ধীরে রাস্তায় গিয়ে উঠলেন। আমি সাথে সাথে এগিয়ে যাই।

খানিকটা পথ যাবার পর বাবা সাইকেল থেকে নেমে ডাকলেন আমাকে, আনু।

আমি দৌড়ে গেলাম বাবার কাছে। তড়বড় করে ভাঙ্গা গলায় তিনি বললেন, আমার হাতঘড়িটা ফেলে এসেছি টেবিলের ওপর। শিগগির যা।

বাবার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। ঠোঁট দুটো যেন কাঁপছে। আর এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছেন শুধু শুধু। বাসা থেকে একদমে ঘড়িটা এনে ওঁর হাতে দিই। ঘড়িটা হাতে বাঁধতে বাঁধতে বাবা আমাকে বললেন, শুক্কুরবারে বাসা ছেড়ে কোথাও যেও না যেন।

আচ্ছা।—মুখে বলি না, ঘাড় কাৎ করে জানাই।

ঠিক তার পরদিনই বিকাল বেলায় মাস্টার সাহেব থানা থেকে এসে গম্ভীর উদ্বেগ আর শঙ্কা-ভরা গলায় বলেন, আনু, আনু।

কি?

তোমার মাকে ডেকে দাওতো তাড়াতাড়ি।

কেন?—আমার সারাটা শরীর কেমন শিরশির করে উঠল।

দরকারী কথা আছে।

মা এসে দরোজার পাশে দাঁড়ালেন।

আম্মা, থানায় খবর এসেছে দারোগা সাহেব অ্যারেস্ট হয়েছেন।

মা চকিতে মুখ তুলে তাকালেন। কথাটা যেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। আর আমি তখন হতভম্ব হয়ে পড়েছি। কিছুই বুঝতে পারছি না। কিছুই শুনতে পারছি না যেন। মাস্টার সাহেব রীতিমত হাঁপাচ্ছেন। আশ্চর্য, মা-র চোখ ছলছল করে উঠল, মুখখানা বিষিয়ে এলো, তবু শান্তকণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, কার কাছে শুনেছ?

ছোট দারোগা সাহেবের কাছে।

ক্রমে সারাটা বাড়িতে আর শহরে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা, বড় দারোগা সাহেব চার হাজার টাকা ঘুষ খেয়েছেন। বাবার সাথে সাথে যেন আমরাও অপরাধ করেছি, সকলে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকায়। মুখ টিপে হাসে। কেউ কেউ আসেন সহানুভূতি জানাতে, কিন্তু ভাল লাগে না আমার।

বড়ভাইয়ের এন্তেকালে সকলে যা না কেঁদেছে, এবার এক একজন তাই কাঁদল। মা রাঁধতে গিয়ে কাঁদেন, খাওয়াতে গিয়ে কাঁদেন। রাতে লক্ষ্য করেছি, ঘুমের ঘোরেও কাঁদেন তিনি। বড়আপা সব চেয়ে বেশি কাঁদছেন। কেঁদে কেঁদে তিনি দরিয়া করে ফেলেছেন। দেখে শুনে আমিও আর থাকতে পারি না। আমার বুকের ভেতরে একতাল জমাট কান্না ঝরঝর করে ঝরে পড়ল এক সময়।

কোনো রাতেই ভাল করে ঘুম হয়নি আমার বাবার কথা মনে করে। প্রতিটি মুহূর্তে মনে পড়েছে, সেই রাতে আমার গায়ে বাবার কাঁথা টেনে দেয়া। মনে পড়েছে, সেই ঢেউ-ভাঙ্গা হাসির শব্দ আর পথের ওপর দাঁড়িয়ে হাতঘড়িটা বাঁধছেন, সেই ছবি। সকাল বেলা উঠে কতদিন কান পেতেছি, এখনি হয়ত বাবার পড়া শুনতে পাব কাছাকাছি কোথাও। পর মুহূর্তেই ভুল ভেঙ্গেছে আর বুক থেকে উঠেছে কান্না।

থানার হুকুমে একদিন আমাদের এ বাসা ছাড়তে হলো। এই শহরেই রয়ে গেলাম, অন্য এক বাসায় উঠে। থানার সেই কোয়ার্টার ছেড়ে আসবার সময় মা আর একবার কেঁদে উঠেছিলেন। দেয়ালে একদিন বড় বড় করে পেন্সিল দিয়ে লিখেছিলাম, বাবার সেই কথা—'আর্লি টু বেড, আর্লি টু রাইজ, মেকস এ ম্যান হেলদি ওয়েলদি এন্ড ওয়াইজ।'—আসবার সময় ঘষে মুছে দিয়ে এসেছি।

বাবাকে মাঝে কেন যেন সদর থেকে এই শহরেরই হাজতে বদলি করেছিল মাত্র কয়েকদিনের জন্য। প্রত্যেকদিন আমরা সবাই যেতাম বাবার সাথে দেখা করতে, মাস্টার সাহেবের সঙ্গে। ছোট দারোগা সাহেব বড় ভালবাসতেন আমাদের, তাই কোনো আপত্তি করেননি।

শেষবার, যখন বাবাকে ওরা এখান থেকে নিয়ে যাবে, সেদিনের কথা আজো মনে আছে। আমরা সবাই গিয়েছি। আমি ছিলাম সকলের পেছনে। কিন্তু সকলের আগে আমাকেই ডাকলেন বাবা। আমি এগিয়ে এলাম। গরাদে আঁটা লোহার দরোজা দিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে তখন আমার মনে যে ঝড় উঠেছিল, তা যদি বুক চিরে দেখান যেত তাহলে বুঝতে কারু এতটুকু কষ্ট হতো না যে, আমি তখন শুধুমাত্র পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। হয়ত 'পাগল' কথাটা ঠিক হলো না, কিন্তু এর চেয়ে ভাল শব্দ আমার আর জানা নেই।

আমি কি করব বুঝতে না পেরে বাঁ হাতে দেয়াল ঘষছি জোরে জোরে। এত জোরে যে হাতের তালু জ্বালা করে উঠল। বাবা এক হাতে দরোজার শিক ধরে এক হাতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ডাকলেন, আনু।

উঁ। সংক্ষেপে উত্তর করি। কি জানি যদি কান্না পেয়ে যায়!

বাবা ফিস ফিস করে বলেন, তুমি আমার একমাত্র ছেলে। তোমাকে নিয়ে আমার কত আশা, কত ভরসা। একটু থামলেন তিনি, ভাল করে লেখাপড়া করবে। লেখাপড়া শেষ হলে কত বড় চাকুরী করবে। কিছুরই অভাব, কিছুরই ভাবনা থাকবে না তোমার, তুমি মন দিয়ে পড়াশুনা করো। আমি শিগগিরই ফিরে আসব।

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না, কেঁদে ফেললাম আমি। দৌড়ে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো, হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো অনেক দূরে। বাবা আমার মাথাটা তাঁর আরো কাছে টেনে নিলেন। চোখ তুলে তাকালে হয়ত দেখতে পেতাম বাবার চোখও শুকনো নেই।

তারপর সবাইকে, এমনকি মাস্টার সাহেবকে পর্যন্ত বাবা কি যে বললেন তার একটি কথাও আমার কানে যায়নি। আমি তখনও কাঁদছিলাম।

সেদিনই বিকেলের ট্রেনে বাবাকে ওরা নিয়ে গেল। স্টেশানে গিয়েছিলাম সাথে সাথে।

গাড়ি ছেড়ে দেবার পর বাবা আমার চোখের ওপর থেকে সরে গেলেন। আর দেখতে পাইনি। হঠাৎ মনে পড়ল, বড়ভাইও একদিন এমনি করেই চলে গেছেন। আর আসেননি। বাবাও যদি আর না আসেন।

স্বপ্নে চলার মত প্ল্যাটফরমের বাইরে এসে দাঁড়াই। পথ দিয়ে দু একটা ঘোড়াটানা গাড়ি চলে যাচ্ছে। শীত-বিকেলের আভায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে গোটা পৃথিবী। ঘোড়ার খুরে মিহি বালু উড়ছে। আর লাল কাঁকর বিছান টানা সড়কের দুধারে সবুজ গাছ। দু একটা করে নতুন পাতা ধরছে। আরো ধরবে। একদিন কচি সবুজ পাতা গাছগুলোয় ছেয়ে যাবে।

পায়ে পায়ে বাসায় ফিরে এসে একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়েছি। সারাটা রাতে আর একবারও উঠিনি।

সাধারণ চক্কোত্তির জীবনসূত্র

দেবেশ রায়

কয়েক ঘণ্টা বক্তৃতা দেয়ার পরিবর্তে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে আলো কাকে বলে বোঝান অনেক সহজ। সুতরাং সাধারণ চক্রবর্তীকে সারা ভারতবর্ষে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান উচিত।

কিন্তু চক্কোত্তি বছরে মাত্র দু বার ট্রেনে চড়ে। পুজোর ছুটিতে চাকরিস্থল থেকে কুচবিহারে তার বাড়িতে, ছুটির শেষে তার বাড়ি থেকে চাকরিস্থলে। তার পক্ষে এত বড় এই ভারতবর্ষটা ঘোরাঘুরি করা খুব কষ্টসাধ্য হবে। কবি তাঁর ছন্দ বাঁচাবার জন্য ভারতবর্ষের ষোলটা রাজ্যের নামের বদলে মাত্র ছটা নাম ব্যবহার করে জাতীয় সঙ্গীত রচতে পারেন। চক্কোত্তির পক্ষে ত আর তার প্রাণ বাঁচাবার জন্যও ভারতবর্ষের সীমাটিকে ছোট করে নেয়া সম্ভব নয়। তাকে আক্ষরিক অর্থেই আসমুদ্র-হিমাচল ঘুরতে হবে। এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণের নিকট 'দর্শন' দিতে হবে।

আর এই 'দর্শন দান' ব্যাপারটি চক্কোত্তির একেবারে অভ্যাসের বাইরে। সে চিরকাল দর্শন পেয়েই থাকে। দর্শন বিষয়টি তার মজ্জার মধ্যে এমনভাবে সেঁধিয়ে গেছে যে ট্রেনের দর্শন পাবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে, বাসের দর্শন পাবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাসস্ট্যান্ডে, খাম-পোষ্টকার্ড ইত্যাদির দর্শন পাবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডাকঘরের জানালায়, বুকের বাঁ পাশের ধুকপুকুনিটা চালু রাখতে অনিবার্য আহার্য সংগ্রহের উপকরণের নিমিত্ত তিরিশটি দিন, ও সেই ধুকপুকুনিটা কবে থামবে তার জন্য গোটা পঞ্চাশেক বৎসর—সে শুধু অপেক্ষা করেই যায়। সুতরাং হঠাৎ তাকে যদি সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়ে দর্শন দিতে বলা যায় সে বোধহয় হার্টফেলই করবে।

কিন্তু সাধারণ চক্রবর্তীকে যদি সারা ভারতবর্ষে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে না দেখান হয়, তাহলে বর্তমান জীবনযাত্রার এই মজার অঙ্কটা বক্তৃতা দিয়ে বোঝান যাবে না যে: একটি তেলচপচপে বাঁশ বেয়ে রামধুন গাইতে-গাইতে যে-বাঁদরটি তিনহাত উঠে দুই হাত নেমে আসে, সে যখন অবশেষে পাঁচ বৎসর পর বাঁশের মাথায় উঠে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের' পতাকা ওড়ায়, তখন সে দেখতে পায় বাঁশের মাথায় কিছুই নেই, সে শুকিয়ে-শুকিয়ে মরে, তার তেল চুঁইয়ে-চুঁইয়ে পড়ে, এবং তারপর আবার আর একটা বাঁদরকে ওঠান হয়। এই পাঁচ বছরি খেল প্রকাশ করে দেয়ার জন্যই সাধারণ চক্কোত্তিকে ঘোরাতে হবে, দেখাতে হবে ও বলতে হবে—দেখো, এ সেইরকম একটি বাঁদর। অথচ অত ঘোরাঘুরি চক্কোত্তির পক্ষে সম্ভবই নয়। সুতরাং বিকল্প প্রস্তাব এই: সাধারণ চক্কোত্তির একটি ছবি এঁকে, নীচে তার জীবনী ছেপে, গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে, হাটেবাজারে, স্কুলে-কাছারিতে, টাঙিয়ে দেয়া হোক।

কিন্তু ছবিটা আঁকা হবে কোন পদ্ধতিতে? সাধারণ চক্রবর্তীর চোখে চশমা এবং বুক-পেট-কোমর ও নিতম্ব দুই সমান্তরাল সরল রেখায় আবদ্ধ। অথচ, আমাদের

দেশীয় ঐতিহ্য, যার বাজারে চলিত নাম 'ওরিয়েন্টাল আর্ট' সরল রেখার প্রতি বিরাগিনী। এবং সরল রেখা ব্যবহার করলেই কেমন বিদেশী বিদেশী মনে হয়। যদিও আমাদের ডাকের সাজ, পটের ছবিতে সরল রেখাই মূল রেখা, তবু হ্যাভেল সাহেব যে শিখিয়ে গেছেন আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য লতার মত এঁকেবেঁকে চলেন, সুতরাং তাকেই আমরা বাপ-পিতামহর চাল বলে মান্য করি। যা-হোক, ঐ পটের ছবির মত রঙ ব্যবহার করে, আলে-ভাগ-করা একটি সবুজ ভূমি চিত্রিত করা হোক। তার ওপর মন্দিরের মত করে আঁকা হোক একটি ব্যালট বাক্স। এই ব্যালট বাক্সটাতে বৌদ্ধ স্থাপত্য + কাংড়া + মুঘল স্থাপত্য—এই সূত্রের প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন করা হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রপতি ভবনে, মুঘল-উদ্যান গিয়ে শেষ হয়েছে অশোককক্ষে। ঐ ব্যালট-বাক্স থেকে একটা নল বের হয়ে যাক সবুজ মাঠে। আর সেই জমির ওপরে আকাশে যেমন করে যমদূতরা সাঁড়াশি দিয়ে পাপীকে দগ্ধায় বা লোকে সিগারেট খায় সেই রকম করে একটা ক্রেন সাধারণ চক্রবর্তীকে ধরে আছে। সাধারণ চক্রবর্তীর হাতে একটি ব্যালট পেপার। সে ব্যালট পেপার ঐ দেশীয় ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ব্যালট বাক্সতে ফেলছে আর নল দিয়ে গলগল ধারায় সমাজতন্ত্র বেরিয়ে মাঠটাকে যেন ভিজিয়ে দিচ্ছে। ঐ ক্রেনটাকে একটু ললিত করে 'ওরিয়েন্টাল' করে নেয়া যায়। নীচের জমিটাতে সবুজ আর সমাজতন্ত্রের গেরুয়া জলের ব্যবহারে পশ্চিম ইয়োরোপীয় দুঃসাহসের নজির থাকবে। সমাজতন্ত্র শব্দটিতেই ত পূর্ব-ইয়োরোপ রয়ে গেল। ব্যাস। শ্যামও রইল, কূলও রইল। একেই বলে নিরপেক্ষতা। হেঁ হেঁ।

কিন্তু ছবিটা আঁকবে কে? এই নতুন মডেলের জন্য নতুন শিল্পী প্রয়োজন। সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয়তাবাদী দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেয়া হোক।

জীবনীটি লেখা হবে কোন পদ্ধতিতে। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দেশীয় রাজনীতি—সব কিছু মাথায় রাখতে হবে। বেশি জাতীয়তাবাদী হওয়া চলবে না, আবার বেশি আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়াও চলবে না। 'সহাবস্থান' 'পঞ্চশীল' 'জোট-বহির্ভূত' এই সব মনে রাখতে হবে। সবচেয়ে বেশি করে মনে রাখতে হবে 'নিরপেক্ষতা'। ডুডও খাব, টামাকও খাব। গাছেরও খাব, তলারও কুড়োব। এই হচ্ছে 'ভারতীয় ঐতিহ্য: শেষতম সংস্করণ'। সুতরাং সাহিত্যেও এই নিরপেক্ষতা অনুসরণ করতে হবে। এই নতুন ঐতিহ্য অনুসরণ আমাদের সাহিত্যে করা হয়েছে বেশ সাফল্যের সঙ্গেই। উদাহরণত, ধরা যাক, রাঢ় দেশের একটি গ্রাম, বিশেষ টানে বিশেষ ভাষায় লোকে কথা বলে। সুতরাং আঞ্চলিকতা রইল। সেখানে একটি নেটিব ক্রিশ্চান ডাক্তার মানবতার সেবা করে বেড়ায়। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা রইল। সেখানে মহাযুদ্ধের সময় একটি মাতাল ইংরেজ মেয়ে এসে পড়ল। সুতরাং ইতিহাস চেতনা রইল। সেই কাল ক্রিশ্চানের সঙ্গে সেই ধলা মেয়েটার বিয়ে হল— সুতরাং আন্তর্জাতিকতা রইল। বাচ্চালোগ একদফে তালি বাজাও। কাল্লু, সিটি দে। মুরগিওয়ালিরে মেরে ফেল।

সুতরাং এই জীবনী লিখবার জন্য নতুন লেখক প্রয়োজন। সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়া হোক।

সেই অনাবিষ্কৃত চিত্রশিল্পী ও লেখকের অবগতির জন্য সাধারণ চক্রবর্তীর জীবনের মূলসূত্র ও কেন তাকে এত প্রতিনিধিস্থানীয় মনে করা হচ্ছে তার যুক্তি নীচে দেয়া হল।

রাঢ়বঙ্গে একটি সম্ভ্রান্ত পুরোহিত বংশে চক্কোত্তির পিতামহের জন্ম। কিন্তু তার পিতামহের যৌবনেই যজমান সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ায় ও আয় দিনদিন কমতে থাকায়, পিতামহ কুচবিহার দেশীয় রাজ্যে একটি মন্দিরের সহকারীর পদ গ্রহণ করেন,

ও কুচবিহারেই স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। পিতামহের মৃত্যুর পর চক্কোত্তির পিতা ঐ পদে বহাল হন। এবং পিতার মৃত্যুর পর চক্কোত্তিই হয়ত ঐ পদে বহাল হত, কিন্তু তার দ্বাদশবর্ষ বয়ঃকালে ভারতবর্ষ সহসা স্বাধীন হওয়ায় ব্যবস্থার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কারণ সাতচল্লিশ সালে কুচবিহার রাজ্যের অধিবাসীগণ বুঝতে পারেনি, তারাও স্বাধীন হল কি না। এদিকে কাগজেপত্রে, পাশের জেলার লোকজনের কাছে আসন্ন স্বাধীনতার সংবাদ, অপরদিকে সেই স্বাধীনতা কুচবিহারের পক্ষে ভাল কী খারাপ, এ বিষয়ে সন্দেহ ও সেই স্বাধীনতায় নিজেদের কোনো অংশ খুঁজে না-পাওয়ায় অবস্থা দাঁড়াল এরকম, যেন অন্ধকারে পা ফেলা হয়েছে ও কোনো সিঁড়ি পায়ের তলায় ঠেকছে না।

অবশেষে আড়াই বৎসরকাল এই প্রকার অনিশ্চয়তার মধ্যে কালক্ষেপের পর উনিশ শ পঞ্চাশ খ্রিষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারি কুচবিহার ভারত-ইউনিয়নে যোগ দেয়। একটি অনিশ্চয়তার অবসান ঘটল।

কিন্তু চক্কোত্তিদের নয়। কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি জেলায় পরিণত হয় এবং কুচবিহারের সমস্ত কর্মচারীকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি চাকরিতে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যেহেতু ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সেইহেতু কুচবিহার-রাজ্যের দেবায়তনের কর্মচারীদের সরকারি চাকরির আওতায় নেয়া গেল না। আগের মত চক্কোত্তির বাবার বেতন থাকল পনের টাকা ষাট নয়া পয়সা। কিন্তু আগের মত, মন্দিরের আদায়ীকৃত প্রণামীর ওপর তাদের অংশ থাকল না, কারণ, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মন্দিরের হিশাবনিকাশ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিলেন।

তখনো এক ভগ্নী অনূঢ়া। সুতরাং উনিশ বৎসর বয়সে আই.এ.পাশ করার পর চক্কোত্তির আর পড়া হয় নি। চাকরি নিয়ে সে বাড়ি ছেড়ে আসে।

চক্কোত্তির পিতৃদত্ত নাম সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, কারণ তার জন্মের দিন বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজা ছিল। কিন্তু চাকরিক্ষেত্রে চক্কোত্তিকে মেসে থাকতে হয়, ও মেসে পদবী ধরে ডাকাডাকি করা হয়। দুজন চক্কোত্তি হওয়ায় বিশেষ অসুবিধা ঘটে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন বিশেষ লম্বাচওড়া হওয়ায় ও লম্বাচওড়া কথা বলায়—তার নাম হয় অসাধারণ। সুতরাং এর নাম হয় সাধারণ।

পিতৃদত্ত নামটাকে ত চক্কোত্তি রক্ষা করতে পারলই না—নতুন নামটাও স্বক্ষমতায় উপার্জন করতে পারল না।

চাকরিক্ষেত্রে এসেই চক্কোত্তি এই মেসে ওঠে। এবং মেসে উঠেই বোসকে পেল। তখন তার কাছে বোসই ধ্যানস্থান হয়ে উঠল। তার একমাত্র কারণ যে চাকরি জীবনে বোস হওয়াটাই তার কাছে একমাত্র সত্য বলে মনে হল। বোস ঢুকেছিল এল.ডি. কেরানি হিশেবে। কিন্তু বিভাগীয় পরীক্ষা দিতে-দিতে সে এমন একটা জায়গায় পৌঁচেছে যে, আর গোটা দুয়েক পরীক্ষা দিলেই সে বর্তমানে যে অফিসের কেরানি তার মালিক হয়ে যাবে। সেই দুটো পরীক্ষা পাশ করতে আরও পাঁচ কি দশ বছর লাগবে কিন্তু বোসের হাবভাব চলাফেরা দেখেই বোঝা যায় তার সামনে অফিসের ঐ চেয়ারই শুধু আছে—আর সেই চেয়ারটার জন্য চোখ বুজে কান বুজে সে এগচ্ছে—হয়ত কচ্ছপের মত, হয়ত শামুকের মত, কিন্তু এগচ্ছে তো বটেই। সেই কোন সুদূর ভবিষ্যতে বোস একদিন তার অফিসটার মালিক হবে— এই আশায় সে এখন থেকেই নিজেকে আলাদা করে রাখে, সকলের সঙ্গে মেশে না, সকলের সঙ্গে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারে না। তাছাড়া শুধুমাত্র দুটো পরীক্ষায় পাশ করলেই যে ঐ চেয়ারটিতে সে বসতে

পারবে তা নয়। সেই কারণে তাদের এসোসিয়েশনেও সে যায় না। এবং ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ে।

যেহেতু চক্কোত্তির নিজের বলতে কিছুই ছিল না, যোগ্যতা বা বিশ্বাস, সেই হেতু বোসকে বেষ্টন করেই সে নিজেকে তৃপ্ত করল। আর বোসও সম্ভবত নিজের সাধনায় ক্লান্ত হচ্ছিল। তাই চক্কোত্তিকে পেয়ে সেও উপদেশ দেয়ার বেশ একটি উর্বর ক্ষেত্র পেল।

রাস্তায় বেড়াতে-বেড়াতে বোস চক্কোত্তিকে বলত, 'বুঝলেন মশাই, দেখতে হবে গবমেন্ট আপনার যোগ্যতা ও চেষ্টা অনুযায়ী সুযোগ দিচ্ছে কিনা। ইনসেনটিভ হচ্ছে যে-কোনো ভাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মূল কথা। আমি ত বুঝি না, আমাদের মাইনে বাড়াবার জন্য বা মজুরদের বেতন বাড়াবার জন্য এত আন্দোলন করার কী দরকার। দেখুন একজন লেবার যদি ট্রেনিং নিয়ে আসে তাকে তো আর গবমেন্ট কম মাইনে দিতে পারবে না, আমি যে দু-দুটো ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় পাশ করলাম, তার জন্য গরমেন্ট ত আমাকে বেশি মাইনে দিয়েছে। আপনি যদি পরীক্ষা না দেন তবে, মাইনে বাড়াবার পক্ষে কী করে কথা বলবেন, বেশি মাইনে চাইতে ত লজ্জা করা উচিত। আমার মতে একজন কেরানিকে প্রতিদিনের কাজ অনুযায়ী টাকা দেয়া উচিত। আমরা যে কাজ করে যে টাকা পাই তা কি আমাদের পাওয়া উচিত?

'তা ত ঠিকই' এছাড়া চক্কোত্তির কিছু বলার থাকে না।

বোস কর্তৃক অধিকৃত যখন চক্কোত্তি তখনই মেসে মিত্রসাহেবের আবির্ভাব। সুতরাং চক্কোত্তি বোসকে ছেড়ে মিত্রকে নিয়ে পড়ল। মিত্র সাহেব রেল কনস্ট্রাকশনে একটা মোটামুটি বড় পোস্ট নিয়েই এসেছিলেন, কিন্তু আসার পর তিনি আর কোথাও ওঠার জায়গা পান নি। শেষ পর্যন্ত স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিঙ রুমটাই ঠিক করে নিচ্ছিলেন, এমন সময় বোস সব জানতে পেরে তাঁকে বহু অনুনয়বিনয় করে এই মেসে নিয়ে আসে। ভদ্রলোক অফিস থেকে একটা জিপ পেয়েছেন। প্রতিদিন সকালে স্নান করে বেরিয়ে যান, বাইরে-বাইরে কোথায়-কোথায় রেলের সব কনস্ট্রাকশন দেখে ফেরেন সেই রাত নটা-সাড়ে নটায়। তখন আবার স্নান করেন, খেতে খেতে বহু গল্প করেন।

মিত্রসাহেবের গল্প, 'দেখুন আমি ছোটবেলা থেকেই ডেয়ারিঙ। এখানে আসার আগে মা বলছিলেন একটু অপেক্ষা করে চিঠিপত্র লিখে যা। আমি ওসব পুতু-পুতু ভাবনা চিন্তার মধ্যে না থেকে সোজা চলে এলুম, আর দেখলেন ত ব্যবস্থাও একটা হয়ে গেল।...... বুঝলেন, আজ দুটো কনস্ট্রাকশন দেখতে গিয়েছিলাম। ফেরবার সময় মনে হচ্ছিল এই যে এত বড় আমাদের দেশ, এর উন্নতির জন্য আমিও ত কিছু করছি। কিন্তু করে কী হবে? আমি না হয় দিনে পঞ্চাশ মাইল, ষাট মাইল, আশি মাইল দৌড়াতে পারি, আমাদের ইয়ঙম্যানেরা ত দেড় মাইলও পারেন না। গিয়েছি এক ক্যালভার্ট দেখতে। গিয়ে দেখি ওয়ার্ক সরকারটি ওখানে নেই, নেই ত নেই, তিনি নাকি গত তিনদিন ধরে ঐ সাইটেই যান নি, ভেবে দেখুন কী অন্যায়! একটা ক্যালভার্ট। তার ওপর দিয়ে কত প্যাসেঞ্জার যাবে—একটা মিনিমাম সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি যে থাকবে তা না, এদিকে আবার বলবে, অফিসাররা ঘুষ খায়, আমাদের মাইনে কম এই সব। একবার মনে হল দিই সাসপেন্ড করে। কিন্তু মা কাউকে ভাতে মারতে না করেছেন—তাই ছেড়ে দিলাম।

চক্কোত্তির সারাটা শরীর যেন ধিক্কার ছিটাল ঐ ওয়ার্ক সরকারটির বিরুদ্ধে।

মিত্রসাহেবকে মেসের একটা আস্ত ঘর ছেড়ে দেয়া হয়েছে খাবার টেবিলে মিত্রসাহেব একা কথা বলেন, আর সব শ্রোতা। মিত্রসাহেবের ব্যস্ততা, মোটর গাড়ি, দামী লুঙি—সব কিছু মিলে মেসের কাছ থেকে আপ্যায়ন আদায় করে নিচ্ছিল। দুদিন পরে তিনি মেস ছেড়ে চলে যাবেন। যেন তিনি সুখস্মৃতি নিয়ে যেতে পারেন: হে ক্ষণিকের অতিথি।

মিত্রসাহেব চলে গেলেন। কোন স্মৃতি নিয়ে গেলেন কি না বোঝা গেল না। তাঁর চরিত্রে স্মৃতির স্থান খুব বেশি বলে প্রতিভাত হয় না।

চ্যাটার্জি এমন একটি লোক, যে মেসে আছে কি না আছে বোঝাই যেত না। একটি ইস্কুলে মাস্টারি করে। সকাল দশটায় ইস্কুলে যায়, ফেরে রাত গোটা আটটা-সাড়ে আটটায়। কখনো কখনো তারও পরে। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশোনা করে, কী সব লেখেটেখেও।

একদিন বোস চক্কোত্তিকে বলল, 'দেখুন বোস, আপনি চ্যাটার্জি সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'না, জানবার কী আছে?'

'না, ও ত একটা স্কুলে কাজ করে, কিন্তু যেসব বইপত্র পড়ে, তাতে একটু রাজনীতি-ঘেঁষা বলে মনে হয়।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'না হয় নি কিছু, তবে আমরা সব সরকারি কর্মচারী, কি জানি, যদি অন্য রকম কিছু—'

'তা ত বটেই—'

এর মাসখানেক পর বোস মেস ছেড়ে দিল। সে নিজে একটা বাসা ভাড়া করেছে। মেসে তার পড়াশোনার অসুবিধা হয়।

তার মাসখানেক পর বোস চক্কোত্তিকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। চক্কোত্তির মাথায় এই সহজ হিশেব ঢুকল না: মেস ছাড়ার ফলে বোসের যে বেশি খরচ পড়েছিল, চক্কোত্তি আসার পরে পঞ্চাশভাগ পূরণ হয়ে গেল; বাকি পঞ্চাশভাগ ভবিষ্যতের নিরাপদ কর্মজীবনের জন্য বোসের বিনিয়োগ; অথচ ভবিষ্যতের কোনো নিরাপত্তা ও উন্নতির স্থিরনিশ্চিত সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও দুজনে মিলে আলাদা বাড়ি করে থাকার জন্য বেশি খরচের পুরো পরিমাণটাই চক্কোত্তির পক্ষে বোসের উন্নতির জন্য দেয় কর হয়ে যায়।

এত সামান্য একটি অঙ্ক বোঝে না বলেই চক্কোত্তির মত সনাতন বশংবদের পক্ষে একথা চিন্তা করারও দুঃসাহস হয় না যে, সে যদি ঐ কর দেয়া বন্ধ করে তবে বোস আর-কোনোদিন বোসসাহেব হতে পারবে না।

সেইজন্যই প্রস্তাব: সরকার যেমন, 'ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন, দেশের শিল্পকরণে সাহায্য করুন', 'প্রাইজবন্ড কিনুন, দেশের শিল্পকরণে সাহায্য করুন' '..... শেয়ার কিনুন, দেশের শিল্পকরণে সাহায্য করুন' —ইত্যাদি প্রচারপত্র লাগিয়ে বেড়ায়, তেমনি সাধারণ চক্রবর্তীর একটি ছবি ও জীবনী ছেপে ভারতবর্ষের সর্বত্র লাগিয়ে দেয়া হোক, শুধু এই সোজা অঙ্কটা বোঝাতে: বোস বোসসাহেব হওয়ার জন্য সাধারণ চক্কোত্তির কাছ থেকে পয়সা চুরি করছে।

মৃত মানুষের অমৃতকথা

সমীর মুখোপাধ্যায়

আষাঢ়ের এক মেঘে-ঢাকা সকালে নির্জন নদীতীর-সংলগ্ন শ্মশানের চিতার লেলিহান অগ্নিশিখার বেষ্টনীর মধ্যে চুরানব্বই বছরের অতি-জীর্ণ একটি দেহ প্রায় নিঃশব্দে দগ্ধ হচ্ছিল। দেহটি মোহিতমোহনের। মুখচ্ছবির দিকে ভাল করে তাকালে মনে হতে পারে, মৃত চক্ষু দুটি মুহূর্তের মধ্যে খুলে গিয়ে অপার বিস্ময়ে বলে উঠতে পারে, 'তাই তো, এই বুঝি মরণ! থ্যাংক ইউ।' একজন ডোম আর দুটি পাড়ার ছেলে যথাসাধ্য পোড়াবার ব্যবস্থায় আছে। একজন পোড়া বাঁশ নিয়ে এটা, ওটা গুঁজে দিচ্ছে। আগুনও লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। মোহিতমোহনের শরীরটি এই সদ্য এখানে ওখানে একটু পুড়েছে। যেটা আশ্চর্য, মরা পোড়ার সময় যেরকম উৎকট শব্দ হয় তেমনটি এখন শোনা যাচ্ছে না। সেইদিকে নিরীক্ষণ করে মোহিতমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রাজকুমার ঈষৎ বক্র হেসে আমাকে বললেন, 'পিতৃদেব বেঁচে থাকতে কোন শব্দ করেননি। এখন যখন দগ্ধ হচ্ছেন, এখনও কোন শব্দ করছেন না। কিছু বুঝলেন?'

আমি, নিরঞ্জন রায়, মোহিতমোহনের প্রথম যুগের ছাত্র—রাজকুমারের কথা তেমন বুঝলাম না। কী জানি উনি কী বলতে চান, দেখা যাক। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে। কয়েকটি ঘেয়ো কুকুর ধুতরো আর কলকে ফুলগাছের নীচে কী একটা প্রাণীর মাংসখণ্ড নিয়ে কামড়াকামড়ি করছিল। বড়দা ব্রজকুমার থেকে গেছেন বাড়িতে। আশি-উত্তীর্ণা মাকে সামলাচ্ছেন। মায়ের হাতের শাঁখা এখনও ভাঙা হয়নি—এ সংবাদ কনিষ্ঠকে জানিয়ে তিনি একটু আগেই চলে গেছেন। রাজকুমার আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন নির্জনে। একটি বৃক্ষের নীচে বসে বললেন, 'দাদার মতো আমিও শবদাহ দেখতে পারি না। তার ওপর হৃদযন্ত্রটি আমার তেমন সুবিধের নয়। আসুন, এইখানে, এই মোটা শেকড়টার ওপর চেপে বসুন। আজ আমার একটা গল্প বলতে ইচ্ছে করছে। বুঝতেই পারছেন কার গল্প।'

'হ্যাঁ, মাস্টারমশাই-এর গল্প তো।'—আমি সেই বিশাল, সুপ্রাচীন, পত্রবহুল বৃক্ষের নীচে মোটা শেকড়ে এসে বসলাম। অদূরে একটা নালা দিয়ে জলঢোঁড়া জল কেটে তীরবেগে চলে গেল। সিগারেটে মৃদু টান দিয়ে রাজকুমার বললেন, 'মোহিতমোহনের জীবন আপনিও জানেন, একেবারেই ঘটনাহীন। মদীয় পিতৃদেবের জীবনে কোন গল্প নেই। তবুও এখন যা বলব তাকে কাহিনী ছাড়া, ঘটনা ছাড়া আর কী বলা যাবে?' প্রত্যেকটি মৃত্যুর শিয়রে আছে একটি প্রচ্ছন্ন কৌতুক। এ মৃত্যুর পিছনেও আছে কৌতুক। কৌতুক আর একটি চিঠি। ঘণ্টা দুয়েক আগে বাবার বালিশের নীচ থেকে আমি যা উদ্ধার করি।

চিঠিখানি অদ্ভুত।

'আমি এক্ষুণি তা দেখাতে পারি আপনাকে। চিঠিতে বাবার গোটা জীবন ধরা আছে মাত্র কয়েকটি লাইনে। ওঁর সমস্ত জীবন আপনাকে খুলে না দেখালে এ চিঠির মর্মার্থ

আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন না। সুতরাং আগে বাবার গল্পটা হোক, পরে চিঠিটা হবে, কী বলেন নিরঞ্জন বাবু?'

সিগারেটে পুনরায় লম্বা টান দিয়ে, রাজকুমার বলতে লাগলেন, 'আমার পিতৃদেব জীবনে মনে রাখার মতো একটি কাজও করেননি। দেশে গণ্ডায় গণ্ডায় গায়ক, বাদক, তবলচি, কবি বা লেখক জন্মায় না। এ সত্য মানি। কিন্তু আমরা সবাই অন্তত কিছু না কিছু করি। নিজে সরাসরি কিছু না করেও আমরা কোন না কোন কিছুর সঙ্গে যুক্ত থাকি। যেমন ধরুন একটা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা অথবা একটা কালীমন্দির স্থাপন অথবা একটা লাইব্রেরি বা কোন কনসার্ট পার্টি—এসবের মধ্যে থাকা বা এতে রস পাওয়া, আমার পিতৃদেব এর কোনটাই করেননি বা যুক্ত থাকেননি। সব থেকে যেটা অবাক কাণ্ড, তাঁর এসব ভালই লাগত না। কোনও ব্যাপারে, তা সে নিজের ব্যাপারই হোক বা সামাজিক কোন ব্যাপারই হোক—কোন কিছুতে উদ্যোগ নেওয়া ওঁর ধাতে সইতো না। কেমন করে যে এটা উনি পেরেছিলেন—এই একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকা, এ ভারি অদ্ভুত। আপনার বুঝি ধূমপান চলে না?' এই শেষের কথাটি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলা।

'আমার মদ্যপান। জলেই আমি ভালো থাকি।'

'ওঃ। যার যেমনটি।' —ব'লে রাজকুমার মৃদু অনুচ্চ স্বরে বলতে থাকলেন এক আশ্চর্য নিশ্চেষ্ট জীবনের গল্প। 'ওই যে বলছিলাম না—বাবা জীবনে কিছুই করেননি, কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নিজের বা নিজের স্ত্রীর জন্য বা পুত্রকন্যার জন্যও তো লোকে কত কী করে। উনি কস্মিনকালেও কোনকিছু করেননি। এমনকী, এখানের এই হুগলির বসতবাড়িটিও মা করেছেন। উনি রোজগারও করেননি কোন অফিসের ঘানি টেনে। চা বাগানের তিন তিনটি শেয়ার ছিল। ও ক'টি দত্তকসূত্রে পেয়েছিলেন। সারা বছর সংসার ধারেই চলত। আমাদের দু'ভাইয়ের পড়াশুনো—তাও ধারে। বছরের শেষে শেয়ারের টাকা আসত। তাতেই ধার শোধ হয়ে যেত। ধার শোধ হয়ে গেলে বাবা আবার নতুন করে এখানে ওখানে ধার গাঁথতেন। এইরকম ধারে-গাঁথা ছিল আমাদের জীবন। মাইনে দিতে পারতাম না সময়মতো। নাম কাটা যেত। একবার তো ছ'মাস স্কুলে যেতে পারিনি। বইটইও সব কিনে উঠতে পারতাম না। বড় লজ্জা করত। খুব বেশি বয়েস পর্যন্ত শ্লেট ব্যবহার করেছি কাগজ, কেনার পয়সা জোটাতে পারতাম না বলে। ফাউন্টেন পেন কেনা তো ছিল চরম বিলাসিতা। এখন তো স্কুলে সব ছেলেমেয়ের হাতে ঘড়ি। আমাদের কাছে স্কুলজীবন কাটানোর অনেক পরেও ঘড়ি কেনা, ঘড়ি-পরা ছিল স্বপ্নের ব্যাপার। এই দেখুন না, আমার হাতে এখনও ঘড়ি নেই। এখন কি কিনতে পারি না? তা নয়। সময়কালেই পরলাম না। এখন আর ঘড়ির বাহারে কী হবে? তাছাড়া অভ্যেস মশাই, সবই অভ্যেস। ভোরবেলা বালির মোড়ে পাঁচুকাকার ভাড়াটে বাড়িতে বাবা গান গাইতেন, বড় বড় খাসি খেতে ভালোবাসি, বোকা পাঁঠায় অরুচি। বড় বড় মণ্ডা দশ বিশ গণ্ডা, পয়সা নেই তার করবো কী। এইকরম সব গান। শেষকালে মায়ের তাড়নায় বাবা টিউশনি ধরলেন।'

এইখানে আমি কথা বলার ফুরসত পেলাম, বললাম, 'হ্যাঁ, আমি সেদিনের সাক্ষী। আমি ওঁর সেই প্রথম যুগের অধম ছাত্র।'

বিমর্ষ ভঙ্গিতে রাজকুমার বললেন, 'উনি তাতেও ফেলিওর। এক-একটা লোক এমনই। কোন কিছুতেই তারা সুবিধে করতে পারে না। অথচ দেখুন মোহিতমোহন তখনকার যুগের বি-এ। এই তখনকার যুগ বলতে কোন ধারণা আছে? আজ থেকে অন্তত সত্তর বছর আগে খাস কলকাতাতেই বা ক'জন বি-এ ছিল? বাবার মুখে শুনেছি ওঁর বি-এ পাশের খবর শুনে ওঁদের কারফরমা লেনের বাড়িতে—নিমতলা থেকে, মণ্ডলস্ট্রিট থেকে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

স্ট্রিট থেকে, জোড়াসাঁকো থেকে বেশ ক'জন বাবাকে চাক্ষুষ দর্শন করতে এসেছিল—যেন বাবা সাক্ষাৎ দেবদূত। বাবা অবশ্য লজ্জায় বাড়ি থেকে বার হননি।'

আমি এইবার বললাম, 'উনি মাইনে চাইতে পারতেন না। উত্যক্ত হয়ে উনি দেয়ালে কাগজ লটকে দিতেন, ওতে লেখা থাকত কার কার ক'মাস করে মাইনে বাকি আছে। সবাই দেখত, মুচকি মুচকি হাসত, মাইনে যারা দেবে না ঠিক করত তারা আদৌ দিতো না, চুপচাপ পড়ে যেত। মাস্টারমশাই তাদের কিছু বলতে পারতেন না। আমরা হয়তো বলেছি, আপনি না পারেন যদি বলেন তো আমরা ওদের গার্জেনকে ধরি। উনি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলেছেন, না, না। সে কী ঠিক হবে? এর মধ্যে গার্জেনদের আনা কেন? ওঁরা মাইনে ঠিকই দেন, ছেলেরা উড়িয়ে দেয়, তো ওনারা কী করবেন। ওসব করতে হবে না।'

রাজকুমার বললেন, 'আসলে ফেলিওর। ওঁর জীবনটাই এইরকম। একের পর এক শুধু ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা। তার আগে আরও একটা কথা বলে নিই। লোকেদের কত ব্যাপারেই না ইন্টারেস্ট থাকে। ওঁর কিন্তু কোন ব্যাপারেই কোন ইন্টারেস্ট ছিল না। যখন উনি অনেকদিন কলকাতা ত্যাগ করে হুগলিতে এসেছেন, দাদা যখন মহসীন কলেজে পড়ে, দাদাই একদিন আমার সামনে বাবাকে জিগ্যেস করেছিল, আচ্ছা, আপনি নেতাজিকে দেখেছিলেন? কলকাতার বাড়িতে তো সাতাশ-আঠাশ বছর পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন। অবশ্য তখন উনি নেতাজি হননি। শুধুই সুভাষচন্দ্র।—আমি নিজে শুনেছি, উনি বললেন, ওসব সুভাষচন্দ্রটন্দ্র, ওসব আমার ভালো লাগতো না। সুভাষবাবু যখন অ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা করছেন তখন হয়তো আমরা কলেজ স্ট্রিটের দিলখুসে বসে মজা করে কাটলেট ওড়াচ্ছি, বুঝলি? আমাদের মুখে মুখে তখন গান ঘুরতো, রবিবাবুর গান, নজরুলের—

'দাদা বলল, আচ্ছা নেতাজি থাক। রবিবাবুর তাহলে ভক্ত ছিলেন? ওঁর বাড়ি তো জোড়াসাঁকোতে, তাহলে তো উনি ঘোড়ার গাড়িতে অথবা পায়ে হেঁটে পাথুরেঘাটা দিয়ে গেছেন। আপনি দেখেননি না দেখার ইচ্ছে হয়নি? আশ্চর্য, বাবার সাফ জবাব, না। শুনেছিলাম এর-তার মুখে কী সব কবিতা টবিতা লেখেন, বাস, এই পর্যন্ত। তাতেও না দমে দাদা ফের বলল, তা না হয় হল, কিন্তু যেবার উনি নোবেল পেলেন তখন—

'বাবার মুখে পরিহাস, বললেন, ধ্যুস। দাদা তারপরও বলল, সে না হয় না হলো, শান্তিনিকেতন কলকাতা থেকে অনেকটা পথ আর আপনার বয়স তখন মোটে চোদ্দ, ওটা না হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু পরে তো অনেকবারই উনি কলকাতায় এসেছেন, বিখ্যাত জায়গাগুলোতে বক্তৃতা দিয়েছেন, নিছক একজন বাঙালি হিসেবেও কি আপনার কোন কৌতূহল ছিল না ওঁকে দেখতে, ওঁর কথা শুনতে? বাবা তা শুনে মুখ গোমড়া করে বলেছেন, কী কৌতূহল হবে? ওনার ওইসব মিষ্টি মিষ্টি কথা, নাচা, গান করা, এসব কী আমাদের পছন্দ হয়? আমাদের মতে আদর্শ ছিলেন রবিবাবু নয়, গোবরবাবু। দাদা অবাক হয়ে বলল, গোবরবাবুটি আবার কে? এবার বাবা গর্বের সুরে বললেন, গোবরবাবুর নাম জানিস না, এদিকে আবার ফটর ফটর করছিস। মস্ত কুস্তিগীর। উনি গোটা ভারতবর্ষে বাঙালির ইজ্জত রেখেছিলেন। দাদা সে কথা শুনে বলে উঠল, আপনি কি কুস্তি লড়তেন?

'রামো!—বাবা বেজায় বিরক্ত হয়ে বললেন, কুস্তি লড়তে যাব কেন—গোবরবাবুকে পছন্দ করি বলে? লেংটি পরে গায়ে ধুলো মাখবো? কানে আতর-ভেজানো তুলো গুঁজে বাদামপেস্তা মেশানো সরবত খাবো? তুই যেন কী?—সোজা কথায় ওই যা বলছি, বাবার কোনও ব্যাপারে কোন ইন্টারেস্ট ছিল না। ধর্মকর্ম? তাতেও ছিলেন না কোনদিন। যে কোন মহাপুরুষকে অনায়াসে বলে দিতেন, বেটা বুজরুক, ভণ্ড। শেষের দিকে, বয়স যখন আশি ছাড়িয়ে গেছে তখনও কালীঠাকুরের বাঁধানো ফটোর সামনে বসে চোখ বুজে হাতের

মালা ঘুরোনো, এসব কখনও দেখিনি। মনের জোর? না। ওসব কিছু নয়। ওইরকমই মানুষ, কিছুই ভাল লাগে না, কোন কিছুতেই জড়িয়ে নেই, জন্ম-উদাসীন, সংসারীও নয়, অসংসারীও নয়, অদ্ভুত নিশ্চেষ্ট মানুষ, রবিবাবুর ব্যাপারটাই দেখুন না!'

আমি বললাম, 'তা বটে। রবিবাবুর গান গাইছেন মাস্টারমশাই, অথচ খোদ রবিবাবুকে দেখবার আগ্রহ নেই। গোবরবাবু আদর্শ। অদ্ভুত, স্ট্রেঞ্জ।'

'শুনবেন আর? এখনও গল্পের ভাঁজ তেমন করে খুলিনি। যদি বলেন গুটোই।' রাজকুমার আমার দিকে ঔৎসুক্য নিয়ে তাকালেন। আমি বললাম, 'বলুন, বলে যান। তার আগে আমিও একটা কথা বলে নিই। আমি আপনাদের গোড়াকার অবস্থা দেখেছি। সেদিনের কিছু কিছু ছিটেফোঁটা আজও মনে আছে। উনি কিন্তু ওরই মধ্যে মুখের হাসিটাকে ধরে রেখেছিলেন। এ মশাই খুব শক্ত ব্যাপার। আমরা, বলতে গেলে ওঁর হাঁটুর বয়সী, উনি খুব স্বচ্ছন্দে আমাদের মধ্যে মিশে যেতে পারতেন। পড়াতে পড়াতে হঠাৎ হঠাৎ সুরও ভাঁজতেন, ওই যে ওই গানটা—কে বিদেশি বাজাও বাঁশি বা কানাকেষ্টর গান, চরণ ধরে বারণ করি আর টেনো না চোখের টানে। ওঁকে সেইসময় খুব ছেলেমানুষ দেখাত। মনে হত, আমাদের থেকে বছর দশেকের মাত্র বড়ো হলেও হতে পারেন। বয়েস লুকোবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল মাস্টারমশাই-এর।'

'লক্ষ্য করেছিলেন নিশ্চয়ই,' বিষণ্ণ গলায় রাজকুমার বললেন, 'উনি ওঁর সমবয়স্কদের সঙ্গে মিশতে পারতেন না। যাঁরা বেশ দাঁড়িয়ে গেছেন উনি তাঁদের ছায়াও মাড়াতেন না। যাঁরা জীবনে অসফল, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর একরকম জমতো। এই ধরুন কাপড়ের দোকানের বিষ্টুদা—অতি সজ্জন ব্যক্তি, গোটা দিনের মধ্যে দশটি কী বারোটি কথা বলতেন, কোথা থেকে এক একটি উৎকট ইংরেজি অথবা বাংলা শব্দ জোগাড় করতেন আর একে ওকে জিগ্যেস করে খুব তৃপ্তি পেতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই দোকানের ফরাসে বাবা আর বিষ্টুদাকে মুখোমুখি বসে থাকতে দেখেছি। এমনও দেখেছি, দুজনের মধ্যে কোনও কথা নেই, হাস্য-পরিহাসও নেই, এমনি বসে আছেন দুজনে, দুজনে রাস্তার গাড়ি গুনছেন। বাবা হয়তো বললেন, কটা গুনলেন? বিষ্টুদা বলল, এই দশটা। আপনি? বাবা বললেন, বারোটা। ব্যস, আবার চুপচাপ। আবার চুপচাপ থেকে গাড়ি গোনা। এই চলল চোপরদিন। আর একজন ছিল পঞ্চু কুণ্ডু। ওনার তেজারতির বিজনেস ছিল। বাবা সেখানেও বসতেন। দোকানের রুজু রুজু আর ছিল পুলিশ ফাঁড়ির লোক, ওরা ইংরেজিতে দরখাস্ত টরখাস্ত লিখিয়ে নেবার জন্যে বাবার কাছে ভিড় করত। বাবা যাদের সঙ্গে মিশতেন তারা কিছু না হোক—ওঁর চেয়ে বিশ-বাইশ বছর বয়েসের ছোট সব। নিজে যে অক্ষম এটা হাড়ে হাড়ে বুঝতেন। তাই শিং ভেঙে বাছুরের দলে নাম লিখিয়েছিলেন। এখনও বাবার শরীর সম্পূর্ণ পোড়েনি। সম্পূর্ণ পুড়তে এখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকি, মাথার খুলিতে ডাঙশ মারার পর্ব এখনও বেশ কিছুটা দূর, তবু এসব কথা বলতে হচ্ছে, এ বড় দুঃখের। কেউ ওঁকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটু চা খাওয়ালে উনি বর্তে যেতেন। বাড়ি এসে চোখ বড় বড় করে বলতেন, 'জানো, আজ মিত্তিরদের প্রাণকেষ্ট—এই যে লরির মালিক গো, কী খাতির আমাকে, নমস্কারের ঘটা কী, আপনি আজ্ঞে ছাড়া কথা নেই, ভারি বিনীত ভাব, কী খাতিরটাই না করলে! বললে, আজ আপনাকে অন্নগ্রহণ করতেই হবে। আপনাকে ছাড়ছি না। তো বললাম, তা হয় না প্রাণকেষ্ট। তোমার একটা দরখাস্ত লিখে দিয়েছি বলে—! ও তাড়াতাড়ি জিভ কেটে দু'কান মুলে বলল, ছি ছি! এসব কী বলছেন মাস্টারমশাই! কীরকম মান্যিগণ্যি মানুষ আপনি। তায় ব্রাহ্মণ। আপনাকে খাওয়াতে পারলে আমাদের কত পুণ্য জানেন... এইরকম সব মিষ্টি মিষ্টি কথা। আমরা এসবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা

দুভাই বিলক্ষণ জানতাম, বাবা বানিয়ে বানিয়ে বলছেন। তিলকে তাল করছেন। বাবার কথা শুনে আমরা ফুক ফুক করে হাসতাম। উনি সে হাসি দেখে জ্বলে উঠতেন। রেগে গিয়ে কথা না খুঁজে পেয়ে বলতেন, হবে না কেন? যেমন মা তেমন ছা। বুড়ো বাপকে অশ্রদ্ধা! যা না প্রাণকেষ্টর বাড়িতে? বাড়িটা দেখলে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। উনি যত প্রাণকেষ্টকে বড় করতে চাইতেন আমরা ততো ফুক ফুক করে হাসতাম। কোথাও তো কলকে পেতেন না, হয়তো প্রাণকেষ্ট নিজের কোনও লেখাপড়ার কাজ ওনাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে আর তার বদলে একটু চা খাইয়েছে, ব্যাস, উনি গলে গেলেন।... শেষদিকে মোহিতমোহন পাড়ার এর-তার রোয়াকে শুয়ে থাকতেন নিঝুম হয়ে। আমার মেয়েকে ওর বন্ধুরা বলতো, তোর দাদুটা কী রে! দেখলাম মিত্তিরদের রোয়াকে শুয়ে আছে। মেয়ে বাড়িতে এসে রীতিমতো হইচই ফেলে বলত, বুড়োটা সত্যিই কীরকম যেন। একটুও প্রেস্টিজ বোধ নেই। শুতেই যদি হয় তার জন্য তো নিজের বাড়ি আছে। লোকে কী ভাবে বল তো।—যেন তোমরা তোমাদের বাবাকে শুতে পর্যন্ত দাও না।—সত্যিই বাবাকে নিয়ে আমাদের লজ্জার সীমা ছিল না। কাল দেখলাম জেলেপাড়ার মধু পালের বাড়ির নীচে বসে আছেন। পরশু দেখলাম চকবাজারের আশু সাহার বাড়ির ধাপিতে পা ঝুলিয়ে বসে। তরশু দেখলাম জগা দাসের বাড়ির পাশের মাঠে একটা ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখছেন। কেন এসব? আসলে এসব আমাদের মজানোর জন্যে। পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে আমাদের মাথা হেঁট করা।

—ইচ্ছে করে ওসব করে বুঝলে! বিনু নাপতানি পর্যন্ত সেদিন বলেছিল, তোমাদের বাবা, তোমাদের গায়ে লাগতেই পারে। বলবে তো, চুরানব্বই বছর বয়েস। এখন কি মাতার ঠিক থাকে? আমি বলি, ওনার মাতার কলকব্জা ঠিক আছে, তোমাদের থেকেও ঠিক আছে। সেদনে আমি জিগ্যেস করলাম—ও মেজোকত্তা, এবার ছেলেরা পুজোয় কী দিল? চলে যাবার সময়ে ভগমানের কাছে একটা ভালো কিছু পরে যাও। তো আমায় কী বলল জানো? বলল, আর আমার পুজোর জামা লাগবে না। তা বেশ। কিন্তু বুড়ো কত্তা করলো কী, মুকুজ্যেদের বৌ বাড়িতে ছেঁড়া তেনা জড়িয়ে—ওমা আমার কী হবে, দিব্যি চলে গেল। ওরা বলল, দাদু, এ তোমার কী রাজবেশ! তো উনি বলল, আমার এই বেশ। আচ্ছা, এই ভাবে ইচ্ছে করে তোমাদের মাথা হেঁট করানো কেন? এসব ভালোমানুষি নয়, এই আমি বিনু নাপতানি বলে দিচ্ছি, আসলে বুড়োটা খুব কুচুক্কুরে। মনটা বাপু আদপেই সাদা নয় তোমাদের মতো।'

গল্পের এইখানে এসে রাজকুমার একটু থামলেন। ওঁর হাতের সিগারেট নিভে গিয়েছিল। উনি লাইটারের সাহায্যে ধরিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'এ যেন প্রকারান্তরে নিজের জীবনকেই দেখা। আপনি বোরড্ হচ্ছেন না তো।'

'আরে না। প্রশ্নই ওঠে না।' আমি হাত নেড়ে বললাম, 'আপনি চালিয়ে যান।'

রাজকুমার সিগারেটে দীর্ঘ একটি টান দিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন আমি বাবা শব্দটি বেশি ব্যবহার করছি না। মাঝে মাঝেই মোহিতমোহন বলছি। তার মানে আমি অনেকটা ইম্পারসোন্যাল হয়ে গেছি ইতিমধ্যেই। জীবনের এ-ও এক রহস্য। নিরঞ্জনবাবু, এমনিতেই আপনি আমাদের কাছের লোক ছিলেন। এই শ্মশানে এসে এখন আরও কাছে এসে গেছেন। আমাদের ফ্যামিলি ম্যাটার্স কিছু কিছু জানেনও। আপনার সামনে সবটা খুলে বলা যায়।' বলে আবার একটু থামলেন। তারপর একটু দোনামোনা করে বলেই ফেললেন।

'এই একটা কেতা হয়েছে দু'দশ বছর ধরে। নিজের স্ত্রীকে স্ত্রী বলতে অসুবিধে হচ্ছে। সাহেবি ঢঙে —আমার মিসেস না বললে আর যেন মান থাকে না। সে যা হোক, আমার স্ত্রী বা আমার বউদি যার কথাই বলি, দু'দশ বছর এঁরা সংসার করার পর কেমন সহজেই বুঝে গেলেন আমাদের পিতৃদেবের নিন্দে আমাদের সামনেই করা চলে। আমার স্ত্রী প্রায়ই বলতেন, আমাদের শ্বশুরমশাই ফর নাথিং এতদিন বেঁচে আছেন। এ সংসারে ওঁর কোন কনট্রিবিউশানই নেই। এ সংসার শাশুড়িরই দান। উনি মুখ করুন আর যাই করুন, এ সংসারের ভালোমন্দের জন্যে উনিই দায়ী। শ্বশুরমশাই কিছু না। যে সমস্ত মানুষের নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সম্বন্ধে কোন ভাবনাচিন্তা নেই—সাধারণত সেই ধরনের মানুষেরাই দীর্ঘজীবী হন। কিন্তু এইভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ? এ কথার জবাবে আমি বলেছি, বাবাকে একটু বোঝার চেষ্টা কর। ওরকম একতরফা বলা ঠিক নয়। আজ থেকে কত কত বছর আগে বাবার একটা রোগ হয়। মরে যাব, মরে যাব—বাতিক। বাসে উঠলে মরে যাব, ট্রামে চড়লে মরে যাব, হাঁটলে পর্যন্ত মরে যাব। এ এক মানসিক রোগ। তখনকার কলকাতাতেও এ রোগের চিকিৎসা ছিল না। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি অভিশপ্ত মানুষটি দিবারাত্র বিষ্টুদার দোকানের পাশের ধাপিতে বসে আছেন। মাথার চুল অবিন্যস্ত। চোখেমুখে উৎকট ভয়ার্ত দৃষ্টি। উনি হাতের নাড়ি ধরে মুখটাকে ভয়ানক করে বসে বসে ভীষণ ঘামছেন। নাড়িতে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছেন। যাঁর এইরকম মহারোগ—তিনি কী কোন কাজের যোগ্য থাকেন? এটা বোঝার চেষ্টা কর। এর উত্তরে আমার স্ত্রী বলতেন, তাই যদি সত্য হয় তবে ওনার বিয়ে করাই উচিত হয়নি। জেনেশুনে এ বিষ নিজে কেন পান করলেন, অন্যকেও কেন পান করালেন? জবাব দিয়েছি আমি, ঠিক, তুমি যা বলেছ তা সর্বাংশে ঠিক। রোগটা যখন সামান্য ছুঁয়ে গেছে বাবাকে, বাবা তখন থেকেই যথেষ্ট সাবধান হয়েছিলেন।

'আমরা মা'র মুখেও শুনেছি—বাবা সত্যি সত্যি বিয়ে করতে চাননি। আত্মীয়-স্বজনের মুখে শুনেছি উনি বহুবার বহুভাবে বিয়েতে ভাংচি পর্যন্ত দিয়েছেন। এই নিয়ে আমাদের ফ্যামিলিতে নানারকম মুখরোচক গল্পও আছে। সে যাক। নিয়তি কেন বাধ্যতে। এই আপ্তবাক্য শেষ পর্যন্ত মানতেই হয়। নিয়তি বা ভাগ্যচক্রের গূঢ় অভিসন্ধি সাধুসজ্জনেরাই বুঝতে পারেন না—মোহিতমোহনের মতো সাধারণ মানুষ তা কেমন করেই বা বুঝবেন? বলা বাহুল্য আমার স্ত্রী—এই উত্তরে মোটেই সন্তুষ্ট হননি। রাগ-রাগ মুখে উনি বলেছেন, আসলে উনি একটি অচল টাকা। এ সংসার বলেই উনি কোনক্রমে টিকে গেলেন। অন্য সংসার হলে এই অপদার্থ মানুষকে সকলে টান মেরে ডাস্টবিনে ফেলে দিত। শুধু বউরা কেন—আমাদের মা-ও তো বলত, দূর, দূর। ও একটা মানুষ! সারাজীবন হাতের নাড়ি ধরে বসে রইল। কলকাতার বাড়ি থেকে জোর করে দাদা হুগলিতে—আমার বাপের বাড়িতে ওকে নিয়ে এলো। উনি তারপর থেকে একদিনের জন্যেও কলকাতায় ফিরে যেতে পারলেন না। কী সব দিনই না গেছে! একা মুখ্যু মেয়েমানুষ। একদিকে ওনার সেবা করেছি, ছেলেদের মানুষ করেছি, লেখাপড়া জানি না, বাইরে কখনও এর আগে বেরুইনি, তবু যেতে হয়েছে আমাকে, কলকাতার ভাড়াটে বাড়ি থেকে ওইসব দুঁদে লোকেদের কাছ থেকে টেনে হিঁচড়ে ভাড়া আদায় করতে হয়েছে। রামেশ্বরপুরের পৈতৃক সম্পত্তি অন্য ভাসুররা বেচবেন না, কী করি, নিজেই ওখানের একটা লোক ঠিক করে, হুগলীতে বসে বসে ওনার ভাগের সম্পত্তি বেচে দিয়েছি, তেতপ্পর দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে, জলে কাদায় হাতড়ে হাতড়ে বাগুড় কলোনির জমি কিনেছি, সেই জমি আবার পরে মোটা টাকায় বেচে, কলকাতার বাড়ি ভাড়াটে সমেত বিক্রি করে এখানে বাড়ি করেছি, দমদমে বাড়ি করেছি, একা মুখ্যু মেয়েমানুষ—আর উনি কী করেছেন? না—খালি মরে যাব মরে যাব

বুকনি দিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। কাজের মধ্যে আমার মশারি গুঁজে দিয়েছেন, ঘরদোর মাঝেমাঝে ঝাঁট দিয়েছেন, আমার ঘুমের ব্যাঘাত যাতে না হয় তার জন্যে বারান্দায় বালতি বালতি জল ঢেলে লোকজনকে বসতে দেননি, আর মাঝেমাঝে খুব অনুতপ্ত ভঙ্গিতে আমার মাথার শিয়রে এসে বলেছেন, বুড়ু, আমি তো কিছুই করতে পারলাম না। এ আমার ভাগ্য। তুমি আমার থেকে চোদ্দ বছরের ছোট। তবু আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। —ভাবো একবার, মোটে যখন আমার বয়েস পনেরো, যখন জীবনের যৌবনের সব শখ-আহ্লাদ সামনে জ্বলজ্বল করছে, তখনই আমার কপাল পুড়েছে, তখনই কপালে জুটেছে এমন স্বামী—যার সমস্ত জীবনটাই অভিশপ্ত, যিনি আর কিছুই করেন না—শুধু দিবারাত্র হাতের নাড়ি ধরে বসে থাকেন, শুধু মরে যাব, মরে যাব করেন আর কাঁদো কাঁদো মুখে বলেন, আমি পারলাম না, আমি পারলাম না—একালের কোন মেয়ে কল্পনা করতে পারবে—কী স্বামী নিয়ে আমি ঘর করে গেলাম।

'মায়ের জন্যে মদীয় পিতৃদেব যে কিছু করতে পারেননি এটা উনি আমাদের কাছেও মানতেন। উনি কতদিন বলেছেন, আমি না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। তোদের মা না থাকলে তোরা ভেসে যেতিস। বাবার এ স্বীকারোক্তিতে কোন ভেজাল ছিল না। সেইজন্য মা যখন চারিদিক থেকে ঝালাপালা হয়ে বাবাকে যা নয় তাই বলে বিষ ওগরাতো আমরা তখন আমাদের চির-অপরাধী, অক্ষম, অসহায় বাবার পক্ষ নিতুম। এমন একটা দিনও যেতো না যেদিন বাবা-মার ঝগড়া হত না। আর সে কী ঝগড়া! মা যেন বাবাকে কামড়ে ছিঁড়ে খাবে। যেন জন্মজন্মান্তরের শত্রুতা। পাড়াপ্রতিবেশী বলত, এই রে, লেগে গেছে! অথবা ঢাকের কাঠি বেজেছে। অথবা এই শুরু হল—এসব ওরা বেশ শুনিয়ে শুনিয়ে বলত আর আমাদের লজ্জা করত। উঃ, সেসব কী দিনই গেছে। বাবা-মা মুখোমুখি হলেই যেন খুনোখুনি লেগে যেত। বাবা প্রায় সব সময় চুপ করেই থাকতেন। মা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে তবু বলত, চুপ করে থাকবে না তো কী করবে? মুরোদ তো নেই এক কড়ার। সেটা তো জানে ভাল রকম। যদি এক ছটাকও মুরোদ থাকত তাহলে আমাকে জুতোর ঠোক্করের নিচে রাখত। চুপ করে থেকে ভালমানুষ সাজা আর লোককে দেখানো আমি কত ভালো আর ও কত খারাপ। ঝাঁটা মারো ভালো মানুষের মুখে! না হয় একটু মন্দই হতে তুমি। তাতে কি এমন ক্ষতি হতো? পুরুষমানুষ তো এমনই হয়, একটু মদভাং খায়, একটু বার টান থাকেই, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। কিন্তু পুরুষমানুষকে পুরুষমানুষই হতে হয়, ভেড়ুয়া নয়। তুমি আমার কোন্ কাজে লাগলে? না হোমে না যজ্ঞে, ঝাঁটা মারো।'

এইখানে রাজকুমার একটু থামলেন। বোধহয় ভিড়ের ভেতর পরিচিত কাউকে দেখতে পেয়েছেন। হুঁ, ঠিক তাই। ওই তো কে একজন, সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ এইদিকেই আসছেন। 'আরে সাধুদা', রাজকুমার শেকড় থেকে দাঁড়িয়ে উঠে আনন্দপ্রকাশ করলেন। তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'উঃ! কতদিন পর সাধুদা তোমার সঙ্গে দেখা হল। ভাগ্যিস বাবা মারা গেলেন—তাই, তা না হলে'।—

সাধুদা বললেন, 'খবরটা পেয়েই ছুটে আসছি। বাড়িতে বউদির কাছে গিয়েছিলাম। তোর দাদা বলল, তুই এখানে আছিস। চলে এলাম মশাইকে দেখতে। আহা, কী মানুষ ছিল মশাই আর কী কখনও এরকম মানুষ হবে? তারপর একটু থেমে নীচে শেকড়ের ওপর বসে সাধুদা বললেন, 'হ্যাঁরে, রেজো, সেই ফটিকের বাবা বুড়ো দেবেনবাবুকে তোর মনে পড়ে?' রাজকুমার বললেন, 'খুব।' সাধুদা বললেন, 'মশাই ওকে নিয়ে কী রগড়ই না করত! মশাই যখন বলত, ও দেবেনবাবু, একটু নাচুন তো। দেবেনবাবু অমনি স্থান নেই কাল নেই কোমরে কাপড়ের ফেত্তা জড়িয়ে নিয়ে, মাথায় ওরই মধ্যে ঘোমটা দিয়ে কী

কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে তোবড়ানো গাল নিয়ে কীরকম হিজড়ে নাচ নাচতো, তোর মনে পড়ে। মনে পড়ে জগন্নাথ ধাড়াকে, যে সব সময় নতুন নতুন খবর শুনতে চাইতো। ও জগন্নাথদা, আজ আসামে ভূমিকম্প হয়েছে, শুনেছেন? একরম শুনে জগন্নাথদা বলতেন, ওসব তো পুরনো খবর। নতুন কিছু থাকে তো বল। সব সময় নতুন নতুন খবরের সন্ধানে থাকতেন। ঘুম থেকে উঠে বাসিমুখে নতুন খবর চাই, দুপুরে নতুন খবর চাই, রাত্রে শোবার আগে নতুন খবর চাই। ওঁর নতুন খবরে, মশাই একদিন অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেন, ও জগন্নাথবাবু, এতো নতুন খবর লোকে আপনাকে কী করে দেবে বলুন তো। নতুন খবর কী রোজ রোজ গজায়? শুনে জগন্নাথদা রেগে দু'মাস আর আমাদের আড্ডায় আসেননি। তারপর আমাদের কাছেই নতুন এক খবর এলো, হঠাৎ স্ট্রোকে উনি মারা গেছেন। সেই কান-কাটা ডাক্তারকে মনে পড়ে? যে মশাইকে চালের ব্যবসায় নামিয়ে তারপর কাশ ভেঙে, সটকান দিয়েছিলো মশাইকে ফাঁসিয়ে। তার ভাঙা গলার গান। মনে পড়ে, আজি এসেছি, আজি এসেছি নিয়ে এই হাসি রূপ গান, আজি আমার যা কিছু আছে—, উনি গান গাইতেন আর মশাই আর আমি হেসে কুটিপাটি হতাম, কারণ মেয়েছেলের মতো নেচে নেচে উনি ও গানটা গাইতে গাইতে একটু একটু করে মশাই-এর দিকে এগিয়ে আসতেন।'

রাজকুমার একটু একটু করে চানকে উঠছিলেন পুরোনো দিনের কথায়। উনি বললেন, 'আচ্ছা সাধুদা, সে গল্প তোমাকে কি বলেছি কোনদিন! দুপুরে পড়া পারিনি বলে বাবা মেরেছেন। বিকেল পার হয়ে সন্ধে হতেই নীচেকার বাতাবিলেবুর গাছটায় জোনাকিতে জোনাকিতে ভরে গেছে। এমন সময় মশাই ডাকলেন তেতলার ছাদ থেকে, রাজকুমার! আমি পড়ি কী মরি ছুটে গেলাম ছাদে। প্রথমে অন্ধকারে কিছু দেখতে পাইনি। তারপর তারার অস্পষ্ট আলোয় মশাইকে দেখতে পেলাম। মশাই অলৌকিক দেবদূতের মতো দুহাতে দুখানি জাহাজ-ঘুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে, বললেন, উড়ে উড়ে যাচ্ছিল, আমি তোর জন্যে হাত্তা মেরে ধরেছি। কী, খুশি তো! মনে পড়ে সাধুদা?'

সাধুদা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'কোথায় চলে গেল দেবেন বাবু, কোথায় গেল সেই কান-কাটা ডাক্তার, কোথায় চলে গেল জগন্নাথ ধাড়া আর এখন কোথায়ই বা চলে গেল মশাই। আমারও যাবার সময় হল, কী বল, যাই।' বলে চোখ মুছতে মুছতে সাধুদা রাজকুমারের কোন অনুমতি না নিয়েই দ্রুত সামনের সরু খালটা ডিঙিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

সাধুদা চলে যেতে অনেকক্ষণ ধরে যে প্রশ্নটা খচ্‌খচ্ করছিল, আমি এবার সে কথাটা বললাম, 'আপনারা, বিশেষ আপনার এই সাধুদা—কাকে যেন মশাই মশাই করছিলেন? মনে হচ্ছিলো যেন মাস্টারমশাইকেই লক্ষ্য করে বলছিলেন? কেন, মশাই কেন?'

রাজকুমারের মুখ ক্ষণিকের জন্য অন্ধকারে যেন ঢেকে গেল। রাজকুমার গভীর হতাশার সঙ্গে বললেন, 'হাঁ, এ-ও হয় সংসারে, এরকম লজ্জাও আছে। একটু বড় হলে বাবা আমাদের বলতেন, তোরা আমাকে বাবা, বাবা বলে ডাকবি না। আমার ভীষণ লজ্জা করে। তো আমরা তা শুনে খুব অবাক হয়ে বলেছি, সবাই তো তাদের বাবাকে বাবা বলে। বাবা না বলে বুঝি আর কিছু বলা যায়? যায়, বাবা বলতেন, বলবি মশাই। বলবি ও মশাই, এই যে ও মশাই, মশাই শুনুন, যেন আমি অন্যদের বাবা, তোদের নই। ফলে আমরা মশাই বলতে পারতাম না, বাবাও বলতে পারতাম না। এরকম অবস্থায় অনেকদিন গেছে। অনেক পরে বাবা বলেছি।'

'কেন? মাস্টারমশাই এরকম বলতেন কেন'? আমি অবাক হয়ে রাজকুমারের দিকে তাকালাম।

রাজকুমার তেমনই হতাশ গলায় বললেন, 'ঠিক জানি না। অনেক ভেবেছি। কিন্তু বুঝতে পারিনি কেন উনি এরকম করতেন। বোধহয় উনি একটু আলগোছে থাকতে চাইতেন। মনে হয়—মনের গভীর তলদেশে মোহিতমোহনের এ ভাবনা ছিল যে উনি জন্ম দিয়েছেন বটে কিন্তু ওঁকে ঠিক মানাচ্ছে না। আমরা যেন অন্যের ছেলে, ওঁর নই, যদিও ওঁরই, তবু উনি ঐরকম। ওঁর বাবা-সত্তাকে মশাই-এর আড়ালে রাখতে চাইতেন। আসলে এ-ও সেই ব্যর্থতা, অনিবার্যভাবে ফেলিওর একজন হতভাগ্য মানুষ, জন্ম দিয়েও যিনি বাবা নন, মশাই।'

'স্ট্রেঞ্জ। মাস্টারমশাই-এর এ পরিচয় তো জানতাম না। ভেরি স্ট্রেঞ্জ।'

রাজকুমার বললেন, 'শুনবেন? আর একটু শুনুন। শেষদিকে উনি আর টিউশানি পেতেন না। যদিও মগজ ওনার ঠিকই ছিল। কিন্তু লোকে ওই বুড়ো মানুষকে কেন টিউশনি দেবে? উনি এর তার কাছে টিউশনি খুঁজতেন। আমরা সব জানতাম। উনি এখানে ওখানে খেয়ে ফেলেন। একে ওকে খাওয়ান। আমরা সব জানতাম। কেউ ধরলে না বলতে পারতেন না। যদিও সঙ্গতি নেই। ফলে এখানে ওখানে ধার গেঁথে ফেলতেন। হীরার দোকানে ভোরবেলা গিয়ে চা খেলেন, শঙ্করমামার দোকান থেকে একটু পরিমল নস্যি কিনলেন অথবা এক একদিন বালির মোড়ের দোকানে গিয়ে চুপি চুপি খানকতক কচুরি খেয়ে ফেললেন, এমন কিছু নয়, তবু এতেও তো পয়সা লাগে, এখন এ পয়সা কে দেয়। বাবার তো রোজগার আর ছিল না, ওই যে বললাম, টিউশানি পেতেন না। মজার কথাটা কোথায় জানেন? উনি আমাদের কাছে সরাসরি টাকা চাইতে পারতেন না।' রাজকুমার আবার একটু বক্র হাসলেন।

আমি এবারেও অবাক হয়ে বললাম, 'কেন টাকা চাইতে পারতেন না কেন? বাপ হয়ে ছেলেদের কাছে হাত পাতা কি অন্যায়?'

রাজকুমার এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, 'উনি পোস্টবাক্সের ভেতর চিরকুট রেখে দিতেন। কখনও ওনার চিরকুট পাওয়া যেত আমার বই-এর ভাঁজে। কখনও যে ব্যাগটা নিয়ে বাজার যাব তার মধ্যে। অর্থাৎ নিশ্চিত ভাবে যেন চিরকুট পাই। তাতে লেখা থাকত অনেকটা এইরকম, এবার ঝুনু দিল্লি যাবার আগে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গেছে। তা দিয়ে হীরার দোকানের দেনা মিটিয়েছি। নস্যির দরুন তোমার দাদা কুড়ি দিয়েছে। তুমি কিন্তু কোনভাবেই উপুড়-হস্ত হচ্ছ না। অথচ তোমাদের খ্যাটন তো বেশ ভালোই চলছে। রবিবার রবিবার মুরগীর ঠ্যাং ওড়াতে অসুবিধে নেই, কেবল বুড়ো বাপকে দশ টাকা ঠেকাতে মরে যাও। আমি রসগোল্লা, পান্তুয়া খাই না, সে বরাত করে আসিনি। ওরই মধ্যে একটু কচুরি খাই। —এ দেনাটা কে শোধ করবে?

'বেশ মজা পেতাম ওরকম চিরকুট পেয়ে। মনে মনে হাসতাম। যতদিন না সরাসরি বলেন ততদিন যত ইচ্ছে চিরকুট লিখুন; আমি কিছুতেই উপুড়-হস্ত হব না। কিন্তু উনি কোনওদিনই আর সরাসরি টাকা চাইতে পারলেন না। অবশ্য পরে আমি নিজেই ওঁকে না জানিয়ে ওঁর বালিশের তলায় অথবা হ্যাঙারে ঝোলানো পাঞ্জাবির নীচেকার পকেটে কিছু নোট গুঁজে দিতাম। আপনি বলেছেন, বাপ কেন ছেলের কাছে টাকা চাইতে পারবে না? এর উত্তরে বলি মোহিতমোহন তেমন বাপই ছিলেন না। যে কারণে বাবা হয়েও আমাদের শেখাতেন ওঁকে মশাই বলতে ঠিক সেই একই কারণে আমাদের কাছে টাকা চাইতে পারতেন না।'

আমি বললাম, 'অথবা এও তো হতে পারে, এতটাই ছিল ওঁর সৌজন্যবোধ, ভদ্রতাবোধ। এ অসুবিধে অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন মানুষেরই হয়।'

'ভুল।' রাজকুমার বললেন, 'আপনি ভ্রান্ত। উনি ভীতু মানুষ ছিলেন। ছিলেন অত্যন্ত কাপুরুষ। নিজের বাবার সম্বন্ধে এ রকম কথাবার্তা, নিশ্চই সুরুচির পর্যায়ে পড়ে না— বিশেষ করে এখনও যখন দাহকার্য চলছে কিন্তু আজ আমি সত্যবদ্ধ, মোহিতমোহনের সমস্ত জীবন আমি নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরব। এতে কিছু কটু মন্তব্য থাকতেই পারে কিন্তু আমি নাচার নিরঞ্জনবাবু। অস্ত্রোপচার করতে কি আমারও আহ্লাদ হচ্ছে! আসলে এ শ্মশানভূমিতে মিথ্যে কথা বলা যাবে না। শুনুন, একটা কথা জেনে রাখুন, নিজের ন্যায্য দাবি জানাতে গেলেও পৌরুষের দরকার হয়। দুঃখের বিষয়, সে পৌরুষ ওনার ছিল না। তবে টাকা জুটে যাবার পর উনি আন্দাজ করে সংশ্লিষ্ট মানুষটির উদ্দেশ্যে যে চিরকুট পাঠাতেন, তাতে বড় বড় হরফে লেখা থাকত, থ্যাঙ্ক য়ু। অর্থাৎ টাকা দেওয়া হয়েছে বলে প্রাপকের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে। একে আপনি কী বলবেন? ভদ্রতা? ছেলের সঙ্গে বাপের সম্পর্ক তা হলে ভদ্রতার? আপনি কি বলেন? কিসের থ্যাঙ্ক ইউ? এতো ওঁর প্রাপ্যই। আমাদেরই তো চিরকুট পাবার আগেই নিজে থেকে দিয়ে দেওয়া উচিত। আমরা যে তা করিনি সেটা কী শুধু আমাদেরই দোষ? উনি কী এই অবস্থার জন্যে নিজেই দায়ী নন? এ সংসারে থাকতে গেলে কেড়ে নিতে হয়, ছিনিয়ে নিতে হয়, কামড়াকামড়ি করতে হয়, দু আউড়ি মিথ্যে বলতে হয়, দাবড়ে রাখতে হয় সকলকে। এটা যে পারে না সেই শুধু মোহিতমোহনের মতো আপাদমস্তক ভদ্রলোক সেজে থাকেন।'

আমি হেসে বললাম, 'আপনার অ্যানালিসিসে কোনও খুঁত নেই ভাই। কেবল আপনি যে বেশ একটু চটে আছেন, এটা গল্পের ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই উঠে আসছে। এই ঝাঁঝটুকু না থাকলেই ভাল ছিল।'

'আর একটা গল্প বলি শুনুন।' রাজকুমার বলতে থাকলেন, 'আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি মোহিতমোহন প্রায়ই যেতেন। আপনি তো শুনেছেন অথবা দেখেও থাকবেন এই চুরানব্বই বছর বয়সে মোহিতমোহন কী রকম স্বাবলম্বী ছিলেন। নিজের বিছানা নিজেই করতেন। নিজের মশারি নিজেই টাঙাতেন। এমনকি নিজের চান করবার জল ছোট বালতি করে রাস্তার ধারের কল থেকে নিজেই তুলে আনতেন। ওই আত্মীয়ের বাড়িতে ওঁর প্রতিদিন নিয়ম করে হাঁটাচলা ছিল অব্যাহত। এরকম একটি দিনের কথা বলি। এঘটনাটি না বললে মোহিতমোহনের জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই বার সেই আত্মীয়টি, যাকে উনি লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, নিজেই একে ওকে তাকে বলে যার চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর মুখের কথা একটু শুনুন নিরঞ্জনবাবু। উনি সেদিনের একটা ঘটনা উল্লেখ করে বলেছিলেন, আর বলবেন না আপনার বাবার কথা। সে সব কহতব্য নয়। উনি মনে করেছিলেন উনি খুব সেয়ানা। আমি বোকা। প্রায়ই বাড়িতে আপনাদের ওনার কাছে খোঁজ নেন—আমি বাড়ি আছি কি না। সে দিন দেখি সিঁড়ির নিচে আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফ্রিজ থেকে আপেলজুসের বোতলটি বার করে চুমুক দিয়ে ঢালছেন গলায়। বড় সুখের সময় চলছিল। কিন্তু যম যে ওঁর সাক্ষাৎ পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ওঁর দিকে কটকট করে তাকিয়ে—উনি বোতল ঢালবার নেশায় এতোই মশগুল যে সেটা টের পাননি। টের যখন পেলেন, তখন ভয়ে আতঙ্কে হাতের বোতলটি মেঝেতে ফেলে দিলেন। তারপর তাড়াতাড়ি দোষ ঢাকবার জন্যে বললেন, ওই একটু, ইয়ে হয়েছে, মানে জানোই তো বুড়ো বয়েসে একটু লোভ টোভ হয়, যা হোক আমি ওটা কিনে দেবো। —এই শেষের কথায় আমি জ্বলে উঠলাম। বললাম, থাক। মুরোদ জানা আছে। আমি পেছন ফিরলেই আমার কত্তার কাছে গিয়ে বলা হবে, তুমি বোতল একটা দোকান থেকে কিনে এনে আমার হাতে দিও। ও অমনি তাই করবে। কিনে দেওয়াচ্ছি? আমার টাকায় কিনে এনে শেষে নিজের নামে চালানো বার করছি। চোর, চোর সব, চোরের বংশ। ছিঃ। এই বয়েসে এতো লোভ,

ছিঃ। গলায় দড়ি জোটে না? বাবা রাগ-রাগ গলায় বললেন, আর আসছি না তোমার বাড়ি, দেখে নিও। তার উত্তরে আমাদের আত্মীয়াটি বলেছিলেন, তা হলে তো বাঁচি। হাড় জুড়োয় আমার। অন্য বোতলগুলো রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু মোহিতমোহন কী করলেন? উনি কি ওঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন? না, করলেন না। শুধু তাই নয়, সেইদিন বিকেলেই উনি আত্মীয়টির বাড়ি গেলেন। আত্মীয়টির হাতে পাঁচ টাকার একটা মিষ্টির প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা বউমাকে দিস। আমার মরার বয়েস কবে পেরিয়ে গেছে। এখনও কি আমার রাগ করা চলে!'—বলে রাজকুমার আমার দিকে তাকালেন, আমার অনুমোদনের জন্যে ফের আবার বললেন, 'একে কী বলবেন নিরঞ্জনবাবু?' রাজকুমারের নীচেকার ঠোঁট তীব্র শ্লেষে বেঁকে গেল। 'আমি জানি আপনি এর মধ্যেও অসাধারণত্ব খুঁজে পাবেন'—রাজকুমার ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, হুঁ, এই সব ভদ্রতা— এ সব আপনার জামার আস্তিনে ঢুকিয়ে রাখুন। সোজা সাপ্টা বলছি, তা মশাই, শুনতে যতই খারাপ লাগুক, যে কারণে সরাসরি আমাদের কাছে টাকা দাবি করতে পারতেন না, এ সেই একই কারণ, সেই আদি ও অকৃত্রিম—পৌরুষের অভাব, এক চরম অপদার্থতা। উনি তো বলতে পারতেন, আমাকেই বা লোভ করতে হবে কেন? নিজেদের ফ্রিজে থরে থরে লাল,হলুদ, নীল বোতল সাজিয়ে রেখেছ, কোনওদিন তো নিজের হাতে আমাকে দিয়ে বলোনি, আপনি একটু খান। তুমি জানো না তোমার স্বামীর পড়া, চাকরির মূলে এই শর্মা। আচ্ছা, অতো যদি বলতে না পারলেন কিন্তু এটা তো পারতেন—ও রকম অপমানের পর আর ও বাড়ির ত্রিসীমানায় না যাওয়া? এটা তো হাতের মুঠোর ভেতর ছিল? এমন বাপকে বাপ বলতে সত্যিই অসুবিধে হয়, আমাদের মশাই বলাই ভাল ছিল।'—বলে রাজকুমার কিছুক্ষণের জন্যে একেবারে গুম খেয়ে বসলেন।

তারপর বেশ একটু ঝিমোনো সুরে আরম্ভ করলেন, 'ওঁর মৃত্যুও তো ওঁর মত করেই এল। অন্য কী রকম করেই বা আসবে? এমনকী যখন মারা যাচ্ছেন তখন আমরা দোতলায়, নিচেকার অন্ধকূপের মতো ঘরটায় কী হচ্ছে, তখনও জানি না, এমনকী পাশের ঘরে মা যে আছে, তা-ও টের পায়নি, আমি অভ্যেসবশত ঘরে নেমে কী রকম একটা সন্দেহে নাকে হাত দিলাম, দেখলাম নিশ্বাস পড়ছে না, নাড়ি ধরলাম, নাড়িতে স্পন্দন নেই, চোখের দিকে তাকালাম, চোখের দৃষ্টি স্থির। আমি চোখের পাতা দুটি বন্ধ করে দিয়ে সবাইকে খবর দিলাম। একটা অতি তুচ্ছ মানুষ, একটা আজন্ম মরা মানুষ, সারাজীবন যিনি একবারের জন্যেও জাগলেন না, মরে মরেই কাটালেন সুদীর্ঘ জীবন, শেষ বিদায়ের সময়েও কোনও শব্দ না করে চলে গেলেন। লক্ষ করুন, এখন যখন পুড়ছেন, পোড়ার সময় ফটফট করে কত শব্দ হয়, ওনার বেলায় সে শব্দটুকুও হচ্ছে না, স্ট্রেঞ্জ!'— বলতে বলতে রাজকুমারের মুখে বিদ্রূপ আবার ঝলসে উঠল।

আমার কী করে যেন চিঠির কথা মনে পড়ে গেল। বললাম, 'কী একটা চিঠির কথা বলেছিলেন—ঘণ্টা দু-এক আগে যেটা আপনি মাস্টারমশাই-এর বালিশের তলা থেকে উদ্ধার করেন, ওটা নাকি তখন দিলে আমি বুঝতাম না।'

'ও, হাঁ।'—রাজকুমার পকেট হাতড়ে চিঠিটা বার করে আমাকে দিলেন। বললেন, 'পড়ুন।' চিঠিটা পড়লাম, তাতে লেখা—মৃন্ময়ী, ধরণীতে কেন আসিলাম বুঝিলাম না। কেন এত দীর্ঘদিন কাটাইলাম তাহাও জানি না। বোধহয় তোমার সহিত দেখা হইবার কথা ছিল তাই দেখা করিতে আসিয়াছিলাম। দেখা হইল, তোমার সকাশে কয়েকটি দিন একরকম কাটিল, ভালোয় ভালোয় চলিলাম।

চিঠিটা পড়ার পর আমরা দুজনেই অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলাম। জীবনের মানে কী? শুধুই দুঃখ পাওয়া? শুধুই লাথি-চড়-কিল খাওয়া? অথবা নিছক যান্ত্রিক নিয়মে

বংশবৃদ্ধি করা? সুখহীন, আনন্দহীন এ পোড়া সংসারে তা হলে কী শুধুই কাঁদতে আসা? ঠিক এই রকম যখন ভাবছি, তখন আমাদের পাশে গৌরবর্ণ একটি লোক এসে বসলেন। তাকে দেখে রাজকুমার বললেন, 'এই যে ব্রজ। কখন এসেছেন?'

ব্রজ বললেন, 'রাজকুমারদা। একটা কথা আজ বলি। তোমার সঙ্গে দেখাও হয়েছে কয়েকবার। কথাও হয়েছে। কিন্তু যে কথাটা সবচেয়ে বলা দরকার ছিল সে কথাটা এতদিন বলিনি। আজ এখানে শ্মশানে এসে খুব বেশি বেশি করে তা মনে পড়ছে। কেউ ও মানুষটিকে চেনেনি, তুমি যে ওঁর ছেলে, রাজকুমারদা, তুমিও চেনোনি, তোমাদের কোনও আত্মীয়স্বজনও না। এই শ্মশানে সে কথা যদি না বলি তা হলে অপরাধ হবে।' বলে একটু থেমে ছলছল চোখে উনি ফের বললেন, 'মাস পাঁচেক আগেকার একটা ঘটনা। মায়ের তখন একেবারে যায় যায় অবস্থা। ডাঃ চক্রবর্তী জবাব দিয়ে গেছেন। অমি পাগলের মতো ছোটাছুটি করছি। একটু বাইরে গিয়ে কী জন্যে যেন আবার ফিরে এসেছি। ফিরে এসে দেখি, মাস্টারমশাই, কেউ তাঁকে খবর দেয়নি, কী করে যেন খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন। শুধু তাই নয়, যে মাকে উনি তেমন করে চেনেন না, পাড়াপ্রতিবেশী হিসেবে হয়তো কয়েকবার দেখে থাকবেন, সেই আমার মুমূর্ষু মায়ের মুখে চামচে দিয়ে একটু একটু গঙ্গাজল ঢেলে দিচ্ছেন, গীতাপাঠও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, মাস্টারমশাই-এর কাঁপা কাঁপা গলায় সেদিনের পবিত্র কণ্ঠস্বর আজও যেন শুনতে পাচ্ছি, বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়। আমি তো অবাক, আমার বাড়িসুদ্ধু অবাক। এ রকম মানুষও হয়। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, কেউ খবর দিক ছাই না দিক, উনি খবর পেয়েই ছুটে আসেন, মৃতকল্প মানুষটির শিয়রে এসে বসেন, বাড়ির সবাইকে আশ্বাস দেন, গভীর, শান্তস্বরে বলেন, তোমরা শোক কোরো না। শান্ত হও। প্রস্তুত করো নিজেকে। উনি চলে যাচ্ছেন এই নশ্বর লোক থেকে অমৃতলোকে। ঈশ্বর মহিমময়। ঈশ্বরের জয় হোক। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি। মায়ের শিয়রে গীতাপাঠ করে উনি চলে যাচ্ছেন, সোজা বয়েস তো নয়, নব্বুই পেরিয়ে গেছে, রাস্তায় যদি টাল খেয়ে কোথাও পড়ে যান সুতরাং আমি ওঁকে এগিয়ে দিতে গেছি, খানিকটা দিয়েছিও, উনি বলেছেন, অনেকটা তো আগিয়ে দিলে। এবার তুমি যাও। আর আসতে হবে না। তোমার আবার হার্টের রোগ। আমি যদি এখন মরে যাই এমন কী ক্ষতি। আমি বরং তোমাকে এগিয়ে দি। বলে উনি আমাকে জোর করে এগিয়ে দিয়েছেন। ভাবো একবার রাজকুমারদা, আমার হার্টের রোগ, আমার আত্মীয়স্বজনরা ভালো করে জানে না, জানলেও না জানার ভান করে, উনি খবর নিয়েছেন। কে আমি? কী আমার পরিচয়? না হুগলী কোর্টে মুহুরী। আর কিছু নয়। শুধু ওনার পাড়ায় থাকি মাত্র। ভাবা যায়!' আরও দু-পাঁচ মিনিট থেকে ব্রজবাবু চলে গেলেন। আমরা দুজনে একেবারে নিশ্চুপ। সরু নালাটা দিয়ে একটা জলঢোঁড়া চলে গেল জল কেটে কেটে। কয়েকটা কলকে ফুল ঝরে পড়ল মাথার ওপর থেকে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে একমুঠো শুকনো অশ্বত্থ পাতা উড়িয়ে নিয়ে গেল। সম্পূর্ণ অন্য গলায় অন্য মানুষ হয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাষায় রাজকুমার বললেন, 'আজ, এই শেষ মুহূর্তে বড় শান্তি, বড় শান্তি। চোখের ওপর থেকে একটা কালো পর্দা যেন সরে গেল। ভাবতে অবাক লাগে, মোহিতমোহন এই পচা পৃথিবীর সমস্ত মারামারি, কামড়াকামড়ি, নোংরামির মধ্যেও নিজেকে কী করে এতখানি শুদ্ধ, পবিত্র রেখেছিলেন।'

এই প্রথম আমি দেখলাম রাজকুমারের চোখে জল। আমি ওঁর পিঠে হাত রাখলাম। আস্তে আস্তে বললাম, 'শ্মশানভূমিতে সত্যপুরুষ, দিব্যপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। আসুন তাঁকে আমরা প্রণাম করি।'—এই কথা বলে আমরা দুজনে সেই অনাদ্যন্ত শাশ্বত পুরুষের উদ্দেশে ললাটে জোড়হাত রাখলাম।

বৃত্ত

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

সুবোধ ঢোকে না, বাইরে থেকেই বলে, 'সতুবাবু আসছেন। মনে হয় এখানেই।'

শুনলেনই না হয়তো। থুম ধরে বসে আছেন। কদিনেই কেমন যেন বদলে গেলেন। অমন ধন্বন্তরী চিকিৎসক—দশ গাঁয়ের গরিবগুর্বোর একমাত্র ভরসা—তারও চিকিৎসায় ভুল হয় আজকাল। কোন কিছুতে মন নেই। কি যে হলো মানুষটার।

কথাটা বলতে হয় আবার।

তখনই বাইরে থেকে সত্যব্রতর গলা ভেসে এল, 'ডাক্তার আছেন নাকি?'

সুবোধকেই বলতে হয়, 'আছেন। আসুন।'

ভেতরে পা দিয়েই সত্যব্রত অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন, 'আপনাকে হয়তো বিরক্ত করা হলো।'

কেমন যেন কাঠকাঠ গলায় প্রবাল বলে, 'বসুন। সুবোধ, ভেতরে যা। —জানতাম আপনি আসবেন।'

'তাই!' ছোট্ট করে হাসলেন। —'ডাক্তার কি আজকাল অকাল্ট সায়েন্সের—'

কথাটা শেষ করতে পারলেন না। তার ভেতরই প্রবাল গুঁজে দেয়, 'ভয় দেখানোটা বাকি থেকে গেছে না এখনও।'

সত্যব্রতর মুখে রক্ত ছড়াল। দীর্ঘদেহী মানুষটি উঠে দাঁড়ালেন। খুবই বিচলিত দেখাল তাঁকে। কিন্তু নিজেকে ফিরিয়ে আনলেন সহজেই। ষাট বছরেরও বেশি সময় রাজনীতিতে রয়েছেন। প্রবৃত্তির ঝোঁক কাটিয়ে ওঠার শিক্ষা কি আজকের! খুব সহজভাবে বললেন, 'চলুন, বাইরে বসা যাক।'

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এই কোয়ার্টারটি ছোট, কিন্তু তার চারধারে অনেকটা খোলামেলা জায়গা। কম্পাউণ্ড ওয়ালের কোন বালাই নেই। বদলে, বাঁশের চৌখুপি বেড়া। বেড়ার গা বেয়ে উঠেছে লতানে গাছ—অপরাজিতা বোগেনভেলিয়ার ঠাস বুনুনি। বাগানটি ছিমছাম। দিশি মরশুমি ফুলের ঝলমলে বিন্যাস। মন ভরে যায়।

এই মুহূর্তে অবশ্য ফুল দেখার মত মন ছিল না তাদের। বাইরে এসেও নিজেকে কঠিন করে রাখল প্রবাল। সত্যব্রতর অস্তিত্বই যেন উপেক্ষা করতে চাইল। সত্যব্রত বোঝেন, প্রত্যাঘাত করার জন্য যেন মুখিয়ে রয়েছে ছেলেটি। ভালও লাগে। চাপের মুখে বড় সহজেই ভেঙে পড়ে লোকেরা আজকাল। 'শক্ত ধাতের মানুষ' নামের প্রজাতিটি যেন নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট' তত্ত্বটি কেমন যেন অসার মনে হয় ইদানীং। যারা টিকে রইল, টিকে থাকে, তাদের যোগ্যতম বলে ভাবতে ভেতর থেকে কোন সাড়া পান না।

শীতের বিকেল বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। রোদ এখনও আছে, কিন্তু তাত নেই। 'উত্তরায়ণের সূর্য তার স্বধর্ম হারিয়েছে। প্রকৃতির এখন রিক্ত হওয়ার কাল।

কম্পাউণ্ডের ভেতর হঠাৎ একটি ধনেশ পাখি নজরে আসতেই কথা বলার উপলক্ষটি পেয়ে যান, 'আজকাল আমাদের এদিকে ধনেশ পাখি বেশ দেখা যায়। এ-সময়টাই আসে, পদ্মা পেরিয়ে, পাসপোর্ট ছাড়াই।'

প্রবাল সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'পাখিদের ভেতর ভাগ্যিস হিন্দু-মুসলমান নেই।'

খোঁচাটা গায়ে মাখলেন না। প্রসঙ্গ পাল্‌টে জিগ্‌গেশ করলেন, 'সুহৃদ কেমন আছে? সদরে গিয়েছিলেন শুনলাম?'

প্রবাল ঝলসে ওঠে, 'সুহৃদবাবুর যেমন থাকা উচিত হতো বলে সাব্যস্ত করেছেন আপনারা, তিনি তেমনটি নেই।'

কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সুবোধকে দেখে থমকে গেলেন। ট্রে নামিয়ে রেখে সে চলে যায়। সত্যব্রতর সামনে বিস্কুটের প্লেট, চায়ের কাপ ধরে দিয়ে প্রবাল, এই প্রথম, সহজভাবে বলল, 'নিন—'

চায়ের চাপ তুলে নিয়ে সত্যব্রত জিগ্‌গেশ করেন, 'আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?'

'মনে তো হয় ভালই আছেন। তবে—মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত। ওর বিশ্বাস, বা সংস্কার, যাই বলুন না কেন, প্রশাসনের কথা মত কাজ করলে, তার পাপে, ওর গর্ভে যে এসেছে, তার ক্ষতি হতে বাধ্য।'

কথাটির গুরুত্ব বুঝতে পারেন সত্যব্রত। এই প্রথম মা হতে যাচ্ছেন যিনি, সন্তানের অমঙ্গলের আশঙ্কায় তিনি তো বিচলিত হবেনই। শুধু প্ল্যাসেন্টা নয়, আরও কত রকমের সুরক্ষার প্রাচীর তুলেই না প্রাণের বীজটিকে নিরাপদে রাখতে চান মা। ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত প্রাণের আভ্যন্তর লালনের দায় এবং গৌরব তো তারই। সন্তানের প্রতি তার এই উৎকণ্ঠাকে সংস্কার বলে তিনি উড়িয়ে দেন কি করে!

কেবল ডাক্তারের কথাই ভেবেছেন। তার স্ত্রীর কথা ভাবা হয়নি। সত্যব্রতর শরীর-মনে অস্বস্তির ঢল নামে।

খানিকবাদে গেটের মুখ থেকে কেউ বলে, 'ডাক্তারবাবু আচেন নাকি?'

'কে?—আসুন।'

কাঠিকাঠি চেহারার লোকটি এগিয়ে আসতেই সত্যব্রতকে দেখতে পায়। তড়িঘড়ি বলে ওঠে, 'অ, সতুবাবুও রয়েচেন। আদাব, আদাব। দেকতি পাইনি।'

'জামিল না?'

'হ, বাবু।'

'এখানে কি মনে করে?'

'শরীলডা ভাল যাচ্ছে না। তাই—' বাকি কথাগুলো বলে না।

'হাসপাতালে এলে হতো না?'—প্রবাল বলে।

'প্যাটের ধান্দায় দশ গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই। সুমায় পাব কনে?'

প্রবাল আর কথা বাড়ায় না। গলা তুলে সুবোধকে ডাকে, 'স্টেথোটা দিয়ে যা তো।'

সত্যব্রত বলেন, 'তোমার তো পেটের ধান্ধায় দশ গাঁয়ে ঘুরে বেড়াবার কথা নয়, জামিল। দু-দুটি জোয়ান ছেলে রয়েছে তোমার।'

'হ, বাবু, তা রয়েচে। তবে—আমারই ছাওয়াল তো তারা।'—বলতেই মুখখানা নুয়ে পড়ে।

প্রবালের ডাকে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'কষ্টটা কি?'

'প্যাটের মদ্দি বড় দুক্‌খু, ডাক্তারবাবু। মরিচ বাটার মত জ্বলে।'

'জিভ দেখি—জিভের তলায় জল কাটে?'

জামিল মাথা নাড়ে।

চোখের পাতা টেনে ধরেই ছেড়ে দেয়। কোলের দিকটা বড্ড ফ্যাকাশে। হবারই কথা, মনে মনে বলে। পেটে হাত রাখে। অল্প চাপেই আর্তনাদ করে পিছিয়ে যায় জামিল।

মুখখানা থমথমে হয়ে ওঠে প্রবালের। মাথা নিচু করে বসে থাকে। এইসব রোগীর সামনে বড় অসহায় মনে হয় নিজেকে।—কাকে বলবে যে যে-ভাইরাসের তারা শিকার, ডাক্তারিশাস্ত্রে তার কোন চিকিৎসা নেই।

'ডাক্তারবাবু, কথা বলচেন না ক্যান। রোগ সারবে না?' —কথাগুলো যেন বুক চিরে বেরিয়ে এল।

জামিলের দিকে তাকায়। মুখ ভর্তি রেখা আর রেখা। প্রতিটি রেখারই হয়তো আলাদা আলাদা ইতিহাস রয়েছে। অথবা সে ইতিহাস হয়তো একই। দুঃখ বঞ্চনা গ্লানি অসম্মান দারিদ্র্যের একই কাহিনীই হয়তো ধরা রয়েছে এইসব রেখায়।

বুঝতে পারে, লোকটি কিছু শুনতে চায় তার কাছে। হাসতে হয়। ইনটার্ন থাকার সময় বারবার এ উপদেশ শুনতে হয়েছে যে ডাক্তারের প্রসন্ন মুখ রোগীকে আশ্বস্ত করে। রোগীর অবস্থা যখন এখন-তখন, তখনও ডাক্তারের বিচলিত হওয়া নেই। প্রতিটি চিকিৎসককেই এই অভিনয় করে যেতে হয়।

প্রসন্ন হেসে বলে, 'ঘাবড়ে যাওয়ার মত কিছু নয়। নিয়ম করে যা হোক কিছু খাবেন। সেরে উঠবেন।'

পাঁজরার ভেতর থেকে কি রকম একটা আওয়াজ বেরয়। তার চাপেই যেন রেখাগুলো ফেটে যায়, 'খেতে বলচেন। পাব কনে!'

প্রবাল সত্যব্রতর দিকে তাকায়। সত্যব্রত চোখ নামিয়ে নেন।

'থাকেন কোথায়?' —ইচ্ছে করেই বুঝি ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যেতে চাইল।

'শালতলি।'

'শালতলি, মানে—যেখানে আনোয়ার আলি আর সুহৃদবাবুর ওপর'—

জামিল মাথা নাড়ে।

'সেদিনের মিটিং-এ ছিলেন?'

জামিলের যেন অস্বস্তি হয়। সত্যব্রতর দিকে একনজর তাকিয়ে বলে, 'আসলে এসব মিটিনে আমার মত লোক ডাক পায় না। চাষের এক ছটাক জমিনও নেই যার, ডীপের মিটিনে তার কি ঠ্যাহা, কন?'—থেমে যায়। মনে মনে যেন গুছিয়ে নিতে থাকে। তারপর কারো দিকে না চেয়ে বলে যায়, 'তবে, গিয়েচিলাম। ওই আনোয়ার আলি আর সুরিদবাবু এক রহম জোর করেই নিয়ে গেল। গিয়ে দ্যাহা গেল, সবাই তেতে রয়েচে। সকলেই নিজের গাঁয়ে ডীপ বসাতি চায়। মেলাই কতা কাটাকাটি, চিৎকার চেঁচামেচি হলো। তহন, সুরিদবাবু বললেন, ডীপ বসা উচিত দশ গাঁয়ের মাঝামাঝি জায়গায়—শালতলি। কতাডা ঝ্যান মনে ধরল সকলের। তো তাই ঠিক হলো। মিটিন শ্যাষ হলো। যে যার বাড়িমুহো হাঁটা দিল। হটাস, আন্ধারে কারা ঝ্যান ঝাঁপায়ে পড়ল আনোয়ার আলি, সুরিদবাবুর ওপর। তারপর তো'—ঘনঘন দম নিতে থাকে, যেন হাঁপিয়ে পড়েছে। হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে ওঠে, 'অমন মানষের মতো দুটো মানুষ—আপদেবিপদে কার পাশে না দাঁড়িয়েচে কন? তাদের গায়ে হাত তোলা! হাতগুলান পচে যাবে রে, শালোরা। কুষ্ট হবে। গরিব-গুর্বোদের দ্যাহার আর কেউ

রইল না। —আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সুরিদবাবু এহন কেমন আচেন? লোকজন বলচে, সে-ও নাহি বাঁচবে না?'

প্রবালের কাশি পায়। সত্যব্রতর চোখে বুঝি সায়াহ্নের অন্ধকারই তিরতির করে কাঁপতে থাকে। মুহূর্তগুলো ভারি হয়ে ওঠে।

তিনিই বলেন, 'সদরের হাসপাতালে চেষ্টার কোন ত্রুটি হচ্ছে না। তবে বাঁচা-মরার কথা কি কিছু বলা যায়, বল?'

'হ-অ। —জামিল মাথা নাড়ে। —'একখান কতা কই। দুষ পাবেনা না, ডাক্তারবাবু। সুরিদবাবুরে আপনের কাচে নিয়ে আসেন, এই হাসপাতালে। আপনে তারে ঠিক সারায়ে তুলতে পারবেন। আনোয়ার আলিও বাঁচত, এহানে থাকলে।'

বুকের ভেতরটা চিন্‌চিন্‌ করে ওঠে প্রবালের।

জামিল একসময় বুঝতে পারে, তার কথাটা কানেই নিল না কেউ। এ-রকমটাই যেন হবার কথা। আজ পর্যন্ত তার কথা মানে নি কেউ। মানুষ হিসাবে এত নগণ্য সে, এত ধারাবাহিক তার অসাফল্যের ইতিহাস যে তাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনা কেউ। সব অর্থেই সে প্রান্তিক মানুষ। এক সময় কষ্ট হতো, এখন আর তা-ও হয় না।

'চলি। বেজায় বেশকম কিচু কয়ে থাকলে মাপ করে দিয়েন।'

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পায় প্রবাল। বড় শূন্য হাতে ফিরে যাচ্ছে মানুষটা। বোঝে, কথাগুলো বলার কোন মানে হয় না, তবু বলবনা বলবনা করেও বলেই ফেলে, 'খালি পেটে থাকবেন না।'

জামিল হাসে, মুখখানা বড় করুণ দেখায়, 'ইচ্ছে করে কে আর না খেয়ে থাকে, ডাক্তারবাবু।'

'তবু চেষ্টা করবেন।'

'চুরি-ডাকাতি ছাড়া কোন চেষ্টারই কসুর করি নাই।'

'তাই করবেন এবার।'

'চুরি-ডাকাতি!' —জামিল স্তম্ভিত হয়ে যায়।

'নয় কেন! থাকলেন তো ভাল মানুষ হয়ে। কি পেলেন! কিছুদিন খারাপ হয়েই দেখুন না।'

সত্যব্রতর ওপর নজর পড়তেই জামিল ঘাবড়ে যায়। লোকটার কথায় থানা পুলিশ ওঠে বসে। তার সামনেই কিনা—কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে থাকে।

জামিল গেটের বাইরে চলে যেতেই সত্যব্রত বলেন—বিরক্তি চাপার কোন চেষ্টাই করেন না, 'এসব কি করছেন! এ তো রীতিমতো অ্যানার্কি! ও কিছু একটা করে বসলে, বাঁচাতে পারবেন?'

'আমি না পারলেও আপনি তো পারবেন।'

'চোর-ডাকাতদের বাঁচানো আমার কাজ নয়।'

'তাই নাকি!' —বিদ্রূপে ঝলসে ওঠে।

'মানে!' —উত্তেজিত দেখায় তাকে। উঠে দাঁড়ান।

'ওই যে লোকটা চলে গেল, কি রোগ ওর জানেন? ক্ষুধা। বহু বছরের বাসি ক্ষুধা নিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আইনের প্রতি অনুগত, পাপ এবং দোজখের ভয়ে ক্লিষ্ট ওই মানুষটা। কখনও কোন অন্যায় করে নি। এই সৎ লোকটাকে বাঁচান। চোর-ডাকাত বাঁচাতে বলছি না।'

'এ-দেশে কত লোক দারিদ্র্যরেখার তলায় রয়েছে জানেন?'

'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট পরিসংখ্যানে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি জামিলের কথা বলছি। আমার পেশেন্ট।'

সত্যব্রত কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তখনই হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে যান্ত্রিক আওয়াজ আর পোড়া পেট্রলের ঝাঁজ ছড়িয়ে সাঁ-সাঁ করে ঢুকে পড়ল একটি জিপ।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ডি-এমের মুখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল, 'বাহ্, একেবারে দার্জিলিং ফ্লেবার। ডিস্ট্রিক হেড-কোয়ার্টারেও এ জিনিস পাই না আমরা। কোত্থেকে পান, সার?'

প্রবাল হাসে। জেলার প্রশাসনিক প্রধানকেও অভিনয় জানতে হয়।

'নাকি, ম্যাডামের হাতের গুণ!'

লোপা মুচকি হাসে।

'ওঁর রান্নারও খুব হাতযশ।' —এই জরুরি খবরটা দিয়ে সত্যব্রত যেন হাল্কা হলেন।

'রিয়েলি!' —ডি-এম যেন এই প্রথম শুনলেন বাঙালি গৃহিণীদের রান্নাও আসে। কাজেই উচ্ছ্বাসটুকু ধরে রাখতেই হলো। —'সুট করে চলে আসব একদিন। খাঁটি বাঙালি রেসিপি চাই কিন্তু। ছেঁচকি শুকতুনি নালতে শাক—নালতে শাক বোঝেন তো, ম্যাডাম? ওহ্হো, ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনারা তো আমাদের প্রতিবেশী হতে যাচ্ছেন। যখন খুশি পাত পেড়ে বসে গেলেই হলো—'

'আপনাদের প্রতিবেশী হতে যাচ্ছেন কি রকম!' —ইঙ্গিতটা ধরতে পারলেও সত্যব্রত অবাকই হলেন।

'বাহ্, সারা জীবন ডা. মিত্র এখানেই পড়ে থাকবেন নাকি! কম দিন তো হলো না। এবার ওকে ছেড়ে দিন।'

'আমরা কার ভরসায় থাকব?'

খুনসুটি। আটাত্তর পেরনো নেতা আর পঞ্চাশে পা-রাখা প্রশাসকের। একজন কিছুতেই ছাড়বেন না, অন্যজন জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাবেনই। প্রবাল বোঝে, সরাসরি প্রস্তাবটা এলে ঘুষের মত দেখাত। টোপ যে, বুঝতেই দেয়া হচ্ছে না। খেলাটা চলতেই থাকে।

চোখ তুলতেই দেখে, লোপা তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে, একদৃষ্টে। মুখখানা ফ্যাকাশে, নাকের দুপাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আঁচলের একটা কোণ বাঁ হাতের তর্জনীতে ক্রমাগত জড়াচ্ছে আর খুলছে। কোন কথায় ভেতর থেকে সাড়া না পেলে আঁচল নিয়ে এই খেলাটা, হয়তো অজান্তেই, চলে আসে ওর। চোখের ইশারায় লোপাকে আশ্বস্ত করতে চায়।

ততক্ষণে ডি-এম উঠে দাঁড়িয়েছেন। কণ্ঠে রীতিমত উদ্বেগ তার, 'না না, সার, ও-সব কোন ব্যবস্থাই নয়। গড ফরবিড, কোন কমপ্লিকেশন দেখা দিলে, কিস্যু করার থাকবে না। আমাদের ওখানে ওয়েল-ইকুইপড্ সব নার্সিং হোম রয়েছে। মিসেস মিত্রকে নিয়ে গ্যাম্বলিং করতে যাব কেন আমরা!'

সত্যব্রত হার মানলেন, 'যা ভাল বোঝেন!'

ডি-এম লোপার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কোন চিন্তা করবেন না। সব ঠিকমত হয়ে যাবে। আমরা তো আছি।' —একটু থেমে লোপার প্রতিক্রিয়া হয়তো বুঝতে চাইলেন। পরক্ষণেই অনেকখানি হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'আমরা এখন একটু বাইরে বসব, আপনার বাগানে, খোলামেলায়। কিছু মনে করবেন না।'

বেরিয়ে যাওয়ার আগে প্রবাল ফিশ্‌ফিশ্‌ করে বলে যায়, 'ভাবছ কেন? সব মাছই কি টোপ গেলে।'

ডি-এম ডালিয়ার বেডের সামনে দাঁড়ালেন। নুয়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে সামনের ফুলটিকে যেন আদর করলেন। প্রকৃতই একজন পুষ্পপ্রেমিক বলে মনে হচ্ছিল তাকে।

প্রবাল মানতে বাধ্য হয় যে, একজন মানুষের ভেতর যে কতরকম মানুষ লুকিয়ে থাকে, বাইরে থেকে তা বোঝবার জো নেই। ফুলের সামনে, প্রকৃতির এই অকৃপণ দাক্ষিণ্যে লোকটির মুগ্ধতা তার ভাল লাগে।

প্রায় তখনই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। প্রবালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গিয়েছিলাম শালতলি। প্লেস অব অকারেন্‌সটা স্বচক্ষে দেখে এলাম। ওপর থেকে বেজায় চাপ আসছে। অযোধ্যার ঘটনাতেও আমাদের জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। আর—বুঝুন, একটা ডীপ টিউবওয়েল কোথায় বসবে, তা নিয়ে দু-দুটো মানুষ খুন হয়ে গেল। এরপর ও-এলাকায় উন্নয়নের কোন কাজ আর হবে! বোঝাবেন কাকে? টেনস্‌ড হয়ে রয়েছে পুরো এলাকা। না পঞ্চায়েত, না পোলিটিক্যাল লীডারশিপ, কিস্যু নেই। পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। কিন্তু একা পুলিশ কখনও দাঙ্গা ঠেকাতে পারে—আমরা সবাই মিলে যদি সহযোগিতা না করি? বলুন?'

প্রশ্নটির উত্তর না দিয়ে ভিন্ন কথা বলে প্রবাল, 'দু-দুটো মানুষ খুন হওয়ার কথা বলছিলেন। সুহৃদবাবু কি মারা গেছেন?'

ডি-এম ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'যাওয়া উচিত। এলাকার মঙ্গলের জন্য মরে যাওয়া উচিত ছিল তার। এ-লোক নাকি রাজনীতি করত আবার। তার কমরেড ইন-আর্মস খুন হলো, সে লোকটা বেঁচে আছে কোন লজ্জায়?' সত্যব্রতর ওপর চোখ পড়তেই যেন কুণ্ঠিত হলেন, 'কথাগুলো হয়তো আপনার ভাল লাগল না। কিন্তু এটা তো মানবেন, ভদ্রলোক বেঁচে গেলে যে কোন সময় কমিউনাল ফ্লেয়ার আপ হতে পারে। সেটা নিশ্চয়ই আমরা কেউ চাইব না।'

প্রবাল যেন সত্যব্রতকে আলোচনার বাইরে রাখতে চায়। বলে ওঠে, 'কিন্তু সুহৃদবাবুর ইনজুরি এমন কিছু ফেটাল নয় যে তিনি মারা যেতে পারেন।'

'আপনার ওই মেডিকেল রিপোর্টটাই তো কাল হয়েছে।' —ডি-এম ধমকে ওঠেন। —'না হলে, সদর হাসপাতালে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা যেত এত দিনে। ওখানকার ডাক্তাররা খুবই কো-অপারেটিভ। আপনি মেডিকেল রিপোর্টটা পালটে দিন। বাকি কাজটা ওরা করবেন। ডাক্তারি বিদ্যে দিয়ে সব সব কিছু বোঝার চেষ্টা করবেন না।'

প্রবালের মুখ থমথমে হয়ে ওঠে। ভেতরকার উত্তেজনা শুধু মুখে নয়, গলায়ও ধরা পড়ে, 'ডাক্তারের কাজ মানুষ বাঁচানো, মারা নয়।'

'ও-সব এথিক্‌সের কথা রাখুন তো। দেশটা এথিক্‌সে চলছে! ছেড়ে দিন এ-সব বুকিশ কথা। দাঙ্গা দেখেছেন কখনও? কত মানুষ মারা যেতে পারে একটা দাঙ্গায়, অনুমান করতে পারেন? একজন মানুষের মৃত্যুতে যদি অনেক মানুষ বেঁচে যায়, এলাকার শান্তি সম্প্রীতি রক্ষিত হয়—কোনটা চাইবেন আপনি? ডা. মিত্র, হিপোক্রিটাস এ-রকম কোন সঙ্কটের কথা অনুমানও করতে পারেন নি। যাকগে। আমি এখন যাব। কাল ডি-এম-ও আসবেন আপনার মেডিকেল রিপোর্ট আর ট্রান্‌সফার অর্ডার নিয়ে। পুরনো রিপোর্টটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে একটা রিপোর্ট লিখে দেবেন। কি লিখতে হবে তার ড্রাফ্‌টও তিনিই করে আনবেন। আর, ব্যাক ডেটে ট্রান্‌সফারের একটা দরখাস্ত লিখে দেবেন। মিটে গেল। ও-কে? পুরোটাই নিজের হাতে রাখবেন না। মিসেসের সঙ্গে কথা বলুন। মেয়েরা অনেক প্র্যাকটিকাল হন। সত্যব্রতবাবুও আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। চলি।'

পেছন ফিরে আর দেখলেনও না। সোজা জিপে উঠে পড়লেন। স্টার্ট নেওয়ার মুখে হাতের ইশারায় ডাকলেন। কাছে এলে গম্ভীর মুখে বললেন, 'এখানে দাঙ্গা হলে তার জন্যে দায়ী হবেন আপনি। কথাটা মনে রাখবেন।'

প্রবাল যেন পাথর হয়ে যায়।

সময় জমে জমে পাথর হতে থাকে। সেই কখন যেন প্রশ্নটা করেছিল প্রবাল, 'সুহৃদবাবু তো শুনি আপনার হাতে তৈরি। আপনি চান, আমাদের হাতে তিনি খুন হোন?'

হাসপাতালের সামনেই রাস্তা। কিছুদিন আগে ইট বিছানো হয়েছে। এখন লাল ধুলো ওড়ে। ধুলোর একটি মিহিন চাদর পড়ন্ত বেলায় রাস্তায় চারপাশের শূন্যতায় ভেসে বেড়ায়। রাস্তার ওপাশ থেকে দিগন্তরেখা পর্যন্ত অবারিত মাঠপ্রান্তর। যখন শস্যে পূর্ণ, কত বিভঙ্গ তার, সবুজ হলুদের কত রকমফের। এখন খাঁ-খাঁ, নিঝুম। প্রান্তরেখা ঝাপসা হয়ে আসছে। সন্ধ্যা নামছে সেখানে। সামনের খেত জুড়ে গোধূলির বিষণ্ণতা। দূর থেকে মাইকে ভেসে আসে আজানের বিলম্বিত সুর। খানিকবাদেই ক্যাসেটে ধ্বনিত হবে ঈশ্বরের মহিমা।

সুহৃদ আনোয়ারের কথা মনে পড়ে। প্রায় তারই বয়েসী। হঠাৎ হঠাৎ চলে আসত লোপার গান শুনতে। গণসঙ্গীতের একটা ক্যাসেট উপহার দিয়েছিল। ওদের আশা ছিল সে-সব গান লোপা তুলে নেবে। ওদের গণসঙ্গীতের স্কোয়াড পরিচালনা করার মত সে-রকম কেউ ছিল না। লোপাই সে অভাব পূর্ণ করবে একদিন, ধরেই নিয়েছিল। লোপা হাসত।

খুব প্রাণবন্ত ছিল। সব সময় যেন ফুটছে। এ-রকম নিঃস্বার্থ কাজ-পাগল মানুষ দেখাই যায় না আজকাল। কাছের মানুষ ছিল সবার। দুটি নাম একসঙ্গেই উচ্চারিত হতো। সেই লোক দুটিকে—কারা, তারা কারা? কেন তারা সরিয়ে দিতে চেয়েছিল ওদের? এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে ধরতে পারে নি। কেন? প্রশাসনের এই গয়ংগচ্ছ ভাব লাগামহীন গুজবের জন্ম দিচ্ছে শুধু—

'ডাক্তার'—

সত্যব্রতর ডাক কানে যেতেই প্রবাল নিজেকে গুটিয়ে আনে। মানুষটির দিকে তাকায়।

সত্যব্রত রায়—জেলার কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতি। কৈশোরে স্কুলে পড়ার সময় যুগান্তর দলের সান্নিধ্যে আসেন। জেলা জজ ক্যাম্পবেল হত্যা মামলায় প্রথম সাজা—রাজশাহী জেলে পাঁচ বছর। সেই শুরু, ১৯৩২। ষোল বছরের কিশোর তখন। জেল থেকে বেরিয়ে এলেন কমিউনিস্ট হয়ে। শেষবার জেলে যেতে হলো ১৯৬৩। ছেষট্টি-তে বেরিয়ে এলেন। তখন তিনি পঞ্চাশ। সাঁইত্রিশ থেকে পার্টির কাজে। তখন 'প্রফেশনাল রেভলুশনারি' বলা হতো। কথাটার আর চল নেই আজকাল। এখন হোলটাইমার। মাঝে, পঞ্চাশে, অতি-বামপন্থী ঝোঁকের অভিযোগে, দল থেকে বহিষ্কৃত হন।

জেলা জুড়ে কত কিংবদন্তী মানুষটিকে নিয়ে। দল নির্বিশেষে তাকে শ্রদ্ধা এবং সমীহ করে সবাই। এম-এল-এ হতে পারতেন, মন্ত্রী হতে পারতেন, জেলা কমিটির সম্পাদক হতে পারতেন। হলেন না। শুভানুধ্যায়ীদের পীড়াপীড়িতে সঙ্কুচিত হন। বলেন, 'আরে আমি হোলাম চাষাভুষো মানুষ। আমাকে কি ও-সব মানায়!' চাষাভুষোদের সঙ্গেই থেকে গেলেন।

অন্ধকারে মুখখানা আবছা আবছা দেখা যায়। চেয়ে আছেন সামনের দিকে। সেখানে গাঢ় অন্ধকার। দূরে তারার মত দু একটি জোনাকি ফুটছে সবে।

'ঠিকই শুনেছেন, আনোয়ার সুহৃদ আমার হাতেই তৈরি। সাবেক কমিউনিস্ট তো আমি। সেই ছাঁচেই তৈরি ওরা। বড় নিশ্চিন্তে ছিলাম।' —বলতে বলতে থেমে গেলেন।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। প্রবালের মনে হলো, বড় দুর্বল জায়গায় আঘাত দিয়ে ফেলেছে সে। খুবই বিচলিত যেন তিনি। পুত্রশোকের বেদনায় মুহ্যমান মানুষটিকে দেখে কষ্ট হয় তার। কথাটা বলা তার ঠিক হয় নি, বোঝে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'মনটা বড্ড এলোমেলো হয়ে আছে। আঘাতটা যে আপনারই সব থেকে বেশি করে লাগার কথা—'

হাত তুলে থামিয়ে দিলেন। খানিকবাদে ঘনিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, 'ব্রিটিশ পিরিয়ডের শেষ দিকে, খোঁজ নিয়ে দেখবেন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় কমিউনিস্টদের হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াত গবমেন্ট। তারাও জানত, কমিউনিস্টরাই দাঙ্গা ঠেকাতে পারে। কারণ, দু-সম্প্রদায়েরই আস্থাভাজন ছিল তারা। আর আজ—' বোধহয় হাসলেন, তারপর নিজেকেই যেন ধিক্কার দিলেন, 'এ-গ্লানির কথা কাকে বলব! কিছু সমাজবিরোধীর হাতে আনোয়ার মারা গেল। মৃত্যুর পর ওর মুসলিম পরিচয়টাই একমাত্র পরিচয় হয়ে উঠল। ওর কমিউনিস্ট পরিচয়টা মনেই রইল না কারো। আমরাও বোধহয়—' মাথা নুয়ে পড়ল, লজ্জায় গ্লানিতে। মাথা না তুলেই বললেন, 'বসুন বউমা। আমি বরং উঠি।'

'কেন! আমি অসুবিধে করলাম? আমি ওদিকটায় বসছি। আপনারা কথা বলুন।' —লোপার গলায় অভিমান চাপা রইল না। হাত বাড়িয়ে একটি মোড়া তুলে নেয়।

'বউমা, বসুন।'

লোপা বসে। তিনটি ছায়ামূর্তি নির্বাক হয়ে বসে থাকে। অন্ধকার সরিয়ে নক্ষত্রেরা উঁকি দিতে থাকে দু-এক করে।

লোপাই শেষ পর্যন্ত কথা বলে। বুকের গভীরে যে প্রশ্নটি আটকে ছিল, বুক খুঁড়ে যেন তা বেরিয়ে এল, 'সুহৃদবাবুকে মরতে হবে কেন? তিনি তো কোন দোষ করেন নি।'

নৈঃশব্দ্যই ভাল ছিল, সত্যব্রতর মনে হয়। তবু উত্তর দিতে হয়, 'সুহৃদকে যদি মরতে হয়ই তো জানবেন, আমাদের অযোগ্যতাই তার কারণ। মসজিদে মসজিদে মিটিং করে বলা হচ্ছে—প্রতিপক্ষের উশকানি তো রয়েছেই—দুটি মানুষ আক্রান্ত হল, বেছে বেছে মারা গেল আমাদের ছেলেটিই। বলছে, আগে থেকেই সব ঠিক করা ছিল হিন্দুদের। মুসলমান আনোয়ার তাই বাঁচে না। আর হিন্দু সুহৃদ' —গলাটা কেঁপে ওঠে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপার ব্যর্থ চেষ্টা করে কোন রকমে বলেন, 'এই প্রচার রুখতে পারি নি আমরা। আমাদের এই অযোগ্যতার মূল্য কাউকে তো দিতেই হবে।'

সব কথা বুঝি শেষ হয়ে গেল। এখন বুঝি শুধু শোক আর নীরব ক্ষরণ।

আকাশ জুড়ে তারায় তারায় ইশারা। প্রবাল ভাবে, ওইসব সংকেতের অর্থ যদি জানা থাকত তার! ওই নক্ষত্রপুঞ্জ, ওই ছায়াপথ কত সভ্যতার উত্থান-পতনের মৌন সাক্ষী। ওই জ্যোতির্লোক থেকে তারা যেন নিয়ত বার্তা পাঠায় আমাদের, 'সাহসী হও, সতর্ক হও, আমাদের মত তোমরাও জ্যোতির্ময় হতে পার।'

আভ্যন্তর এক আবেগে সত্যব্রতর হাত চেপে ধরে সে, 'ডাক্তার হিসেবে এ-অঞ্চলে আমারও কিছু প্রভাব আছে, সত্যব্রতবাবু। আসুন না, আমরা দুজনে মিলে গ্রামে গ্রামে সত্য কথাটা বলি। এ ব্যাপারে যদিও আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, তবু আমার বিশ্বাস, প্রচারটা রোখা যাবে। মানুষের উদ্ধার শেষ পর্যন্ত তো মানুষেরই হাতে।'

সত্যব্রত হকচকিয়ে যান। এ-রকম একটা প্রস্তাবের জন্য তিনি আদৌ তৈরি ছিলেন না। প্রবালের হাতখানা মুঠোর ভেতর টেনে নেন। হাতখানা কাঁপছে। বুঝতে পারেন, ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে রয়েছে ডাক্তার।

দুচোখে উদ্বেগ নিয়ে স্বামীর দিকে তাকায় লোপা। দুম করে কথাটা না বললেই চলছিল না। ডাক্তার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াবে! সতুবাবু সঙ্গে থাকলে ভয়ের কিছু নেই ঠিকই, তবু—

সত্যব্রত উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'কথা বলে দেখি'—তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যান।

লোপা চেঁচিয়ে বলে, 'রাতে একা একা চলাফেরা করা কিন্তু উচিত নয় আপনার।'

থামেন। মুখ ফিরিয়ে কিছু বলতে গিয়েই বোঝেন, গলার ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। গেটের গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন। এক সময় কোন রকমে বলেন, 'একাই তো হয়ে গেলাম।'

গেট বন্ধ করার শব্দ হয়।

প্রবাল ভাবে, এই ভাল, অন্ধকারে ডুবে থাকা। আলোর কাছে কোন ফাঁকি চলে না। নানা প্রশ্নের সামনে সে দাঁড় করিয়ে দেয়। তখন শুধু দীর্ণ হওয়া। সে-সময় তো রইলই। চিকিৎসক প্রবাল আর সামাজিক প্রবালের ভেতর সেই রক্তাক্ত দ্বৈরথের জন্য সময় তো রইলই। এখন চুপচাপ বসে থাকা শুধু।

লোপা বোঝে, প্রবাল এখন একা থাকতে চায়। কোন জটিল রোগের চিকিৎসার বেলায় যখন সে নিশ্চিত হতে পারে না, তখন এমনি করেই নিজেকে গুটিয়ে নেয়। লোপা জানে, ভেতরে ভেতরে সৃষ্টিরই এক প্রক্রিয়া চলে তখন। সে উদ্‌ভাসের মুহূর্তটির জন্য একাকী হতে হয় মানুষকে।

লোপা উঠব-উঠব করছে, তখনই প্রবাল বলে, 'একটা গান গাইবে?'

তখনই পারে না। গুছিয়ে নিতে সময় লাগে। যতই না কেন প্রবাল বলুক, 'তুমি কোন চাপ নেবে না', চাপ এসেই যায়।

একটু কেশে নেয়। এক সময় উঠে আসে সুর আর বাণী, 'বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি—'

প্রবালের চোখে হঠাৎ ধরা পড়ে, তার চারপাশে বস্তু বলে কিছু নেই। বস্তুর কঙ্কাল সব। লোপাকেও এক রেখায়িত-দ্বিমাত্রিক মূর্তি বলে মনে হয়। এ যেন তার পরিচিত কোন জনপদ নয়, প্রাচীন এক সভ্যতার ধ্বংস অবশেষ, সময় যাকে জীর্ণ করে ফেলেছিল, প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানের হাতে যা ধরা দিয়েছে একদিন। সেই প্রাচীন ধ্বংসস্তূপকে শান্তির বারিতে নিষিক্ত করতে চাইছে যে-নারী আগামী দিনে সে মা হবে। তার এই আকুলতা যেন তার সন্তানের সুরক্ষার জন্যই—'হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক—এই সময়েই আর্তি তার কণ্ঠ বেয়ে যেন নির্ঝরের মত নেমে আসতে থাকে।

গান শেষ হতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে লোপা।

অনেক রাতে ঘুম থেকে তুলে থানার বড়বাবু খবরটা দিয়ে গেল—সুহৃদ মারা গেছে।

থুম ধরে বসে রইল প্রবাল। নিজেকে বড় অপাংক্তেয় মনে হয়। আর কিছু করার রইল না। ছেলেটি যেন দায়মুক্ত করে দিয়ে গেল তাদের। এবার স্থগিত শোকসভাটি হওয়ার আর কোন বাধা রইল না—আনোয়ার সুহৃদের যুক্ত শোকসভা। পুলিশ ক্যাম্প উঠে যাবে। উত্তেজনামুক্ত সাম্প্রদায়িক সদ্‌ভাব ফিরে আসবে।

তবু কেন যেন মনে হয়, এই গ্রামগঞ্জের মানুষের কাছে সুহৃদ তাদের উলঙ্গ করে রেখে গেল। কি করে মুখ দেখাবে সে!

মনে হতেই সমগ্র স্নায়ুগ্রন্থি ঝনঝন করে ওঠে। তা যেন এমনি করেই বেজে যাবে, অনন্তকাল।

ভি এম স্যার

তারাপদ রায়

'তোমরা কি কেহ কখনো মাছরাঙা পাখি দেখিয়াছো?' গ্রন্থের নাম নবনীতিসুধা। গ্রন্থকারের নাম যতদূর মনে আছে উপেন্দ্রমোহন দাস।

নবনীতিসুধা বইয়ের প্রথম রচনাটি মাছরাঙা পাখির বিষয়ে। বইয়ের শুরুতেই একটা পূর্ণ পৃষ্ঠা মাছরাঙা পাখির রঙীন ছবি রয়েছে।

তখন রঙীন ছবি সুলভ ছিল না। খবরের কাগজে, পত্র-পত্রিকায়, বইপত্রে সবই ছিল সাদাকালো ব্লকের ছবি।

সন, উনিশশো তেতাল্লিশ খ্রিষ্টাব্দ, তেরোশো পঞ্চাশ বঙ্গাব্দ। মহাযুদ্ধ, মহামারী, মন্বন্তর। রঙ্গমঞ্চে নাটকের নায়কের আবেগকম্পিত কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে, 'বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা।'

আমি তখন বড় হচ্ছি। মফঃস্বল শহরের পুরনো দালানবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোন পেরিয়ে পুকুরধারের কাঁচা রাস্তা ধরে খোয়া-বাঁধানো সড়কে উঠছি। আর একটু এগিয়ে গিয়ে খালপাড়ে ইস্কুল, বিন্দুবাসিনী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। বড় ইস্কুল।

আমাকে বড় ইস্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। ক্লাস থ্রি। ঐটাই বড় ইস্কুলের সবচেয়ে নিচু ক্লাস।

আমি ইস্কুলে একা যাই না। আবার পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দলবেঁধেও যাই না। আমাকে কেউ না কেউ বাড়ি থেকে ইস্কুল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে, আবার ছুটির পরে নিয়েও আসে।

আমাকে একা ছাড়া হয় না দুটো কারণে। ইস্কুলে যেতে গেলে খালের ওপরে কাঠের সাঁকো পার হয়ে যেতে হয়। তাছাড়া খালের ওপারেই বড় রাস্তা, বাসস্ট্যান্ড। সেখানে ধুলো উড়িয়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস আসে জেলাসদর থেকে, আবার ধুলো উড়িয়ে ফিরে যায়। তখনও মফঃস্বলে, বিশেষত আমাদের ঐ নদীনালার দেশে এমন লোকের অভাব ছিল না যারা বাস বা মোটরগাড়ি দেখে অবাক হত, চড়তে ভয় পেত।

অন্য যে কারণে আমার সঙ্গে ইস্কুল যাতায়াতের পথে লোক দেয়া হত, সেটা হল লঙ্গরখানা।

আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামান্য একটু কাঁচা রাস্তা অতিক্রম করে বাঁধানো সড়কে উঠলে ডানদিকে কালীবাড়ি, একটু বাঁদিকে এগোলে মসজিদ।

বোধহয় সরকারি দাক্ষিণ্যেই সে-সময় দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের জন্য শহরে দু'টো লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে, কালীবাড়ির সামনে হিন্দুদের জন্যে আর মসজিদের সামনে মুসলমানদের জন্যে। দু-জায়গায় একই খাবার, খিচুড়ি। লাল কুমড়ো, শোলা কচু,

খোসাসুদ্ধ যে-কোনো জাতের ডাল আর মোটা চাল, বিশাল কাঠের উনুনে বড়বড় টিনের ড্রামে বহুক্ষণ ধরে অনেক জল ঢেলে ঢেলে ফোটানো হত। দিনে একবারই, দুপুরের পরে বড় বড় লোহার হাতায় গরম খিচুড়ি শরণার্থীদের ভাঙা থালায়, সানকিতে বা কলাপাতায় ঢেলে দেয়া হত। খেয়াল রাখা হত যাতে মন্দির আর মসজিদের খিচুড়ি এক সময়েই পরিবেশন করা হয়, না হলে বড় ধরনের গোলমাল হতে পারে, তাছাড়াও ক্ষুধার্তেরা খাদ্যের লোভে যদি ভিন্ন ধর্মের লোকের ভিড়ে মিশে খাদ্য গ্রহণ করে, তাহলে তো জাত যাবে।

তবে জাত যাওয়ার ঢের আগে অনেকের প্রাণ চলে যেত। কালীবাড়ির সামনের রাস্তায় আর মসজিদের সামনের রাস্তায় প্রতিদিনই দুয়েকটা মড়া পড়ে থাকত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের কবর দেওয়ার বা দাহ করার কেউ জুটত না। অনেকক্ষণ পরে মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় কালু এসে মৃতদেহ নিয়ে যেত। প্রায় ছয় ফুট লম্বা, আবলুস-কালো, বিরাটকায় দৈত্যের মত চেহারা ছিল কালুর: চওড়া কাঁধ, বিশাল বিশাল হাতের থাবা। একটা বহুব্যবহৃত, অতি জীর্ণ, শুকনো রক্ত-নোংরা মাখা খেজুরপাতার পাটিতে শক্ত নারকেলের দড়ি দিয়ে মড়াটা বেঁধে কাঁধে তুলে অক্লেশে নিয়ে যেত কালু। পরে শুনেছি প্রতিটি মড়া বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কালুর বরাদ্দ ছিল আট আনা। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির বড়বাবু লঙ্গরখানার মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার রেট কমিয়ে চার আনা করে দেন এই যুক্তিতে যে অনাহারে মৃত কঙ্কালসার মানুষের ওজন সাধারণের চেয়ে অনেক কম। তাই অর্ধেক রেট।

বড় তাড়াতাড়ি বড় খারাপ জায়গায় পৌঁছে গেলাম। গল্পটা এক প্রায় দুগ্ধপোষ্য বালকের ইস্কুল যাওয়া নিয়ে। পাখি-ডাকা, ছায়া-ঢাকা মফঃস্বল শহরের লাল সুরকি-বাঁধানো রাস্তা। সাইকেল রিকশা তখনো আসেনি, ক্বচিৎ কদাচিৎ খুটখুট করে ঘোড়ার গাড়ি যায়—টমটম, এক্কা। পালকি দুরকম, পালকি ঘোড়ার গাড়ি আর বেহারা-টানা হুমহুম পালকি। তাতে চড়ে রোগী আসে ডাক্তারবাড়িতে, গ্রামগঞ্জের নায়েব তহশীলদার আসে নথিপত্র নিয়ে উকিলবাড়িতে। আর দুই বেহারার কাঁধে ডুলি, কাপড় দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে ঢাকা ডুলির মধ্যে নাকে নোলক-পরা পাড়াগাঁয়ের কিশোরী বৌ আকণ্ঠ ঘোমটা টেনে বসে নায়রে যায়, নায়র থেকে পতিগৃহে ফেরে।

দূরে কালীবাড়ির পিছনে আদালতের মাঠে গত শতাব্দীর একটা অশ্বত্থ গাছ, সারা সময় হাওয়ায় ঝিরঝির করে তার সবুজ পাতা নাচছে, তার চূড়ায় সারাদিন রোদ ছুঁয়ে আছে।

তারও ওপারে খালের ওপারে সিনেমা হল, বাসস্ট্যান্ড। একপাশে হাই ইংলিশ ইস্কুল, তারও বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। পুরনো দিনের লম্বা টানা টিনের চালা, তার মধ্যে ছেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে ভাগ করে করে ক্লাস, শুধু ইস্কুলের অফিসঘর, হেডমাষ্টারের ঘর, টিচার্সরুম এইসব একটা সাবেকি থামওয়ালা দালানে।

সেই দালানের সামনের বারান্দায় একটা আংটার সঙ্গে ঝোলান আছে খাঁটি কাঁসার বেল একটা। তিনজন দপ্তরি তিনরকমভাবে সে বেলটা বাজায়। সুন্দর, মধুসূদন আর ইসমাইল। বহু দূর থেকে বেল বাজানো শুনলে সারা শহরের লোক বুঝতে পারত এদের মধ্যে কে বেলটা বাজাচ্ছে।

বেল বাজানোয় সুদক্ষ ছিল সুন্দর, আমরা বলতাম সুন্দরভাই, সে বিহারী ছিল, আমাদের ওখানকার ভাষায় পশ্চিমদেশী বা পশ্চিমা, সেইজন্যেই বোধহয় সুন্দরদা না হয়ে সুন্দরভাই হয়েছিল।

বেল বাজানোকে একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল সুন্দরভাই। ফার্স্টবেল, সেকেন্ড বেল, টিফিন বেল, ছুটির বেল, হাফ হলিডে বেল— সব কিছুর মাত্রা তাল লয় একটু আলাদা ছিল। শুনলেই বোঝা যেত কোন্ বেলটা কিসের জন্যে।

বেল বাজানোর পুরো দায়িত্বটাই ছিল সুন্দরভাইয়ের। তবে ছুটিছাটায় কিংবা অসুখবিসুখে অন্য দুজন দপ্তরি এ কাজটা করত, কিন্তু তার কোনো মাধুর্য ছিল না।

ইস্কুল আরম্ভ হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ আগেই আমি ইস্কুলে পৌঁছে যেতাম। দূর গ্রামের দু-চারজন ছাত্র ছাড়া সেই সময়ে আর কেউই এসে পৌঁছাত না। অনেকটা হেঁটে, জলকাদা ভেঙে, কিছুটা ডিঙি বা খেয়ানৌকায় বেশ খানিকটা রাস্তা পাড়ি দিয়ে আসতে হত বলে দূরের ছাত্ররা কিছুটা সময় হাতে করেই আসত।

আর আসতেন ভি এম স্যার।

সকালবেলা তালা খুলে ইস্কুল খোলার আগে থেকে বিকেলে ইস্কুল বন্ধের পর ঠিকমত তালা লাগানো হল কি না, সবগুলো তালা ধরে টেনে টেনে দেখে তারপর ভি এম স্যার ফিরতেন। সেকালে খোলা বারান্দা বা উঠোন থেকেও চেয়ার, বেঞ্চি বা তক্তাপোশ চুরি যেত না। তবুও প্রতিটি ক্লাসগৃহের তালা টেনে নিজে না যাচাই করে তাঁর মনে শান্তি হত না।

ঘণ্টা বাজানোর ঠিক আগের মুহূর্তে হেডমাস্টার মশায়ের দেয়ালঘড়ি দেখে ভি এম স্যার ঘণ্টার কাছে এসে দাঁড়াতেন। এর পর তিনি আঙুল তুলে নির্দেশ দিলে সুন্দরভাই ঘণ্টা বাজানো আরম্ভ করত। তখন ঘড়ির এত ছড়াছড়ি ছিল না, পুরো ইস্কুলে একজন ছাত্রেরও কোনো ঘড়ি ছিল না। মাস্টারমশায়দের মধ্যেও মাত্র দুয়েকজনের পকেটঘড়ি ছিল। হাতঘড়ি মনে পড়ছে না।

তা সে হাতঘড়িই হোক, আর পকেটঘড়ি হোক, ঘড়িওলা লোক তখন একজন মান্যগণ্য মাতব্বর মানুষ। হাতঘড়ি পরে একটা লোক রাস্তা দিয়ে গেলে বা বাড়িতে এলে লোকে সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকিয়ে দেখে। এমনকি ঘড়ি দেখা ব্যাপারটাও একটা বিশেষ বিদ্যা বলে ধরা হত, অনেকেই জিজ্ঞেস করত বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় নিতে গিয়ে, 'কি খোকা, ঘড়ি দেখতে জানো?' আর কনেদেখার সময় এই প্রশ্নটা অনিবার্য ছিল।

সে এক অতীতকালের ব্যাপার।

ভি এম স্যার এক অবলুপ্ত প্রজাতি। বহুকালের কথা, বহুদিন হল কোনও ইস্কুলে, বিদ্যালয়ে ভি এম স্যার দেখা যায় না।

ভি এম মানে ভার্নাকুলার মাস্টার। বোধহয় তাই, ভুল হল কিনা বলতে পারছি না। হয়ত বা অন্য কিছুও হতে পারে ভি এম, কারও কাছে যাচাই করে নেব এতদিন পরে সে উপায়ও নেই।

সে যা হোক, আমাদের বিদ্যালয়ের খুচরো তদারকি ছাড়াও তিনি আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর ক্লাস-শিক্ষক ছিলেন। বড় ইস্কুলে যাওয়ার আগে আমি কোনও পাঠশালায় বা পাড়ার ইস্কুলে পড়িনি। সরাসরি ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হয়েছিলাম। সেই দিক থেকে ভি এম স্যারই আমার প্রথম শিক্ষক।

ভি এম স্যার আমাদের অঞ্চলের লোক ছিলেন না। আমরা পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের অন্তবর্তী যমুনা-ধলেশ্বরীর অববাহিকার বাসিন্দা। ভি এম স্যার এসেছিলেন দূরাঞ্চল থেকে, নোয়াখালি জেলা থেকে।

ভি এম স্যারের প্রকৃত নাম ছিল মৌলভী নঈমূল হোসেন কিংবা ঐরকম কিছু। কিন্তু সে নাম ভি এম স্যার খেতাবের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। বহুকাল ছিলেন তিনি আমাদের শহরে ও ইস্কুলে। শেষ বয়েসে তিনি গৌরবান্বিত বোধ করতেন এই বলে যে— অমুক-অমুক বাড়ির বাপ-ঠাকুর্দা-নাতি তিন পুরুষকে তিনি পড়িয়েছেন, তিন পুরুষ তাঁর হাতে কানমলা খেয়েছে।

ঠিক তিন পুরুষ না হলেও বড় জ্যাঠামশাইকে বাদ দিলে আমার বাবা-জ্যাঠারা তিন ভাই এবং আমরা চারভাই তাঁর কাছে পড়েছি। ভি এম স্যার সম্ভবত উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, বিদ্যালয়ের সবচেয়ে নিচু ক্লাসগুলোতে তিনি বাংলা, ইতিহাস—এইসব বিষয় পড়াতেন।

তখন নিচু ক্লাসের শিক্ষক আর উঁচু ক্লাসের শিক্ষকের তারতম্য আমরা বুঝতাম না। কোন্ মাস্টার বেশি শিক্ষিত বা কম শিক্ষিত, ভাল পড়ান বা খারাপ পড়ান এ নিয়েও খুব একটা মাথা ঘামানো হত না।

আমরা যখন ভি এম স্যারের ক্লাসে ভর্তি হয়েছি তখন তাঁর বয়েস পঞ্চাশের খারাপ দিকে। সে সময়ে মাস্টারমশায়দের অবসরের বয়েস নিয়েও কড়াকড়ি ছিল না, শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাকে যতদিন ইচ্ছে রেখে দিতেন।

ভি এম স্যারকে ধুতি পরতে দেখেছি। তবে সাধারণত ইস্কুলে আসতেন ঢিলে- হাতা একটা নীল পাঞ্জাবী আর গোড়ালির ওপরে ওঠা খাটো-ঝুল একটা পাজামা পরে। পায়ে ফিতেওলা কালো চামড়ার জুতো, কেনার পরে সে জুতোয় কোনো কালে কালি দেওয়া হত বলে মনে হয় না। জামাকাপড়ও সব সময়ে পরিচ্ছন্ন থাকত তা নয়। তবে তখনকার মফঃস্বলে জীবনযাত্রার ধরনধারণ ছিল অন্যরকম। ফিটফাট, ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা লোকজন খুব কম দেখা যেত। ইস্ত্রিহীন সাবানকাচা জামা গায়ে দিয়েই আমাদের বাল্যকাল কেটে গেছে, জুতো একজোড়া বাসায় থাকলেও সব সময় পায়ে থাকত না।

ভি এম স্যার আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর ক্লাস শিক্ষক হিসেবে প্রত্যেক দিন প্রথম ঘণ্টার ক্লাস নিতেন, সেটা বাংলার ক্লাস। ঐ উপেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত নবনীতিসুধা। প্রথম রচনাই মাছরাঙা পাখি;

'তোমরা কি কেহ কখনো মাছরাঙা পাখি দেখিয়াছ?'

আমাদেরও বাঙাল দেশ, আমাদেরও কথার মধ্যে 'খামু' 'যামু' আছে, কিন্তু ভি এম স্যারের নোয়াখালি উচ্চারণের কাছে সে কিছু নয়। বহু বৎসর আমাদের ওদিকে থেকেও তাঁর উচ্চারণে কোনো উন্নতি হয়নি। অনেক সময় বুঝতে একটু কষ্ট হত, কিন্তু তিনি দৈনন্দিন কথাবার্তা তাঁর নোয়াখালি উচ্চারণেই সারতেন। তাঁর উচ্চারণের অসুবিধে বা অসঙ্গতি সম্পর্কে ভি এম স্যার যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এবং সেই জন্যে ক্লাসে পড়ানোর সময়ে তিনি যথাসাধ্য সাধুভাষায় কথাবার্তা বলতেন।

বহুকাল পরে একটি বিখ্যাত বাংলা চলচ্চিত্রে রূপকথার রাজাকে এইরকম সাধুভাষায় কথা বলতে শুনেছি এবং শোনামাত্রই বহু আগের ভি এম স্যারের কথা মনে পড়েছে।

চলচ্চিত্রের রাজা সাধুভাষায় কথা বলায় বেশ বৈচিত্র্যের এবং কৌতুকের সৃষ্টি হয়েছিল। ভি এম স্যারের ব্যাপারটা অবশ্য ঠিক তা নয়।

তখন তো পাঠ্যপুস্তকের প্রায় সমস্ত গদ্যরচনাই ছিল সাধুভাষায় আর আমাদের সেই বাঙাল মফঃস্বলে মাস্টারমশায়েরা প্রায় কেউই পড়ানোর সময় বা অন্য সময় প্রকৃত চলিত ভাষায় কথা বলতেন না, বলতে পারতেন না। সাধু, বাঙাল এবং চলিত ভাষার একটা গোঁজামিল সংমিশ্রণ তাঁরা ব্যবহার করতেন।

তার চেয়ে ভি এম স্যারের সাধুভাষা খারাপ ছিল না। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য না হলেও মোটামুটি শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন সাধুভাষা ভি এম স্যার ব্যবহার করতেন, অন্তত ব্যবহার করার চেষ্টা করতেন।

প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসেই নাম ডাকা শুরু করে ভি এম স্যার একে একে আমাদের প্রত্যেকের বংশপরিচয় জেনে নিলেন। আমরা অনেকেই তাঁর চেনাজানা পরিবার থেকে এসেছি, 'তুমি যোগেন্দ্রের পুত্র, তুমি অনিলের ভাগিনেয়, তুমি ডাক্তারসাহেবের দৌহিত্র ইত্যাদি সম্ভাষণে তিনি আমাদের সনাক্ত করলেন।

ঐ প্রথম দিনেই ভি এম স্যার তাঁর দুর্বলতাগুলো প্রকাশ করতে কোনো দ্বিধা করলেন না। আমার পাশে বসে ছিল আমাদেরই পাড়ার জাহেদ, জাহেদদের বাড়ির পিছনের ডোবার ধারে মানকচুর ঝোপ, মাখনের মত নরম অতি বিখ্যাত সেই মানকচু, সারা শহরে সে কচুর সুনাম। তাছাড়া মানকচু নাকি বাতের ওষুধ, ভি এম স্যার পুরনো বাতব্যাধির রোগী, কোমরে ব্যথার জন্যে একটু টেনে টেনে চলতেন। তিনি জাহেদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের বাড়িতে কোনো মানকচু ইহার মধ্যে তোলা হইয়াছে কি?'

সেটা পৌষমাস, জলপাইয়ের ঋতু। ভি এম স্যার আমার কাছে জানতে চাইলেন তোমার কর্তামা জলপাই জারক দিয়াছেন কি'? অর্থাৎ আমার ঠাকুমা জলপাইয়ের আচার করেছেন কিনা।

এইরকম সব টুকটাক প্রশ্ন প্রায় সকলকে এবং সবই কোনো দ্রব্যের সন্ধান করার জন্যে। পরে বাসায় ফিরে ঠাকুমাকে জলপাইয়ের আচারের কথা বলতেই ঠাকুমা বললেন, 'ঐ ভি এম তো? খালি চাওয়া আর চাওয়া। কাসুন্দি, আচার, কাগজিলেবু, কলার মোচা তোর বাবার কাছে চাইত, কাকার কাছে চাইত। ও লোকটা এখনো আছে?'

আমার ঠাকুমার কথাবার্তা এইরকমই ছিল। কিন্তু পরের দিন সকালে যখন ইস্কুলে যাচ্ছি আমাকে বললেন, 'তোদের ভি এম-কে বলিস, রোববার সকালে একটা কাঁচের বয়াম নিয়ে আসতে।'

প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসের আরও দুয়েকটা কথা মনে আছে। আবার এমনও হতে পারে, সবই প্রথম দিনের ঘটনা নয়, আগে-পরে মিলেমিশে স্মরণে একাকার হয়ে গেছে।

নাম ডাকা অর্থাৎ রোলকল এবং তৎসহ পরিবার পরিচয় এবং সম্ভাব্য আদান বিষয়ে কথাবার্তা বলার পরে ভি এম স্যার তাঁর ঢোলা পাঞ্জাবির ঢোলা পকেট থেকে মলিন, অতি জীর্ণ, বহু-ব্যবহৃত দুটো বই বার করলেন। একটা গোলাম মোস্তাফার 'আলোকমঞ্জরী' আর অন্যটা ঐ উপেন্দ্রমোহনের 'নবনীতিসুধা'।

বই দুটো দুহাতে উঁচু করে ধরে পুরো ক্লাসকে জিজ্ঞাসা করলেন ভি এম স্যার, 'তোমরা বই দুইটি কিনিয়াছ?'

আমরা কয়েকজন কিনেছিলাম, বাকীরা পরে কিনবে।

অনেকে এখনো বই কেনেনি দেখে তিনি যেন একটু খুশি হলেন, বললেন, 'তোমরা এই সপ্তাহের মধ্যেই বইদুটি খরিদ করিবে। খালপাড়ে কাঠের পুলের পাশে বলাই সান্যালের বইয়ের দোকানে আমার নাম বলিবে, টাকায় দুই পয়সা কমিশন পাইবে।'

বইয়ের দোকানটা অবশ্য বলাই সান্যালের নয়। দোকানের মালিক কানাই সান্যাল, অকৃতদার, বিপ্লবী, স্বদেশী। কানাই সান্যাল তখন রাজবন্দী, নাকি ইনটার্ন হয়ে গ্রামবন্দী, দোকানটা তার অনুপস্থিতিতে চালাতেন তাঁর ভাইপো বলাই সান্যাল।

দোকানের নাম ছিল 'স্বদেশী পুস্তকালয়', দোকানের বিরাট সাইনবোর্ডে ভারতমাতার ছবি ছিল, উদ্যত ত্রিশূল হাতে ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর ভারতজননী সামনে এক পা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে তাঁর মেঘের মত এলো কালোচুলে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, চোখে আগুন।

সে বড় ধরাধরি, কড়াকড়ি, টানাপোড়েনের যুগ, আহত ব্রিটিশসিংহ পাগলের মত আচরণ করছে। স্বভাবতই ভি এম স্যার কানাই সান্যাল কিংবা স্বদেশী পুস্তকালয়ের উল্লেখ না করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলাই সান্যালের কথা বললেন।

কেউ কেউ বলত, ঐ দোকান থেকে বই কিনলে ভি এম স্যার দু-চার পয়সা কমিশন বাবদ পেতেন। কিন্তু বোধহয় এটা ছিল বন্ধুকৃত্য।

ব্যক্তিগত জীবনে কানাই সান্যাল তাঁর সুহৃদ ছিলেন। যখন কানাইবাবু জেলে থাকতেন না বা আত্মগোপন করে থাকতেন না, তখন প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় কাছারির মোড়ে বিখ্যাত

'আইডিয়াল টি স্টলের' একই কাঠের বেঞ্চির অংশীদার ছিলেন দুজনে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে অনেক রাতে দুজনে দুদিকে বাড়ি ফিরতেন। একেক দিন গল্প করতে করতে একজন আরেকজনের বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন, তারপর অন্যজনের এগিয়ে দেওয়ার পালা, এইভাবে রাত আরও বেড়ে যেত। অনেক সময় তাঁরা গলা নামিয়ে নিচু কণ্ঠে কি সব আলোচনা করতেন। অনেকের ধারণা ছিল ভি এম স্যারও গোপনে স্বদেশী ছিলেন। একসময়ে নাকি খদ্দরের জামাকাপড়ও পরতেন।

এতদিন পরে আমার মনে হয় কোনোরকম ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, নেহাতই বন্ধুর অনুপস্থিতিতে দোকানের কোনো ক্ষতি যাতে না হয় সেজন্যে তিনি আমাদের ঐ দোকান থেকে বই কিনতে বলতেন।

বছরে কয়েকবার দেশে মানে নোয়াখালিতে যেতেন ভি এম স্যার। এমনিতে তাঁর কোনো বিলাসিতা ছিল না, কিন্তু বাড়ি থেকে যখন ফিরতেন একটু রঙীন হয়ে আসতেন। তাঁর ছিল একগাল কাঁচাপাকা দাড়ি, কিন্তু বাড়ি থেকে যখন ফিরে আসতেন, দেখা যেত তাঁর দাড়িটা মেহেদি দিয়ে রঙ করা হয়েছে। আমাদের শহরের রোদে জলে সেই মেহেদির রঙ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেত। যথাসময়ে কাঁচাপাকা দাড়ি বেরিয়ে পড়ত। পরে আবার দেশে গিয়ে রঙীন হয়ে আসতেন।

আমরা যেবার ইস্কুলে ভর্তি হলাম সে বছর ইংরেজি বছরের গোড়াতেই পর পর কয়েকদিন ছুটি, সরস্বতী পুজো, তার আগে ঈদ না মহরম কি যেন জুড়ে প্রায় এক সপ্তাহ ইস্কুল বন্ধ।

ইস্কুল খোলারও দুয়েকদিন পরে ভি এম স্যার ফিরলেন রঙীন দাড়ি নিয়ে। যেদিন তিনি ইস্কুলে এলেন, উঁচু ক্লাসের কয়েকটি ছেলে আমাদের ক্লাসঘরে ইস্কুল শুরু হওয়ার আগে ঢুকে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিয়ে গেল,

'ভি এম স্যারের রঙীন দাড়ি'।

ভি এম স্যার ক্লাসে এলেন। শুধু রঙীন দাড়ি নয়, সাজপোশাকেরও কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এবার পরনে লংক্লথের পাঞ্জাবি, পাজামাটাও নতুন। তবে পায়ের বুটজুতো জোড়া অপরিবর্তিত রয়েছে।

ক্লাসে ঢুকে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখাগুলো নজরে পড়তে একটু ভুরু কুঁচকোলেন ভি এম স্যার। তারপর কিছুই না বলে ডাস্টার দিয়ে ব্লাকবোর্ডটা পরিষ্কার করে মুছে ফেললেন।

আজ তাঁর সঙ্গে বই নেই, তিনি সামনের ফার্স্ট বেঞ্চের প্রথম ছেলেটির কাছ থেকে নবনীতিসুধা বার করে পাতা খুলে মাছরাঙা পাখির রঙীন ছবিটা বার করে উঁচু করে ধরলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা কে কে মাছরাঙা পাখি দেখিয়াছো, হাত তোলো'।

অনেকেই হাত তুলল। কিন্তু আমি হাত তুলতে সাহস পেলাম না। আমাদের বাড়িতে, বাড়ির চারপাশে পুকুরপাড়ে অনেক গাছগাছালি, সেসব গাছে অনেক পাখি, কিন্তু সেসব পাখির নাম জানি না, বিশেষ করে ছবির পাখিটা আমার চেনা নয়।

আমাকে হাত তুলতে না দেখে ভি এম স্যার বললেন, 'তোমাদের বাড়ির পাশে অত বড় পুষ্করিণী। তুমি মাছরাঙা পাখি দেখ নাই?'

পরের রবিবার সকালে আমাদের বাসায় এসে ভি এম স্যার জলপাইয়ের আচার নিয়ে গেলেন। তাঁর মেহেদি-রাঙানো দাড়ির সংবাদ বাড়ির মধ্যেও পৌঁছেছিল। অন্দরমহলে তাই নিয়ে একটু হাসাহাসিও হল।

সে যাই হোক, ভি এম স্যার আমাকে পুকুরপাড়ে নিয়ে গেলেন মাছরাঙা পাখি চেনাতে। কিন্তু কোনো মাছরাঙা পাখি পুকুরপাড়ে দেখা গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ভি এম স্যারের নজরে এল পুকুরের ওপারে একটা তেঁতুল গাছের নিচু ডালে জলের থেকে সামান্য ওপরে একটা মাছরাঙা পাখি ঝিম মেরে নিঃশব্দে বসে রয়েছে।

সে বছর বৃষ্টি ভাল হয়নি। নদীতেও জল কমে এসেছিল, বর্ষায় পুকুর বিল এগুলো মোটেই ভরেনি। আর তখন তো শীতকাল, পুকুর মজে গিয়ে প্রায় শুকিয়ে এসেছে। ভি এম স্যারের সঙ্গে পায়ে পায়ে হেঁটে পুকুরের ওপারের দিকে এগোলাম, পাখিটাকে কাছ থেকে দেখতে হবে।

পাখিটার কাছে পৌঁছানোর আগেই পাখিটা একটা বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপ দিয়ে জল থেকে একটা মাছ ধরে ওপাশের একটা বড় গাছের উঁচু ডালের আড়ালে গিয়ে বসল।

মাছরাঙা দর্শন আমার সম্পূর্ণ হল। ভি এম স্যার ফিরে গেলেন।

তখনো মাছরাঙা পাখির পাঠ চলেছে। পরদিন ক্লাসে মাছরাঙার পাঠ পড়াতে পড়াতে ভি এম স্যার বললেন, 'মাছরাঙা পাখি জীবন্ত মৎস্য ছাড়া ভক্ষণ করে না'।

তিনি একটা গল্প বললেন, একবার জেলেরা জাল দিয়ে মাছ ধরছিল, সেই জালের ওপর থেকে ছোঁ দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে একটা মাছরাঙা পাখি জালে আটকিয়ে যায়। তিনি সেই পাখিটা জেলেদের কাছ থেকে এক আনা দিয়ে কিনে বাসায় নিয়ে পুষেছিলেন। দৈনিক বাজার থেকে ছোট মাছ এনে পাখিটাকে দিতেন। কিন্তু সেই পাখিটা ওইসব মাছ খেতো না। কয়েকদিন পরে পাখিটা মারা যায়। তখন তিনি বুঝতে পারেন, মাছরাঙা পাখি তাজা মাছ ছাড়া খায় না।

ভি এম স্যার আমাকে মাছরাঙা পাখি চিনিয়ে দেবার পর আমি যখনই পুকুরপাড় ধরে যেতাম, পাখিটাকে দেখার চেষ্টা করতাম। সব সময়ে দেখতে পেতাম তা নয়। তাছাড়া মাছরাঙা পাখি খুব সতর্ক পাখি, একটু শব্দ হলে, একটু লোকজন দেখলে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়।

মাঝে মধ্যে আমাদের উঠানের নারকেল গাছের ডালে এসে বসত পাখিটা। বোধহয় একটাই পাখি ছিল, কারণ একসঙ্গে দুটো পাখি কখনো দেখিনি। যখন নারকেলগাছের সতত কম্পমান শাখায় বসে পাখিটা দুলত, আমি বারান্দায় এসে নবনীতিসুধা খুলে রঙীন ছবিটা বের করে পাখিটার সঙ্গে মেলাতাম। কেমন যেন মনে হত এ বইতে যে মাছরাঙা পাখির ছবি দেয়া আছে, আর আমাদের এই মাছরাঙা পাখি, অনেকটা একরকম হলেও ঠিক এক নয়, একটু আলাদা।

এর মধ্যে একদিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ ভি এম স্যার আমার ঠাকুরদার কাছে এলেন। ঠাকুরদা ওকালতি করেন, সন্ধ্যেবেলা বাড়ির সামনের দিকে কাছারিঘরে মক্কেলদের নিয়ে বসেছেন। সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুমা তুলসীতলায় প্রদীপ দেখাতেন, কাছারিঘরের পিছনেই তুলসীতলা, আমি সে সময় এবং অনেক সময়ই ঠাকুমার কাছে থাকতাম। সেই সন্ধ্যায় তুলসীতলা থেকে দেখি ভি এম স্যার কাছারিঘরে ঢুকছেন।

আমার কেমন আশঙ্কা হল, হয়ত আমার ক্লাসের পড়াশুনোয় কোনো গাফিলতির কথা ভি এম স্যার ঠাকুরদাকে বলতে এসেছেন।

আমি ঠাকুমাকে পুজোর ঘরে পৌঁছে দিয়ে ভি এম স্যার কি বলেন শোনার জন্যে চুপিসাড়ে কাছারিঘরের দরজার একপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

অবশ্য তার প্রয়োজন ছিল না, কারণ ঠিক তখনই আমাদের মুহুরিবাবু কাছারিঘর থেকে বাড়ির মধ্যে এলেন ঠাকুমার কাছ থেকে পনেরোটা টাকা নিতে। এইরকম অসময়ে ঠাকুরদা কাছারিঘরে টাকা চাওয়ায় ঠাকুমা বললেন, 'এই রাতের বেলায় এতগুলো টাকা দিয়ে কি হবে?'

মুহুরিবাবু বিচক্ষণ লোক, চাপা গলায় বললেন, 'ভি এম স্যার'। ঠাকুমা বললেন, 'ভি এম? সংসার চালাতে পারে না, বারবার বাড়ি যায় কেন?' তারপর পনেরোটা টাকা ক্যাশবাক্স খুলে বার করে দিয়ে বললেন, 'যার যেমন স্বভাব'।

আসলে ভি এম স্যারের বিষয়ে একটা অকারণ দুর্বলতা ছিল আমার ঠাকুমার। তাঁর বাবা ছিলেন সাব-রেজিস্ট্রার, তিন বছর ছিলেন নোয়াখালিতে। ঠাকুমার বাল্যকাল কেটেছে নোয়াখালিতে। সেখানে তাঁদের সরকারি বাড়ির সামনে একটা ড্যাফল গাছ ছিল, জীবনে আর কোথাও সে গাছ ঠাকুমা কখনো দেখেননি। ভি এম স্যার তাঁকে নোয়াখালির কথা মনে করিয়ে দিত।

আমি কাছারিঘরের সিঁড়ির ওপরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, মুহুরিবাবু টাকাটা নিয়ে এসে ভি এম স্যারের হাতে দিলেন, কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তিনি ঠাকুরদার দিকে তাকিয়ে।

ঠাকুরদার টেবিলে লণ্ঠনের আলো জ্বলছে। সেই আলোয় ভি এম স্যারের মেহেদি- রঞ্জিত দাড়ি, মুখাবয়বের সিলুয়েট, মাথার সাদাকালো চুল, সহসা আমার কেমন মনে হল ভি এম স্যারকে কেমন যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে, এবং তখনই বুঝতে পারলাম ভি এম স্যারকে একদম মাছরাঙা পাখির মত দেখাচ্ছে, যে পাখির রঙীন ছবি নবনীতিসুধায় রয়েছে।

এ কোনো গল্প নয়।

এ গল্পের কোনো মাথামুণ্ডু নেই। এ এক অলীক স্মৃতিচারণ। অল্প কিছুটা সত্যি, কতটা, তা আমি নিজেও জানিনা। জানতেও চাই না। যা আছে মনে-মনেই থাকুক, কাগজ-কলমে লিখে একটু বেকায়দা হয়ে যাচ্ছে।

তবে আরও একটু বেকায়দা আছে। সেই যে ভি এম স্যার বলেছিলেন, মাছরাঙা পাখি মরা মাছ খায় না, সে কথাটা সত্যি নয়।

মরা মাছের কথা জানি না, মরা মানুষের কথা বলি।

'যদি বর্ষে মাঘের শেষ', শীতের শেষাশেষি আমাদের ও প্রান্তে একটা বড় বৃষ্টি হত, সে বছর সেই বৃষ্টিও হল না। চৈত্রমাস আসতে না আসতে নদীনালা, খালবিল সব শুকিয়ে গেল, আমাদের বাড়ির সামনের পুকুর শুকিয়ে বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

তখন একটা-দুটো লঙ্গরখানায় পোষাবে না, হাজার হাজার লঙ্গরখানা দরকার। কেউ ধান চাইছে না, চাল চাইছে না, ভাত চাইছে না, শুধু 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও'।

ফ্যানই বা কে দেবে, চাল না ফোটালে তো ফ্যান পাওয়া যাবে না। সেই চাল কার ঘরে আছে?

মফঃস্বলের নিস্তব্ধ আকাশ চঞ্চল করে উড়ে যাচ্ছে বোমারু বিমান, গোপন এরিয়েলে বার্মা সীমান্ত থেকে ভেসে আসছে নেতাজীর মন্দ্র কণ্ঠস্বর, কালীবাড়ি আর মসজিদের সামনের রাস্তায় এত মড়া পড়ে থাকছে যে কালুডোম আর সামাল দিয়ে উঠতে পারছে না।

পুকুর শুকিয়ে যাওয়ার পরে বহুদিন মাছরাঙা পাখিটাকে দেখিনি।

মহামন্বন্তরের চরম দিনে সেদিন একের পর এক মৃতদেহ পড়ে আছে কালীবাড়ি থেকে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায়, ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না কোন্‌টা মসজিদের মড়া আর কোনটা কালীবাড়ির মড়া।

কোনোরকমে মড়া এড়িয়ে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলাম, হঠাৎ দেখলাম সেই মাছরাঙা পাখিটাকে। পাখিটা মরা মানুষ ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।

পরের দিন ইস্কুলে ভি এম স্যারকে একথা বললাম। তিনি বললেন, 'হইতেও পারে, সর্ব বিষয়ে সর্ব কিছু আমরা জানি না।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আকালের সময় অনেক কিছু ঘটে। তাহার সব ঠিক নহে'।

শ্বেতপাথরের টেবিল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শ্বেতপাথরের টেবিলটা ছিল দোতলায়, দক্ষিণে রাস্তার ধারের জানালার পাশে। ঠিক চৌকোও নয়, গোলও নয়। চারপাশে বেশ ঢেউ-খেলানো। অনেকটা আলপনার মত। বেশ বাহারি একটা ফ্রেমের উপর আলগা বসানো। নিজের ভারেই বেশ চেপে বসে থাকত। পাথরটা প্রায় মন দুয়েক ভারি। ফ্রেমের চারদিকে জাফরির কাজ করা কাঠের ঝালর লাগানো ছিল। সারা ফ্রেম ঘিরে ছিল অসংখ্য কাঠের গুলি। গোল গোল ডাম্বলের মত। দুদিক সরু। অনেকটা পালিশ করা পটলের মত। ঘোরালে সেগুলো বনবন করে ঘুরত। পায়া চারটে ছিল কারুকার্য-করা থামের মত। তলায় ছিল ভরাট পাদানি।

যে বয়সে আমার বাবার যৌবন ছিল, মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো কালো চুল ছিল, সামনে চেরা সিঁথি ছিল, ঠোঁটের উপর বাটার-ফ্লাই গোঁফ ছিল, যে বয়সে তিনি বিকেলে পায়ে বার্নিস-করা জুতো পরে, ইয়ংসাহেবের উপহার দেওয়া গ্রেহাউন্ড চেনে বেঁধে নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন, সেই সময় টেবিলটারও যৌবন ছিল। বাবাই কিনেছিলেন নিলাম থেকে। টেবিল আর কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো যায় এমন একটা দোলনা একই সময় বাড়িতে এসেছিল।

বড় হতে হতে আমার চিবুকটা যখন শীতল পাথরে রাখার মত অবস্থায় এল তখন দেখতাম রোজ সকালে চেয়ারে উবু হয়ে সামনে একটা ডিমের মত আয়না রেখে বিচিত্র-মুখভঙ্গি করে বাবা দাড়ি কামাচ্ছেন। দাড়ি কামাবার সময় পাশে দাঁড়ালে বাবা খুব রেগে যেতেন। এমনিই বাবার খুব দাপট ছিল। সে যুগটাই ছিল বাঙালীর দাপটের যুগ। রাগী ছিলেন তেমনি। রোজ সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে, বাড়িতে দু'জন যুবক কাজের লোক ছিল, পালা করে এক একদিন এক একজনকে জুতোপেটা করে একটা লুঙ্গি পরে এই টেবিলে বসেই রাগ-রাগ মুখ করে চা খেতেন। আর ঠিক সেই সময় আমার শান্তশিষ্ট মজলিশী মেজ জ্যাঠামশাই বাঁ পাশের হাতলহীন খালি চেয়ারে এসে বসতেন। গায়ে একটা খড়খড়ে তোয়ালে। চুলে কলপ লাগাতেন। খানিকটা অংশ কালো, খানিকটা লাল, জায়গায় জায়গায় সাদার ছিট।

জ্যাঠামশাই বোঝাতেন রাগ জিনিসটা ভাল নয়। বিশেষ করে দিনের শেষে অফিস থেকে ফিরেই এই ধরনের জুতোজুতি শরীরের বাড়তি এনার্জি টেনে নেয়। চাকরবাকরেরা একটু আডামেন্ট হয়েই থাকে। জ্যাঠামশাইয়ের মৃদু স্বভাবের জন্যে বাবা খুব একটা পাত্তা দিতেন না। কে বড়, কে ছোট বোঝাই যেত না। চায়ের কাপটা খটাং করে টেবিলে রেখে বাবা বলতেন, 'তুমি আর এর মধ্যে নাক গলাতে এস না। ফার্স্ট অ্যান্ড ফোরমোস্ট থিং ডিসিপ্লিন। ছেলেটার দিকে তাকাতে হবে। ওরা দুপুর বেলা নিজেদের মধ্যে খেস্তাখিস্তি করেছে। অশ্বতর বলেছে।' বাবা খুব পিউরিটান ছিলেন, খচ্চর শব্দটা

উচ্চারণ করলেন না। অফিস থেকে এসে দাঁড়ানো মাত্রই রিপোর্টটা আমারই পেশ করা। আর সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশান। লম্বা বারান্দার এধার থেকে ওধার, বাবা আর নিরঞ্জনের ছুটোছুটি। পুবদিকের প্রান্ত থেকে পেটাতে পেটাতে পশ্চিমের সিঁড়ির বাঁক পর্যন্ত এসে জুতো ফেলে দিলেন।

জ্যাঠামশাই নিরঞ্জনকে ভালবাসতেন, কারণ নিরঞ্জন রবিবার সকালে পচা পাঁউরুটি কুঁড়ো পনির আর পিঁপড়ের ডিম দিয়ে তরিবত করে জ্যাঠামশাইকে মাছের চার মেখে দিত। সেই কারণেই বোধ হয় নিরঞ্জনের হয়ে সালিশি করতে এসেছিলেন। কিছু আর বলার রইল না। আস্তে আস্তে উঠে বাথরুমে চলে গেলেন। অশালীন কথা বাবা কোনো সময়েই বরদাস্ত করতে পারতেন না। একদিন ছুটির সকালে এই পাথরের টেবিলে দাদু আর বাবা মুখোমুখি বসে মুড়ি তেলে-ভাজা খাচ্ছিলেন। শ্বশুর আর জামাইয়ের গল্প বেশ জমে উঠেছে। দাদু বারকয়েক 'শালা' বলেছেন। শালা পর্যন্ত অ্যালাউড। হঠাৎ দাদু বলে উঠলেন কি একটা কথা প্রসঙ্গে— 'পাছার কাপড়'। বাবা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন। ঘর থেকে একটা ঠোঙা নিয়ে এলেন। দাদুর মুড়ি আর তেলে-ভাজার বাটিটা টেনে নিয়ে ঠোঙায় ঢেলে ফেললেন। ঠোঙাটা দাদুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাড়িতে গিয়ে কিংবা রকে বসে খান। টেবিলে বসে খাবার মত সিভিলাইজড্ আপনি নন। আপনার স্ফিয়ার আলাদা।' বৃদ্ধ মানুষ। টকটকে গায়ের রঙ। লম্বা চওড়া পালোয়ানের মত চেহারা। বাবার কথায় মুখটা আরো টকটকে হয়ে উঠল। ছেলেমানুষের মত হয়ে বললেন, 'কেন বল তো? হঠাৎ কি হল তোমার!' দাদু তখনো অপরাধটা বুঝতে পারেননি। বাবা বললেন, 'আপনি ভীষণ স্ল্যাং।' দাদু অপরাধীর মত মুখ করে বললেন, 'ওহো, ওই পা—'

বাবা হাত তুলে বললেন, 'ডোন্ট রিপিট'। দাদু এবার ভয় পেয়ে গেলেন, 'কি বলব তাহলে?' বাবা বললেন, 'কেন, পেছনের কাপড়, কি পরনের কাপড় বলা যায় না!' দাদু তখনও হাল ছাড়লেন না। নিজের সপক্ষে একটু ক্ষীণ ওকালতি করতে গেলেন। বললেন, 'সেকেলে মানুষ তো। আমাদের সময়, বুঝলে পরমেশ্বর, ওই সব কথারই চল ছিল।' বাবা দাদুকে কোনো রকম ডিফেনসের সুযোগ না দিয়েই শ্বেতপাথরের টেবিল ছেড়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। দাদু সেই মুড়ির ঠোঙাটা হাতে ধরে উদাস হয়ে বসে রইলেন। কি করবেন বুঝতে পারলেন না। এক সময় করুণ হেসে বললেন, 'নাঃ, পরমেশ্বর দেখছি খুব রেগে গেছে।'

বাবার দাপটে সংসারে মা ভীষণ আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন। ছুটির দিনে মাকে জীবিত কোনো প্রাণী বলে মনে হত না। অনেকটা ছায়ার মত নিজের কাজে ঘুরে বেড়াতেন। সারাদিনে বাবাকে বার চব্বিশ চা করে দিতেন। বাবাকে চা দেবারও একটা কঠিন কায়দা ছিল। কাপ থেকে ছলকে ডিশে এক ফোঁটা চা পড়লেই চা খাওয়া মাটি। কাপের কানায় চা ভরে ডিশের উপর ব্যালেনস করে আনতে হবে।

আমার মার একটা পা আর একটার চেয়ে বোধ হয় একটু ছোটো ছিল। সাবেক আমলের বাড়িতে ঘরে ঘরেই উঁচু চৌকাঠ, ফলে মার খুব অসুবিধে হত। চা হাতে যখন আসতেন মনে হত তরল বোমা নিয়ে আসছেন, একটু কেঁপে গেলেই বিস্ফোরণ।

মা যখন চা নিয়ে এলেন, দাদু তখনও ঠোঙাটি হাতে ধরে বসে আছেন। বাইরে তেলে-ভাজার তেল ফুটে উঠেছে। দাদু বললেন, 'চা আর খাবো না তুলসী, জামাই খুব রেগে গেছে।' মা ব্যাপারটা জানতেন, রান্নাঘরে গিয়ে আগেই আমি রিপোর্ট করে এসেছিলুম। মা ফিসফিস করে বললেন, 'চা খেয়ে আপনি চলে যান।' দাদু বললেন,

'আমি তো চলেই যেতুম রে, কিন্তু আটকে গেছি।' মা একটু অবাক হলেন, 'কিসে আটকে গেছেন?' দাদু বললেন, 'সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার।' মা একটু ভয় পেলেন। দাদু খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে একটু বেহিসেবী ছিলেন, পাঁচপো দুধের সঙ্গে পুরো একটা কাঁঠালের রস, ডালের সঙ্গে আধ শিশি কাঁচা ঘি, এইসব ছিল তাঁর সাংঘাতিক খাওয়া। মা ভাবলেন দাদু হয়তো কাপড়ে করে ফেলেছেন। আগে একবার দু'বার এই ধরনের ঘটনা ঘটে গেছে। মা বললেন, 'করে ফেলেছেন।' দাদু খুব বুক ঠুকে উত্তর দিলেন, 'না না, সেরকম বিচ্ছিরি নয়।' সেই কাজটি করে ফেলেননি বলে যেন বেশ গর্বিত। 'তবে কি করেছেন?' মা যেন বেশ ধাঁধায় পড়লেন। দাদুর মুখটা যেন দুষ্টু ছেলের মত হয়ে উঠল। চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বললেন, 'ডানহাতের আঙুলটা টেবিলে আটকে গেছে।' মা নীচু হয়ে বললেন, 'কই দেখি?' টেবিলের পাশে যে কাঠে হরতন, চিঁড়েতন, ইস্কাবন কাটা ডিজাইন ছিল তারই একটায় দাদুর ডান হাতের তর্জনীটা আটকে গেছে। মা বললেন, 'টেনে বের করে নিন না।' দাদু অসহায়ের মত বললেন, 'বেরোচ্ছে না।' 'ঢুকলো কি করে?' দাদু তখন ঢোকার বিবরণ দিলেন, 'পরমেশ্বর রাগ করে উঠে গেল তো, আমি একলা বসে আছি। অন্যমনস্ক আঙুলটাকে এই গর্ত সেই গর্ত এমনি করতে করতে হঠাৎ একটায় ফস করে ঢুকে গেল। হাতে তেল ছিল। ওমা, তারপর আর বেরোচ্ছে না কিছুতেই। জামাই মুড়ি আর তেলে-ভাজা যত্ন করে ঠোঙায় ঢেলে দিয়ে গেল। এখনো দুটো চপ খাওয়া হয়নি। ডান হাতটা আটকে গেছে।'

ভয়ে মার মুখ শুকিয়ে গেল। 'কি হবে এখন!'

দাদু ছেলেমানুষের মত বললেন, 'কাঠটা ভেঙে আঙুলটা বের করে নিতে পারি, কিন্তু পরমেশ্বর যদি রেগে যায়।' মা বললেন, 'না না, কাঠ ভাঙা চলবে না। কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। আপনি বরং আর একবার চেষ্টা করুন।' 'হচ্ছে না রে তুলসী। তখন থেকে ঘোরাতে ঘোরাতে ছাল উঠে গেল।' মা চায়ের কাপটা শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর রেখে উত্তরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ওই দিকে এক ফালি জমিতে বাবার কিচেন গার্ডেন। ভাল রোদ পড়ে না। তবু বাবার সাধনার শেষ নেই। এক টুকরো জমিতে খুঁজলে সব গাছ পাওয়া যাবে। রোদের অভাবে সমস্ত গাছই উচ্চতায় বিশাল। গোটা কতক পেঁপে গাছ তিনতলার ছাদের কার্নিস ছুঁতে চলেছে। বাবা তখন বাগানে। সঙ্গে সহকারী নিরঞ্জন। সকালে নিরঞ্জনের মত লোক হয় না। সন্ধ্যেবেলা সেই নিরঞ্জনকেই জুতো-পেটা। গাছের গোড়ায় গোড়ায় পচা খোলের জল দেওয়া চলেছে। একটু বেসামাল হলেই নিরঞ্জন চারাগাছ মাড়িয়ে ফেলবে। বাবা মাঝে মাঝেই হাঁ হাঁ করে উঠছেন, 'যাঃ সর্বনাশ করে ফেললি, ড্যাফোডিলটা গেল।' নিরঞ্জনের দৃকপাত নেই, 'না না ছোটবাবু।' বাবা দাঁতে দাঁত চেপে বলছেন, 'ব্লাডি বাগার, পা দিয়ে চেপে দাঁড়িয়ে আছিস, ক্রিস্ট্যালাইজড ইডিয়েট। ওই জন্যে বলে মিনিমাম এডুকেশন দরকার।' নিরঞ্জন বলছে, 'সব জায়গাতেই তো গাছ। না মাড়িয়ে যাবো কি করে?' 'কেন, তোর বুড়ো আঙুলে কি পক্ষাঘাত হয়েছে, এইভাবে যাবি, টিপ টো কাকে বলে জানিস, এই দেখ।' বাবা দেখাতে গেলেন, 'যাঃ গেল, নিজেই শেষে মাড়িয়ে ফেললুম, ফ্রুসটা গেল, দূর ছাই'। নিরঞ্জন ভরসা দিল, 'ও একটা দুটো যাবেই বাবু। পেটের সবকটা ছেলেই কি আর বাঁচে। একটা দুটো মরেই।' বাবা বললেন, 'ঠিক বলেছিস। লাগা, তুই দিয়ে যা। গোড়া থেকে ছ' ইঞ্চি দূরত্ব থাকবে মনে থাকে যেন।' মা জানতেন এই ব্যাপার চলবে বেলা বারোটা অবধি। ওইখানে দাঁড়িয়েই মশার কামড় ও বার কয়েক চা খাওয়া চলবে। তারপর গাছের বাড়তি ডাল কাটতে গিয়ে হাত কেটে, ওপরে উঠে আসবেন— গেল গেল করতে করতে। আয়োডিন আর ব্যান্ডেজ তৈরিই রাখা আছে।

মা উত্তরের বারান্দা থেকে দক্ষিণে টেবিলের সঙ্গে আটকে-থাকা দাদুর কাছে চলে এলেন। সামনেই রাস্তার ওপারে সনাতনের ছোট্ট ছবি-বাঁধাইয়ের দোকান। সারাদিন ছোট্ট হাতুড়ি নিয়ে ঠুকঠুক করে কাজ করে। লম্বা, কালো পাকানো চেহারা। মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের ডিবে খুলে বিড়ি মুখে দিয়ে যখন এ বাড়ির জানালার দিকে তাকায় তখন দেখেছি চোখ দুটো ঘোলাটে হলুদ। মা বললেন, 'সনাতনকে একবার চুপি চুপি ডেকে আনতে পারিস?' সনাতন এসে হাজির, 'কি বলছেন মা?' রোগা হলে কি হয়, বাজখাঁই গলা। মা ফিসফিস করে বললেন, 'আস্তে-আস্তে'। সনাতন গলাটাকে যথাসম্ভব খাটো করে বলল, 'কি হয়েছে মা'? মা তখন সনাতনকে ব্যাপারটা দেখালেন। হাঁটু মুড়ে দাদুর চেয়ারের পাশে বসে সনাতন টেবিলটা ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, দুটো স্ক্রু দিয়ে কাঠটা লাগানো আছে। স্ক্রু দুটো খুলে নিলেই কাঠটা আঙুলের সঙ্গে টেবিল ছেড়ে চলে আসবে লম্বা আংটির মত।' মা বললেন, 'তাহলে খুলে ফেলুন। খুব তাড়াতাড়ি। একটুও শব্দ করবেন না।' সনাতন খড়ম পায়ে সিঁড়ি দিয়ে খটাং খটাং করে নামছিলেন। মার কাঁচুমাচু অনুরোধে শুধু পায়ে হাতে খড়ম নিয়ে দোকানে চললেন যন্ত্র আনতে।

স্ক্রু দুটো অনেকদিনের। মরচে পড়ে মাথার ঘাট বোধ হয় বুজে এসেছিল। সনাতনকে বেশ কসরত করতে হল। টেবিলটাকে ঠেলে সরাবারও উপায় নেই। দাদু আঙুল আটকে বসে আছেন। ঘুপচিমত জায়গায় কোনো রকমে সনাতন অসাধ্য সাধনে ব্যস্ত। দাদুর মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন বেশ মজা হয়েছে এমনি ভাব। মার মুখে চাপা উৎকণ্ঠা। একটা কান বাগানের দিকে পড়ে আছে। বাবার গলা শুনতে না পেলেই পা টিপে টিপে গিয়ে দেখে আসছেন।

হঠাৎ ঝরঝর করে এক গাদা পটলের মত গোল গোল কাঠ মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে গেল। 'এই রে, কি হল' বলে মা এগিয়ে গেলেন। সনাতন টেবিলের পাশ থেকে হাসি হাসি মুখ তুলে বললেন, 'একটা পাশ খুলে ফেলেছি।' 'এগুলো খুললেন কেন?' মার প্রশ্ন। কাঠটা খুললেই তো এগুলোও খুলবে মা। উপরের কাঠের চাপে এই কেয়ারিগুলো ঠাস হয়ে ছিল।' সনাতন অন্য দিকটা খোলার কাজে মন দিলেন। দাদু দেখলেন চুপ করে থাকা ঠিক নয়। সনাতনকে তারিফ করে বললেন, 'বেশ কাজের লোক হে তুমি। ঠিক খুলেছো তো দেখছি।' মা তখন গোল কাঠগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আঁচলে ঢাকছেন বামাল ধরা পড়ে যাবার ভয়ে।

কাঠের টুকরোটা অবশেষে টেবিলের মায়া ছেড়ে দাদুর পুরুষ্টু তর্জনীর সঙ্গে খুলে এল। দাদুর সে কি মুক্তির আনন্দ! মনে হল যেন জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কাঠটা আঙুল সমেত দুবার ঘুরিয়ে দেখে বললেন, 'বেশ ফিট করেছে রে তুলসী!' দাদুর উল্লাসে মা ঠিক যোগ দিতে পারলেন না। জানি মার মনে তখন কি খেলা করছে। একটু পরেই ওই রুমাল আকৃতির এক টুকরো বাগান থেকে বাবা ঘর্মাক্ত চেহারা নিয়ে ওপরে উঠে আসবেন। মুখে নানারকমের অদ্ভুত শব্দ। খুব পরিশ্রম হলে বাবা জোরে জোরে মুখ দিয়ে হাওয়া ছাড়তেন। ফুস...স। ফুস...স। অনেকটা এখনকার প্রেসার কুকারের মত।

রবিবার দ্বিতীয় বিশাল কাজ ছিল, টেবিলের শ্বেতপাথর পুটি দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করা। আগের রবিবার ইচ্ছে করেই পরিষ্কার করেননি। সেও এক ঘটনা। আমার বন্ধু বিপুল, কপিং পেনসিল দিয়ে পাথরের উপর নাম লিখেছিল—বিপুল রায়। গোটা গোটা হাতের লেখা। যেদিন লিখে গেল তার পরের দিন বাবার চোখে পড়ল।

বাবা পাশে 'অ্যারো' দিয়ে আরো বড় বড় করে লিখলেন ব্লাডি বাগার। দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা কি ছবি আঁকা, বইয়ের পাতায় নাম সই, শ্বেতপাথরের টেবিলে নিজের নাম জাহির করা, খাতায় ঘিচু ঘিচু কিছু আঁকা দেখলেই বাবা উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। সঙ্গে সঙ্গে লেখকের জন্যে শুরু হত মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা। আমাদের বাইরের সদর দরজায় এই রকম লেখার লড়াই কার বিরুদ্ধে জানি না বেশ কিছু দিন চলছে। ঢোকার মুখে কোনো অতিথি একটু লক্ষ করলেই অবাক হবেন। প্রথম লেখা, বাঘের বাসা। লেখক বোধহয় আমাদের বাড়িকে 'বাঘের বাসা' নাম দেবার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বাবা লিখলেন—'স্কাউন্ড্রেল'। অদৃশ্য লেখক লিখলেন—'পাগলের আখড়া'। বাবা উত্তরে লিখলেন—'সোয়াইন'। উত্তর এল—'বাটারফ্লাই'। লেখক বোধহয় বাবার গোঁফ সম্পর্কে মন্তব্য করলেন। বাবা লিখলেন—'স্টুপিড'। বিশাল সদর দরজায় লেখার জায়গার অভাব নেই। সপ্তাহে সপ্তাহে উতোর-চাপানের খেলা বেশ জমে উঠেছে।

শ্বেতপাথরের টেবিলে বিপুলের লেখা আর এগোবে না। কারণ বিপুল যে ব্লাডি বাগার নিজে এসে দেখে গেছে এবং মনে হয় এ বাড়ির ত্রিসীমানা সে আর মাড়াবে না। আমাকে জিজ্ঞেস করল, ব্লাডি বাগার মানে কি রে। মানেটা আমি ঠিক জানতুম না। বিপুল মুখ চুন করে চলে গিয়েছিল।

মা দাদুকে তাড়াতাড়ি টেবিল-ছাড়া করলেন। ঠিক হল দাদু সনাতনের দোকানে গিয়ে বসবেন। সনাতন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে, কাঠটা অক্ষত আঙুল থেকে খোলা যায় কিনা। 'দাঁড়া তুলসী, চপ দুটো বাঁ হাতে চট করে খেয়ে নি।' মা আঁতকে উঠলেন, 'না না, ওপরে আসার সময় হয়ে গেছে, আপনি এখুনি পালান।' এক হাতে ঠোঙা, অন্য হাতে আঙুলে গলান কাঠের টুকরো, পায়ে কালো ক্যাম্বিসের জুতো, দাদু সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, পেছনে সনাতন, হাতে যন্ত্রপাতি। অন্যদিকে বাড়ির পেছনের সিঁড়ি দিয়ে বাবা উঠে আসছেন। মুখে প্রেসার কুকারের শব্দ। পেছনে নিরঞ্জন, হাতে খুরপি, সারের কলসি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে বোঝার উপায় নেই, পাথরের তলার এক পাশের কেরামতি ঝরে গেছে। মা আশা করেছিলেন, দুর্ঘটনাটা তক্ষুণি ধরা পড়বে না। কিছু দিন হয়তো চাপা থাকবে। বলা যায় না, সনাতনের অদ্ভুত কেরামতিতে কাঠের টুকরোটা দাদুর চাঁপাকলার মত আঙুল থেকে হয়ত খুস করে খুলে আসবে। তারপর অফিস-বারে বাবার অনুপস্থিতিতে আবার যথাস্থানে বহাল হয়ে যাবে। বাবা ওপরে এসেই এক গেলাস জল চাইলেন। বেশ মোটা কাঁচের একটা বড় গেলাস ছিল। প্রায় সেরখানেক জল ধরত। জলের গেলাসটা হাতে নিয়ে টেবিল থেকে কিছু দূরে মেঝেতে উবু হয়ে বসলেন। জল খাবার এইটাই ছিল তাঁর ধরন। একটু একটু করে জল খাচ্ছেন আর সামনের জানালা দিয়ে রোদ-ঝলসানো দ্বিপ্রহরের সুনীল আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। জল খেতে খেতে মাঝে মাঝে আঃ আঃ করে অদ্ভুত শব্দ করছেন। কিছু দূরে মা উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জানালার সামনে টেবিল। শ্বেতপাথর সমাধি-ফলকের মত শুভ্র। রবিবারের সমস্ত শান্তি যেন সেই মুহূর্তে ওই পাথরের তলায় সমাহিত। শেষ চুমুকে জলটা সমস্তই খেয়ে ফেলে বাবা একটা ফাইনাল শব্দ করলেন। ভেন্টিলেটার থেকে একটা চড়ুই পাখি উড়ে গেল। ঘুলঘুলিটার দিকে একবার তাকালেন। গত কয়েক রবিবার ধরে শুনছি ওই গর্তটা টিন মেরে বন্ধ করা হবে। গেলাসের তলানি শেষ বিন্দু জলটা ঝেড়ে ফেলে বাবা উঠে দাঁড়ালেন। যাক, দেখতে পাননি। দেখে ফেলতেও পারতেন। যে জায়গায় বসেছিলেন সেখান থেকে টেবিলের তলা ও পাশ সহজেই নজরে পড়ে।

গোড়ালির উপর ভর দিয়ে দুম দুম করে হেঁটে বাবা বাথরুমে ঢুকে গেলেন। সব কিছুতেই স্পিড—এই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। কেবল একটা জিনিসে স্পিড ছিল না, সেটা হল ইভ্যাকুয়েশান। কনস্টিপেশানের ব্যাপার। মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে বলতেন, এমন একটা উপায় থাকত ব্লাডারটা খুলে ফেলে ঝেড়ে ফেলা যেত। নিরঞ্জন সময় সময় আদেশমত পেটটা প্যাঁক প্যাঁক করে দিত। একমাত্র বেলের সিজনে খুঁতখুঁতুনিটা একটু কম থাকত।

আধঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মত সময় পাওয়া গেল। তার আগে বাথরুম থেকে বাবার বেরোবার সম্ভাবনা নেই। মা আর আমি দৌড়ে রাস্তার দিকে জানালার ধারে গেলুম। সনাতনের দোকানে দাদুর আঙুল থেকে কাঠ খোলার কসরত চলেছে। সনাতন একা দোকানে বসে আছে, দাদু নেই। অন্য সময় সনাতন হামেশাই জানালার দিকে মিটমিট করে তাকায়। সেই মুহূর্তে সনাতন তন্ময়। কি যে করছে! অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পর সনাতন হলদেটে চোখে তুলে তাকাল। মা হাতের ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন— কি হল? সনাতন ফিক্ করে হেসে দু খণ্ড কাঠ তুলে দেখালে। দাদু আঙুল ঢুকিয়েছিলেন একটা চিড়িতনে। সেই জায়গা থেকেই কাঠটা দু টুকরো হয়ে গেছে। মার মুখের মৃদু হাসি মিলিয়ে গিয়ে একটা থমথমে ভাব ফুটে উঠল।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই বাবা সেদিনের বুলেটিন ঘোষণা করলেন—অ্যাবসোলিউটলি নো ইভ্যাকুয়েশন। নিরঞ্জন সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। মানে না বুঝলেও ইংরেজিটা তার চেনা। সঙ্গে সঙ্গে বললে—'একটু প্যাঁক প্যাঁক!' বাবা বললেন—'এখন না। দাঁড়া একটু চা খেয়ে দেখি।' মা খুব দরদ দিয়ে চা করে দিলেন। একে কোষ্ঠ সাফ হয়নি, তার ওপর টেবিল ভেঙেছে। ভেঙেছেন আবার মার বাবা। ভাল চায়ে মেজাজটা যদি একটু নরম হয়।

বেলা দেড়টার সময় শুরু হল পুটি দিয়ে টেবিলের পাথর পরিষ্কার করার কাজ। মা আশ্রয় নিলেন মেজ জ্যাঠামশায়ের ঘরে। জ্যাঠামশায় একটা পুরোনো টুথব্রাশ দিয়ে ঘাড়ের কাছের চুলে কলপ লাগাচ্ছিলেন। গায়ে একটা খড়খড়ে তোয়ালে। এই বাড়ির সমস্ত অপরাধীর আশ্রয়দাতা মেজ জ্যাঠামশায়। উদারপন্থী, সদাহাস্যময়। মর‍্যাল-ফর‍্যালের ধার ধারেন না; আবেগের নির্দেশে কাজ করেন।

আমি বহুবার জ্যাঠামশায়ের শরণাপন্ন হয়ে বিশেষ সুবিধে করতে পারিনি। মার বরাতে কি হবে বলা শক্ত। সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরেই ওই শ্বেতপাথরের টেবিলে বাবা যখন আমাকে পড়াতে বসতেন, বাড়ির সকলেরই অবস্থা তখন ছিলে-টান ধনুকের মত। কখন কি হয়। প্রথমেই হোমটাস্ক। টাস্কের চৌকাঠেই প্রথম হোঁচট। একটা ভুল, দুটো ভুল। মেজাজের পারা চড়ছে ব্যারোমিটারের মত। আবহাওয়ার পূর্বাভাস। ঝড় এলো বলে। মেঘ ডেকে উঠলো—'সারাদিন কি করা হয়েছে? গুলি, ঘুড়ি, গল্পের বই?' অপরাধ চাপা থাকে না। বাবা উঠে পড়লেন। জয়েন্ট ফ্যামিলির মুখ-ফাঁদালো উনুনে প্রথম আহুতি, ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি থেকে আনা 'আবার যখের ধন'। শ্বেতপাথরের টেবিলের তলার পাদানিতে লুকোনো ছিল। যে-কোনো গুপ্ত জিনিস গুপ্ত চিন্তা টেনে বের করার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল বাবার। তারপরেই উনুনে পড়ল সিন্দুকের পাশে লুকোনো সুতো ভর্তি লাটাই। সবে চ্যাঁভোঁ মাঞ্জা দিয়ে রাখা। তারপরই ঘুড়ির কাঁপকাঠি, বুককাঠি ভাঙার পটাপট আওয়াজ। মনে হচ্ছে বুকের এক-একটা পাঁজর ভাঙছে। সেই সঙ্গে বাবার সিংহবিক্রমে দাপাদাপি আর চিৎকার—'শয়তান শয়তান, সেটান, সেটান!' মা কিছুটা দূর থেকে গরাদের-ওপাশে-থাকা ফাঁসির আসামীর সঙ্গে যেভাবে কথা বলে সেইভাবে করুণ কণ্ঠে আমাকে বলতেন—'কেন বাবা ঠিক করে অঙ্কগুলো কষলি

না।' সব শেষ করে, সব শ্মশান করে দিয়ে বাবা আবার টেবিলে এসে বসতেন। বুক ভর্তি কাঁচাপাকা চুল। ফোঁটাফোঁটা ঘাম গড়াচ্ছে। এদিকে এত কাণ্ডের পরও ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আসছে। মাথা ঝুঁকে আসছে টেবিলের পাথরের দিকে। বাবা তাক করে থাকতেন। মাথাটা প্রায় কাছাকাছি এলেই পিছনে এক ভুঁই থাপ্পড়। ঠাঁই করে কপালটা পাথরে ঠুকে ঘুম ছুটে যেত আপনি। চোখের সামনে সাদা শ্বেতপাথর, কপালে ঠিকরে আলুর যন্ত্রণা, পাথরে কোঁদা চুলওলা বাবা, খোলা বইয়ের পাতায় নৃত্যশীল কালো কালো অক্ষর। জীবনের অন্ধকারতম দিনে আলোর বীভৎস সাধনা। জ্যাঠামশায়ের কাতর প্রার্থনা—'ছেলেটাকে এবার ছেড়ে দে।' যেন বাঘে ধরেছে। বাঘের সংক্ষিপ্ত গর্জন—'ডোন্ট পোক ইওর ফাইন নোজ।' কর্তা সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে, ক-তো বা-আর বলতে হবে, কনডেনসড ইডিয়েট। লেখো। বড়ো বড়ো কোরে।'

সামনের রাস্তায় গভীর রাতের এক-আধটা পথিক, অজস্র কুকুরে লুটোপুটি ঝগড়া। সেই মেজ জ্যাঠামশায়ের কাছে শেলটার নিয়েছেন মা। কত দূর কি হবে বলা শক্ত। চুলে কলপ লাগানো বন্ধ। দরজার পাশ থেকে গুপ্তচরের মত একটা মাত্র চোখ বের করে আমি ওয়াচ করছি। মেজ জ্যাঠামশাই আশা দিচ্ছেন মাকে—'কোনো ভয় নেই বউমা, আমি ফেস করব। আজ আমি তোমার জন্যে জান দিয়ে দেবো।' পাথরে পুটি চড়ল। চারপাশে ঘুরে ঘুরে কাপড় দিয়ে পাথর ঘষছেন। জানালার দিকের অংশে গিয়ে বাবা হঠাৎ উঃ করে লাফিয়ে উঠলেন। নীচু হয়ে মেঝে থেকে কি একটা তুলে নিলেন। স্ক্রু। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন, 'এ কি হল? কোত্থেকে এল? কোন্ শয়তানের কাজ!' মার মুখ বিবর্ণ। মেজ জ্যাঠামশাই প্রস্তুত। মুখ দেখে মনে হল—তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, 'চিত্রে সমর' বলে একটা বই বেরোতো, সেই বইয়ের পাতায় দেখা যুদ্ধবন্দীদের মুখের মত করুণ।

স্ক্রুটা দু আঙুলে ধরে বাবা নীচু হয়ে টেবিলের পাশটা দেখতে লাগলেন, কোথা থেকে খুলে পড়েছে, ব্যস ধরে ফেলেছেন। একবার দেখলেন। দুবার দেখলেন। সোজা উঠে দাঁড়ালেন। স্বগতোক্তি—'এ কি হল? নিরঞ্জন!' দুবার ডাকলেন। 'ভেগেছে। হাওয়া হয়ে গেছে।' জানালার দিক থেকে সরে এসে দরজার দিকে মুখ করে চিৎকার করে বললেন, 'নিরঞ্জন কি মরে গেছে?'

জ্যাঠামশায় বেরিয়ে এলেন। ঘাড়ের কাছে কিছু চুল কালো, কিছু তামাটে। জ্যাঠামশায় বাবার কাঁধে হাত রেখে, আস্তে আস্তে মোলায়েম করে বললেন, 'চল একটু বসি, উত্তেজিত হসনি।' বাবা খুব অবাক হয়ে জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'চল না একটু বসি। একটু বসি।' একটু বসাটাকেই ঠুংরী গানের মত জ্যাঠামশাই বার কতক বললেন। কোয়েলিয়া গান থামা এবার, গান থামা এবার, গান থামা এবার। 'কিন্তু আমার তো বসার সময় নেই।' মুখ বিকৃত করে ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করে বাবা তাঁর সময়ের অভাবটা জ্যাঠামশাইকে জানিয়ে দিলেন। এই জানানোর মধ্যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল। কারণ জ্যাঠামশাই চুল রঙ করছিলেন আর বাবা টেবিল সাফ্ করছিলেন। একটা অকাজ। অন্যটা কাজ। কাঁচুমাঁচু মুখে জ্যাঠামশাই বললেন, 'কথা আছে। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় তোর নেবো না।'

দু'জনে দুটো চেয়ারে বসলেন। বাবা কোনো রকমে পেছনটা চেয়ারের ডগায় ঠেকিয়ে রাখলেন। শরীরের পুরো ভারটা রইল পায়ের উপর। হাত দুটো হাঁটুর উপর টান-টান। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত। চোখ দুটো খোলা আকাশে লটকানো। এই রকম একটা ভঙ্গি, এই রকম একটা মুখের সামনে বসার শক্তি চাই। জ্যাঠামশাই

ঘটনাটা বলে চলেছেন। মুখটাকে ঈষৎ বাঁকিয়ে বাবা শুনছেন। কোনো সময় জ্যাঠামশায়ের দিকে তাকাচ্ছেন না। মাঝে মাঝে নাকের ওপর কপালের কিছুটা অংশ কুঁচকে যাচ্ছে। ঘটনার বর্ণনা শেষ করে জ্যাঠামশাই বাবার হাত দুটো স্পর্শ করে বললেন—'তুই আর এই নিয়ে রাগারাগি করিসনি। বউমা ভীষণ ভয়ে ভয়ে আছে।'

কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। তারপরই অ্যাকশান। হাঁটুতে চটাস করে চারটে চাপড় মেরে বাবা বললেন, 'হোয়াই সনাতন, হোয়াই সনাতন। আমি কি মরে গিয়েছিলুম?'

'না না, মরে যাবার কথা আসছে কি করে? তুই ব্যাপারটা অন্যভাবে নিচ্ছিস। মুকুজ্জেমশায়ের আঙুল তুই খুলবি সেটা ভালো দেখায় না বলেই—'

'ভাল দেখায় না বলেই একটা উটকো বাইরের লোককে ডেকে টেবিলটার সর্বনাশ করতে হবে! আমি হয়তো কাঠটা ইনট্যাক্ট রেখেই খুলতে পারতুম। আমাকে একবার চান্‌সই দেওয়া হল না। কেন হল না? বলতে পার কেন হল না। এক্সপ্লেন।'

'একটা সামান্য ব্যাপার, তোকে বিরক্ত না করে যদি হয়ে যায় তাই আর কি। সনাতন পুরোনো লোক। যন্ত্রপাতি রয়েছে। টুক করে খুলে দিলে।'

'সেই কাঠ আর কেয়ারিগুলো কোথায়?'

জ্যাঠামশায় ঘটনার সেকেন্ড পার্টটা জানতেন না। অসহায়ের মত মুখ করে দরজার দিকে তাকালেন—'বউমা।'

'ও তুমিও জান না। সনাতনকে তুমি ডেকেছিলে?'

'আমি, আমি পাশের ঘরেই ছিলুম। সনাতন তো চোখের সামনেই থাকে। ওই তো কাজ করছে। চোখাচোখি হতেই চলে এল আর কি। ডাকতেও হয় না। ইশারাতেই কাজ হয়।'

'কার ইশারা?'

জ্যাঠামশায় খুব বিপদে পড়লেন। বাবা ঠেলতে ঠেলতে তাঁকে কোণঠাসা করে ফেলেছেন।

'দেখেছো বাড়ির ডিসিপ্লিন কোথায় নেমে গেছে? বাড়ির বউ কাউকে কিছু না বলে জানালা দিয়ে ইশারা করে একটা লোফার মিস্ত্রিকে হুট করে ডেকে নিয়ে এল। টেবিলটা বড় কথা নয়, মেজদা, বড় কথা হল ডিসিপ্লিন। তুমি পাশে রয়েছো জানলে না, আমি নীচে রয়েছি জানলুম না। এ হাইড অ্যান্ড সিক গেম। নিপ ইন দি বাড।'

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। জ্যাঠামশায়ের শেষ চেষ্টা—'শোন্, আমার অনুরোধ, আমি তোর চেয়ে বয়সে বড় তো, একটা রিকোয়েস্ট, এই নিয়ে তুই আর গোলমাল করিসনি। ব্যাপারটা বড্ড ডেলিকেট, বুঝলি। আমি তোর পয়েন্টটা বুঝেছি।'

হাতের একটা বিচিত্র ভঙ্গী করে বাবা বললেন—'নো কমপ্রোমাইজ।'

জ্যাঠামশায়ের মুখটা একটু কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল। বউমাকে আশা দিয়েছিলেন শেলটার দেবেন কিন্তু দাবার চালে বাবা কিস্তি মাৎ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। জ্যাঠামশায়ও উঠে দাঁড়ালেন। বাবার চেয়ে লম্বা, একটু কৃশ, অল্প কোলকুঁজো।

বাবার চেতানো বুকের সামনে বড় বেশি দুর্বল।

আমরা সকলে ভেবেছিলাম বাবা ঘরের দিকে যাবেন। তিনি ঘুরে রাস্তার দিকে জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। গরাদহীন ফরাসী জানালা দিয়ে বুকের আধখানা রাস্তার দিকে ঝুলিয়ে দিলেন। কি করতে চাইলেন বোঝা গেল না। জ্যাঠামশায় কিছু দূরে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে। আমার মনে হল, মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাচ্ছেন বোধ হয়।

কিংবা সনাতনকে ডাকবেন। হঠাৎ জানালার বাইরে হাত বের করে ফটাফট করে বারকতক তালি বাজালেন। কাকে ডাকছেন? চিৎকার করে ডাকাটা, 'আউট অব ইংলিশ এটিকেট'। তালিতে কাজ হল না। যতদূর সম্ভব চাপা গলায় ডাকলেন—'শরৎ, শরৎ, এ...এই শরৎ।' শরৎ কি করবে? শরৎ বোধ হয় সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। বাবার ডাকে মুখ তুলে তাকাল মনে হয়।

'তোমার গাড়িটা নিয়ে এখুনি একবার এস।' রাস্তা থেকে শরতের গলা শোনা গেল, 'আমি এইমাত্র গ্যারেজ বন্ধ করে খেতে যাচ্ছি।'

'আধ ঘন্টা পরে খেতে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

'আমি খেয়ে আসি না ছোটবাবু!'

'দশ টাকা দেব, কুড়ি টাকা দেব, এখুনি গাড়ি বের কর।'

তেরপলের হুক লাগানো শরতের একটা প্রাচীন গাড়ি ছিল। চারদিক খোলা। আধকাটা দরজা। দরজার সব ক'টা লক ভাঙা। আরোহীরা উঠে বসলে নারকেল দড়ি দিয়ে দরজা বেঁধে দেওয়া হত। পিছনের সিটে গদির বদলে কয়েকটা মাথার বালিশ পাতা। এই গাড়িটাই আমাদের পারিবারিক ভ্রমণে, উৎসবে নানা সময়ে ভাড়া খাটত। শরতের গাড়ি দুঃখের দিনে, আনন্দের দিনে।

বাবা জানালা থেকে সরে এলেন। বোঝা গেল শরৎ আবার বাধ্য হয়েই গ্যারেজের দিকে ফিরে গেল। সেই গোড়ালির উপর ভর দিয়ে যেমন দুমদুম করে হাঁটেন সেই ভাবেই হেঁটে বাবা ঘরে ঢুকলেন। জ্যাঠামশায় বাবাকে অনুসরণ করছিলেন। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাবাকে কাপড় নিতে দেখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'গাড়ি কি হবে রে? এই এত বেলায়।' বাবা কোনো উত্তর দিলেন না। প্রায় ছিটকে আর একদিকে চলে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, বাবা মালকোঁচা মেরে কাপড় পরলেন, তার উপর চাপালেন সাদা টেনিস শার্ট। ছুটির দিন দাড়ি কামাননি, একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি। 'চললি কোথায়?' জ্যাঠামশায় এ প্রশ্নেরও কোনো জবাব পেলেন না। সব কিছুই ঘটে চলেছে 'স্পেকটাকুলার স্পিডে'।

গাড়ি থামার আওয়াজ পাওয়া গেল। বাবা হাঁকলেন—'নিরঞ্জন।' নিমেষে নিরঞ্জন সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের কোণের দিকে মার চকোলেট রঙের ট্রাঙ্কটা দেখিয়ে বললেন—'তুলে দে গাড়িতে।' এমন ভাবে বললেন যেন ওই ট্রাঙ্কটার মধ্যে মার অনেক দিনের গলিত মৃতদেহ রয়েছে। বাবা এগিয়ে গেলেন জ্যাঠামশায়ের ঘরের দিকে। মা তখন খাটের এক পাশে পা ঝুলিয়ে বিষণ্নমুখে বসে আছেন। অসম্ভব ফর্সা রঙ। রক্তশূন্যতার জন্যে আরো সাদা দেখাচ্ছে। আমার আবির্ভাবের পর থেকেই মার শরীর ভীষণ ভেঙে গেছে।

আমার নাকি ভূমিষ্ঠ হবার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। জঠরের ঈশান কোণে ঘাপটি মেরে বসে ছিলাম, বোধ হয় বাবার ভয়ে। তারপর এক সময়ে উপায় না দেখে হেলানো পাটাতন বেয়ে লোকে যেমন হড়কে নামে সেইভাবে সড়াৎ করে নেমে এলুম। আসার সময় মার একটা ভাইটাল নাড়ী উপবীতের মত গলায় জড়িয়ে এনেছিলুম। বাপকো বেটারা বোধ হয় এই কায়দায় জন্মায়। আগে মাথাটা বের করে হালচাল দেখে নেবার প্রয়োজন বোধ করে না। তাতেও মার কি আনন্দ! অসংখ্য সন্তানের জননী হবার ইচ্ছে ছিল মায়ের। গিনিপিগের মত ঘরময় ঘুরে বেড়াবে। বাবার ঠিক উলটো। ওয়ান ইজ এনাফ। সেকেন্ড ইজ অ্যাকসেপটেব্‌ল উইথ এ স্ট্রাকচার।

বিছানার উপর হাতের চেটোটাকে উলটো করে রেখে মা আপন মনে আঙুল গুনছিলেন। লম্বা লম্বা আঙুল। একটা সাদা পোখরাজের আংটি জ্বলজ্বল করছে অনামিকায়। বাবা একেবারে মার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।—'ওঠো।' মা ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'চলো।' বাবা চলতে শুরু করলেন। জানেন এ আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারুর নেই। মার পরনে একটা নীল বুটিদার শাড়ি। জ্যাঠামশায়ের এইটা লাস্ট চান্‌স। নিজের কোর্টে প্রতিপক্ষকে পেয়েছেন। দরজা আগলে দাঁড়ালেন। 'এই দুপুর বেলা বউমাকে নিয়ে কোথায় যাবি?'

'তুমি পঞ্চতন্ত্র পড়েছ?' দরজা থেকে একটু দূরে থমকে দাঁড়িয়ে বাবা প্রশ্ন করলেন। জ্যাঠামশায় একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। 'বুঝেছি পড়নি। পড়বে কখন? জীবনে দুটি জিনিস।' দুটো আঙুল তুলে হাতের একটা ভঙ্গি করলেন, 'চুল আর মাছ। শুনে রাখ, শরীরের জন্যে প্রয়োজন হলে একটা অঙ্গ ত্যাগ করবে। গ্রামের জন্যে একটি পাড়া, শহরের জন্য গ্রাম, দেশের জন্যে শহর। ফর দি স্যাংটিটি অব দি ফ্যামিলি লেট দেম বি রিমুউভড্।' মুউ শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে বাবা দরজাব্যূহ ভেদ করার জন্যে এগিয়ে এলেন। জ্যাঠামাশায় কিন্তু প্রকৃত বীরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন স্বদেশী আমলে একটা কথা প্রায়ই আমাদের কানে আসত—ডু অর ডাই। জ্যাঠামশায়ের সাহস দেখে মনে হল এই সঙ্কটপূর্ণ দিনে তাঁর ব্রত হল—ডু অর ডাই। 'তোর স্বেচ্ছাচারিতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। হিটলারের মত একটা ডিক্টেটার হয়ে উঠছিস। বউমাকে তুই কোথাও নিয়ে যেতে পারবি না। আই ওন্ট অ্যালাও।' জ্যাঠামশায়ের মুখে ইংরেজী মানে তিনি খুব রেগে গেছেন। শুকনো তোয়ালেটা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল, দু হাতে তাড়াতাড়ি চেপে ধরলেন আর 'গাদি' খেলার খেলোয়াড়ের মত বাবা সট্ করে দরজা গলে বেরিয়ে গেলেন। মা দাঁড়িয়ে রইলেন, কি কববেন ভেবে পেলেন না। শেষে বললেন, 'আমি তবে আসি।'

'কোথায় আসবে তুমি মা? তুমি এইখানে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে। হু ইজ হি? এ টাইরান্ট। আই উইল সি হিম।'

জ্যাঠামশায় হাঁকলেন—'নিরঞ্জন।'

রাস্তা থেকে উত্তর এল—'যাই মেজবাবু।'

'নামিয়ে নিয়ে আয়।'

'বাক্সটা?'

'হ্যাঁ বাক্স।'

নিরঞ্জন চলে গেল বাক্স আনতে।

বাবা পাল্টা নির্দেশ দিলেন, 'খবরদার নামাবি না।' নিরঞ্জন সিঁড়ির বাঁকে থেবড়ে বসে পড়ল। জ্যাঠামশাই টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে ঘোষণা করলেন, 'এই বাড়ি থেকে কারুর একপা বেরুনো চলবে না। এটা জয়েন্ট ফ্যামিলি। কারুর একার মতে সংসার চলবে না।'

বাবা ঘুরে দাঁড়ালেন, 'অবিশ্বাসী, ষড়যন্ত্রকারী স্ত্রী নিয়ে সংসার করা চলে?'

'বউমা এর কোনটাই নয়। তোমার চিরকালের স্বভাব তিলকে তাল করা। আই ডোন্ট এগ্রি উইথ ইউ।'

'আমার ফ্যামিলি আমার মতে চলবে। এ সব ব্যাপারে নো লিনিয়েনসি।'

শরৎ রাস্তা থেকে চিৎকার করে উঠল, 'কি হল রে বাবা!'

জ্যাঠামশাই চিৎকার করলেন, 'নিরঞ্জন, রাসকেল, বাক্স নামিয়ে আন আর শরৎকে দশটা টাকা দিয়ে বিদেয় কর।'

'আমাকে ছোটবাবু জুতোপেটা করবেন।'

'আমি তোকে ডাণ্ডাপেটা করব রাসকেল। তোমার ফ্যামিলি কি? আমরা তোমার বিয়ে দিয়েছিলুম। বউমা তোমার একার নয়। এই বাড়ির বউ।'

নিরঞ্জন বাক্সটা ঘাড়ে করে ওপরে উঠে এল। শরতের গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলে গেল।

'তুমি জামাকাপড় খুলবে কি না?'

'মেজদা, তোমার প্রশ্রয়ে সংসার উচ্ছন্নে যাবে।'

'যায় যাবে। ডোন্ট ফরগেট, সংসারটা তোমার অফিস নয়। কথায় কথায় ডিসচার্জ আর চার্জশিট করবে।'

'স্বীকার করুক অন্যায় হয়েছে। আই উইল পার্ডন হার।'

'বউমা।'

মা পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন, দরজার পাশেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখ একেবারে বিবর্ণ।

'বলো অন্যায় হয়ে গেছে।'

বাবা বুক চিতিয়ে চিবুক উঁচু করে দাঁড়ালেন। মা গলায় আঁচল দিয়ে খুব মৃদু সুরে বললেন, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

বাবা মুখ উঁচু রেখেই বললেন, 'আর কখনো এরকম কোরো না। দিস ইজ ভেরি ব্যাড। পানিশেবল অফেন্স। কক্ষনো নিজে কোনো ডিসিসান নেবে না। মেয়েছেলে, মেয়েছেলের মত থাকবে।'

মা পিছন ফিরে ধীরে ধীরে চলে যেতে যেতে নারীর অধিকার সংক্রান্ত শেষ উপদেশ শুনে নিলেন।

সেই শ্বেতপাথর। সেই শ্বেতপাথর দাঁড় করানো রয়েছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। সেই নক্শা ফ্রেম চলে গেছে উইয়ের পেটে। আর শ্বেত বলা চলে না, অব্যবহারে ধূসর। জীবন থেকে চল্লিশটা উত্তপ্ত বছর বাষ্পের মত বের করে দিয়ে বরং বাবার চুল এখন প্রকৃত দুগ্ধশুভ্র। মা এখন অয়েল পেন্টিংয়ে অস্পষ্ট স্মৃতি। জ্যাঠামশায় একটি ধূসর ছবি। শুকনো মালায় মাকড়সার লালা। দাদুর লাউফাটা তানপুরা গলায় দড়ি দিয়ে হুক্ থেকে ঝুলছে। চিবুক উঁচু করে বাবা এখনো দাঁড়াতে পারেন কিন্তু পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসার মত কেউ এ পরিবারে আর অবশিষ্ট নেই।

কুণ্ডুবাবুর কুকুর, আমি এবং ভূতনাথ
তপোবিজয় ঘোষ

ওই কুকুরটাকে আমি একদিন খুন করব।

কুণ্ডুবাবুদের ওই প্রকাণ্ড এ্যালসেসিয়ানটার কথাই বলছি। শালা এক নম্বরের হারামি, আমাকে কিনা সন্দেহ করে। এমনি চুপচাপ নিরীহ ভালমানুষটি, সিঁড়ির গোড়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে দু'পা আকাশে উঁচিয়ে আছে। কখনো লেজ নাড়ছে, কখনো পা দিয়ে নাকের ডগার মাছি তাড়াচ্ছে। মেমসাহেবদের মতো কটা-চোখ আধবোজা, ঘন লোমে বাতাসের ঢেউ খেলছে। কুণ্ডুগিন্নীর ধাড়ি বেড়ালটা ওর সামনে দিয়ে গর্ গর্ করতে করতে চলে যাচ্ছে, ভজুয়া ঝাড়ন হাতে দরজা-জানালা সাফ করছে, কার্তিক জলের ঝাঁঝরি নিয়ে টবের গাছে জল দিচ্ছে, কাউকে কিছু বলছে না। রসকলি-কাটা সাহেব-বোষ্টমদের মতো মায়া-মাখানো মুখের ভাব করে এক-আধবার মিট মিট করে তাকাচ্ছে, আবার জিভ ঝুলিয়ে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ছে।

কিন্তু যেই আমি রাস্তার ধারে বাগানের ছোট গ্রীলের দরজায় হাত রাখলাম, অমনি দেখ, শালা যেন রণমূর্তি! চকিতে দাঁড়িয়ে গেল উঠে, পাকিয়ে তুলল চোখ, সামনের দিকে ছড়িয়ে দিল থাবা, বর্শাফলকের মতো ঝল্‌কে উঠল দাঁত, আর সমানে ঘেঁও-ঘেঁও-ঘাঁক—। প্রথম দিন আমি তো দারুণ ভয় পেয়েছিলাম।

এই মফঃস্বল শহরের স্কুলে সবে ঢুকেছি। একদিন সেক্রেটারি নিত্যানন্দ কুণ্ডু হেডমাস্টারের ঘরে ডেকে পাঠালেন। একথা সেকথার পর মেদবহুল ভারি শরীরটা সেগুন কাঠের ঈজিচেয়ারে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, শুধু স্কুলে পড়ালেই তো চলবে না মাস্টার। আমার ঘরেও যে একটি ছাত্র আছে—

হেডমাস্টার তাড়াতাড়ি বললেন, সুবোধ। খুব ভাল ছেলে। আমাদের স্কুলেই টেন্ বি-তে পড়ে।

সেক্রেটারি চুরুট ধরালেন, ইংরেজি-বাংলা কালিদাসবাবু দেখিয়ে দেন। আপনি একটু সায়েন্স সাবজেক্টগুলো—

টীচার্স-রুমে ফিরে আমি কালিদাসবাবুর খোঁজ করলাম। এক কোণে বসে বাসি কাগজ পড়ছিলেন। মাথার চুল সমস্তই সাদা। লম্বা নাকে নিকেলের গোল চশমা। এই স্কুলের প্রবীণতম শিক্ষক। আমি কাছে গিয়ে বসতেই দন্তহীন মুখে নিঃশব্দ হাসলেন, 'কখন যেতে বললেন কুণ্ডুবাবু?'

বললাম, 'সকালের দিকে আপনি তো সন্ধ্যায় যান—'

'হুঁ! টাকা, পয়সার কথা কিছু বললেন?'

'না।'

'পাবেন না। ফ্রি সার্ভিস!'

'মানে?'

'মানে বেগার খাটুনি—'

'আপনিও?'

'হ্যাঁ।'

শুনে সেই গোড়ার দিকেই মনটা অপ্রসন্ন হলো। টাটকা পাশ করে বেরিয়েছি। শরীরের তাজা রক্ত কারণে অকারণে উষ্ণ হয়। একটু চড়াগলায় বলে ফেললাম, 'তাহলে যাব কেন বেগার খাটতে?' কালিদাসবাবু নিচু গলায় বললেন, 'না গেলে মুস্কিল আছে। তার চেয়ে যান, আখেরে লাভ হতে পারে।'

সেদিন বিকেলেই আবার হেডমাস্টার ডেকে পাঠালেন, 'নতুন হোস্টেল-বিল্ডিংটার কাজ শেষ হলে আপনি সুপারিনটেনডেন্ট হবেন। কুণ্ডুবাবু বলে গেলেন।'

বুঝলাম, ফ্রি সার্ভিসটা একেবারে ফ্রি নয়। কালিদাসবাবুও আশা করে আছেন, আসছে বছর তাঁর রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেলে কুণ্ডুফার্মের কোথাও শ'খানেক টাকার একটা কাজ পেয়ে যাবেন। হোস্টেল-সুপার হলে বিনাভাড়ায় বাসস্থান জুটবে। উপরন্তু মাসিক ত্রিশটাকা ভাতা। চাকরিতে ঢুকতে না ঢুকতে এই বাড়তি সুবিধা, মন্দ কি!

তবু অস্বস্তি দূর হলো না। সমস্ত ব্যাপারটা একটু যেন পিচ্ছিল অপমানকর মনে হতে লাগল। সহকর্মীদের চোখে ঈর্ষার ফুলকি, ঠোঁটে চাপাহাসির বিদ্রূপ। ছুটির মুখে সীতেশ রায় তো বলেই ফেলল, 'এসেই সেক্রেটারির গুড় বুকে উঠে গেলেন! আপনাদেরই কপাল মশাই—।' লজ্জিত আহত ভঙ্গিতে আমি চুপ করে রইলাম। আমার হয়ে কালিদাসবাবু বললেন, 'হবে না। কেমিস্ট্রির লোক যে। শক্ত করে না বাঁধলে দড়ি ছিঁড়তে কতক্ষণ—'

সীতেশ অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বাঁকা করে হাসল, 'সত্যি কালিদাসদা! কি কুক্ষণে যে ইতিহাস পড়েছিলাম—'

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমি ঘুমাতে পারলাম না। প্রাণবন্ধু হোটেলের জীর্ণ তক্তাপোষে শুয়ে মশার গুনগুন, ট্রেনের শব্দ, নাইট-শো সিনেমা ফেরত দর্শকদের উচ্চকণ্ঠ কোলাহল শুনতে শুনতে অধৈর্য ও বিরক্ত হয়ে বার দুই বাথরুমে গেলাম, জল খেলাম এবং শেষকালে যথেষ্ট রাগত ভঙ্গিতে নিজের মনেই এক ধরনের যুক্তি খাড়া করে অর্থনৈতিক-তত্ত্বের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা করলাম: আমি তো আসলে রসায়ন শাস্ত্রের লোক, গাঁয়ের এই স্কুলগুলোতে আমার যথেষ্ট চাহিদা আছে কিন্তু সে অনুপাতে যোগান নেই। সুতরাং আমার বাজার দর যদি কিছু চড়া হয় এবং সে কারণে সুপারের পোস্টটা যদি অনেককে ডিঙিয়ে আমার ভাগেই পড়ে, তাহলে এর মধ্যে অন্যায় বা অযৌক্তিক কি আছে! এটা আসলে আমারই প্রাপ্য। তা ছাড়া, আমি নতুন ঢুকেছি কাজে। ওপরওয়ালাদের কোনো কারণে চটিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে এখনই উচিত না। সপ্তাহে মোটে তিনদিন তো যাচ্ছি পড়াতে। যখন ভাল লাগবে না তখন না গেলেই বা ক্ষতি কি! সে তো আমার ইচ্ছের মধ্যেই।

পরের দিন সকালে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। ছাতা হাতে কুণ্ডুমশাইয়ের বাড়ি চললাম। শহরের শেষ দিকে নতুন হাসপাতালের কাছে বাড়ি। এতবড় আর এমন হাল-ফ্যাসানের বাড়ি এই শহরে আর একটাও নেই। সামনে-পিছনে সুন্দর সুদৃশ্য বাগান। বাগানের পেছনে জীপ-ট্রাক ইত্যাদির জন্য টিনের শেড্ দেওয়া মস্ত বড় চৌহদ্দি, তার পাশে কুণ্ডুফার্মের অফিস ও পেট্রোল পাম্প। এই শহরের পয়লা নম্বরের কন্ট্রাক্টর কুণ্ডুবাবু। বাসরুটগুলোও তাঁর দখলে। ত্রিশখানা বাসের সঙ্গে শ'খানেক রিকসাও আছে। নিত্যানন্দ কুণ্ডু নিজে কোন রাজনীতি করেন না। সে দপ্তরটা তাঁর দাদা

সত্যানন্দ কুণ্ডুর ভাগে। সত্যানন্দ এ অঞ্চলের ডাকসাইটে বক্তা, ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ্। ওঁদের এই ভরাডুবির বাজারেও সত্যানন্দ ডুবে যাননি, দু'পাশের কচুরিপানা প্রবল ভাবে দুই হাতে সরিয়ে মাথাটা ভাসিয়ে রেখেছেন। প্রাণবন্ধু হোটেলের মালিক নগেন চাটুজ্যে বলেছেন, ইলেকশনে সত্যানন্দ নাকি লাখ দুই টাকা খরচ করেছিলেন। সে টাকা এসেছে কুণ্ডুফার্ম থেকে। ফলে, নতুন হাসপাতালের বাড়তি অংশ এবং স্কুলের হোস্টেল-বিল্ডিংটা নাকি শুধু বালিতেই গাঁথা হচ্ছে! নিত্যানন্দবাবু সেক্রেটারি-হেতু স্কুলের কাজকর্মের কন্ট্রাক্ট কুণ্ডুফার্ম নিতে পারে না। তার কন্ট্রাক্ট নিয়ে থাকেন শ্রীযুক্তা স্নেহলতা কুণ্ডু। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ কুণ্ডুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী।

অবশ্য এসব বানানো কথাও হতে পারে। আমি নতুন এসেছি, ঠিক জানি না। গতকাল হেডমাস্টার-মশাই তো বললেন, কুণ্ডুবাবুদের মতো মহৎপ্রাণ লোক আর হয় না। সত্যানন্দ যদি শিব, তবে নিত্যানন্দ বিশ্বকর্মা! একজন আত্মভোলা দেশসেবী, অন্যজন বিষয়নিষ্ঠ কর্মযোগী। এই শহরে দানের অন্ত নেই ওঁদের। এই যে এতবড়ো স্কুলটা দেখছেন, সব জমিই ওঁদের। ওঁদের মায়ের নামেই স্কুলের নাম 'ভবতারিণী বহুমুখী বিদ্যালয়'। আর তাই তো সত্যানন্দ কখনো ইলেকশনে হারেন না। দেশের লোক তো আর অন্ধ না, সোনাপেতল চেনে। যাচ্ছেন তো ও-বাড়িতে। কাছে থেকে দেখবেন কেমন মানুষ—

টিপটিপ বৃষ্টির জন্য দরজা-জানালাগুলো অধিকাংশ বন্ধ ছিল। আমি সেই তিনতলা বাড়িটার সর্বত্র দৃষ্টি ফেলেও কাউকে দেখতে পেলাম না। নিচের হলঘরের দরজাটা শুধু খোলা। ওপরে ওঠার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। আমি বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে গ্রীলের দরজাটায় হাত রাখলাম। একটু বুঝি শব্দ হলো। আর তৎক্ষণাৎ—

হ্যাঁ, বাঘের মতো বিশালাকার পাটল বর্ণের সেই কুকুরটা।

সিঁড়ির আশেপাশেই কোথাও ছিল। এক লাফে মোরামের রাস্তাটুকু পার হয়ে একেবারে দরজার সামনে। কটা-চোখে উদ্যত সন্দেহ, বর্শাফলকের মতো তীক্ষ্ণ দাঁতে ধারালো হুঁসিয়ারি, ছুঁচলো থাবার নখে আক্রমণের পূর্বাভাস! কিন্তু শব্দমাত্র নেই। অসম্ভব নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে এসে গ্রীলের দরজায় দুই পা তুলে আমার প্রতি দৃষ্টি স্থির করল। আমি সভয়ে দু'পা পিছনে হটলাম। ভাগ্যিস দরজাটা খুলিনি!

এখন কুকুরটা নিঃশব্দে আমাকে দেখছে। আমি নিঃশব্দে কুকুরটাকে দেখছি। দু'জনেই অদ্ভুত রকমের স্থির ও শান্ত। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বাতাস-বাহিত জলকণায় আমার প্যান্ট শার্ট ভিজে উঠছে। ঘন পশমের মতো নরম পাটলবর্ণ লোম কুকুরটার, বৃষ্টির ছাঁটে আরও যেন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে।

এই কুকুরটা আমাকে কখনো দেখেনি। এত পরিপুষ্ট, টলটলে, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে মিল-টানা এমন ক্ষিপ্র চতুর শিকারি কুকুর আমিও আর কখনো দেখিনি।

আমার বাপ দাদা মামা কাকারা এ্যালসেশিয়ান দূরে থাক, নেড়ি কুত্তাও কেউ পোষে না। আমাদের সংসারের যা আয় তাতে বাড়ির বাচ্চাগুলো সবসময়ই একবাটি মুড়ি কি একখণ্ড রুটির জন্য কুকুর ও বেড়ালছানার মতো মা-মাসীদের পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে। আর আমরা যারা বয়সে তেমন না বেড়েও মনে মনে অসম্ভব বড় ও বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছি, খিদেটাকে পরিপাটি ভাঁজ করে নাইকুণ্ডলের চক্রে শুইয়ে রেখে নানা কাজের ধান্দায় ব্যস্ত থাকি। বাড়তি কুকুর বেড়াল পোষার কথা আমাদের মনেই পড়ে না।

একবার উঠোনে ফাঁদ পেতে একটা টিয়ে ধরেছিলাম। মাকে খাঁচার কথা বলতেই বাবা তেড়ে এলেন, 'কোথায় রাখবি শুনি! বাইরে রাখলে শেয়াল কুকুরে খাবে। ঘরে রাখলে হেগে-মুতে একশা করবে, ছেড়ে দে এক্ষুনি।'

টিয়েটা দু'দিন পরেই দড়ি কেটে পালিয়েছিল। কিন্তু বাবার আপত্তির কারণটা আমি বুঝেছিলাম আরো পরে। একমুঠো ছোলা কি ভাত, ওর পেছনে যা-ই খরচ হোক না কেন, সেটুকুর ভার বইবার মতো ক্ষমতাও আমাদের সংসারের ছিল না। নেহাৎ ঘরের কাছে কলেজ আর ভাল ছেলে হিসাবে বাড়তি কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলাম, তাই অনার্স-ডিগ্রিটা কেড়ে আনতে পেরেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের খপ্পর থেকে। তা না হলে আমার তো মদন সা'র মুদির দোকানে খাতা লেখার কথা—

মফঃস্বলের ছেলে হলেও এ্যালসেশিয়ান আমি দু একটা দেখেছি। আমার কলেজের বন্ধু রবিদের বাড়িতে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে পর্যন্ত দেখেছি। এমন বড় ছিল না সেটা। প্রকৃতিতেও শান্ত ছিল। আমি বলতাম 'দো-আঁশলা', তাতে রবির প্রেস্টিজে লাগত। মুখ গম্ভীর করে বলত, 'তুই তো ভারি চিনিস! খাঁটি বাঘের রক্ত আছে টমির গায়ে। বাবা নিউ-মার্কেট থেকে কিনেছে। সত্তর টাকা দাম'।

শুনে আমি অবাক হতাম। একটা কুকুর-ছানার দাম সত্তর টাকা! অনার্সের অর্ধেক বই যে কেনা হয়ে যেত ওই টাকায়। কোন্ সে নিউ মার্কেট! কেমন তার চেহারা! আমি যখন পাশ করে চাকরি করব তখন একবার কলকাতায় নিউ-মার্কেট দেখতে যাব। সত্তর টাকা কি সোজা কথা! আমার বাবা সারা মাস খেটে মাইনে পায় যে মোটে দেড়শ টাকা—

কুণ্ডুবাবুর কুকুর এই সময় অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে থাবা দিয়ে গ্রীলের দরজা আঁচড়াল। ঘাড় গলা ঝাঁকিয়ে বৃষ্টির জল ঝড়ল। আমার দিকে একলক্ষ্যে তাকিয়ে মৃদু শব্দ করল, গরর্ গরর্...। চোখে সন্দেহ স্থির অকম্পিত বক্ররেখায় ঝুলে রইল।

তা থাকুক। আমি কিছু কুণ্ডুবাড়ির জামাই না যে এ-বাড়ির মেয়ের গন্ধ গায়ে লেগে আছে বলে সেই ঘ্রাণে ও আমাকে চিনে নেবে। বরং মনে মনে আমি ওর প্রভুভক্তির তারিফ করলাম। কিন্তু এভাবে, মধ্যবর্তী-দরজার দুই প্রান্তে দুইজন, একজন মানুষ ও একটা কুকুর, কতক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। আশে পাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। ছ'টা বেজে দশ। কুণ্ডুবাড়ি কি নতুন বর্ষার জল পেয়ে সেকেন্ড রাউন্ড ঘুম দিল! ছাত্রের নাম ধরে চিৎকার করাটা নিশ্চয়ই সৌজন্য-বিরোধী হবে, আর 'কুণ্ডুবাবু' বলে হাঁকলে চাকরি যাওয়া বিচিত্র নয়। আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অসহায় ভঙ্গিতে চারদিকে তাকালাম। এ বাড়ির চাকর-দারোয়ানেরা গেল কোথায়।

আর তখুনি মনে হলো, এই কুকুরটা যদি জোরে চেঁচায় তাহলে কাজ হবে। সুতরাং সে চেষ্টাই করা যাক। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে দরজা সহ সংলগ্ন পাঁচিলের উচ্চতা পরীক্ষা করলাম। লাফিয়ে আসার ভয় নেই দেখে মুখটা বিকৃত করে জিভ বের করলাম এবং ছাতাটা বাড়িয়ে ওর নাকের ডগায় বার কয়েক দুলিয়ে দিয়ে চোখ পাকিয়ে শব্দ করলাম, হোই হোই হুস্ হুস্...

সঙ্গে সঙ্গেই ফল ফলল। চোখ মুখ রক্তাভ হিংস্র করে কুকুরটা প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ল, ঘেঁউ ঘেঁউ ঘেঁউ— ওর সারা শরীর টান টান সোজা হয়ে গেল। দু'পা দিয়ে গ্রীলের দরজা আঁচড়াতে লাগল, লাফিয়ে ওপরে উঠতে চাইল। মনে হলো, এই মুহূর্তে আমি যদি ওর নাগালের মধ্যে থাকতাম তাহলে ও নির্ঘাৎ আমার টুঁটি চেপে ধরে মাংস ছিঁড়ে নিত। কুণ্ডুবাড়িতে পা দিতে না দিতেই কি সাংঘাতিক অভ্যর্থনারে বাবা।

পরের ব্যাপারটাও হিসেবমতোই ঘটল। টাইগারের বাড়ি-কাঁপানো চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে দোতলার পর্দা সরিয়ে একটি নারীমুখ উঁকি দিয়ে অদৃশ্য হলো। তিনতলার ঝুল-বারান্দা থেকে ঝাড়ন-হাতে একটা লোক গলা বাড়িয়ে ডাকল, 'টাইগার, এই টাইগার।' আর নিচের বাগান-অংশের কোনো অদৃশ্য স্থান থেকে একটা কালো ঢ্যাঙা লোক চকিতে বেরিয়ে হন হন করে এগিয়ে এল। টাইগার সমানে চিৎকার করতে লাগল। এই লোকটা এসেই টাইগারের গলার বেল্ট শক্ত করে টেনে ধরে ধমকাল, 'এই শালো! চুপ যা, চুপ যা! এত চিঁচাইছিস কেনে! ঘরে কি ডাকাত ঢুইক্‌ল, এ্যাঁ?'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে, 'ভিতরে আসবেন বাবু? তবে টুকচি অপিখ্যে করুন। ইয়াকে বেঁধে আসি। ভারি হারামি কুকুর বাবু—'

সেই কার্তিক, এক হাতে গাছ কাটার প্রকাণ্ড কাঁচি, অন্য হাতে কুকুরটার বেল্ট ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল বারান্দায়। কুকুরটা যেতে যেতেও বার বার ঘুরে আমাকে দেখল আর চাপা রাগে শব্দ করল, গরর্ গরর্—ঘাঁক! ওকে শেকলে বেঁধে কার্তিক দরজা খুলে দিল। ততক্ষণে আমার ছাত্রটিও দোতলার বারান্দায় উঁকি দিয়েছে। সে ক· ল, 'স্যারকে ওপরে নিয়ে আয় কার্তিক।'

সিঁড়িতে পা রাখার সময় কুকুরটা আবার চেঁচাল, মেঝে খামচাল এবং একলক্ষ্যে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

আমি চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, 'কি সাংঘাতিক কুকুর তোমাদের!'

সুবোধ সরু করে হাসল। বেবিফুডের বিজ্ঞাপনে যে-সব টলটলে হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চাদের ছবি দেখা যায়, তারই কিছু বড় সংস্করণ ও। হাসলে গালের মাংসে ভাঁজ পড়ে, চোখ দুটো ছোট হয়ে আসে। বলল, 'হ্যাঁ স্যার, খাঁটি আমেরিকান কুকুর যে!'

খাঁটি আমেরিকান কুকুর বলতে কি বোঝায় আমি বোকার মতো জানতে চাইলাম। পড়াশুনা সেদিন বিশেষ জমল না। সুবোধ খুব গম্ভীরভাবে আমাকে কুকুর-বিষয়ে জ্ঞান দিল। বছর পাঁচেক আগে সত্যানন্দ কুণ্ডুর সঙ্গে যোগাযোগ করে কয়েকজন আমেরিকান সাহেব এসেছিলেন এই অঞ্চলে। কুণ্ডুবাড়িতেই উঠেছিলেন ওঁরা। দুমকার ঘন শালবনকে কেন্দ্র করে একটা কাঠের ব্যবসা শুরু করার ইচ্ছে ওঁদের। ওঁদের গাড়িতেই ছিল টাইগারের মা ও বাবা। কোলকাতা হয়ে দিল্লীতে ফিরে যাবার কিছুদিন পর ভারতের খাস রাজধানীতে টাইগারের জন্ম। লোকসভার মাননীয় সদস্য সত্যানন্দ কুণ্ডু প্লেন যোগে টাইগারকে কোলকাতায় আনেন। সেখান থেকে নিজস্ব গাড়ি যোগে এ বাড়িতে। টাইগারের অন্য ভাই-বোনেরা দিল্লীতেই রথী মহারথীদের ঘরে আশ্রয় পেয়েছে। সুবোধ দু'একটা নামও বলল। আলমারি খুলে একটা এ্যালবাম্ বের করে টাইগারের শৈশব থেকে সাম্প্রতিক অবস্থার ধারাবাহিক ছবি দেখাল। সব ওর নিজের ক্যামেরায় তোলা। ছবি তুলতে খুব ভালবাসে ও।

আমি একসময় শুকনো গলায় বললাম, 'ওকে বেঁধে রাখ না কেন?'

সুবোধ বলল, 'সারাদিন তো বাঁধাই থাকে স্যর। রাত্রে খুলে দিই, বাড়ি পাহারা দেয়।'

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আমি আবার টাইগারকে দেখলাম। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিশাল শরীরটা এলিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। হ্যাঁ, নির্ভেজাল আমেরিকানই বটে! এ দেশের মাটিতে এমন চেহারা এমন তেজ হয় না। কুণ্ডুবাড়ির বিপুল সম্পদ রাতভর পাহারা দেবার পক্ষে এও একাই যথেষ্ট। সুবোধ আসছিল সঙ্গে। বলল, 'ওর চোখ দেখেছেন স্যর, মেমসাহেবের মতো নীল। অন্ধকারে বাঘের মতো জ্বলে!'

আমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল টাইগার। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘাড়ের লোম ফুলে উঠল, কটাচোখ রাগে বড় হলো, থাবার নখে মেঝে আঁচড়ে চাপা ক্রুদ্ধ-গলায় চেঁচাল, ঘেউঁ ঘেউঁ ঘাঁক!

সুবোধ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ধমকাল, 'এই টা-ই-গা-র!'

আমি সন্তর্পণে লাফিয়ে বারান্দা পার হয়ে লনে নামলাম।

তারপর থেকে কি যে হলো, টাইগারের সঙ্গে আমার, কাগুজে ভাষায় যাকে বলে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ', তাই শুরু হয়ে গেল। অথচ এমনটি হওয়া উচিত ছিল না। কেন না শ্রীযুক্ত টাইগার কুণ্ডুবাড়ির সম্পত্তি রক্ষক এবং খাঁটি আমেরিকান বংশসম্ভূত, আর আমি অখ্যাত গ্রামবাংলার এক কনিষ্ঠ করণিকের সন্তান এবং কুণ্ডুবাবুর স্কুলের জুনিয়র-মোস্ট মাস্টার। আসলে সূক্ষ্ম বিচারে টাইগারের সঙ্গে আমার তো অনেকটা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক! সে হিসেবে আমি ওকে মান্য করব এবং ও আমাকে করুণাপূর্বক অবজ্ঞা করবে, এইরকম হওয়াই উচিত ছিল!

কিন্তু টাইগার আমাকে সহ্য করতে রাজী হলো না। আর আমিও ওকে তেমন মান্য করতে পারলাম না। সেই প্রথমদিন যেভাবে আমার প্রতি ঝাঁপিয়ে এসেছিল তাতে আমি হয়ত দারুণ ভয় পেয়েছিলাম। সেই ভয় থেকে ক্রমে রাগ ও বিতৃষ্ণা জন্ম নিল। আর সেই প্রথম দিন আমি ওকে দাঁত-মুখ ভেংচে ছাতার ডগা দিয়ে উত্যক্ত করেছিলাম, সে কারণেই কিনা কে জানে, ও আমাকে দেখামাত্রই ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল।

সকাল বেলায় বাগানের দরজার কাছে এসে দাঁড়ানো মাত্র ঠিক টের পেয়ে যায়। আর তৎক্ষণাৎ টান টান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় টাইগার। মুখচোখের শান্তভাব মুহূর্তে ধারালো হিংস্র হয়ে ওঠে। সামনের দু'পা দিয়ে বারান্দার মেঝে আঁচড়ে চেঁচিয়ে ওঠে, ঘেউঁ ঘেউঁ ঘেউঁ উঁ—

সেই ভয়ঙ্কর গলা শুনে আমার বুকের ভেতরটা দুর দুর করে। রক্তের ভিতর এক ধরনের লাফালাফি শুরু হয়ে যায়। মাথার ভিতর ঝিম ঝিম করে। নিজেকে খুব আহত, অপমানিত মনে হয়। কিন্তু একই সঙ্গে স্নায়ুগুলো সজাগ ও সতর্ক হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টি প্রখর ও চোয়াল শক্ত হয়। ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে কুকুরটার মুখ দু'হাতে চেপে ধরি, তারপর একটা আঙ্গুল ছুরির মতো ঢুকিয়ে দিই ওর চোখে। ও কি ভাবে আমাকে!

মাঝে মাঝে টাইগার এত ছটফট করে যে আমার ভয় হয়, ও এক্ষুনি শেকল ছিঁড়ে ফেলবে। আমি ভয়ে ভয়ে ডাকি, 'কার্তিক, এই কার্তিক!'

বাগানে কাজ ফেলে ছুটে আসে কার্তিক। হাসতে থাকে, 'ডর নাই মাস্টারবাবু! সিধা ওপরে চলে যান। শেকলটা ও টেনে ধরে থাকে, আমি তাড়া-খাওয়া একটা খরগোশের মতো দ্রুত ওপরে উঠে যাই।

একদিন কার্তিক বলল, 'চেনা হয়ে গেলে টাইগার তো এমন করে না বাবু। আপনাকে দেখলে এত কেনে ক্ষেপে যায়!'

আমি বলি, 'চোর-ডাকাত ভাবে নিশ্চয়।'

'কি যে বলেন আজ্ঞে!' কার্তিক হাসে। ওর নিচের মাড়িতে অনেকগুলো দাঁত নেই। হাসলে আরো বুড়ো দেখায়।

সুবোধও বলল একদিন, 'টাইগারের সঙ্গে দেখছি আপনার এখনও ভাব হয়নি স্যার!'

আমি বললাম, 'হওয়া মুস্কিল! আমার মতো কালো চামড়ার মানুষ ওর বোধ হয় পছন্দ না।'

'তা কেন!' কুকুরের হয়ে সওয়াল করল সুবোধ, 'কার্তিক জগুয়ারা ত আরো কালো; ওদের সঙ্গে কেমন সুন্দর ব্যবহার করে!'

'কি জানি! তা হলে হয়ত অন্যকিছু ভাবে।'

একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখলাম মস্ত বড় একটা গামলায় দুধ খেতে দেওয়া হয়েছে ওকে। সের দুই হবে। যুঁই ফুলের মতো সাদা ঘন টলটলে দুধ। সঙ্গে ক'টা রুটি, কার্তিক ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছে। আমাকে দেখে টাইগার যথারীতি ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করল। জোরে চেঁচাল না। বোধ হয় সম্মুখে খাদ্য ও কার্তিক উপস্থিত বলে। একগামলা দুধ দেখে অবাক হয়ে বলে ফেললাম, 'বাবাঃ, এত দুধ!'

কার্তিক মুখ তুলে বলল, 'এত কুথায় গো মাস্টরবাবু! ই-শালো আরো খেতে পারে।'

'শুধু দুধ খায়? মাংস খায় না?'

সুবোধ রোজই খানিকটা নেমে আসে। ও বলল, 'এখন গরম পড়ে গেছে বলে রোজ মাংস দিই না সার। গায়ে পোকা হবে। লোম নষ্ট হয়ে যাবে।'

সারাটা পথ আমি যুঁই ফুলের মতো সাদা ঘন টলটলে এক গামলা দুধের কথা ভাবতে ভাবতে হোটেলে ফিরলাম। আমার ছোট ভাইবোনগুলোর কথা মনে পড়ল। আমার বুড়ী ঠাকুমার মুখটা চোখে ভাসল। ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় বেশিক্ষণ বই খুলে রাখলে আমার মাথা ধরত বলে একজন অধ্যাপক আমাকে এক গ্লাস দুধ কি হরলিকস খেতে বলেছিলেন। আমি লজ্জায় বাবাকে বলতে পারিনি—সে কথা মনে পড়ল। দু'বেলা চায়ের জন্য আধ সের দুধ বরাদ্দ ছিল। ছোট বোন বিনি একদিন পায়েস খেতে চেয়েছিল বলে মা আরো আধ সের নিয়েছিল। বাবা শুনে বলল, 'এই মাসে পনেরো টাকা প্রিমিয়ম দিতে হবে, আর তুমি কিনা রাজ্যের বাড়তি খরচ জুটিয়ে বসে আছ! কবে যে বুদ্ধি হবে তোমার।' আমি সেদিন দেখেছি, আমার রোগা মায়ের হলুদ চোখে জল টলটল করছিল।

এই ঘটনার পর থেকে টাইগার আমার কাছে আরো অপ্রিয় ও অসহ্য হলো। অনেক চেষ্টা করেও আমি মনটাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে, আসলে ও একটা কুকুর, আমি মানুষ। এই সামান্য দুধটুকু নিয়ে আমার উচিত না ওকে ঈর্ষা করা। ও সারারাত জেগে কুণ্ডুবাড়ির বিপুল সম্পদ পাহারা দেয়। ওকে পরিমাণমতো আহারটুকু না দিলে চলবে কেন? এ-টুকু তো ওর ন্যায্য পাওনা। এ নিয়ে একটা ইতর প্রাণীকে ঈর্ষা করা আমার শোভা পায় না।

কিন্তু পরের দিন টাইগারের মুখের সামনে আবার যেই দুধের গামলা দেখলাম অমনি আমার মনে রোগা মায়ের হলুদ চোখে জলের ধারা টলটলিয়ে উঠল। এরপর অভ্যাসমতো কুকুরটা যখন আমার দিকে তাকিয়ে রাগে গরগর-গাঁক্ করল, আমিও তৎক্ষণাৎ থমকে দাঁড়িয়ে চাপা-গলায় ধমকে উঠলাম, 'এই-ও!' তাতে কুকুরটা আরো রেগে বাঁধা অবস্থাতেই ঘাঁ-ক করে এমন ঝাঁপ দিল যে আমি ভয়ে দেয়ালে সেঁটে গেলাম। খানিকটা দুধ উল্টে দিয়ে ভয়ঙ্কর মুখে ছটফট করে চেঁচাতে লাগল। কার্তিক ওর গলার বেল্ট ধরে টেনে রাখতে পারছে না, এমন রাগ! সুবোধ তাড়াতাড়ি নেমে এসে কান টেনে ধরে ওকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করল।

এ নিয়ে কার্তিকের কাছে আমাকে কিছু অনুযোগ শুনতে হলো। সুবোধও বলল পরের দিন, 'টাইগারকে কিছু বলবেন না স্যার। ও ভীষণ রেগে যায়।'

উত্তপ্ত হয়ে বললাম, 'আমি কিছু বলিনি।'

সুবোধ বলল, 'কেউ কড়া চোখে তাকালেও ও রাগ করে।'

আমি বললাম, 'টাইগার থাক। তুমি অঙ্ক কর।'

কিন্তু কুণ্ডুনন্দনের পড়াশুনায় তেমন মন নেই। আমিও ওর প্রতি তেমন যত্নবান নই। ফলে অঙ্ক করার ফাঁকে ফাঁকে ও যথারীতি টাইগারের কথা বলতে লাগল। আমি অপ্রসন্ন বিরস মুখে চেয়ারে গা এলিয়ে বসে রইলাম।

যেমন রাগ, তেমনি অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি। জ্যেঠু অর্থাৎ সত্যানন্দ কুণ্ডু নিজে ট্রেনিং দিয়ে সব শিখিয়েছেন টাইগারকে। তিনি চোখের ইশারা করলেই টাইগার সব বুঝতে পারে। একবার এই বাড়ির এক ঝি ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে কোঁচড়ে কিছু চাল বেঁধে সরে পড়ছিল। এ অঞ্চলে তখন চাল আক্রা। দর চার টাকা পর্যন্ত উঠেছে। ঝি-টা ভেবেছিল, কেউ টের পায়নি। কিন্তু ঠাকুর ঠিক দেখেছিল। সে এসে বললে ছোট জেঠিমণিকে। ছোট জেঠিমণি বলল বড়মাকে। বড়মা জ্যেঠুকে খবর দিলেন। জ্যেঠু কাউকে কিছু না বলে টাইগারকে ডেকে পাঠালেন।

তারপর টাইগার ছুটল। ঝি-টা তখন বাড়ির পেছন দিককার দরজা খুলে ফেলেছে। টাইগার নিঃশব্দে গিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। না কামড়াল না। শুধু দাঁত আর নখ দিয়ে আঁচড়ে পরনের কাপড়টা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে দিল। চালগুলো ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ঝি-টা ডুকরে উঠে হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে বসে পড়ল। সঙ্গে ছিল ওর ছেলেটা। সে ভয়ে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল। জ্যেঠুরা না আসা পর্যন্ত টাইগার থাবা উঁচিয়ে ওকে পাহারা দিতে লাগল। ছেলেটাকেও এক পা নড়তে দিল না। বাবা সব দেখে শুনে আর মারধোর করলেন না। শুধু কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। জাগুয়ার বৌ তাড়াতাড়ি একটা তেলচিট্‌ বিছানার চাদর এনে দিল। সেইটে পরে তবে ও বাড়ি গেল!

'দাঁড়ান স্যর, আমি আপনাকে ছবি দেখাচ্ছি।'

খুব উদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সুবোধ। আলমারি খুলে একটা লম্বা খাম বের করল। তারপর ফিরে এসে বলল, 'এর মধ্যে আছে স্যর। আমি নিজে তুলেছি। এখনো অ্যালবামে সাজানো হয়নি—'

সবই প্রায় টাইগারের ছবি। নানা সময়ের, নানা ভঙ্গির। তার মধ্যে থেকে একটা তুলে আমাকে দেখতে দিল। দেখলাম, একটা কমবয়েসী মেয়েমানুষ দু'হাতে মুখ ঢেকে হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছে। তার চারদিকে ছড়ানো চাল, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, নানা মানুষের ভিড়। ঝি-টা একেবারে উলঙ্গ, দু' হাতের ফাঁক দিয়ে কালো স্তনের ড্যালা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। টাইগার ওর ঘাড়ের বাঁ পাশে ছুঁচলো মুখটা ঠেকিয়ে চুপ করে বসে আছে। তার পাশেই ধুলোবালি-মাখা একটা বাচ্চা ছেলে, ভয়ে আতঙ্কে কচি মুখটা নীল, মায়ের ঘাড়ের চুল শক্ত করে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ডান দিকে সত্যানন্দ আঙুল উঁচিয়ে নিত্যানন্দ কুণ্ডুকে কি যেন বলছেন।

দেখতে দেখতে আমার মনে হলো এই ঝি-টাকে আমি চিনি। যেন কোথায় দেখেছি! তারপরই মনে পড়ল, হ্যাঁ, এর নাম বিমলি। এই ছেলেটার নাম ভূতনাথ। বিমলি আমাদের প্রাণবন্ধু হোটেলে বাসন মাজে। ভূতনাথ টেবিল সাফ করে। চায়ের গ্লাস ধোয়। এখান থেকে চাকরি যাওয়ায় প্রাণবন্ধু হোটেলে কাজ নিয়েছে ওরা। নগেন চাটুজ্জে একদিন যেন বলেছিল ওদের কথা।

এইসময় আরো একটা ছবি টেনে বার করল সুবোধ, 'এইটে দেখুন স্যর। পুলিসের কুকুরের মতো টাইগার কেমন চোর খুঁজে বার করছে—'

দেখলাম ওপরের কোনো টানা-বারান্দায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠাকুর চাকরেরা, এ-পাশে কুণ্ডুবাবুরা দুই ভাই সহ ডজন খানেক অভিজাত মহিলা। টাইগার নীচু হয়ে একজনের পা শুঁকছে।

সুবোধের নাকি একটা পকেট-সাইজ ট্রানজিস্টার ছিল। 'সুখদাস গজানন রাইস মিলে'র মালিক নাথুরাম জন্মদিনে প্রেজেন্ট করেছিল সুবোধকে। খাঁটি জাপানী জিনিস। চমৎকার সাউন্ড। পাঁচশো টাকার ওপর দাম।

একদিন চুরি হয়ে গেল।

সারা বাড়ি তোলাপাড় করেও খুঁজে পাওয়া গেল না যখন, তখন জ্যেঠুর পরামর্শে ঠাকুর চাকরদের লাইন করে দাঁড় করানো হলো। তারপর টাইগারকে ছেড়ে দিয়ে পুলিসি কায়দায় হুকুম হলো, 'কে নিয়েছে বার কর!'

টাইগার প্রথমে কুঁই কুঁই করে নিত্যানন্দ কুণ্ডুর পা চাটল। ধমক খেয়ে গেল পিসীর কাছে। আবার ধমক দিতেই বাবুলালের কাছে এসে বার দুই ঘেঁউ ঘেঁউ করে পা শুঁকতে লাগল। বাবুলালের ছোকরা বয়স। পাজামা গেঞ্জিটা একটু ফর্সা রাখে এবং চুলে তেলটেল দেয় বলে ওকে একটু সৌখিন দেখায়। সত্যানন্দ কুণ্ডু হুংকার দিয়ে বললেন, 'তুই ঠিক ধরেছিস টাইগার। এই হারামজাদাই সরিয়েছে—'

তারপর বাবুলালের ঠোঁটের কস বেয়ে রক্ত গড়াল। বাঁ দিকের চোখটা ফুলে উঠল। নিত্যানন্দ কুণ্ডু এত জোরে হাতটা মুচড়ে ধরলেন যে সুবোধের বড়মা অর্থাৎ সত্যানন্দের প্রথমা স্ত্রী বলে উঠলেন, 'আহা, ঠাকুরপো ছেড়ে দাও। ভেঙে যাবে যে!'

জ্যেঠু একসময় বন্দুকটা এনে বুকে ঠেকিয়ে বললেন, 'এবার বল রাস্কেল।'

বাবুলাল তখন প্রায় চেতনাহীন। তবু জ্বর বিকারের মতো বিড়বিড় করে বলল, 'বিশ্বাস করুন বাবু, আমি নিইনি।'

অগত্যা বাবুলালকে পুলিসেই দিতে হলো।

সুবোধ বলল, 'এখন ও ছাড়া পেয়েছে সার। রিক্সা চালায়। আমাদের বাড়ির কাছ দিয়ে গেলে টাইগার এখনও চেঁচায়। কেমন মনে রাখে ও!'

আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসছিল। ছবিগুলো আমি আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল আমি কোনো হালকা গোলাপী রঙের ডিসটেম্পার-করা ঘরে বসে নেই, যেন একটা ঘন অরণ্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। সেখানে সারিবদ্ধ নিষ্কম্পগাছের পত্রেপল্লবে অন্ধকার স্থির হয়ে আছে। আর একটা বিশালকায় হিংস্র প্রাণীর দুই নীলবর্ণ চক্ষু থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ছে। জন্তুটা একলক্ষ্যে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে!

আমি জড়ানো গলায় বললাম, 'টাইগার তো আমাকে দেখলেও ছটফট করে। চেঁচায়।'

মাংসল গালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলে সুবোধ হাসল, 'হ্যাঁ, স্যর। কি করা যায় বলুন তো? আপনি আজ ওর গায়ে হাত বুলিয়ে একটু আদর করবেন—'

আমি ওকে খুন করব। হ্যাঁ, কুণ্ডুবাড়ির সম্পত্তিরক্ষক ওই এ্যালসেসিয়ানটাকে! শালা কিনা আমাকে সন্দেহ করে! আমি কি একটা চোর-চোট্টা, না, বদমাস? আমি কি ফর্সা জামাকাপড়ের আড়ালে ছোরা কি গুপ্তি লুকিয়ে এ-বাড়িতে ঢুকি। অথবা বেরিয়ে আসার সময় সুবোধের সুদৃশ্য কলম, হাতঘড়ি কিং আঙুল থেকে খুলে-রাখা মুক্তাবসানো আংটিটা হাতিয়ে নিয়ে আসি। তবে আমাকে দেখে এমন মাটি খামচানো, মেঝে আঁচড়ানো, কুঁই কুঁই গাঁক গাঁক করা কেন। একদিন সুযোগ বুঝে এমন লাথি ঝাড়ব মুখে, চোয়াল ভেঙে দুধ-খাওয়া জন্মের মতো বন্ধ হয়ে যাবে!

এর পরের দিন টাইগার আবার যে-ই ঘেঁউ ঘেঁউ শুরু করল, আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম ওর চোখের দিকে।

ওর কটা-চোখ রাগে বড় বড় হলো। ঠোঁটের কালো-অংশ কাঁপতে লাগল। আমিও হাত মুষ্টিবদ্ধ ও চোয়াল শক্ত করলাম। লেজ নাড়িয়ে থাবাদুটো ও সামনের দিকে একটু বাড়িয়ে দিল। আমি টান টান সোজা হয়ে একটা বর্শাফলকের মতো দাঁড়ালাম। এ যেন উভয় পক্ষের আক্রমণ শুরু হওয়ার আগের স্তব্ধ শীতল মুহূর্ত!

কার্তিক অবাক হয়ে বলল, 'মাস্টারবাবু, ওপরে যান আজ্ঞে—'

দোতলা থেকে সুবোধ ডাকল, 'চলে আসুন স্যার। কার্তিক টাইগারকে ধরে রাখবে।'

আমি দেখলাম, টাইগারের চোখ ক্রমশ গণগণে আগুন হয়ে উঠছে। ওর পিঠের শিরদাঁড়া সামান্য বেঁকে গেছে। ঠোঁটের ফাঁকে ধারালো দাঁত। লেজটা প্রবল বেগে নড়ছে। গলায় অদ্ভুত এক ধরনের গোঁ গোঁ গাঁক গাঁক শব্দ।

কার্তিক তাড়াতাড়ি এসে শেকল টেনে ধরল, 'টাইগার খুব রেগে গেছে বাবু। তাড়াতাড়ি উঠে যান।'

ততক্ষণে আমার সাহসও ফুরিয়েছে। হাত পা ঘামতে শুরু করেছে। বুকের ভিতর ভয়ের ধড়ফড়ানি। থাকলই বা শেকলে বাঁধা, ছিঁড়তে কতক্ষণ। তাহলে একা কার্তিক কি ওকে সামলাতে পারবে? তৎক্ষণাৎ মুখের ভাব নরম করে লাফিয়ে সিঁড়িতে উঠলাম। টাইগার হুঙ্কার দিয়ে উঠল, ঘেঁউ-ঘেঁউ-ঘাঁক! আমি একসঙ্গে তিনটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে গেলাম।

কার্তিক হেসে ফেলল। সুবোধও হাসল, 'না, কুকুরটাকে দেখছি সরিয়ে বাঁধতে হবে।'

ওদের হাসিতে আমার রক্তে জ্বালা ধরে গেল। আমাকে কি পেয়েছে টাইগার! আমি কি একটা কাঠের বল, শালিক চড়ুই কি গঙ্গা ফড়িং যে প্রতিদিন আমাকে নিয়ে ও খেলা শুরু করেছে! আমার সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে অনেক বিষ আছে—একদিন আমি ওকে খুন করব।

তারপর সেই ঘটনাটা ঘটল।

তখন শীতকাল। ছ'টা বাজলেও কুয়াশার চাদর ওঠে না। চারদিকে ঘোলাটে অন্ধকার ছড়িয়ে থাকে। কুণ্ডুবাড়ির কেউই ঘুম থেকে ওঠে না। আমি গিয়ে সুবোধকে বিছানা থেকে ডেকে তুলি। ও হাতমুখ ধুতে যায়। আমি দোতলার ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাগানের কাজ দেখতে দেখতে ভাবি, আর না, পড়ানো আমি ছেড়ে দেব। আমি কি কুণ্ডু-বাড়ির চাকর নাকি যে, সুবোধকে বিছানা থেকে তুলে আমাকে পড়াতে হবে। এত অসভ্য, অভদ্র কেন ও! বিনে পয়সায় যে পড়ে, গরজটা তো তারই হওয়ার কথা।

কিন্তু ছাড়া হয় না। কেন না চাকরির নিরাপত্তা। কেন না হোস্টেলটা তৈরি হয়ে গেছে, এই মাসেই চালু হবে। আমি বিরস বিরক্ত মুখে ওপর থেকে টাইগারকে লক্ষ্য করি। নীচে থেকে মুখ তুলে ও চেঁচায়। বাগানের মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কার্তিক ওকে ধমকায়।

একদিন এসে দেখি কুণ্ডুবাড়ির সবাই জেগে গেছে। তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সত্যানন্দ, তাঁর পাশে দুই স্ত্রী, এক গণ্ডা ছেলে মেয়ে। চারতলায় সস্ত্রীক নিত্যানন্দ। দোতলায় সুবোধ, সুবোধের এক পিসী, জামাইবাবু। ঠাকুর চাকরেরা নীচের বাগানে ভিড় করে আছে। দেয়াল ঘেঁষে জানলার কিছু ভাঙা কাঁচ, কিছু ইটের টুকরো। কার্তিক এক গামলা জলে তুলো ডুবিয়ে টাইগারের থাবা, ঠোঁট ও দাঁত ঘষে ঘষে পরিষ্কার

করে দিচ্ছে। তুলোটা রক্তে লাল হয়ে উঠতে ফেলে দিয়ে অন্য তুলো নিচ্ছে। ডেটল জাতীয় একপ্রকার ওষুধের গন্ধ বেরুচ্ছে।

আমাকে দেখে টাইগার গাঁক গাঁক শুরু করতেই ওপর থেকে নিত্যানন্দ কুণ্ডু খুব জোরে এক ধমক দিলেন। তাতে ও চুপ করে গেল।

ভাবলাম, টাইগারের কোথাও কেটেকুটে গিয়েছে।

কিন্তু তা না। টাইগারই অন্যদের কেটেকুটে এসেছে।

পড়ার ঘরে সুবোধ বিস্তারিত রিপোর্ট দিল। কিছুদিন থেকে ছোটজাতের ক'টা দুরন্ত ছেলে ফুল চুরির চেষ্টায় আছে। প্রায়ই বাগানের আশেপাশে ঘুরঘুর করে। কাঁটাতারের বেড়া সরিয়ে ঢুকতে চায়। কিন্তু টাইগারের জন্য সাহস পায় না। ওদের দেখলেই টাইগার চেঁচাতে থাকে। বেড়ার ধার পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে যায়। সেই রাগে ওরা এখন রাস্তা থেকে পাথর ছুঁড়ে মারে। সেদিন একটা পাথর লেগে বারান্দার বাল্বটা ভেঙে গেছে। আজ দুটো জানালার কাঁচ। বাবা খুব রেগে গিয়ে আজ বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে ছিলেন। কিন্তু জ্যেঠু বন্দুকের ছররাগুলির পরিবর্তে কুকুর ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। গুলিগোলার ঝামেলা অনেক। লোকেই বা কি বলবে! কুকুরে দোষ নেই। ওতো জন্তু-জানোয়ার। কি করতে কি করে বসে তার আবার হিসেব কি।

গেট খুলে রেখে কুকুর নিয়ে বসে ছিলেন দুই ভাই।

ছেলে ক'টা টের পায়নি। একটা পাথর ছুঁড়ে মারার সঙ্গে সঙ্গে টাইগারকে লেলিয়ে দিলেন সত্যানন্দ কুণ্ডু। নিত্যানন্দ কুণ্ডু বারান্দায় দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিলেন।

ছেলেগুলো প্রাণের ভয়ে দৌড়ুচ্ছে। টাইগার পেছন পেছন। ছেলেগুলোর চিৎকারে আকাশ ফাটছে, কিন্তু টাইগার নিঃশব্দ। ক'হাত যেতে না যেতেই লাফ দিয়ে পড়ল একজনের ঘাড়ে। হাতের ডানা কামড়াল, ঘাড় ও পেটের মাংসে থাবা বসাল। শব্দ করে চাপা উল্লাসে গোঙাল।

সেই ছেলেটাই নাকি দলপতি! বাকি ক'টা পালিয়ে গেছে। ও জখম হয়েছে খুব। বাবা তখুনি ডেকে না নিলে ওকে মেরেই ফেলত। সে কি ভীষণ চেহারা তখন টাইগারের! আপনি যদি দেখতেন স্যার! আকাশে আলো ছিল না বলে আমি ছবি তুলতে পারলাম না—

সুবোধ বলছিল। উত্তেজনায় রোমাঞ্চে ওর চোখ জ্বল জ্বল করছিল। ওর মাংসল মুখের প্রতিটি ভাঁজে অদ্ভুত এক হিংস্রতা খেলা করছিল। আর আমি দেখছিলাম—টাইগারের থাবায় রক্ত, দাঁতে রক্ত, ঠোঁটে রক্ত। আজ মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে টাইগার—

পড়াতে ভাল লাগল না। বললাম, 'আমার মাথা ধরেছে। হোটেলে ফিরে যাচ্ছি।'

নীচে নেমে টাইগারকে দেখতে পেলাম না। সত্যানন্দ কুণ্ডু তখন ওকে স্নান করানোর কথা বলেছিলেন। কার্তিক হয়ত নিয়ে গেছে। সবুজ ঘাসের ওপর এখনও রক্তমাখা তুলোগুলো পড়ে আছে।

হোটেলে ফিরে দেখি সেখানেও ভিড়। মফঃস্বলের ছোট রাস্তায় লোক উপচে পড়েছে। নগেন চাটুজ্যে সমানে চিৎকার করছেন, 'তুই ছড়িস না বিমলি! ভূতোকে নিয়ে এক্ষুনি থানায় যা—'

আর সেই কমবয়েসী বিধবা বিমলি, একদা টাইগার যাকে নগ্ন করে পাহারায় ছিল, কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'কেন তুই মরতে ওই রাক্ষুসে বাড়ি গিয়েছিলি মুখপোড়া।'

একটা চেয়ারে আচ্ছন্নের মতো বসে আছে ভূতনাথ। অতিশয় কালো ও রোগা, বছর তেরোর ছেলে। তার হাতে পেটে ঘাড়ে ব্যান্ডেজ। গালে গলায় আঁচড়ের রক্তাভ

দাগ। রক্তমাখা একটা জামার পুঁটুলি মুঠিতে ধরা। ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু কালো ডাগর চোখ জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো ঝিকুচ্ছে। যেন চিতায় পুড়তে পুড়তে এই মাত্র আগুন থেকে উঠে এসেছে ভূতনাথ। চাপাগলায় ও মাকে শাসাচ্ছে, 'তুই চুপ থাক। আমি আবার যাব।'

শুনলাম, রিক্সা নিয়ে হীরালাল আসছিল ওই পথ দিয়ে। ভূতোকে চিনতে পেরে তুলে নিয়েছে। ওর তখন জ্ঞান ছিল না। তারপর জ্ঞান ফিরলে ও নাকি একটুও কাঁদেনি। শুধু বার কয়েক বিড়বিড় করে বলেছে, 'সেরে নিই। শালা একবার সেরে নিই।'

এই ছেলে ফুল চুরি করতে গিয়েছিল কুণ্ডুবাড়িতে? কি করবে ও ফুল দিয়ে? ওর কি এখন ফুল খেলার বয়স, না অবস্থা?

ভূতনাথের জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে সহসা মনে হলো, না ফুল না। আসলে পাথর ছুঁড়তেই গিয়েছিল ও দল বেঁধে। ছুঁড়ে ছুঁড়ে হয়ত উপড়াতে চেয়েছিল টাইগারের দাঁত, ভাঙতে চেয়েছিল কুণ্ডুবাড়ির জানালা-দরজা, ফাটল ধরাতে চেয়েছিল ঢালাই-করা শক্ত ভিতে—

কেন না তেরো বছরের এই বালক তার এগার বছর বয়সে মায়ের অপমানিত নগ্ন মূর্তি চোখের সামনেই দেখেছিল যে!

আমি টাইগারকে কি খুন করতে পারব? আমার রক্তে মধ্যবিত্তের ভীরুতা ও সুবিধাবাদ। আমার কি এত সাহস হবে! না পারি ক্ষতি নেই ; আমি ওর প্রতি লক্ষ্য রাখব।

টাইগারসহ কুণ্ডুবাবুদের যারা খুন করবে সেই ভূতনাথেরা ঘরে ঘরে বড় হচ্ছে।

কুমারী মা

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

'আব্‌বে ফোট' এই শব্দটা উচ্চারণের আগেই চামেলি যুবতী ঠেলে সরিয়ে দেয় ট্রেনের মহিলা কামরার মুখ থেকে ময়লা ছেঁড়া ফ্রক-পরা রোগা কালো এক কিশোরীকে। কিশোরী চামেলি যুবতীর চোখের দিকে তাকিয়ে চোখের রাগী ভাষা পড়ে নিয়ে সরে যায়। চামেলির পেছনে ছিল লতিকা যুবতী। সে,ও 'এই যে কালো মোটা বৌ! একটু সরে দাঁড়াতে পার না।' বলতেই মোটা বৌ মুখ খেঁকিয়ে বলে ওঠে, 'সরবো কোথায় রে মাগী! সরবার জায়গা আছে? মোটা বৌয়ের ওরকম কথা শুনে চামেলি মুখ ঘুরিয়ে নিতেই লতিকা বলে, 'কোন খানকি বলল রে কথাটা?' লতিকা একটু নরম প্রকৃতির যুবতী, চামেলি সেরকম নয়। লতিকা চামেলিকে সামনের দিকে ঠেলে বলে, 'ছেড়ে দে। ভেতরে চ।' তখন চামেলি যুবতী লতিকার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে, 'আব্‌বে ফোট। শালিকে একবার দেখিয়ে দিই। কত তার ইয়ের জোর।' বলেই একটি অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করে গাল দেয়। লতিকা চামেলীকে সামলায়। ঠেলে গাড়ির ভিতরে নিয়ে যায়। মুখোমুখি সাতজন বসে আছে দুদিকে। একদিকে চারজন, অপরদিকে তিনজন। একজন মোটা বৌ পা তুলে জোড়া করে বসে উল বুনছিল। লতিকা ভেতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় কাঁধে ঝোলানো লতিকার কালো সেলাই-করা ব্যাগটা উলবোনা মোটা মহিলার নাকে লাগে। লতিকা শোনে, 'দেখে চলতে পার না! যতসব নোংরা।' কথাটা শুনে লতিকা জবাব দেয় না। চামেলী দেয়, 'বাজে কথা একদম বলবেন না। নোংরা! সাহস কম না! নোংরা আপনি।' এবার লতিকা জবাব দেয়, 'পাটা নাবান, ওখানে আরেকজন বসবে।' উলবোনা মোটা বৌ পা নাবায় না। উলবোনা বৌটার পাশে জানলার ধারে বসে আসে একজন কলেজগার্ল। হাঁটুর ওপর বাটিকপ্রিন্টের ফাইল। ফাইলের উপর পলসায়েন্সের মোটা বই।

উলবোনা ও কলেজগার্লের মাঝখানে একচিলতে সরু লম্বা ফাঁকা জায়গা। সেই ফাঁকা জায়গায় চামেলী নিজেকে ঠেলে দিতেই কলেজ গার্ল সামান্য সরে যায়। আর উলবোনা বৌটা 'আঃ লাগিয়ে দিলে' বলেই পা'টা নামাতে বাধ্য হয়। হৃদয়পুরে লোক্যাল থামে। কলেজগার্লের বিপরীতে বসা মেয়েটি নেমে যেতেই লতিকা জানলার ধারে বসে। চামেলী বলে কলেজগার্লকে 'আমাকে একটু জানলার ধারে বসতে দেবেন? আমার আবার বারবার থুতু ফেলার খারাপ অভ্যেস আছে।' কলেজগার্ল চামেলীর মিথ্যা ভাষণ বুঝতে পারে। তবু চামেলীকে জানলার ধারে বসতে দেয়। বসেই চামেলী বাইরে 'ওয়াক থু' শব্দ করে থুতু ফেলে। উলবোনা বৌটি মুখ বিকৃত করে বলে, 'কি নোংরা! কি নোংরা! বাতাসে যে গায়ে থুতুর ছিটে আসে তাও জানে না। অসভ্য কোথাকার!' চামেলী, লতিকা ওর কথায় পাত্তা না দিয়ে মিঠুন, গোবিন্দা, সঞ্জয় দত্তকে নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠে। চামেলী বলছে, 'সামনের হপ্তাতেই মিঠুনের বই আসছে। আগের বইটার প্রথম দুটো শোতে চল্লিশটাকা কামিয়েছি। এই বইটা যদি ভাল সেল পায়, তাহলে মাকে একটা সায়া কিনে দেবো। বাবা শালা হারামির বাচ্চা, বিয়ের পর থেকেই কিচ্ছু কিনে দেয় নি মাকে। খালি পয়দা করে গেছে। একমাত্র

আমিই বেঁচে আছি। তিন বছর কারখানা থেকে ছাঁটাই। বাপ শালা বাড়িতে ধুঁকছে, মরেও না। একটা পেট বেঁচে যায়।' 'তুই চালাচ্ছিস', লতিকা জানতে চায়। 'তাহলে এখন?' 'মা বাসন মাজে। আমি টিকিট ব্ল্যাক করি।' বলেই চামেলী একটা হিন্দীগান গায়।

লতিকা মুখচোখে দুঃখপ্রকাশ করে বলে চামেলীকে—হ্যাঁরে চম্পা, আমার হবে তো! কেউ তো বাধা দেবে না?'

চামেলি গান থামিয়ে চটপট্ উত্তর দেয়, 'আব বে ফোট। কোন শালা আছে বে। শম্ভুদাকে বললে কেউ রাটি করবে না। তোকে যে কোন একটা কাজে ঢুকিয়ে দেবেই।' লতিকা চামেলীর সাথে বন্ধুত্ব পাতাবার পর লতিকা চামেলীকে চম্পা বলে ডাকে। লতিকা বাঁজা, ও দুবার বিয়ে করেছিল। দুবারই স্বামীরা লতিকাকে ছেড়ে চলে গেছে। তারপর থেকে চম্পা মাঝে মাঝে লতিকার আট বাই ছয় ঘরে রাত কাটিয়ে যায়। লতিকাও বিপত্নীক বাড়িওয়ালার ঘরে রাত কাটায়, যখন বাড়িওয়ালার ছেলে ছেলের বৌ থাকে না। ফলে বাড়িওয়ালা লতিকাকে কোনদিন ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলে না। এ একটা গোপন যৌনচুক্তি, পঞ্চাশ বছরের পুরুষের সাথে পঁচিশ বছরের যুবতীর।

লতিকা আবার চোখেমুখে দুঃখ প্রকাশ করে বলে, 'হ্যারে চম্পা, আজকের দুপুরের শোতেই শম্ভুদা আমাকে লাইনে ঢুকিয়ে দেবে তো?'

চামেলি উত্তর দেয়—তোকে তো আজই নিয়ে যেতে বলেছে।

এবার লতিকা একটু হাসে। হেসে বলে—শম্ভুদা তোকে বুঝি—' বাকি কথাটা শেষ করার আগেই চামেলি উত্তর দেয়, 'খুব ভালবাসে। শম্ভুর বৌও আমাকে ভালোবাসে। পুজোয় শাড়ি দিয়েছে। তোকেও ভালবাসবে। হোটেলে শম্ভুদা যা চাইবে দিবি। দেখবি তোকে কেউ লাইন থেকে হটাতে পারবে না। শম্ভুদা কাওকেও আটকে রাখে না। তোর যদি ভাল না লাগে চলে আসবি। আরে শালা বেশ্যা না হয়ে পয়সা কামাতে গেলে পুরুষ মানুষকে একটু তেলাতে হয়।'

এমন সময় উলবোনা মোটা বৌটা চেঁচিয়ে বলে,'তোমরা থামবে! যতসব বাজে কথা। এটা পাবলিক প্লেস, ওসব কথা বললে তোমাদের পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি। জানো আমি লালবাজারে কাজ করি।'

লতিকা উলবোনা বৌটার কথা শুনে প্রসঙ্গ পাল্টায়। লতিকা ফিসফিসয়ে বলে, 'টিকিট ব্ল্যাক করিস। পুলিস কিছু বলে না?'

চামেলি হিন্দি গানের ফাঁকে ফাঁকে উত্তর দেয়—'পয়সা খাইয়ে দিই। ওসব শম্ভুদাই ম্যানেজ করে। শোন লতু, আমাদের যে খাওয়াবে পরাবে সেই আমাদের স্বামী। এখন শম্ভুদাই আমাদের স্বামীর মতো। শম্ভুদাতো আমাদের অন্য পুরুষের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে পয়সায় ভাগ বসাচ্ছে না। আমাদের খাটিয়ে নিয়ে পয়সা দিচ্ছে। এই তো সেদিন একটা দোকানে মাল তুলে দিলাম। ত্রিশটা টাকা পেলাম। সে তো শম্ভুদার জন্যেই।'

ওরা দুজন এখন একটু চুপ। সাময়িক নীরবতার মধ্যেই ওদের কানে আসে, 'অ পিসি, পিসি গো, আমি যে আর বসে থাকতে পারছি না। প্যাটে যে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।' কথাটা অনেকক্ষণ ধরেই একই জায়গায় ঘুরছে। চামেলী এবং লতিকার কানে এই প্রথম এল। যন্ত্রণাকাতর কথাগুলো কোথা থেকে আসছে তা দেখবার জন্য ওরা দুজনেই চোখ ঘোরায়। দুপুরের লোক্যাল ট্রেন। মহিলাদের কমপার্টমেন্ট। ভীড় থাকে। তবে দাঁড়ানো যায় সহজ ভাবেই। অবশেষে ওরা দেখলো অল্পবয়সী এক পোয়াতি বৌকে। পিসিকে ওরা দেখতে পেল না ঘুরে পেছন ফিরে দাঁড়াবার জন্য। পোয়াতি বৌটা ফুটবোর্ডের উপর বসে ছিল। পিসি দাঁড়িয়ে ছিল।

ট্রেন মধ্যমগ্রাম পেরিয়ে যায়। নবীন পোয়াতি বৌ কোথা থেকে উঠেছে ওরা টের পায় না। বারবার 'অ পিসি তলপ্যাটে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে' শুনে ওরা যেন নবীন পোয়াতি বৌ-এর মনের কাছে চলে গেছে। যখন শুনতে পেলো—'অ পিসি শোব। বসতে পারছি না। ভীষণ ব্যথা হচ্ছে।' পিসি নির্বিকার। মুখটা বৌয়ের মুখের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে উত্তর দেয় 'এ্যাতো ভীড়ে কোথায় শুবি লা, মুখপুড়ি। আমার পায়ে ঠেস দিয়ে বসে থাক। এখুনি শ্যালদা এসে যাবে।' বলেই পিসি চারদিকে তাকায়। বসার জায়গা থেকে কেউ ওঠে কিনা লক্ষ করে। এমন নির্দয়ভাবে কথাগুলো পিসি বললো যে পোয়াতি বৌ মরে গেলেও ওর কিছু যায় আসে না। কেউ ওঠে কিনা লক্ষ করে. আর ঠিক সে সময় চামেলী ওর মুখটা দেখতে পায়। এবং শুনতে পায় পিসি একজনকে বলছে, 'শ্যালদা নীলরতনে যাব দিদিমনি, ডেলিভারি করাতে। ওর স্বামী ওখানে দাঁড়িয়ে।' শুনে অফিস দিদিমনি তখন বলে,'ওর অবস্থা যে খারাপ। শেয়ালদা পর্যন্ত যেতে পারবে কিনা সন্দেহ। যাকগে, এখন শুইয়ে দাও তো।' বলেই অফিস দিদিমনি সবাইকে একটু সরে দাঁড়াতে অনুরোধ করে। তারপর পোয়াতি বৌকে বলে, 'তোমার নাম কি?' পোয়াতি বৌ যন্ত্রণাকাতর স্বরে উত্তর দেয়, 'কুন্তী।' অফিস দিদিমণি মনে মনে ভাবে কুন্তী নামটা খুব কম শোনা যায়। সবাই সরে যায়। সামান্য একটু জায়গা পেয়ে নবীন পোয়াতি বৌ শুয়ে পড়ে। আর সে সময় চামেলি জায়গা ছেড়ে উঠে যায়। পিসির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুণ্ডাদের মতো পিসির সাদামালা ব্লাউজ আর বুকের শাড়ি ধরে বলে,'কি পিসি, চিনতে পারছো?' পিসি চামেলীকে দেখে চমকে যায়। চামেলী বছর চার আগে ছিল মির্জাপুরে। সে সময় চামেলীর সাথে পিসির আলাপ ছিল। এই পিসি সেদিন চামেলীর বিয়ে দিয়েছিল। মন্দিরে গিয়ে বিয়ে। আগে প্রেম, পরে বিয়ে। সব ব্যাপারে পিসির হাত ছিল। তারপর চামেলী পোয়াতি হয়। সন্তান প্রসবের জন্য কলকাতায় এক ঝুপড়িতে। সেখান থেকে একদিন রাতে চামেলী যখন ঘুমিয়েছিল তখন স্বামী পিসি চামেলীর সন্তানকে নিয়ে পালিয়ে গেছিল। শেষরাতে, তখন মোরগ ডাকে নি, চামেলী জেগে দেখে সন্তান নেই, স্বামী নেই, পিসি নেই। চামেলী ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে শেষ রাতে পিসি পিসি ডাকছে আর নারকেলডাঙার রেললাইন ধরে ছুটছে। একটা মালগাড়ি আসছিল। তার আলো লাইনের ওপর। পাগলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে চামেলী ছুটছিল। ভোর হয় হয়, মোরগ ডাকে, পায়খানা সারতে আসছিল শম্ভুদা। পরে এই শম্ভুদাই চামেলিকে বারাসাত স্টেশনের কাছে শম্ভুদার বিধবা দিদির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

সেই পিসিকে আজ দেখতে পেয়েছে। আর পিসি ভূতের চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু দেখার মত ভয় পেয়ে গেছে। মুহূর্তেই পিসির মুখ থেকে কে যেন নল দিয়ে সব রক্ত শুষে নিয়েছে। মুখটা যেন খসখসে ময়লা কালচে কাগজ হয়ে গেছে। ধরলেই মুখটা গুঁড়ো হয়ে যাবে, পিসির মুখটা ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে চামেলী আবার বলে, 'কিরে বাচ্চা-ধরা মাগি, চিনতে পারছিস্? বল শালি আমার ছেলে কই, আমার ছেলে কই?' প্রৌঢ় পিসির মুখে কোন কথা নেই। পোয়াতি বৌয়ের যন্ত্রণার চিৎকার কমপার্টমেন্টকে ছিঁড়ে ফেলছে. 'মা, মাগো আমি আর পারছি না। যন্ত্রণায় প্যাট ফেটে যাচ্ছে গো মা।'

লতিকা চামেলির আচরণ দেখে কাণ্ডজ্ঞান না হারিয়ে পোয়াতি বৌকে হাওয়া করছে। গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছে। ট্রেন বিরাটি পেরিয়ে গেছে। হু-হু করে ট্রেন ছুটছে। এক বৃদ্ধা সেসময় পোয়াতি বৌয়ের শাড়ির ভিতর দিয়ে তলপেটের তলায় হাত দিয়ে বলে, 'সরে যাও সবাই। ভীড় করো না। বাচ্চা হবে'। পোয়াতি বৌ হাতপা ছুড়ে ছটফট করছে। সবাই সরে যায়। 'একটা আড়াল চাই। কারোর কাছে পুরনো শাড়ি থাকে তো দাও।' বৃদ্ধা চেঁচায়। কেউ শাড়ি দেয় না। কারোর কাছে পুরনো শাড়ি নেই। লতিকা বলে, 'চম্পা পরের স্টেশনে গাড়ি থামলে হকার উঠতে দিস নে।' বলেই লতিকা তার নিজের শাড়িটা খুলে ফেলেছে। সায়া ব্লাউজ পরা লতিকা এবং আর দুজন মেয়ে পোয়াতির কোমর থেকে

পায়ের কাছ পর্যন্ত শাড়িটা দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। বৃদ্ধা শাড়ির ভিতর ঢুকে প্রসব করাচ্ছে। চারিদিকে ঘিরে-থাকা, ছড়িয়ে-থাকা মহিলা নিত্যযাত্রীরা যেন শোকসভায় নীরবতা পালন করছে। নির্বিকার উলবোনা মোটাবৌ পায়ের উপর পা তুলে পদ্মাসনে বসে উল বুনে যাচ্ছে। বৃদ্ধা দাই চেঁচায়, 'কারোর কাছে ব্লেড আছে?' আর ঠিক সে সময় সকল নীরব শৃঙ্খলা ভেঙে দেয় নবজাতকের আওয়াজ—'ওঁয়া ওঁয়া'। এর পরই 'একটা নতুন ব্লেড আছে কারোর কাছে' বৃদ্ধার উঁচুস্বর শুনে কলেজগার্ল জায়গা ছেড়ে উঠে এসে একটা নতুন দামী ব্লেড বৃদ্ধা দাইয়ের হাতে কাগজের মোড়ক খুলে দেয়। লোক্যাল ট্রেন দুর্গানগর ছেড়ে গেছে। মহিলা যাত্রীরা কোন হকারকে উঠতে দেয় নি। ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে পিসি চামেলীকে ধাক্কা মেরে ভিতরের দিকে ফেলে দিয়ে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মের ঢালু পথে গড়াগড়ি খায়।

পোয়াতি বৌ এখন আর পোয়াতি নয়। বৃদ্ধাদাই ব্লেড দিয়ে নবজাতকের নাড়ির সাথে পোয়াতি বৌ-এর নাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। তারপর নবজাতককে তুলে ধুয়ে মুছে পোয়াতি বৌ-এর বুকের কাছে দিতেই পোয়াতি বৌ একহাত দিয়ে নবজাতককে সরিয়ে দিয়ে বলে,'আমি ওকে জন্ম দিয়েছি বটে, কিন্তু আমি ওর মা নই। আমার বিয়ে হয়নি।' ওর কথা শুনে মহিলা যাত্রীরা কৌতূহলী হয়। তারা আরও কিছু শুনতে চায়। লতিকা তার শাড়িটা পরে নিয়েছে। বৃদ্ধাদাই পোয়াতি বৌয়ের রক্তলাগা শাড়িটা হাঁটু পর্যন্ত টেনে নামিয়ে দিয়েছে। পোয়াতি বৌয়ের সন্তানটাকে কোলে তুলে নিয়েছে। পোয়াতি বৌ বলে, 'পিসি কোথায়?' একজন মহিলাযাত্রী বলে, 'সে পালিয়েছে।' শুনে পোয়াতি বৌ দুঃখ প্রকাশ করে না। শুধু বলে,'আমার বাবা মারা যাবার পর পাজি পিসিটার হাতে তুলে দিয়েছিল। আর ঐ বাঁজা পিসি মাগি আমাকে দিয়ে বাচ্চা পয়দা করাতো। এর আগে আমার আরেকটা বাচ্চা হয়েছিল। বাচ্চাগুলোর কি হতো আমাকে বলতো না। পিসি আমার ডাইনি ছিল।' বলেই পোয়াতি বৌ কাঁদতে থাকে। ওকে আর কেউ ঘাঁটায় না। ওর কথা শুনতে এবং ওর প্রতি 'আহারে, বাছা রে, শুয়োরের বাচ্চা পিসি, এই সমাজের বারোটা বেজে গেছে, এইসব কথায় করুণা প্রকাশ করতে করতে এতোই মগ্ন ছিল,কখন যে লতিকা এবং চামেলী বাচ্চাটাকে নিয়ে দমদম ক্যান্টনমেন্টে নেমে গেছে, কেউ টের পায়নি।

দমদম ক্যান্টনমেন্টে নেমে লতিকা এবং চামেলি লাইন পেরিয়ে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে একটা গাছের নীচে বসে থাকে ট্রেনের অপেক্ষায়। আজ আর ওদের টিকিট ব্ল্যাক করতে যাওয়া হল না। পিসির কাছে থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া নবজাতককে নিয়ে নিজেদের বাসায়, বারাসতে ফিরে যাচ্ছে। চামেলীর কোলে নবজাতক। সেসময় ওরা দুজন শিশুর ঘুমিয়ে-পড়া সরল মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'আমরা দুজনেই ওর মা হবো।' লতিকা শিশুর মুখে নিচু হয়ে চুমু খেয়ে বলে,'আমি হব বড়-মা, তুই হবি ছোট-মা'। তারপর লতিকা একটু ভয় পেয়ে বলে,'কিন্তু সবাই জানে আমরা কুমারী।' 'কলকাতায় চাকরী করি। আমাদের বিয়ে হয় নি।' চামেলি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে, 'তুই থামতো লতু। আমরা তো কুমারী। আমাদের কি মন্তর পড়ে বিয়ে হয়েছে। আর কোন মাগী কুমারী আছে রে এখন, যারা বিয়ের আগেই বিয়ের স্বাদ মেটায় নি? কোন শালা আমাদের মা হতে দেবে না বে।' এই সংলাপের একটু পরেই চামেলী মা সদ্য পাওয়া সন্তানের মুখে গাছ থেকে ঝরে পড়া এক টুকরো বেগুনি রঙের ফুল হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে যাত্রায়-শোনা একটা সংলাপ আওড়ায়।

—আমরা একে মানুষ করবো, আমরা একে লেনিন করবো।

এমন সময় একটা তীব্র আওয়াজ যাত্রার সংলাপকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। একটা থ্রু ট্রেন আসছে ঝড়ের বেগে।

শিবপুজো

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দরী বউটাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই ভিখিরিটা ছুটলো!—বউটার হাতে মস্ত একটা থালা। থালায় সাজানো আপেল, আঙুর, ধূপ, ঘিয়ের প্রদীপ, একটা দুধের ঘটি।

ভিখিরিটার বুকে ঝুলছে একটা জ্যান্ত মানুষের বাচ্চা। আর দুটো শুকনো স্তন।

চলার পথে আটকে পড়েই বউটা ঘ্যাঁক করে উঠল। ভিখিরিটাকে চোখ পাকিয়ে বললো, 'পথ ছাড় বলছি।'

আজ শিবরাত্রি। বউটা এসেছে তাই পুজো দিতে।

ভিখিরিটা বললো, 'দেনা মা আমায় একটু দুধ। বাচ্চাটা আমার খেয়ে বাঁচুক।'

ভিখিরিটাকে পাশ কাটিয়ে বউটা এবার দ্রুত এগিয়ে গেল পথের ধারেই, একটা ভুঁইফোঁড় কালো পাথরের দিকে। ঘিয়ের প্রদীপটাকে জ্বেলে দিয়ে, দুধের ঘটিটাকে তার মাথার উপর উপুড় করে দিয়ে বললো, 'এদের জ্বালায় পুজোটুজো দেখছি এবার মাথায় উঠবে।'

দুধের ছোঁয়া পেয়ে ভুঁইফোঁড় কালো পাথরটা ঝলমল করে উঠলো—অহঙ্কারে। আর একটা মানুষের বাচ্চা এবং তার মায়ের দুটো শুকনো স্তন হঠাৎই তখন হারিয়ে গেল পথের যত ধূলোর অন্ধকারে।

তারপর?

বাচ্চা আর তার মাটাকে আরো একটু অন্ধকারে ঠেলে দিতে বউটা এবার তার চলন্ত গাড়ি থেকে উগরে দিল আরো খানিকটা কালো ধোঁয়া। গাড়িটা তার হুশ করে উধাও হয়ে গেল যেমন এসেছিল।

ভিখিরিটা এবার ছুটলো শিবের দিকে। তার কালোর ওপর জমে থাকা দুধটুকুকে ছেঁকে তুলে যদি পুরে দেওয়া যায় বাচ্চটার পেটে—সেই আশায়। কিন্তু না, তার আগেই একটা ঘেয়ো কুকুর শিবটাকে চেটেপুটে সাফ করে দিল সদর্পে।

হ্যাঁ, এই ভাবেই সাঙ্গ হল—শিবপুজো।

শাঁক বাজালো ফিয়েট, মারুতি! ঘণ্টা বাজালো ট্রাম. ধূনো দিল ভাঙা ট্যাক্সি, পোড়া মবিলের ধোঁয়া ছেড়ে, মন্ত্র পড়ল একটা কুৎসিত কাক, ফলের প্রসাদ পেল পথের ষাঁড়, নর্দমা।

আর এই সবের প্রতিবাদ জানালো মাত্র একজন। ফুরিয়ে যাওয়া, সদ্যোজাত একটা মানুষের বাচ্চা, তার দুটো শুকনো আঙুল চুষতে চুষতে, চুক চুক শব্দ তুলে! যে প্রতিবাদের শব্দ সইতে না পেরে ঘিয়ের প্রদীপটা হঠাৎ নিভে গেল এবার দপ্ করে।

মৃত্যুবার্ষিকী

বুদ্ধদেব গুহ

যোগেনবাবু জানালার সামনে বসে ছিলেন। এখন বারোটা বাজে। বাড়িতে কেউই নেই বলতে গেলে। বড়ছেলে-বড়বৌমা দুজনেই চাকরি করে। তারা অফিসে বেরিয়েছে। মেজ, কোম্পানি ফ্ল্যাটে থাকে, আলিপুরে; বাড ওয়ান কম্পাউন্ডে। মাড়োয়ারী-সাহেব কোম্পানির মস্ত অফিসার সে। ব্যস্তও খুব। মাসে দুমাসে আসে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ছোট, কী একটা ব্যবসা করে। ব্যবসাটা কি, তা যোগেনবাবু নিজেও বলতে পারবেন না। তবে, লুকোচাপার ব্যাপার যে কিছু আছে, এটুকু বোঝেন। ইদানীং ছোট ছেলে মৃগেনের ব্যবসা রমরমে। সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িও কিনে ফেলেছে একটা। ছোট-বৌমা তপু, মানে তপতী কালার টিভি কিনেছে। অলিম্পিক শেষ হলো সবে আজ সকালে। বাঁচা গেল। তপুর বাপের বাড়ির লোকে এই ছোট্ট বাড়িখানা ভরে থাকত সবসময় এই কদিন। কাছেই বাপের বাড়ি। লাভ ম্যারেজ ওদের। যোগেনবাবুর অলিম্পিক দেখার খুবই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও প্রথম দিনের শেষ রাতে ওপেনিং সেরিমনি দেখার পর, বলতে গেলে তাদের ভয়েই আর কালার টি-ভির সামনে যান নি। তাঁর ঘরেও আছে এটি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট সস্তা মডেলের টিভি। মেয়ে মায়া, যোগেনবাবুর স্ত্রী-বিয়োগের পর কিনে দিয়ে গেছিল, যখন এসেছিল এলাহাবাদ থেকে। জামাই রামমোহন, এলাহাবাদের কাছে নৈনির এক কারখানায় এঞ্জিনিয়র। ছেলেটি ভাল। জামাইরা সচরাচর শ্বশুর-শাশুড়ির চোখে ছেলেদের চেয়ে ভাল ঠেকে বলে যে জনশ্রুতি আছে সে জন্যেই নয়; রামমোহন যথার্থই ভাল ছেলে।

ভাবনা-টাবনাও আজকাল সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। পরম্পরা থাকে না কোনো। নাম, মুখ, সময়, কিছুই মনে থাকে না। দোষ নেই। বাহাত্তর হল। তাও যে বাহাত্তুরে ধরে নি এখনও তার জন্যেই সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞ তিনি।

আজ সকাল থেকেই মনটা বড় ভারী হয়ে আছে যোগেনবাবুর। আজ সরলার মৃত্যুদিন। তাঁর স্ত্রী। সহধর্মিনী। চল্লিশ বছরের পার্টনার। আজ ঠিক সাত বছর হবে সরলার চলে যাওয়ার।

সাত বছর। মনে হয় যেন সেদিন। মানুষের জীবনে মৃত্যুর মত 'নিহিত পাতাল ছায়া' আর কিছুই নেই। জন্মানোর মুহূর্তটি থেকে প্রত্যেক মানুষই মৃত্যুর জন্যে তৈরী হয়, প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় নিশ্চিতভাবে অথচ মৃত্যুকে কী অবলীলায় সকলে ভুলে থাকি আমরা। যোগেনবাবু ভাবছিলেন।

সরলার আকস্মিক মৃত্যুটা যোগেনবাবুর সমস্ত জীবনটাকে এমন এক রূঢ় বাস্তব আঘাত দিয়ে গেল যে, সমস্ত জীবন, তার জন্ম থেকে পঁয়ষট্টি বছরের দীর্ঘ জীবনটাকেই সরলার মৃত্যুর দিন অবধি এক সুন্দর স্বপ্ন বলে মনে হয় এখন। জীবনটাই মিথ্যা, মৃত্যুটাই সত্যি! আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! মৃত্যু জীবনের দরজায় এসে ধাক্কা না দিলে

মৃত্যুর অমোঘতা বোধহয় বোঝা যায় না। শ্মশানে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের শব নিয়ে গেলেও নয়, প্রতিবেশীর মৃত্যুতেও নয়, মৃত্যু নিজের জীবনের মূল ধরে টান যতদিন না দিয়েছে ততদিন এর স্বরূপ কিছুমাত্রও বুঝতে পারেননি যোগেনবাবু।

জীবনের শেষভাগে এসে যোগেনবাবু স্বীকার করেন যে বেশিরভাগ স্বার্থপর: কূপমণ্ডুক এবং তিনি নিজেও আদৌ ব্যতিক্রম নন।

এ বছর জুন মাসের গোড়া থেকেই এত বেশি বৃষ্টি হচ্ছে যে অগাস্টের এই তেরো তারিখের আকাশে তাকালে মনে হয় আশ্বিনই বুঝি এসে গেছে। চমৎকার নীল আকাশ। খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ পেঁজা তুলোর মত ভেসে বেড়াচ্ছে, তার ছেলেবেলার কৃষ্ণনগরের গাছপালা-ভরা নোদরপাড়ার আকাশেরই মত। কোথায় যে গেল সেই সব আকাশ, সে সব রোদ, চড়কের মেলা, তালের ভেঁপু, বুড়ির চুল!

পৃথিবী বড় দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এত দ্রুত বদলানো ভাল কি ভাল নয় সে সম্বন্ধে তাঁর মনে আজকাল নানারকম প্রশ্ন জাগে। কিন্তু এই দ্রুত ধাবমান পৃথিবীবাসীদের কারোরই সময় নেই একটুও দাঁড়িয়ে নিজের ছবি নিজের আয়নায় দেখার। বড় সর্বনাশের দৌড়ে মেতেছে আজ সারা পৃথিবী। বড় দারুণ দৌড় এ।

কেই বা ভাবে বা শোনে যোগেনবাবুদের কথা। ওল্ড ফুলস্। ফসিলস্। তা ঠিক। গত তিরিশ বছরে এক জীবনে যত কিছু পরিবর্তন দেখলেন যোগেনবাবু, তার সব কিছু তাঁর এই সেকেলে শ্লথগতি মস্তিষ্কে আঁটানো মুশকিল। আঁটেনা। তাঁর মস্তিষ্ক, এই দুর্দম গতির চাকায় বাঁধা পড়েনি বলে তাও একটু হাল্কা বোধ করেন।

যোগেনবাবুর ঘরের পাশেই বসার ঘর। সরলার মৃত্যুর পর তাঁদের বড় শোবার ঘরটা বড়ছেলে আর বৌমা দিয়েছে। তাঁকে পাঠিয়েছে ছেলে-বোয়েরা পরামর্শ করেই; এঘরটি গুদোম হিসেবে ব্যবহার করা হত। বাড়ি তাঁরই। ব্যালার্ডি থমসন এন্ড ম্যাথুজ-এর এঞ্জিনিয়রকে দিয়ে সরলা আর যোগেনবাবু পরামর্শ করে অনেক শখ করে এই বাড়ি বানিয়েছিলেন। সরলা একটি ঠাকুরঘর চেয়েছিলেন। যোগেনবাবু পরম নাস্তিক ছিলেন চিরদিনই। বানিয়ে দেননি ঠাকুরঘর, এখন দুঃখ হয়। বাড়িটা তাঁর নিজের নামে থাকলে এখনও ছেলেদের কাছে তাঁর আদর এতটা কমত না। তিনি এমন নন এন-টিটি হয়ে যেতেন না হয়ত। কিন্তু ভেবেছিলেন বয়সে যেহেতু তিনি বড়, তিনিই আগে যাবেন, তাই-ই অনেক টাকা গিফট্-ট্যাক্স দিয়ে সরলার নামেই করে দিয়েছিলেন বাড়িটা। সরলার মৃত্যুর পর সকলেরই সমানাধিকার বর্তেছে। হিন্দু সাকসেশান অ্যাক্ট-এ। উইল করে ত মারা যাননি সরলা। ছেলেরা ঃ মেয়ে মায়া এবং তাঁর অংশটুকু লিখিয়ে নিয়েছে তাদের পক্ষে পাছে ভবিষ্যতে কোনো গণ্ডগোল হয়।

চাকরি জীবনে লক্ষ লক্ষ সই করেছেন যোগেনবাবু, কত শত জরুরি কাগজে। ব্রিটিশ সরকারের বড় কর্মচারি ছিলেন। কিন্তু এই বাড়ির অংশ লিখে দেওয়ার সইটুকুর চেয়ে দামি সই বোধহয় তাঁর দীর্ঘ বাহাত্তর বছরের জীবনে আর একটিও করেন নি।

অপেক্ষাকৃত কমবয়সীরা বয়স্কদের এড়িয়েই চলে ঃ ভাবে কী কথা বলব বুড়ো হাবড়াদের সঙ্গে। কিন্তু কথা বললে তারা লাভবানই হত। যোগেনবাবু তাদের বলতেন, দ্যাখো ভায়া, কর্মক্ষম থাকাকালীন নিজের বদান্যতার আর আত্মবিশ্বাসের মূর্খামিতে পড়ে নিজেকে ভিখিরি কোরো না। স্বজনের কাছে ভিক্ষা চেয়ে বাঁচা বড়ই অপমানের। মানুষের জীবনে মাধুকরী বলে কোনো কথা নেই; যা আছে তা নগ্ন, নির্লজ্জ, বড়ই অপমানের ভিক্ষা। অন্যাকে সর্বস্ব দিয়ে দিয়ে নিজে ভিক্ষুক হলে এখন মহৎ বলে সম্মানিত হন না কেউই, মূর্খ বলেই নিগৃহীত হন। অতএব, ভায়ারা, এস্টেট ডিউটি

দিতে হয় দিও, ওয়েলথ-ট্যাক্স দিতে হয় তাও; কিন্তু নিজের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মেরো না।

যোগেনবাবু আকাশের দিকে চেয়ে অন্য যুগে চলে গেছিলেন। একটু নস্যি থাকলে ভাল হত। কিন্তু ফুরিয়ে গেছে। না, নস্যিটুকুও কিনতে পারেন না এমন গরীব তিনি এখনও হন নি। কিন্তু আনাবেন কাকে দিয়ে? চাকরঝি যারাই আছে সকলকেই ছেলে বৌরা মাইনে করে রেখেছে। তাদের কাজ শেষ হলে এবং চাকরঝি-এর দয়া হলেই তবে তাঁর ফরমাস খাটবে। এদিকে প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়ছেন তিনি। খাট থেকে ইজিচেয়ার, ইজিচেয়ার থেকে খাট। এই-ই এখন পরিধি। যোগেনবাবুর জীবনের বৃত্ত। বড় ছোট্ট বৃত্ত।

ছোট বৌমা হঠাৎ ঘরে এল।

বাবা! কাল কি হবে?

কি হবে? কাল?

চমক ভেঙে যোগেনবাবু বললেন।

বাঃ। কাল মায়ের বাৎসরিক নয়? মায়ের মৃত্যুদিন।

যোগেনবাবু ঘষা-কাঁচের চশমা ভেদ করে তাকালেন ছোট বৌমার দিকে।

বললেন, সরলার? সে ত আজ।

ও মাঃ! আজ নাকি! দেখেছেন! আপনার ছেলের কাণ্ড! নিজের মায়ের মৃত্যু তারিখটা পর্যন্ত জানে না।

যোগেনবাবুর মুখে এসে গেছিল, তাতে কি হল তপু? তোমার মায়ের জন্মদিন তো তার মুখস্থ। এটাই ঘটনা। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। স্বল্পক্ষণের জন্যেও মনের মধ্যে এমন নীচ ভাবনা এল বলে খারাপ লাগল তাঁর। এই খোলা দিনে, খোলা পরিবেশে নিজেকে পরিষ্কার রাখাও যে বড় কঠিন।

তপু বলল, এ মা? কি হবে এখন? ফুলটুল কিচ্ছু আনা হলো না। বিকেলে সন্তু আর গিনিকে বলতে হবে গান গাইতে আসার জন্যে। বড়দাদের বলতে হবে। মেজদা মেজবৌদিকেও অফিস থেকে তাড়াতাড়ি আসার জন্যে! সত্যি! সব দায় যেন আমার। দেখেছেন। কোনো মানে হয়?

অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হল।

প্রতি বছর যেমন হয়।

সরলার একটি কালার্ড ফোটো, রামমোহন মস্ত বড় করে এনলার্জ করে বাঁধিয়ে দিয়েছিল শ্রাদ্ধের আগে। যোগেনবাবুর এই ঘরে সেই বড় ছবি রাখার জায়গা নেই এবং আধুনিক ছেলেবৌদের ঘরের দেওয়ালে প্রাচীন-দর্শন মৃত মায়ের ছবি শোভা পেতে পারেনা বলেই ফোটোটি চাল-ডাল-নুন-লঙ্কার সঙ্গে ভাঁড়ারের এক কোণায় পড়ে থাকে সারা বছর। বছরের এই বিশেষ দিনটিতেই সেটাকে বের করে ঘষামাজা হয়, চন্দন লাগানো হয় তাতে, বিরাট জাপানী ভাস্-এ খুব রুচিসম্পন্নভাবে রজনীগন্ধা সাজানো হয়। সাদা অথবা অতি হাল্কা-রঙা শাড়ি পরে বৌমারা এবং পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে ছেলেরা ঈষৎ দুঃখ-দুঃখ মুখ করে যার যার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের চা-জলখাবারের দেখাশুনা করে। এবারে পুজোয় কোথায় যাবে না যাবে বেড়াতে, তার আলোচনা করে। ফ্যামিলির গেট-টুগেদার হয় সরলার মৃত্যুদিন উপলক্ষে।

সেদিনও সেইরকমই হল। সময়মত মঞ্চ সাজিয়ে, সরলার মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনের আড়ম্বর সুষ্ঠুমত সম্পন্ন করে তিন ছেলের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা কোরাসে 'তোমার

অসীমে প্রাণপণে লয়ে যতদূর আমি ধাই, কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই' অথবা—চলো গাই সেই ব্রহ্মনাম! যে নাম স্মরণে প্রাণারাম, মরণ ঘুচে রে! হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়ে, মধুর রাগিণী তুলিয়ে গাও এক প্রাণে এক তানে একেরই কীর্তনে।

গাওয়া হয় ভাব-গদ-গদ গলায়।

যোগেনবাবু চোখ বুজে বসে থাকেন। গান শেষ হয়। তারপর গল্পগুজব। খাওয়া দাওয়া। অনেকে কাছে আসেন। কর্তব্য করার জন্যে ঝুঁকে পড়ে শুধোন নানা প্রশ্ন।

কেমন আছেন মেসোমশায়?

ভাল।

ব্লাডসুগার?

ভাল।

প্রেসার?

ভাল।

হার্ট?

তাও ভাল।

চোখ?

চমৎকার।

তারপর সমবেত যুবক-যুবতীরা যোগেনবাবুর অস্তিত্বটা পর্যন্ত ভুলে গিয়ে হাসি-তামাশায় মেতে ওঠে একসময়। হাসি-তামাশা যে উনি ভালবাসেন না বা বাসতেন না এমন নয়। রামগরুড়ের ছানা তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। তবে, কিছু কিছু সময়, কোনো কোনো দিন হাসতে পারেন না তিনি। হাসি আসে না।

তাঁকে এবং সরলাকে ঘিরে যেসব মানুষের হাসি-তামাশা একদিন তাঁদের দুজনকেই অশেষ আনন্দ দিয়েছে তাঁদের অনেকেই আজ নেই। যাঁরা আছেন, তাঁরা জরাগ্রস্ত। যাঁরা নন, তাঁদের ডাকে না ছেলেরা ও বৌমারা। তাই-ই তার জীবনের এই সব নবাগন্তুকদের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখগুলিকে এবারেই অচেনা বলে মনে হয় তাঁর। এদের কারোর সঙ্গে কোনো রকমের মিল খুঁজে পান না। অথচ দেখাতে হয় যে, এরাই যোগেনবাবুর সব। কারণ, সাম্প্রতিক অতীত থেকে তিনি ক্রমাগতই সাহস হারিয়ে ফেলছেন। চোখে কম দেখছেন, কানে কম শুনছেন, পায়ে জোর নেই।

কোথায় যাবেন যে তাও জানা নেই। পরকাল বলে কিছু কি আছে? সরলার সঙ্গে দেখা হবে কি? স্বর্গ অথবা নরক এসব নিয়ে কখনও নাস্তিক যোগেনবাবু মাথা ঘামাননি। কিন্তু ইদানিং নানা ছবিই ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মন্দাকিনী নদী বয়ে যাচ্ছে, অনেক ফুল, খুবশান্তি সেখানে। অপ্সরা সব মেনকা-রম্ভারা গজেন্দ্রগমনে চলেছেন। আবার এও-ও দেখেন যে, মস্ত কড়াইয়ে তেল ফুটছে। বিকটদর্শন সব লোকরা বড় বড় হাতা দিয়ে সে কড়াইয়ে তেল চড়াচ্ছে।

নাঃ। এবার উঠবেন যোগেনবাবু। কিন্তু উঠতে গিয়েই পড়ে যাবার মত হল। দুপায়েই একেবারে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেছে। চটিটাতে কিছুতেই পা গলাতে পারছেন না। সকলের সামনে একসময় দোর্দণ্ড প্রতাপের মানুষটার এমন দুরবস্থাতে যোগেনবাবু নিজেও অত্যন্ত লজ্জিত বিব্রত হলেন। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করে চটির মধ্যে পাটা গলালেন। তারপর লাঠিটা হাতে করে খুব আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘর অন্ধকার। আলো আর জ্বাললেন না।

ঘরে সরলার একটি ফটো ছিল। ফটোটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। রাস্তার টিউব আলোর একটি ফালি এসে পড়েছিল সেই ফটোর ওপর।—মনে হলো সরলা হাসছেন যেন। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন যোগেনবাবু।

বিড় বিড় করে বললেন, খুব খারাপ সলু, খুবই খারাপ তুমি। জানো, কত লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে? কত অন্যায়, অবহেলা, অনাদরের সাক্ষী এই আমি, তোমার অনেক অভিমানী দুর্দান্ত রাগি স্বামী, হতভাগা যোগেন রায়। দেখতে পাচ্ছ কি সলু? অথচ, ঝগড়া করি, কাউকে উঁচু করে একটা কথা বলি, কারো কাছে অভিযোগ জানাই এমন একজন লোকও নেই আমার পৃথিবীতে। না গো! একজনও নেই। এত লোক চারধারে। ভিড়! অথচ ...

আস্তে আস্তে ইজি-চেয়ারে এসে বসলেন যোগেনবাবু। ছোটবৌমার ঘর থেকে টি-ভির জোর আওয়াজ আসছে। খুবই জোর। কে যেন বলছিল, আজ ভি-সি-আর ভাড়া করে এনেছে তপুরা কীসব আন্‌সেন্সর্‌ড ছবি-টবি দেখবে বলে। সিনেমাই দেখছে বোধ হয় এখন ওরা।

কি থাকে আন্‌সেন্সর্‌ড ছবিতে? আজ আর কোনো ঔৎসুক্যই নেই কোনো ব্যাপারে তাঁর। ঔৎসুক্য মরে যাবারই আরেক নাম বোধহয় মৃত্যু। ভাবেন যোগেনবাবু। আরেকবার সরলার ফোটোটার দিকে চাইলেন উনি। চোখের কোণ দুটো জলে ভরে এল। ভালোবাসা কাকে বলে, জীবনের শেষে এসে, সরলার মৃত্যুর এত বছর পর যেন এই-ই প্রথম বুঝতে পারলেন। একেবারে হঠাৎই।

যার সঙ্গে নির্দ্বিধায়, নিঃসঙ্কোচে ঝগড়া করা যায়, যাকে কিছুমাত্রও না ভেবে দুমদাম্ করে যা খুশি তাই-ই বলে যাওয়া যায় এমন একজন মানুষও আজ আর অবশিষ্ট নেই যোগেনবাবুর জীবনে।

তপুর খাস চাকর এসে বলল, বাবু! আপনি এখন কি খাবেন?

যোগেনবাবু মনে মনে ভাবলেন হঠাৎই। আজ কি তাঁর এত খাতির?

মুখে বললেন, কি? কি ব্যাপার?

আজ মায়ের মৃত্যুদিন বলে খিচুড়ি হয়েছে, মোক্ষদা রেঁধেছে। বৌদিরা সব জোগান দিয়েছেন যে।

খিচুড়ি! অন্যমনস্ক গলায় বললেন যোগেনবাবু।

হ্যাঁ, ভুনি খিচুড়ি। বাবু।

হারামজাদা! নিরুচ্চারে বললেন, যোগেনবাবু। ভুনি খিচুড়ি রান্নার মোক্ষদা বা বৌমারা কী জানে? ভুনি খিচুড়ি রাঁধত বটে সরলা! আহা!

বাবু! নিয়ে আসি এখানে? ছোটবৌদি পাইটে দিলেন আমাকে।

নাঃ। না। না রে জগা। শরীর ভাল নেই আমার। খাব না কিছুই।

জগা বলল, তালে, আমি খেইয়ে নেব বাবু? বইলেন না যেন আবার।

খেয়ে নে, খেয়ে নে। কাউকে বলব না।

ভালোবাসার খিচুড়ি হলেও বা কথা ছিল। খারাপ-বাসার খিচুড়ি কাকেই খেল কি বগেই খেল তাতে যোগেনবাবুর কীই-ই বা এসে যায়!

ঝগড়াই যখন করতেন শুধু, তখন ভাবতেন ভালবাসা তাঁদের মধ্যে বুঝি একটুও অবশিষ্ট নেই। আজ বুঝতে পারেন যে সরলা চলে যাবার পর সব সোহাগ ছাপিয়ে ঝগড়াটুকুর স্বাদই বড় জীবন্তভাবে রয়ে গেছে। যা-কিছুই জীবন-যৌবন সম্বন্ধীয়, তার সব-কিছুরই স্বাদ বোধহয় নোনাই!

মাতৃয়ার্কি

নবনীতা দেবসেন

আচ্ছা খুকু, বলতো দিকি, জগতে সবচেয়ে সুখী কে? আই বেট, তুই বলতে পারবি না।

—জানোই যখন তখন জিজ্ঞেস করছো কেন মা? তোমার নাকে অক্সিজেনের নল। হাতে গ্লুকোজের ছুঁচ। এখন না হয় বকরূপী ধর্মের রোলটা তুমি নাই নিলে? রেস্ট নেওয়া উচিত নয় এখন?

—তার মানে তুই উত্তরটা জানিস না। এই তো? জানতুম, পারবি না।

—আমি তোমার মতন ধীমতী নই মা। ইনফ্যাক্ট তোমার চেয়ে বেশি কেন, তোমার সমান বুদ্ধিমান লোকও আমি জীবনে খুবই কম দেখেছি। ভূ-ভারতে কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার জুড়িটি নেই!

—মেলা তেলাসনি বাছা। তবে এই প্রসঙ্গে যে 'বুদ্ধিমান' শব্দটি ব্যবহার করলে তাতে আমি খুব আনন্দিত। 'বুদ্ধিমতী' যে বললে না, এটাই তোমার বুদ্ধির প্রমাণ।

—থ্যাংকিউ।...কিন্তু ঠিক কোন্ কারণে বলছ এটা?

—সেটাও যদি তোমাকে বানান করে বলে দিতে হয় মা তবে আমারই হিসেবে ভুল ছিল।

—আর তোমার ভুল ছিল স্রেফ ব্যাকরণের লিঙ্গভেদে। উইমেন্স লিব বিষয়ে তুমি অজ্ঞ মনে হচ্ছে। সে যাক গে, আমার প্রশ্নের জবাব কই?

—কোন প্রশ্ন?

—আরে? এর মধ্যেই ভুলে গেলে? এটা একটা রেকর্ড টাইমের মধ্যে ভুলে যাওয়া কিন্তু! নাঃ, জগতে বুদ্ধিই সবচেয়ে জরুরি বস্তু নয় দেখছি।

—নয়ই তো। স্মৃতিও খুব জরুরি। প্রশ্নটা ছিল কী? খেই ধরিয়ে দাও।

—ঐ যে, জগতে সবচেয়ে সুখী কে?

—তার উত্তর তো কবেই—

—আহাঃ। সেটা তো মহাভারতের উত্তর। যুধিষ্ঠিরের দিনকাল পাল্টে গেছে তো, এখন ঐসব পচা পুরনো উত্তর চলবে না। তোমরা নতুন যুগের মানুষ নতুন জবাব খুঁজে দাও। শাকান্নে এখন বড় জোর ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে পারে, সুখ কিন্তু হয় না। নতুন যুগের নতুন উত্তর চাই।

—পুরনো প্রশ্নের নতুন উত্তর?

—প্রশ্নটা চিরন্তন। সংকটজনক পরিস্থিতি যেমন চিরন্তন হলেও সংকট মোচনের পন্থাটা তো চিরকালই এক হয় না?—যুগে যুগে বদলায়, এটাই জগতের নিয়ম। ইতিহাসের ধারা। ধর্ম বলো, দর্শন বলো, রাজনীতি বলো, এরা তো যুগ যুগ ধরে এটাই করে আসছে। পুরনো প্রশ্নের নতুন উত্তর যোগানো। প্রশ্ন একই থাকে, শুধু

যুগে যুগে, দেশে দেশে, সভ্যতা বিশেষে, সময় বিশেষে এবং চিন্তাবিদ বিশেষে জবাবটা পালটে পালটে যায়। যেমন ধরো মূল্যবোধের প্রশ্ন। প্রশ্ন তো পালটায় না, উত্তরই পালটায়। তাই নয় কি?

তাই বটে। কিন্তু মা, তোমার—

—আচ্ছা, আরো সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি তো, বাবা, একটু মাটো আছো। এই ধরো না কেন আমার অসুখের কথাটা, আসলে এই যে অসুখটি আমার হয়েছে এটি তো ঠাণ্ডা লেগে বুকে সর্দি বসে জ্বর, কাশি, ইত্যাদি? এ নির্ঘাত মনুষ্য প্রাণীর চিরকালই হয়ে আসছে। আজ বীজাণু পরীক্ষা করে একে ব্রঙ্কো নিমোনিয়া বলছে। আগে অন্য কিছু বলতো। চরক-সুশ্রুত নির্ঘাত কোন সংস্কৃত নামে এই রোগের ওষুধ লিখে গেছেন, গ্রীস রোমের চিকিৎসকরা আরো কোনো অন্য ট্রিটমেন্টের বন্দোবস্ত করেছেন, আরব মিশরের হাকিমরাও মস্ত মস্ত পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা আবার আরেক রকম প্রেসক্রিপশন দিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। সবেতেই এই রোগটা সেরে যেত। বুঝলে কথাটা?

—বুঝলুম। নতুন বোতলে পুরনো মদ নয়, পুরনো বোতলে নতুন মদ।

—ওসব মদের বোতলের উপমা ছেড়ে দাও। ওটা এখানে অপ্রযোজ্য। অভ্যস্ত উপমা দিয়ে সব কিছু বুঝে নেবার টেনডেনসিটাও ছেড়ে দাও। ওটা অল্প বুদ্ধির লক্ষণ। অশিক্ষিত এবং শিশুরা এটা করে থাকে।

—মা, তোমার কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। একটু বিশ্রাম নিলে ভাল হত না?

—চিরবিশ্রাম তো নিতেই হবে মা। আশি বছরে ব্রঙ্কোনিমোনিয়া মানেই চিরবিশ্রামের সুষ্ঠু আয়োজন। তা তোমরাই তো সে বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছো মা। নাকে নল, শিরায় ছুঁচ, একেবারে আসুরিক যুদ্ধের বন্দোবস্ত করেছ। এ যাত্রায় মনে হচ্ছে চিরবিশ্রাম আর হল না। এ শীতটাকেও হারিয়ে দিলুম। বৃদ্ধবৃদ্ধারা শুকনো পাতার মতন, শীতকালেই বেশি ঝরে যায়। তা, আমি বোধ হয় জালেই ঝুলে রইলুম।

—চুপ করো, চুপ করো। ডোন্ট টেম্পট প্রভিডেন্স। মা!

—অঃ। ইংরিজিতে কুসংস্কার প্রকাশ করছো? মার গায়ে যাতে 'নজর' না লেগে যায়? বেশ বেশ। ইংরিজিতে বললে কানে তেমন ঠেকে না, নারে? এই জন্যে তবে 'ইংরাজী শিক্ষা'? কুসংস্কার ট্রানস্লেশন করবার জন্যে! উত্তরটা কিন্তু দিলে না। স্মুথলি অ্যাভয়েড করে যাচ্ছ।

—আমি জানি না উত্তর। জগতে সবচেয়ে সুখী কে? কে জানে? অন্তত আমি যে নই এটুকু বলতে পারি।

—ইয়ার্কি মেরো না। চিন্তা করো।

—জগৎগুরু শংকরাচার্য চতুষ্টয়? অথবা মার্গারেট থ্যাচার? কিংবা ন্যান্সি রেগন? যাদবপুরে মমতা ব্যানার্জি, দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধী, বম্বেতে অমিতাভ বচ্চন, হিন্দুস্থান পার্কে তুমি। অন্ধ্রে এন-টি-আর, চাঁদে শশক? কী জানি মা, মনস্থির করতে পারা শক্ত। আচ্ছা, বলছি জগতে সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি, সত্যজিৎ রায়। সবচেয়ে গ্ল্যামারাস অন্তত। আফটার মেরিলিন মনরো। হয়েছে উত্তর?

—যতসব ছোট কথা। কত বড় প্রশ্নের কত ছোট উত্তর। শোন আমি বলে দিচ্ছি, জগতে আজকের দিনে যে কোনো লোকের পক্ষেই সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি হওয়া খুবই

সহজ। সেটার জন্য অত মহৎ ব্যক্তি হতে হবে না এবং সেই সহজ সুখটি আহরণ না করে মানুষ সেধে সেধেই নিজের জীবনকে দুঃখে জর্জরিত করে তোলে। অযথা টেনশন সৃষ্টি করে জীবন বিপন্ন করে ফেলে। স্প্রে-টা দাও সিস্টার!

—আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন মাসিমা।

—দিদি, আপনি নিচে যান। মাসিমা বড্ড বেশি কথা বলছেন। শরীর খারাপ হবে—

—দিদি নিচে যাবে না। তুমিই নিচে যাও। আমার এখন নার্সিং দরকার নেই। আমার কম্পানি দরকার। ওটাও খুব জরুরি।

—ঠিক আছে মা—আমিও থাকি, আর সিস্টারও থাকুক। তুমি বরং একটুক্ষণ কথা না বলে মৌনীবাবা হয়ে কথা শোনো। তাহলেই উনি কিছু বলবেন না।

—ছিলুম তো মৌনী এই কটা দিন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও। বাধ্যকরী শোনবার মত কথা কে বলবে যে শুনব? সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি কে তুমিই শুনে রাখো। সেই সুখীতম, যার সমস্ত ইনকামট্যাক্স পুরোপুরি নিঃশেষে শোধ করা অভ্যাস। যার ব্যক্তিগত কোন ঋণ নেই। সরকারের কাছেও কোন ঋণ নেই। সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে সুখী। আমি মরলে ডেথডিউটি পুরো দেবে। যদি লাগে ফাঁকি দেবার চেষ্টা কোরো না।

—ও। আচ্ছা। তুমিই সব দিয়ে থুয়ে যাও না উকিল ডেকে, হিসেব করে?

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ব্যাপারটা ধরতে পারলে না, অথবা ইনকামট্যাক্স দাও না। বা দিতে চাও না। অবিশ্যি তোমার যা ইনকাম, সম্ভবত ট্যাক্সেবল নয়।

—তা কেন, আমাদের তো মাইনে থেকেই কেটে নেয়।

—আমরা তো রাস্তা তৈরি, টিউবওয়েল বসানো বা হাসপাতালের উন্নতি এসব ব্যক্তিগতভাবে করি না, করার শক্তিও রাখি না। কিন্তু যথাযথ ট্যাক্স দিলে, জানি আমার সামান্য রোজগারও দেশের উন্নয়নের কিছু কাজে লাগছে। কত সুখ এই চিন্তায়। ভাবো কত শান্তি।

—ভাবলুম। কিন্তু এও তো পুরানো উত্তরই। অঋণী!

—মা, ট্যাক্সের টাকার কিন্তু সদ্ব্যয় হয় না— অপব্যয়ই বেশি হয়, সরকারি লোকেরা নিজেদের পিছনেই খরচ করে। চুরি অনন্ত।

—হোক অপব্যয়। তুমি-আমি যা খরচ করব সবটাই তো নিজের পেছনে, সবটাই তো অপব্যয়, সে সব সত্ত্বেও যেটুকু উদ্বৃত্ত হবে চক্ষুলজ্জা বাঁচাতেও সরকারি মহল যেটুকুনি দেশের কাজে লাগাবেন, সেটুকুই পুণ্য, এখন আমার পাপাপুণ্যের ধারণাটা বদলে গেছে, ছেলেবেলার মত নেই। ধর্ম থেকে সমাজের দিকে চোখটা ঘুরে গেছে। আর নঙর্থ থেকে সদর্থের দিকে।

—কীরকম? কীরকম?

—এসব প্রশ্ন করবেন না দিদি। আর কথা বলবেন মাসিমা তাহলে। কাল সারারাত ধরে আমাকে বলেছেন পাপ কী আর পুণ্য কাকে বলে। এদিকে এখনও দিনের সিস্টার এল না—কখন যে আসবে?

—না আসুক। দিনমণি তো এসেছেন। তোমার ডিউটি শেষ। তুমি যাও। তুমি আর আমাতে মনোনিবেশ কোরো না তো, বারান্দায় যাও। ওই দ্যাখ রাস্তায় কিসের শব্দ শোনো, খুকু, পাপ আর পুণ্য দুটোই আসলে নিতান্তই সমাজ-সম্পৃক্ত, সমাজ-উদ্ভূত ধারণা। আধ্যাত্মিক বা ভগবত বিষয়ক কোনো ব্যাপারই নয়। অম্বুবাচী-একাদশী গরুর মাংসটাংসর সঙ্গে যুক্ত নয়, সমাজের প্রতি ব্যক্তির আচার আচরণ কেমন, তাই

দিয়েই নির্ধারিত হবে কোনটা পুণ্য আর কোনটা পাপ। যাতে সমাজের আর সকলের মঙ্গল, উন্নতি, সেইটেই পুণ্য। আর উল্টোটা হচ্ছে পাপ। অর্থাৎ যাতে সমাজের সকলের অমঙ্গল, অবনতি ঘটে—সেই কর্মই অপকর্ম, পাপকর্ম। বুঝলে? ব্যক্তিকে সর্বদা এটা মনে রাখতে হবে। পাপ ব্যক্তি করে, ক্ষতি সমাজের হয়।

—হুঁ। পোপও বলেছিলেন এমনি কথা—

—পোপ যাই বলুক। শুনতে চাই না। কোন্ পোপ? পোপ বলে।

—আলেকজান্ডার পোপ, মা। কবি।

—আচ্ছা খুকু, দ্বাদশ জনকে তোমার মনে আছে? ভেটিকানে? এখন তো বোধহয় পোপ পলের রাজত্ব চলছে, না? ৬নং না ৫নং? পোপ জন দি টুয়েলফথকে তুমি যে ভাটিকানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখেছিলে, হোলি ইয়ারে, তোমার মনে আছে কি? অবশ্য খুব ছোট ছিলে।

—আছে মনে একটু একটু। বড্ড ভিড় ছিল। উনি তো বারান্দায় বেরিয়ে হাত নাড়লেন। লাল সাদা জামা ছিল গায়ে।

—ভিড়ের কারণ যুদ্ধের পর ঐ প্রথম হোলি ইয়ার। ক্যাথলিকরা যারা পৃথিবী ভেঙে এসে জড়ো হয়েছিল রোম শহরে। তুমি খুকু খুবই সৌভাগ্যবতী। ওটা খুব জরুরি 'দর্শন' ছিল। অনেক মৃত্যুর পর।

—তা আর বলতে? নেক্সট রোমে যাই অলিম্পিকের বছরে. সোজা ইন্ডিয়াকে হকি খেলে জিততে দেখে এলাম। এখন তো কেবলই হারে। একমাত্র ওয়ান ডে ক্রিকেট ছাড়া। সবেতে হার।

—কেবল হালকা কথা। কত বড় বড় মহৎ মানুষকে তুমি চোখে দেখেছো—সে সব লিখে রেখেছো কোথাও? ডাইরি রাখতে এত করে অভ্যেস করালুম ছোটবেলায়। বড় হয়েই ছেড়ে দিলে। দুর্ভাগ্য।

—তুমি তো মা আমার চেয়েও বেশি বেশি করে বিখ্যাত সব মানুষদের দেখেছো। তুমিও তো লিখে রাখনি। কতকাল আগে ছেড়ে দিয়েছো ডায়েরি লেখার অভ্যাস। কেন ছাড়লে?

—কিছুই থাকে না। আমিও খুব ভাগ্যবতী। সে কথাও ঠিক। দেশ-বিদেশের অনেক গুণীমানী মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি জীবনে। কিন্তু এহ বাহ্য। কিছুই থাকে না। লিখেই বা কি হবে?

—মা, আমাকে তুমি একটাও শিশির ভাদুড়ীর নাটক দেখাওনি। এ দুঃখ কিন্তু আমার কমানো যাবে না।

—কে বলল দেখাইনি। তুমি সীতা দেখেছ। অযথা অভিযোগ করার স্বভাব ভাল না।

—যাঃ সত্যি? সত্যি বলছো মা? আমি সীতা দেখেছি?

—সত্যি। আমাদেরই বরং তুমি দেখতে দাওনি। এত ডিস্টার্ব করেছিলে যে উঠে আসতে বাধ্য হই আমি। তারপর থেকে কোনো থিয়েটারে তোমাকে নিয়ে যাইনি, একেবারে শম্ভু-তৃপ্তির সময়ের আগে। ততদিনে একটু মানুষের মতন হয়েছো। চুপ করে বসে দেখতে। তোমার স্বভাব যে বড়োই অমার্জিত ছিল বাবা। প্রাকৃতজনোচিত এখনো আছে।

—মা, তুমি গিরিশ ঘোষকে দেখেছো?

—"সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল"—নাঃ, আমার আর গিরিশ ঘোষকে দেখা হয়নি। তবে তাঁর ছেলেকে দেখেছি। দানিবাবুকে। দানিবাবুই কি কিংবদন্তি হিসাবে কম

যান? আতুতুতু করে আধো আধো বুলিতে কথা কইতেন। ঠিক তেমনি করেই মঞ্চে অভিনয়ও করতেন— দানিবাবু কেন, আমরা আবার স্বয়ং অমৃতলাল বসুকেও দেখেছি—

—ঈশশ—রসরাজ।

—হায়রে তখন কিছু জ্ঞানই ছিল না। জানতুম না মোটে কী জিনিস দেখছি। কাকে দেখছি। ঠিক মত মূল্য দিতে পারিনি সে সব অভিজ্ঞতার।

—থাক থাক, অত কথা বলে কাজ নেই। আরেক দিন শুনবো। তোমার বাবা কিন্তু গিরিশ ঘোষকেই দেখেছেন। তোমার বাবা শুধু গিরিশ ঘোষকেই দেখেননি, তাঁর গুরুদেবকেও দেখেছিলেন।

—অর্থাৎ? গুরুদেব মানে?

—শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে। এও জান না? সাহিত্য পড়াও?

—ওঃ। ওই গুরু? আমি ভাবছি নাট্যগুরু—

—তবে দূর থেকে। প্রণাম করা হয়নি। তোমার বাবার এটা খুব দুঃখ ছিল।

—ও।

—এই, যাঃ। সত্যি? আমার বাবা রামকৃষ্ণকে দেখেছেন?

—যাঃ। কেন? তোমার বাবা কি আজকের লোক? মহা পুণ্যবান ব্যক্তি তিনি।

—তুমিও দেখেছো নাকি? শ্রীরামকৃষ্ণকে?

—নাঃ। তবে —আমিও অবিশ্যি—

—'তুমিও অবিশ্যি' কী? পুণ্যবতী? পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য। এই লাইনে?

—শাট আপ! পুণ্যটুন্যর কথা হচ্ছে না।

—কী তবে? তুমিও অবিশ্যি কি?

—আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিনি, তবে আরেক জনকে দেখেছিলুম।

—বিবেকানন্দকে?

—তাঁকে তো দেখেইছি, সিস্টার নিবেদিতাকেও আমরা দেখেছি। তাছাড়া আমি ইয়ে,সারদা দেবীকেও দেখেছি। শ্রীমা, আর কি। তাঁকে দেখার ভাগ্য হয়েছিল।

—সে কি? এতদিন বলোনি কেন? এত বড় একটা কথা চেপে যাচ্ছিলে?

—বলবার কী আছে ? কী হবে বলে?

—কোথায় দেখলে? দক্ষিণেশ্বরে?

—না। অন্য জায়গায়। বাগবাজারে। উদ্বোধনে।

—উদ্বোধনে? ওখানে তুমি কেন গিয়েছিলে মা? সারদা দেবীকে দেখতে?

—নিবেদিতা স্কুলে ভর্তি হতে গিয়েছিলুম। চপলা দেবী নামে একজন বাল্যবিধবা মহিলা নিবেদিতা স্কুলে ভর্তি হয়ে শিক্ষিকা হয়ে, বোর্ডিংয়ের সুপারিটেনডেন্ট ও শিক্ষয়িত্রী হয়েছিলেন। উনি খুব স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। চপলাদেবীর কাছে গিয়েছিলুম। সেখানে গণেন মহারাজের সঙ্গে দেখা হল। তিনি যাচ্ছিলেন উদ্বোধনে শ্রীমার কাছে। আমি তখন ১৫-১৬ বছরের মেয়ে। গণেন মহারাজ যাচ্ছেন শুনেই আমিও যাব বলে নেচে উঠলুম। খুব ঔৎসুক্য উদ্দীপনা ছিল। ওই গণেন মহারাজই শ্রীমার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সর্বত্র অবাধ গতি ছিল। খুব পরোপকারী মহৎ মানুষ ছিলেন। নন্দলাল বসুর ছবি নিজে সেধে নিয়ে গিয়ে ধনীদের বাড়িতে বিক্রি করে দিতেন। আজকাল তেমন গণেন মহারাজের নাম শুনি না কোথাও। অথচ এককালে—

—মা, সারদামণিকে তোমার কেমন লাগলো?

—আমি তখন ছোটো তো— কীই বা বুঝি, আমার মনে হয়েছিল সারদামণি গ্রাম্য সরল সাধারণ গিন্নি। ঘরকন্না, নিজের ভাই, ভাইপো, ভাইঝিতে তাঁর মন ছিল। তাঁর মধ্যে লোক ঠকানোর, রং চড়ানোর, মিথ্যের বা কৃত্রিম কোন ব্যাপারই ছিল না। তাঁর সরলতা ও সততা ছিল অসামান্য। যজমানই হলো ভাত-ভিত্তি বামুনদের। তিনি সেটাই বুঝতেন, তাই তাঁর মন্ত্রশিষ্যদের প্রতি অগাধ স্নেহ ছিল। অন্যদের দিকে ততটা মন দিতেন না বোধ হয়। অন্তত আমি তো তাই দেখেছিলুম। একেবারেই অকৃত্রিম, সোজা মানুষ। লোক-দেখানো কিছুই করতেন না। সেজন্য তাঁর প্রতি খুবই শ্রদ্ধা হয়েছিল, পরে। প্রথমে কেমন একটা ধাক্কা লেগেছিল।

—ধাক্কা? কেন মা?

—তখন তো আমরা সদ্যকিশোরী, ব্রাহ্মসমাজ প্রভাবিত, নাগরিক স্মার্টনেসের মোহে বিমোহিত। তখন ওঁকে মনে হয়েছিলো গ্রাম্য। ওঁর অকৃত্রিমতাকে গ্রাম্যতা মনে হয়েছিলো। সেটা ঠিক নয়। এখন বুঝতে পারি।

—সে তো রামকৃষ্ণদেবকেও গ্রাম্য মনে হয় শ্রীমার লেখা থেকে। ওঁরা গ্রামের লোক, গ্রামাই তো ছিলেন। তাতে হয়েছেটা কি? এটাই তো স্বাভাবিক। তাই না?

—তোমাদের এখন যেমন গাঁ নিয়ে মাতামাতি— কেননা শহর এখন পুরানো হয়ে গেছে ফোক সং, ফোক টেল, ফোক ডান্স, ফোক কালচার। আমাদের সময় তো তেমন ছিল না। তখন কলকাতা শহর নিয়েই আসল মাতামাতির যুগ। নাগরিকতা তখনও নতুন। বুদ্ধদেব বসুদের লেখা পড়ে বোঝ না? এখন মহাশ্বেতার কল্যাণে গ্রাম, উপজাতি—এরা সবাই মান্যগণ্য হয়েছে। তখন ঠিক তা ছিল না।

—কেন? জানিস। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ এঁরা সবাই তো গ্রাম জীবন নিয়েই লিখেছেন। শরৎচন্দ্রও তো তাই।

—তবুও, গ্রাম্যতাটা আলাদা করে গুণের কিছু ছিল না। জীবনের অঙ্গ ছিল। এখন তোমাদের কি সব ব্যাক টু নেচার না ব্যাক টু ভিলেজ ব্যাক টু রুটস না কী সব শহুরে কায়দা হয়েছে না। তখন তো তা ছিল না। এখন যে জিনিস যতটা গ্রাম্য, ততই তার কদর শহুরের কাছে।

—আচ্ছা মা, সারদামণিকে কেমন দেখতে ছিল? ছবিতে যেমন দেখি, তেমনি সুন্দর?

—ঠিক তেমনি সুন্দর। খুব সুন্দর শ্রীময়ী লাবণ্যময়ী, গেরস্থ বউ যেমন হলে চোখে ভাল লাগে তেমনি। বেশ স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি ছিলেন। হয়তো আনন্দময়ী মার মতন ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন না। আনন্দময়ী মাকে অল্প বয়সে তো দেখিসনি!

—তুমি দেখেছিলে বুঝি?

—তা দেখেছি। কিন্তু সারদামণির মতই তিনিও মাতৃমূর্তিছিলেন, এমনকি অল্প বয়েসেও।

—মাসিমা,আপনি এখন ওষুধটা খেয়ে নিয়ে এবার একটু বিশ্রাম করুন। এত কথা বলবেন না।

—থাক মা, সত্যি এখন আর কথা বলে কাজ নেই—ওষুধটা খেয়ে চুপচাপ থাকো কিছুক্ষণ।

—কেন? তোদের আরাধ্যা দেবী আগাথা ক্রিস্টির সঙ্গেও তো আমি বেশ দশবারো দিন ছিলুম। হেলসিংকিতে। দাও ওষুধ? কই, দাও। —আগাথা চেন স্মোকার।

—হ্যাঁ? সত্যি? আগাথা ক্রিস্টি? তিনি তোমার সঙ্গে কি কথা বললেন?

—বেশি না। উনি কেবলই ফ্রেঞ্চ বলছিলেন কিনা সকলের সঙ্গে। আমি যদি বা কষ্টে-সৃষ্টে দু ছত্তর ইংরিজি বুঝতে পারি, ফরাসি তো গোমাংস। তাই বেশী কথাবার্তা হয়নি। অ ছাড়া....

—তাছাড়া?

—তাছাড়া উনি বেজায় অহংকারী মহিলা ছিলেন, অন্য মেয়েদের খুব একটা পাত্তা দিতেন না। ঐ যে একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন। আমারও দেখতে ভাল লাগত না। অবশ্য তাঁরও ঠিক এশীয়-টেশিয়দের সঙ্গে কথা বলতে, কালা আদমিদের সঙ্গে মেলামেশাতে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। এক ঐ হো চি মিন-এর সঙ্গে, ফ্রেঞ্চে একটু-আধটু কুশল বিনিময় ছাড়া....

—কে? হো চি মিন বললে কি? মা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ ইন্দোচায়নার, এখন তোরা, তো বলিস ভিয়েৎনামের কবি এবং বিপ্লবী নেতা হো চি মিন রে।

—একটু একটু ঘনাদার মত শোনাচ্ছে কিন্তু মা! কিছু মনে কোর না। একটু নয়, ভীষণ!

—তাহলে শুনিস নি। কে সেধেছে?

—সত্যি সত্যি হো চি মিন? মা? অ মা?

—এর পরে তোকেই তোর নাতি নাতনী বলবে—অ্যাঁ? সত্যি সত্যি মহাত্মা গান্ধীকে দেখেছিলে? কুইন এলিজাবেথকেও দেখেছিলে? অ্যাঁ রবি ঠাকুরকেও? সত্যি সত্যি সত্যজিৎ রায়কে চিনতে? তখন তুইও ঘনাদা হয়ে যাবি। সত্য তো মিথ্যার চাইতেও বেশী অবিশ্বাস্য রে।

—অ। বেশ। তাহলে বল, আগাথা ক্রিস্টি হো চি মিনের সঙ্গে ফ্রেঞ্চে গল্পগুজব করতেন। সিগারেট টানতে টানতে, আর তুমি কি করতে সেখানে?

—কিছুই বুঝতুম না, আর খুব বোদ্ধার মতন মুখ করে বসে থাকতুম। তোর বাবার সঙ্গে গল্প করতুম; ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রাগ হোতো। নাঃ আগাথাকে কিন্তু একদমই ভালো লাগেনি আমার—ভয়ানক উন্নাসিক—

—আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে, মা! ভীষণ!

—বড্ড দাম্ভিক। অবশ্য দাম্ভিক হবার যোগ্যতা সে রাখে। তবুও! হো চি মিন কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। তিনিও তো কিছু কম জরুরি মানুষ নন? নানান দিক থেকে। আজকের যুগে দেখতে গেলে, ঢের বেশী জরুরি, ইতিহাসে।

—মাগো? হো চি মিন তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন?

—কত্তো! আমাদের খুব ভাব হয়েছিল। উনি লাজুক স্বভাবের । কিন্তু অমিশুক নন। আর কি চোখ! কি দৃষ্টি! সত্যি, খুকু, এত সুন্দর চোখ—যেন করুণা ঝোরে ঝোরে পড়ছে। ঠিক মুনি-ঋষিদের মত দেখতে রে—মানুষের প্রতি মমতা, করুণা যেন উপচে পড়চে—এমনি চোখের দৃষ্টি ছিল তাঁর—কখনো কখনো কবিগুরুর চোখেও অমন মায়াময় দৃষ্টি দেখেছি আমরা, আর কখনো কখনো গান্ধীজীর চোখেও। কিন্তু হো চি মিনের চোখে সর্বদাই ঐরকম। আর হাসিটা কি বলব—

—কেমন? হাসিটা কেমন? হাসতেন খুব?

—ঠিক একটা শিশুর হাসি যেমন হয়। হঠাৎ হঠাৎ হেসে ফেলতেন। গান্ধীজীর ফোকলা মুখের হাসির মতো। উনি অবশ্য ফোকলা ছিলেন না। রোজই আমরা বিকেলে একসঙ্গে চা খেতুম। উনি চাইতেন এশীয়রা সবাই একসঙ্গে ঘোরেফেরে, একসঙ্গে থাকে-টাকে। এখন যে তোরা থার্ড ওয়ার্লড-টোয়ার্লড় বলিস, তখন তো অতশত শব্দের খেলা তৈরী হয়নি? তখন সবে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেই বছরেই দেখা—তখন পৃথিবীটা অন্যরকম চরিত্রের লোকে ভরা ছিল। ইলিয়া এরেনবুর্গ বলেছিলেন—

—তাঁকে আবার কোথায় পেলে?

—তাঁকে তো তুমিও দেখেছো পরে। দিল্লিতে? এশিয়ার লোক সমাবেশে? মনে নেই?

—ঠিক মনে পড়ছে না।

—তুমিই তাঁকে বলেছিলে তাঁর তিন বন্ধু না কী যেন বই পড়েছো। আমি তো তাঁর কিছুই পড়ি নি। আমাদের প্রথম দেখা হেলসিংকিতে। উনিও ছিলেন । পীস কংগ্রেসে।

—মা, আমার কিছু মনে নেই।

—অতি দুর্ভাগা মেয়ে মা তুমি। তোমার কি সলোকভকেও মনে নেই?

—সলোকভ? মানে কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন?

—হ্যাঁ, ধীরে বহে ডন যিনি লিখেছেন।

—আমার তাঁকে কী করে মনে থাকবে মা, আমি কি তোমাদের সঙ্গে রাশিয়া গেছি? আমাকে তোমরা নিয়ে যাওনি—

—অভিযোগ কোর না, অভিযোগ করতে নেই। কলকাতায় এসেছিলেন সলোকভ। তোমায় কি সেই সভায় নিয়ে যাইনি তা হলে?

—নিশ্চয়ই না। তাহলে আমার ঠিক মনে থাকতোই।

—এরেনবুর্গের কথাটা যেমন মনে আছে। তুমি অটোগ্রাফ খাতায় সইও করে নিয়ে ছিলে এরেনবুর্গের। খুঁজে দেখো, সলোকভই আমাকে চামড়ার ওই বাদামী রঙের বইয়ের মলাটটা দিয়েছিলেন সোনালী এনগ্রেভিং করা । তুমি যেটা কেবলই নিয়ে নেবার চেষ্টা করতে।

—সেটা সলোকভের দেওয়া উপহার!

—তোমাকে তখনই একাধিকবার বলা হয়েছে সে কথা। আজই যেন প্রথম শুনলে এরকমভাবে কথা বোলো না।

—ভুলে গেছি। মা!

—কোন্ দিন মাকেও ভুলে যাবে।

—ও হো, সত্যি তো? শ্রীমার কথাটা চাপাই পড়ে গেল—মা, সত্যি! কারটা শুনবো, কার কথাটা তুলে রাখবো?

—ভাগ্যিস অসুখ করেছিল, তাই তো কাছে এসে বসলি দু মিনিট। না বসলে শুনবি কেমন করে?

—কী করবো মা—সময় হয় না যে মোটেই? বলো, মা, শ্রীমার কথাটা বলো।

—ওই তো। আমি তখন খুবই ছোট। যদিও বাল্যবিধবা, পড়াশুনোয় ভীষণ আগ্রহ বলে শ্বশুর বাড়ি বাপের বাড়ি উভয় পক্ষই আমাকে ইস্কুলে পড়াতে রাজি হলেন। নিবেদিতা স্কুল তখন মেয়েদের খুব ভালো ইস্কুল। কিন্তু সেখানে নাকি বিবাহিত মেয়ে নেয় না—থাকগে ওসব কথা।

—মা, বড্ড জ্বালাতন করছো কিন্তু। যেই, জমে উঠছে, অমনি—বলো দিকিনি শিগগিরি কী হলো—

—হবে আর কী? হলো না।

—তোমাকে ওঁরা নিতে রাজি হলেন না?

—তা নয়, রাজি হবেন না কেন?

—তবে?

—মিথ্যে বলবো না, কেউই নিতে অমত করেননি।

—তবে যে বললে হলো না?

—আমিই রাজি হলুম না।

—কেন মা? কেন? এত বড় সুযোগ—

—এখন মনে পড়লে ভীষণ কষ্ট হয় রে। তাই তো মনে করি না। ছেলেমানুষি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের মাশুল গুনছি সারা জীবন। বিদ্যে হোল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পড়লো না। কতো কিছু জানার ছিল, যথাযথ শিক্ষার অভাবে জানা হলো না।

—মাগো, তুমি কেন রাজি হলে না?

—সে কথা থাক না।

—না না, থাকবে না।

—আপনি ওকে আর উত্তেজিত করবেন না দিদি। বাকিটা পরে শুনবেন।

—না না উত্তেজিত করার কি আছে? এখনই বলছি আমি। এখনই শুনে রাখুক ও। ওর মায়ের নির্বুদ্ধিতার কাহিনী। ব্রাহ্মসমাজ তো স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারেই সাহায্য করেছে চিরকাল! কেবল এই একটিই ব্যতিক্রম আমি। আমার ক্ষেত্রে স্ত্রী-শিক্ষা আটকে গেল ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে।

—সে কি? কেমন করে? ওরা বাধা দিলেন?

—তা, একটু দিলেন বইকি।

—যাঃ।

—বিশ্বাস হচ্ছে না তো? বাইরের বাধাই কি জীবনের সব? অধিকাংশ বাধাই তো ভিতরের রে। দেখা যায় না। অথচ অনতিক্রম্য। তা বটে। কুসংস্কার যেমন। অদৃশ্য হাত করা।

—ঠিক! মার্জিত রুচির বিষয়ে বাড়িবাড়িও এমনই এক সংস্কার। এক আভ্যন্তরীণ বাধা। যা ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব আমার ভিতরে আপনি গড়ে দিয়েছিলো। সেটা সরিয়ে আমি তখন শ্রীমার কাছাকাছি পৌঁছতে ছাড়িনি। ছোট মেয়ে ছিলুম, বুদ্ধিসুদ্ধি পাকেনি। এক কুসংস্কার ছাড়িয়ে উঠতে গিয়ে অন্য এক কুসংস্কারের আওতায় পড়ে গিয়েছিলুম। সংস্কারমুক্ত হতে পারিনি। রুচির ওই সংস্কার, আমি ওটাকে কুসংস্কারই বলব, তখন শ্রীমাকে বুঝতে বাধা দিয়েছিল। আমারই ওখানে ভর্তি হতে ইচ্ছে করল না তখন।

—কেন? কি হয়েছিল?

—কিছুই নয়। আমার এ পাশের ঘরে ওয়েটিং রুমে ওয়েট করছি। মা আছেন ও পাশের ঘরে। কারুর সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। প্রণাম করলুম। শ্রীমা আশীর্বাদ করলেন। "ওমা একদম কচি মেয়ে তো—আহা রে এ বয়সে বেওয়া?"

তারপরেই বললেন, "ওরা কি আমার যজমান?"

আমার সঙ্গী বললেন—না ! নয়।

—তা হলে ওরা এখন পাশের ঘরে অপেক্ষা করুক। আমি আগে আমার যজমানদের সঙ্গে কথা কয়েনি। তারপরে ওদের সঙ্গে কথা হবে। ব্যস ওতেই হয়ে গেল।

—মানে?

—মানে একে তো ঐ 'বেওয়া' শব্দ। তারপরেই ঐ 'যজমান' শব্দ। গ্রাম্য শব্দ কানে লাগলো। পূজার পুরুতদেরই তো যজমান থাকে—বাঁধা ঘর। দিব্যাত্মা মহামানবী কেন ওই কথা বলবেন? হঠাৎ এই প্রসঙ্গটা মনে হতেই আর নিবেদিতা ইস্কুলে পড়বার উৎসাহটা রইল না। মার্জিত রুচির ফলস অহংকারে বাধলো। ঐ যে উনি আমাকে যজমান নই বলে একটু অবহেলা করলেন, তাতেই অহংকারে ঘা পড়লো। এখন বুঝতে পারি উনি ঠিকই করেছিলেন। দীক্ষিত শিষ্যদেরই উনি যজমান বলেছেন আর সত্যিই তো তাদের দাবি আগে। কিন্তু ঐ 'যজমান' আর 'বেওয়া' অন্ধকার ভবিষ্যৎ শীলমোহর করে দিলে। তাই বলছি

ব্রাহ্মসমাজী মার্জিত ভাষার প্রতি অযথা শ্রদ্ধা, ও দিশি গ্রাম্য ভাষার প্রতি অযথা অশ্রদ্ধাই আমার পড়াশুনা হতে দেয়নি। ইস্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি, সেটাই আমার আসল পাপকর্ম হয়েছে।

—তোমার গার্জেনরাই বা কী রকম? তাদেরই উচিত ছিল উল্টো জেদ ধরে তোমাকে ভর্তি করে দেওয়া।

—অত মাথা ঘামাতোই না ছেলেমেয়ের পড়াশুনা নিয়ে তখনকার বাপ-মা। তাঁরা পড়ায় মত দিয়েছিলেন, এই যথেষ্ট। আমিই ভর্তি না হওয়ায় সবাই যেন বেঁচে গেলেন। খুশিই হলেন আমার ওপর। বোর্ডিংয়ে অবশ্য থাকতে দিতেও রাজি ছিলেন না কেউ।

—আশ্চর্য।

—কিছুই আশ্চর্য নয়। যে কথাটা যেমন ভাবে চলে।

—'যজমান' আর 'বেওয়া' মাত্র এই দুটো শব্দ অ্যালার্জি হয়ে তুমি জীবনের মতো ইস্কুলে ভর্তি হলেই না? এটা ভীষণ খারাপ কথা।

—জানি। তোর মেয়েদের এ গল্পটা কোনো দিন যেন বলিসনি। যা জেদী একেকজন। বড়টি তো একটি মেয়ে পুলিস—জাঁদরেল মেয়ে বটে ! ওদের এই গল্প কখনো করবো না।

—অতি অবশ্যই করবে। ঐরকম জেদ ধরে বড়দের কথা না শুনলে কী হয় তারা জেনে রাখুক। তাদেরই ধারণা ঠিক তোমারই মতো, যে তাদের মা-টি নির্বোধ। কিছু বোঝে না। তারা কিন্তু মহা চালাক, সর্বজ্ঞানী। ঐ করে জেদ ধরেই ফোর্থ সাবজেক্ট পরীক্ষা দিলে না। কতো ক্ষতি হল, দেখেও এখন আবার জেদ ধরেছে—দ্যাখো।

—ফের কমপ্লেন? কমপ্লেন কোর না খুকু। বড্ড বদ অভ্যেস। কিছু লোকের কেবল ঘ্যানঘ্যান করা স্বভাব হয়ে যায়। স্বামী আদর করছে না, শাশুড়ি অত্যাচার করছে? ছেলেমেয়েরা কর্তব্য করছে না বা এই এই কুকর্ম করছে—ওফ খুব বোরিং। তুমি বাছা ওরকম হয়ো না। বি ভেরি ক্যায়ারফুল স্বভাবটাকে সচেতন প্রয়াসে নির্মাণ করতে হয়। অমন য্যায়সা কে ত্যায়সা চালালে হয় না । বল দিকিনি যায়সা কে ত্যায়সা কার বই? কি বই? নভেল, নাটক প্রবন্ধ না গল্পের?

—এই শুরু হলো তো পরীক্ষা করা? তবে তুমিও শোনো মা, কিছু কিছু লোকের বড্ড বদ অভ্যাস থাকে। কেবল প্রশ্ন করা আর উত্তর ধরা। মাস্টারির স্বভাব একদম ভাল নয়। ওফ— খুব বোরিং এবং ভয়াবহ। অমন করলে কিন্তু তোমার কাছে কেউই আসবে না মা! আমিও না। আমি এখন চললুম। ঐ তোমার দিনের সেবিকা এসেছে—ওই থাকুক—গুড বাই—

—পারলি না তো? হেরে গেলি তো? ল্যাজ তুলে পলায়ন?

—হার জিৎ আবার কি? একবার বললে জগতে সবচেয়ে সুখী কে বল দিকিনি! একবার বলছো, য্যায়সা কে ত্যায়সা কার লেখা বই, কী বই। এটা না হয়, আমি জানি, এর পরেরটা তো নাও জানতে পারি? আগেই পালাই!

—জানিস ? কী বই ? কার বই?

—আমাদের টেক্সট। সুবীর পড়ায়। তাই জানি।

—তুই পড়েছিস?

—এবার কি টেক্সচুয়াল কোয়েশ্চেনস করবে?

—আচ্ছা থাক। যা, কোথায় যাচ্ছিলি, যা। তোদের যুগটাই ফাঁকি আর ফোকরের যুগ। ফোকরের আর ফোকটের।

—যাচ্ছি চাকরি করতে। জ্ঞান দিতে।

—শ্রম বিনা জ্ঞান হয় না। আমাদের যুগটা পরিশ্রমের যুগ ছিল। সলিড জ্ঞান ছিল লোকেদের। তোদের সব ফাঁপা। ফাঁকা। যাঃ পালা। ভাগ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য— —মা, তুমি সেরে উঠেই একটা আত্মকথা লিখে ফেলবে? প্লিজ? পুলিসকাকু কত করে বলে গেছেন—

—বিনোদিনী দাসীর মতো?

—তা কেন? রাসসুন্দরী দেবীর মতো?

—দেখলি তো? তোরা উইমেন্স লিবারেশন করিস অথচ ভাবনার বেলায় সেই পুরুষের মতো মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদেরই তুলনা করিস। কই বলতে পারলি না তো জীবনস্মৃতির মতো? কি গান্ধীজীর আটোবায়োগ্রাফির মতো? আর বিনোদিনীর মতো বলতেই অমনি বললি 'তা কেন'? কেন নয়? বিনোদিনীর জীবনই তো বেশি মূল্যবান শিল্পী জীবন।

—যা ব্বাবা । তার চেয়ে রথী ঠাকুরের মতো অমিই বরং একটা 'মাতৃস্মৃতি' লিখতে শুরু করি।

—কেন? আমি কি রবীন্দ্রনাথ? খবরদার ওসব কীর্তি করবি না। লোক হাসাবি না। তোর বাবা অল্প বয়েসে খুব সুন্দর ছবি আঁকতেন। কিন্তু আমি ওঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যে উনি বৃদ্ধ বয়েসে ছবি আঁকায় ফিরে যাননি। অনেক লেখককেই তো দেখলুম কিনা। বুড়ো বয়েসে একটা রবীন্দ্রনাথ কমপ্লেক্স দাঁড়িয়ে যায়।

—বাবা তোমার ছোটবেলায় ছবি এঁকে চিঠি দিতেন—তোমার কাছেই তোলা ছিল তো মা? সেগুলো কোথায়? কী সুন্দর চাইনিজ ইংকে আঁকা।

—আছে কোথাও। স্মৃতিতে থাকাই আসল। মেটিরিয়াল বস্তুগুলো দিয়ে কী হবে। মেটিরিয়াল বস্তুরা অনেক জায়গা নিয়ে নেয়. জায়গা ফুরিয়েও যায়। বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়। স্মৃতি অনশ্বর। কিন্তু স্মৃতির ভাণ্ডার অনন্ত। ওটাই ভরে রাখ, সেই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে।

—আমাদের বাড়ির সব ফার্স্ট এডিশনের বইগুলো তো ক্রমশ স্মৃতির ভাণ্ডারের ধনেই পরিণত হয়ে যাচ্ছে মা।

—যাক গে, কী হবে ফার্স্ট এডিশন জমিয়ে? তখন পাগলের মত এসব জিনিসের মূল্য দিয়েছি। এখন, চলে যাবার সময়ে আর দিই না।

—তবে কাকে মূল্য দেবে?

—কেন? যা দেখলি, যা পড়ালি তাই দিয়ে জীবনটাকে প্রতিদিনের বাঁচাকে কতটা সমৃদ্ধ করতে পারলি, সেটাই সবচেয়ে দামী, সেটাই আসল। তো জানা দিয়ে, তোর দেখা দিয়ে জগতের আর সব মানুষের কতটা উন্নতি, কতটা উপকার করতে পারলি, সেটাই প্রধান বুঝলি? সব জন্তু জানোয়ারই নিজের জন্যে আর নিজের অপরিণত শাবকদের জন্যে খাদ্য আহরণ করে বেঁচে থাকে। এতে বাহাদুরীর কিছু নেই। জন্তুরা তার জন্যে কারোর বাহবা চায় না। ছেলেমেয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা আশা করে না । কিন্তু মানুষ চায়। সেই তো মজা। আচ্ছা, বল তো।

—আমি চললুম।

—না, না, দাঁড়া। আজকাল এই তোদের ফ্ল্যাটে বাস-করা স্বামী-সন্তানের মনুষ্য পরিবারের সঙ্গে গুহায় বাস-করা সিংহ-সিংহীর শাবকের পরিবারের কিংবা গাছের ডালে বাস-করা কাক-কাকিনী শাবকদের তফাতটা কি? কি তফাত? বল আমাকে।

—পারব না। চললুম। ভীষণ দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার, যাচ্ছি এবার মা।

—কোথায়? শাবকদের জন্য খাদ্য আহরণ করতে?

—যদি বল তাই।

—যাও বাছা, কীটপতঙ্গ ধরে আনো। জৈব ধর্মের সেরা কর। তোমাদের এই অর্থ উপার্জন তো আহার-নিদ্রা-মৈথুনের সঙ্গেই একাত্মক। প্রাণধারণের জন্য অবশ্য করণীয়। এতে মনুষ্যত্বের ছায়া নেই। পশুরাও কর্মটি করে থাকে।

—তাহলে মানুষের করণীয় কি? খাদ্য উপার্জন না করা?

—ফের বোকার মত কথা। জীবন ধারণের জন্যে করণীয় যা তার ওধারেও কিছু করা চাই তো? মানুষ জন্ম যখন পেয়েছো? কেবল জৈব কর্মে কাল হরণ না করে সৃজনমূলক কিছুতে মন দাও।

—তাতে পেট চলবে না মা।

—কেবল পেটের চিন্তা না করে অন্তরলোকের দিকে মন দাও এবারে।

—মাসিমা, আপনার অক্সিজেনের নলটা খসে পড়ছে—একটু কাত হন এদিকটাতে।

—আঃ কেবল শরীরের কথা। শোনো খুকু মা, একটু অধ্যাত্ম চিন্তার চেষ্টা কর।

—বিকেলবেলা ফিরে এসে করব মা। এখন একদম সময় নেই, স্নান করা হবে না।

—ওঃ বহিরঙ্গের স্নানে আর কতটুকু পরিষ্কার হবে মা? অন্তরলোক প্রক্ষালন করতে হবে। তোমরা যে যুগে জন্মেছো, কল্মাষপদ রাজার মতন কেবল পা দুটোই নয়, সর্বাঙ্গে তোমাদের পোড়া কালো—ও তো স্নানে সাফ হবার নয়—কই স্প্রেটা কোথায়? ও বাবা মেয়ে পুলিস যে?

—দিম্মা, এই যে কমপ্ল্যান—দিম্মা! আর একটাও কথা নয়, চটপট খেয়ে ফ্যালো। তারপর একদম চুপ। এবারে আমি এসে গেছি ব্যাস! এ তোমার মেয়ে পাওনি।

মৃতের খাদ্য

রাম রায়

চেক-পোস্টটা বসেছে ঠিক চৌরাস্তার মাঝে। জি.টি. রোডে যেখানে ট্রাফিক পুলিশটা দাঁড়ায় তার কয়েক গজ দূরে পেট্রল-পাম্প, এর মাঝে ছোটখাটো একটা রোড আই-ল্যাণ্ড। উঁচু বেদীর মত জায়গাতে বকুল গাছের ছায়ায় তাঁবু বসান হয়েছে। এখন জায়গাটা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। ছোট বকুল চারাটাও সমূলে উৎপাটিত। আশে-পাশে যে দোকান-ঘরগুলো ছিল তা ভাঙ্গার কাজ শেষ হয়েছে। খোয়া, পিচঢালার কাজ সুরু হয়েছে। একটা মস্ত স্টিম-রোলার পেট্রল-পাম্পটার কাছে দাঁড় করান।

অ্যাক্সিডেন্ট কমানোর জন্যে নাকি এই ব্যবস্থা। রাস্তার বিস্তৃতি চারধার থেকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে যেদিক থেকেই গাড়ী আসুক দেখতে অসুবিধে হয় না। শোনা যাচ্ছে একটা অটোমেটিক সিগন্যাল বসানো হবে। যে যাই হোক। ওরা কিন্তু খুশি হয়েছিল। চেক-পোস্টটা এবার তাহলে ওখান থেকে উঠল। সব কিছুই ত ভেঙ্গে লোপাট করে দেওয়া হয়েছে। ওই হাট করা ফাঁকা জায়গায় ত আর তাঁবু ফেলে বসা সম্ভব নয়। দু'একখানা বেপরোয়া লরি হয়ত ওর ওপর দিয়েই চলে যাবে।

দু'একদিন ওরা খুশিতে খুশিতে যাতায়াত করল। কোথাও ত কিছু নেই। গাড়ী থামিয়ে ঝামেলা পাকাতে কেউ আসে না। দিব্বি হটোর হটোর করতে করতে সব কটাই রেশনিং এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে। অবশ্য বলা যায় না, চেক-পোস্টটা এখানেও বসিয়ে দিতে পারে। এই থামাও, থামাও গাড়ী। সব কটা গাড়ীকেই তখন সারিবদ্ধ হয়ে থেমে পড়তে হবে। তারপর খোঁচাখুঁচি, উঁকি-ঝুঁকি। কে জানে বাবা, কার ভেতর থেকে কি মাল বেরিয়ে পড়বে! আর একবার বেরিয়ে পড়লে তখন আর উপায় থাকে না। একেবারে বাপের শ্রাদ্ধ।

সত্যি বলতে কি, দু'এক সের মাল সব গাড়ীতেই থাকে। গাড়ী থেকে ঐ গন্ধমাদন বোঝা নামাও না। কার পাঁচ সের, কার দশ সের, এমনকি এক আধ মণ মালও কোন কোন গাড়ীর তলা থেকে বেরিয়ে পড়বে।

অনন্ত আগে এ-সবে ভয় পেত! মাল না থাকলেও তার বুক দুরু দুরু করত। লাঠি দিয়ে যেমন ভাবে খোঁচায়, সত্যি যদি দু'এক সের মাল বেরিয়ে পড়ে! কেউ হয়ত খচামো করে এক পুঁটলি তার খড়ের গাদার মধ্যে পুরে দিয়ে গেল। সে কি আর জানতে পারছে! তাছাড়া তাকে দলের লোকও ভাবতে পারে। না, সেরকম আজ অব্দি কিছু ঘটেনি। মাল থাকত না বলে সবার আগে-আগেই তার গাড়ী যেত। টিং টিং ঘণ্টি বাজতো দামড়া দু'টোর গলায়। ওরাও যেন চেক-পোস্টটা চিনেছিল। দু'হাত তফাতে ঠিক দাঁড়িয়ে যেত। নাদ আর চোনায় ভরিয়ে দিত জায়গাটা।

লোকটা এগিয়ে আসত। অনন্তকে সামনে পেয়ে তার গাড়ীটাকেই আগে খোঁচা-খুঁচি করত। গাড়ীর চারপাশ একবার বেড় দিয়ে, থুতু ফেলে, দামড়াটার পাঁজরে একটা খোঁচা দিয়ে দিত লোকটা। টিং টিং টিং। চেকপোস্ট পেরিয়ে গাড়ী যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে সুরু করত।

পেছনের গাড়ীগুলোর বেলাও তাই। না, আজ পর্যন্ত কাউকে বিচালির তরফা নামাতে হয়নি। তেমন জোর-জবরদস্তি কেউ করেনি।

দু'একদিন এমন-ও হয়েছে। ধান-কল আর কোল্ড-স্টোরেজটা পেরোবার আগেই গাড়ীগুলোকে আটকানো হল। হুকুম হল, 'বিচালি নামাও।'

এইবার বুঝি ফেঁসেছে। সব-চালাকি ধরা পড়ল! অনন্তর মুখ শুকিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রকৃত যাদের উৎকণ্ঠার কারণ আছে, তাদের মুখে তেমন একটা কিছুর প্রতিফলন পড়ে না। বরং ঠোঁটে থাকে হাসি। চোখে-চোখে কি একটা কথা হয়ে যায়। চেক-পোস্ট থেকে আধ মাইল তফাতে এসে গাড়ী আটকানোর মানেটা তো তাই। গাড়ী থেকে সবাই নেমে পড়ে। ঝোপ-ঝাপের আড়ালে লোকটা তৎক্ষণে সরে গেছে।

গাড়ীর সামনে লাফিয়ে বসে পাঁচনের বাড়ি নির্দয়ভাবে পশুগুলোকে বেড়াতে থাকে ওরা। অশ্লীল গাল-মন্দ করে। যেন দোষটা করেছে ওরা!

এই দেখে অনন্তর একটু সাহস বেড়েছে। প্রতি বৃহস্পতি ও রবিবার তাকে গাড়ী নিয়ে সহরে আসতে হয়। বাবার অসুখ। হাটে গিয়ে তাকেই খড় বেচে আসতে হচ্ছে। এই উপরি রোজগারের পথটা নিলে কেমন হয়? সবাই যখন তাই চালাচ্ছে? দেববাবু ত একদিন বলেইছিলেন, কি অনন্ত, তুমি কিছু নেবে নাকি?

অনন্তর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

তারক বলেছিল, ও এখন বাচ্চা আছে। ভয় পাবে। হয়ত সত্যি কথাই কবুল করে ফেলবে।

দেববাবু বলেছিলেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। সামনে পেছনে দু'একখানা এমনি গাড়ী যাওয়া ভাল।

হেমন্তকালের বিকেল। এখন বিকেল ফুরোতে চলল। দু'পাশে ক্ষেতের জমান জলে বহু রং-এ রঞ্জিত আকাশের ছায়া ধরেছে। পাট-পচানো জলের আঁসটে গন্ধ। তে-কোনা বাঁশের ফ্রেমে জাল বেঁধে, রাস্তার সিমেন্ট-বাঁধানো ধাপিতে বসে, শেষবারের মত মাছের সন্ধান করছে লোকটা রেল-লাইনের পাশে নীচু জলা জমিতে। ধাপার দিকে পাখির হাট বসেছে। কংক্রিটের সাঁকোটা কাঁপিয়ে থ্রু মেল-গাড়ীটা ছুটে গেল।

সব কিছু স্তব্ধ হতেই সেই ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ। একটু যেন ঢুলুনির ভাব। হ্যাঁ, প্রায় সাত-আটখানা গরুর গাড়ী খড়ে বোঝাই করা! কাল রবিবারে হাটবার। আজ রাত থাকতেই ওরা পৌঁছবে সহরে। খড় বেচে খালি গাড়ী নিয়ে আবার এ-পথ দিয়েই ফিরে যাবে।

এখন তাড়া-হুড়ো নেই। তাই অলস মন্থর গতিতে গাড়ীগুলো চলেছে। দামড়াগুলো নিশ্চিন্ত। জানে, এখন আর শক্ত পাঁচনের খোঁচা খেতে হবে না। গাড়ীগুলোকে কোন রকমে টেনে নিয়ে যাওয়ার সক্রিয়তা ওদের চলার কদমে।

গাড়ীর মাথায় যারা, তারাও অলস, তন্দ্রায় ঢুলছে। যেন কোথাও পৌঁছবার গরজ নেই! কেউ কেউ দূরের দিকচক্রবালে তাকিয়ে। এমন উদাস বৈরাগ্য-দৃষ্টি দেখা যায় না। অন্ধকার হয়েছে। কার্তিকের হিম আকাশে তারা ফুটে বেরিয়েছে।

সামনের গাড়ীটা থেমে গেল। টর্চের জোরাল আলো এসে পড়ল গাড়ীগুলোতে— এনফোর্সমেন্ট পুলিশ। খবর পেয়েছে এ পথে বে-আইনী চাল পাচার হচ্ছে। চালের চোরা চালানদাররা কৌশলে চাল পাঠিয়ে দিচ্ছে। দু'দিন ফুরসত দিয়ে তাই হঠাৎ এভাবে শিকারীর মত ওৎ পাতা।

সামনে ছিল মতি দাস। কম-সম খড় বোঝাই করা।

কি আছে?

হুজুর, শুধু খড় আছে।

খড়ের ভেতর কি আছে?

কিছু নেই, হুজুর।

নামাও দেখি।

হুজুর, এই অন্ধকারে—

নামাও বলছি।

বলো হরি, হরি বো-ও-ল

সকলেই সচকিত হল। পেছনে মড়া আসছে। সকলেই সরে এল। নাকে হাত চাপা দিয়ে থুতু ফেলল। এই নিয়ে আজ চারটে মড়া গেল। এক শ্মশানে পোড়াবার ঠাঁই মিলবে না। রোজই দু'একটা যাচ্ছে। যাবে নাইবা কেন। গ্রামে রীতিমত দুর্ভিক্ষ সুরু হয়ে গেছে। চাল ডাল নেই। আবোল-তাবোল খেতে সুরু করেছে। গাছের পাতা, শেকড় কিছু বাদ দিচ্ছে না। মরবে জেনেও ওরা এসব খায়। মরছেও।

হরিবোল দিতে দিতে শবযাত্রীরা এগিয়ে এলো। সামনে একজনকার ভুসো-পড়া হ্যারিকেন। ছোটলোকের মড়া। জেলে, কিম্বা চাষা-ভুষো হয়ত।

অনন্ত, কেদার আর মতি তাকিয়ে রইল। সামনে দীর্ঘ ছায়া ফেলে যতক্ষণ না হ্যারিকেনের আলো রেল-ব্রীজের ওপারে মিলিয়ে গেল, ততক্ষণ ওরা নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল। অনেক দূরে ক্ষীণ হরিধ্বনি শুনে স্বস্তি বোধ করল।

শবযাত্রীরা এগিয়ে যেতেই এনফোর্সমেন্ট পুলিশ আবার তৎপর হল। মতি দাসের অপেক্ষায় রইল না। ওপরে বাঁশের আটায় লাগান দড়ির ফাঁস খুলে হুড়-মুড় করে ফেলে দিল খড়ের তরফা। টর্চ মেরে তন্ন-তন্ন করে দেখল। না, এক দানাও চাল নেই।

সব গাড়ীগুলোকে এমনিভাবে দেখা হল। চোরাই চাল কোথাও পাওয়া গেল না। ওরা যেন হতাশ হল।

প্রায় মাঝরাত। অনন্ত, কেদার আর মতির তিনটে গাড়ী হাটের পথে না গিয়ে গংগার দিতে এগুলো। শিবনাথবাবু খাটালেই থাকবেন। দামড়াগুলোকে ওরা জোর চাবকাতে লাগল। খড় গুছিয়ে গাড়ীতে তুলতে বেশ কিছু সময় গেছে। এতক্ষণ নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে এসে আচমকা চাবুক খেয়ে দামড়াগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে সুরু করল।

শিবনাথ বাবুর খাটাল। পেছনে গংগা। ঝোপে-ঝাড়ে-ভরা ঢালু জমি নদীর চড়া পর্যন্ত নেমে গেছে।

তিনখানা গাড়ী খাটালের সামনে দাঁড়াল। কেদার আর অনন্ত গাড়ী থেকে নামল। পাকা পথ দিয়ে গংগার ধারে গেল।

অন্তিম-নিবাসের কাছে ওরা অপেক্ষা করছিল। টিমটিমে হ্যারিকেনটা রক্তচক্ষুর মত জ্বলছে। কেদার অনন্ত এগিয়ে গেল। ওদের মধ্যে দু'জন উঠে দাঁড়াল।

মাল কৈ?

ওইখানে। গড়ানে ঝোপঝাড়ে ভর্তি জায়গাটা দেখিয়ে দিল একজন।

অনন্ত দ্রুত এগিয়ে গেল। ঝোপ ঠেলে ঠেলে গড়ানে জমিটায় খানিক উঠল। পাশ-বালিশের মত লম্বা দু'খানা বস্তা। অনন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এল।

'নিতাইদার ভাগ্য ভাল, একেবারে চালের বস্তায় চড়ে শ্মশানে এল।'

'মাইরি, শিববাবুর দোকান থেকে যে ঐ চাল কিনবে, নিতাইদা তার ঘাড়ে ভর করবে।'

অনন্ত চমকে উঠল। হ্যারিকেনের পীতাভ আলোয় মৃতের মুখেও যেন ব্যঙ্গ-ভরা হাসি। দুমড়ে ছোট করে বাঁধার সময় মট্‌মট্‌ করে নিতাইদার হাড়-গোড়গুলো ভাঙার শব্দ হচ্ছিল।

অনন্ত শিউরে উঠল।

তিনদিন উপবাসী ছিল নিতাইদা। একমাস ভাত জোটেনি। লোকে গাছের পাতা, শেকড় খেতে দেখেছে তাকে। মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে উঠতে আজই মারা গেল। অনন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

দূরে খাটালের কাছে, গড়ানে জমিটার মাথায় টর্চের আলো জ্বললো। একজন সরীসৃপের মত ওখান দিয়ে সন্তর্পণে নেমে আসছে। অনন্ত বুঝল, শিবনাথবাবু।

ওরা সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

আত্মজা ও একটি করবী গাছ

হাসান আজিজুল হক

এখন নির্দয় শীতকাল, ঠাণ্ডা নামছে, হিম আর চাঁদ ফুটে আছে নারকেল গাছের মাথায়। অল্প বাতাসে একটা বড় কলার পাতা একবার বুক দেখায়, একবার পিঠ, দেখায়। ওদিকে বড় গঞ্জের রাস্তার মোড়ে রাহাত খানের বাড়ীর টিনের চাল হিম ঝকঝক করে। এক সময়ে কানুর মায়ের কুঁড়েঘরের পৈঠায় সামনের পা তুলে দিয়ে শিয়াল ডেকে ওঠে। হঠাৎ তখন স্কুলের খোয়ার রাস্তার দু'পাশের বন-বাদাড় আর ভাঙ্গা বাড়ীর ইটের স্তূপ থেকে হু-উ-উ চিৎকার ওঠে। ঈশেন কোণ থেকে এখন ধর ধর লে লে শব্দ আসে, অন্ধকার—ভূত অন্ধকার কেঁপে কেঁপে ওঠে, চাঁদের আলো আবার ঝিলিক দেয় টিনের চালে। গঞ্জে রাস্তার উপর ওঠে আসে ডাকু শিয়ালটা মুখে মুরগী নিয়ে। ডানা ঝামড়ে মুমূর্ষু মুরগী ছায়া ফেলে পথে, নেকড়ের মত ছায়া পড়ে শিয়ালটার, যাবার দিকে মুখ তুলে চায় সে, রাস্তা পেরোয় ভেবেচিন্তে—তারপর স্কুলের রাস্তার বাদাড়ে ঢোকে। হাতে লাঠি চাঁদমণির বাড়ীর লোক ঠ্যাঙাড়ের দলের মত হল্লা করে রাস্তায় পড়ে—কোন দিকে গেল শালার শিয়েল, কোন দিকি ক দিনি। আরো হিম নামে।

বড় পুলের ওপর থেকে নীচের পানিতে আপন ছায়া দেখতে চায় নিবিষ্ট হয়ে সরদারের ছোট তরফের বড় ছেলে ইনাম। পানির রুপোলী মেঝেয় হাতড়ে বেড়ায় নাক-মুখ। হিম নামে যেন শব্দ করে, বাতাস আসে শির শির, খড়মড় উড়ে যায় বিকেলের বাদাম খোলা, পাগলীর নোংরা ন্যাকড়া চেক লুঙিতে সেঁটে থাকে। খাদের আসশ্যাওড়ার পাতা থেকে আলো চলকে ওঠে, কাঁঠাল গাছের পুবদিকের ডাল হাত নাড়িয়ে ডাকতেই থাকে বিচ্ছিরি। অজস্র খঞ্জনী বেজে ওঠে ঝনঝন।

ইনাম পুল ছেড়ে ধুলো ভেঙে শুকনো বিলের কিনারায় দাঁড়ায়। সেখানে শঙ্খচূড়োর মত দেখায় যে ধবল পথটা এখন তা ত্রস্ত হয়ে এলো, আর ফেকুর বাঘের মতো শরীরটা দেখা গেল। তার পেছনে সুহাস। ওরা খুব গল্প করছে। যে জন্য এখানে এখন এত রাতে সে সম্বন্ধে কোন কথা নেই। কখন সুহাস মামার বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিল, অমৃতের মত পুরী খেয়েছিল আর অঢেল মিষ্টি, সেই গল্প। ট্রানজিস্টারটা বেজেই চলছিল ফেকুর বগলে, ওরা কেউ শুনছিল না। কণিকা বিলের কিনারায় দারুণ ঠাণ্ডায় বৃথাই গাইছিলেন অন্ধকারে একা থাকার যন্ত্রণা। ইনিয়ে বিনিয়ে। আর আশ্চর্য, একটা পাখিও ডাকছিল না। বিলটা চিৎপাত হয়ে পড়েছিল। রেডিওটা বন্ধ করে দে—ওদের দেখে ইনাম বলল। অসহ্য লাগছিল তার। আইছিস—দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা দুজনে। সুহাস হাসল, বিড়ির ধোঁয়ায় কালো দাঁতগুলো প্রায় মুখের বাইরে চলে এলো। ইনামের আবার অসহ্য লাগল। রেডিও বন্ধ করে দে—বলল সে। কেউ শোনপে না, শোনলেও এদিকি আসবে নানে কেউ, ফেকু বলল, সেজন্য বলতেছি না, খারাপ লাগতেছে

গানডা। কণিকার গলা টিপে দিল ফেকু। এখন চল, দেরী করলি ঘুমিয়ে পড়বেন আবার, ফেকু বলল আর ট্রানজিস্টারটা সুহাসের হাতে দিল। সেটা নিতে নিতে সুহাস প্রশ্ন করে, কেডা? বুড়োডা আবার কেডা। সন্ধ্যে হলে ঘুমিয়ে পড়বে কেশো বুড়ো— থু করে থুথু ফেলে বলে ফেকু। যেতে যেতে বাতাস বেড়ে গেল একটু—ফাঁকা বিল থেকেই আসছিল বাতাসটা। শুকনো পাতার শব্দ হচ্ছিল, ঝপ্ করে মাছ লাফিয়ে উঠল কাজীদের পুকুরে। আর বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল খাঁদের বাড়ীতে ধান সেদ্ধ হচ্ছে উঠোনে। উনুনের আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠে খাঁদের সুন্দর সুন্দর মেয়েদের মুখ একবারের জন্য ঝলসে উঠল। ইস্কুলি যাতিছিস না আজকাল—সুহাস জিজ্ঞেস করে। না—ইনাম জবাব দেয়। পড়বি না আর? না, পড়লি আমারে কেউ সিন্নি দেবে ক। চাকরি করবি। হয়, চাকরি গাছে ফলতিছে। সুহাস আর কিছু বলে না। ট্রানজিস্টারটা নিয়ে খুচরো শব্দ করে শুধু আর বেঢপ বুটজুতো দিয়ে ধুলো ছড়ায়। নাকে ধুলো এসে লাগতেই কুকুর গন্ধ পাওয়া যায়। ইনামের বিকালের কথা মনে পড়ে, হাটবারের কথা, মাছের কথা। মাছ থেকে নদী। নদী এখন প্রায় শুকনো, চড়া পড়ে গেছে। গরুর গাড়ীতে লোকে বালি এনেছে নদী থেকে। বাঁকের কাছে কাশ হয়েছে। এ পাড়ে স্কুলবাড়ী, বড় সজনে গাছে ফিঙে, তার লম্বা লেজের দুলুনি। স্কুলের পেটা ঘড়ি ভেঙে গেলে এক টুকরো রেল ঝুলিয়ে লোহার ডাণ্ডায় ঘনাৎ ঘনাৎ আওয়াজ—হুড়মুড় করে হেডমাস্টার, শালার জোকার একটা, বই বগলে মাস্টার তারাপদ, তার পাকানো চাদর, আধভাঙ্গা দাঁত আর মুখে কথার ফেনা। এই সব মনে পড়ল। ঝরঝর করে ছবিগুলো এলো, যেন দক্ষিণ বাতাসে শুকনো নিমের পাতা ঝরে পড়ছে, আর ছবিগুলো চলে গেল যেন ট্রেনটা যাচ্ছে পুলি পেরিয়ে, মাঠের বুক চিরে ন্যাংটা ছেলেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। ছবিগুলো পেরিয়ে যেতেই খেয়াল হয় সুহাস সেই গল্পটা আরও তোড়জোড় করে বলছে, ছোটমামার বিয়ের বরযাত্রী যাবার গল্প। ওর একটা কথাও শুনছে না ফেকু, সে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল—চাঁদের আলোর মধ্যে দেশলাই-এর আগুনটা দেখালো ম্যাড়মেড়ে আর ফেকুর বিতিকিচ্ছি মুখটা দেখা গেল, কপালের কাটা দাগটা, মুরগীর মতো চোখ, নীচে ঝোলানো ঘোড়ার মতো কাল ঠোঁট। খাবি নাহি? ফেকু জিগ্গেস করে। সুহাস গল্প থামিয়ে সিগারেট নেয়, দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে যাওয়ায় আর একটা জ্বালায় এবং আবার শুরু করে, লঞ্চে যাতি হয় তো, মধুমতী নদী দিয়ে—অন্ধকারের মধ্যে গেলাম—দুপাশে গেরাম না কিডা জানে— মনে হচ্ছিল সোন্দর বন। এমন অন্ধকার আর এমন জোঙগল বুজিচো। ইনামের মনে হলো সুহাস গতকাল থেকে গল্পটা বলছে আর আগামীকাল পর্যন্ত চলবে। নাপিত বেটা কমিয়ে কতি পারে না? একেবারে অসহ্য লাগলে এই কথা ভাবল ইনাম। সুহাসের গল্পে একশোটা পল্লব—ছোটমামার চেহারার বর্ণনা, বিয়ের সম্বন্ধ, পাত্রীর খোঁজ, পাত্রীর কাকার সঙ্গে ছোটমামার বাবার ঝগড়া, বিয়ের দিন ধোপাবাড়ী থেকে সিল্কের পাঞ্জাবী ভাড়া নিয়ে আসার ঝকমারি—কিচ্ছু বাদ দিচ্ছিল না সে—তাই ইনাম বলল, তোর ছোটমামা বিয়ে করতি গ্যালো ক্যানো ক তো? সুহাস কান দিল না, সকালে সূর্য উঠতি মধুমতী ঝকমক করতিছে। জ্যাঠামশাই ধপ্ করে কাদায় পড়িলো লঞ্চ থেকে নামতি গিয়ে আর মামীর বোনেরা যা সোন্দর সে আর কলাম না। তোর মামার বাড়ীডা কোয়ানে, শালিরা বেড়াতি আসলি কস আমাকে—ফেকু কথা না বললেই নয়, তাই বলে। সেটি হচ্ছে না, বুজিচো—চোখ বন্ধ করে মনের আরামে বলল সুহাস। ও, তাই তুমি মাসে পাঁচবার করি বেড়াতি যাচ্ছ, বুজিচি ওখেনে তো পয়সা-কড়ি লাগে না—আরামেই আছ দেখা যায়—ফেকু চোখ মটকে বলে।

রাহাত খানের টিনের চাল দেখা যাচ্ছে না আর, পুল কোথায়, বিল সরে গেছে কখন। চাঁদমণির বাড়ির লোকজন চুপ করে গেছে এখন। একটা মুরগীর শোক আর কতক্ষণ থাকে! কাল হয়ত বসুবাবুদের ইটখোলায়, না হয় সরকারদের পড়োবাড়ীর ভেঙে-পড়া সিঁড়িঘরের মধ্যে বেচারির চকচকে পালক, হলদে ঠ্যাং কিংবা ঠোঁটের খণ্ডাংশ পাওয়া যাবে। চাঁদমণির লোকজন কাজেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু বুড়িটা বসে আছে, ফাটা পায়ে তেল ঢালছে আর পিদিমটা কেন নিভছে না তা পিদিম ছাড়া আর কেউ জানে না। কি ঠাণ্ডারে বাবা—বউ, অ বউ, আর একটা কাঁথা দে, মরে গেলাম, হেই বউ। বউটা কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছে আর ছেলেটা বকছে বিড়বিড় করে, মরে যাচ্ছে না ক্যানো? বুড়ি আর একবার চেঁচায়, কিন্তু হঠাৎ হাওয়াটা ওঠে, সুমসাম শব্দ জাগে, বুড়ির কাঁপা গলা কেউ শুনতে পায় না। এইরকম জীবন চলতে থাকে। — ফেকু ঠোঁটে কুলুপ দেয়, সুহাস হঠাৎ ট্রানজিস্টারের চাবিটা ঘট করে খুলেই আবার বন্ধ করে দেয়—ইনাম মাথা নীচু করে ভাবতে থাকে।

রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর পা ঠুকে ধুলো ঝাড়ে ওরা। পাশের গলিপথটায় ঢোকার সাথে সাথে জাপটে ধরে অন্ধকার এবং সপাং করে চাবুক চালিয়ে দেয় কি একটা লতা। ফেকুর ঠোঁট খোলে, অতি জঘন্য একটি গাল দিয়ে ওঠে লতাটিকে। তারপর শান্ত হয়ে গল্প শুরু করে, শালা আজকাল এত বেশী ধরা পড়তিছি ক্যানে কতি পারিস? এই কথায় সুহসের চোখ দুটি চকচক করছে কৌতূহলে, একটা কথা কই, কিছু কবি না ক। ফেকুর সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই সে বলে, অত মার খাস কি করে, আমাকে বলতি পারিস? শালার দাদা এক চড় মারলি চোখে অন্ধকার দেহি। মার খাওয়াডা শিখতি হয় বুঝিচো বাপধন—ওস্তাদের কাছে শিখতি অয়। লেহাপড়ার জন্যি ইস্কুল যাতি হয় যেমন, তেমনি—ফেকু বলে। ইনামের আবার অসহ্য লাগে, ইস্কুলি লেহাপড়া বিয়োচ্ছে, বিটার শালার মাস্টাররা—ইনাম এমন কথা বলে যা মুদ্রণযোগ্য নয়। ফেকু তখন বলছে, ইস্টুপিট হলি আর মার খাতি না জানলি মান্‌সের পহেটের কাছে যাতি নেই। পহেট থে ট্যাহা বেরায়ে থাকলিও না। টাকার কথা শুনে ইনাম অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ল। টেন্ডু ড্রাইভারের কথা শুনে ভীড়ে হাত দিয়েছিল বটিমুখো এক ভদ্রলোকের পকেটে—কাগজ খড়মড় করে উঠল আর এমন শব্দ হোল যে মনে হোল যে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। অ্যাও করে গড়র গড়র গর্জন করে উঠল লোকটা—কিন্তু আসলে ভদ্রলোক গলা ঝাড়ছিল। কাজেই ইনামের কাছে পয়সা নেই। নারকেল চুরি করে বিক্রি করলে হয়—কিন্তু ভাতের চালের অভাবে উপোস করে থাকতে বড়ো কষ্ট।

পথটায় অন্ধকার থকথক করছে। মাথার উপর বাঁ দিকে লতা ডান দিকে চলে গেছে জাল বুনতে বুনতে। গল্প করতে করতে ফেকু সুহাসের উপর এসে পড়ে আর সুহাস চীৎকার করে, উরে মরিছিরে বাপ। ফেকু বলে, দেহিস রেডিওডা ফালাস না, সেদিন কি হোল ক দিনি, এক বাস লোক—বাস যাচ্ছে চল্লিশ মাইল পঞ্চাশ মাইল স্পীডি, সামনের লোকটার পাঞ্জাবীর পহেট থে নোটগুলো বারোয়ে আছে—হাত দিতি খপ্ করে ধরে ফেলল। তারপর উরে মার, ভাগড়ে যেন গরু পড়েছে। কপালি তার ঘা শুকোয়নি এহনও। এইবার গুণ্ডোটা শুরু করিছে ইনাম ভাবল। গল্প শুনতে শুনতে সুহাস ট্রানজিস্টারটা চালিয়ে দেয়, গর্জন করে ওঠে সেটা। আওয়াজটা কিম্ভূত শোনা যায় ঠাণ্ডা আর স্তব্ধ অন্ধকারে। সুহাস থুথু ফেলে বলে, শালা খ্যাল গাতিছে—বলেই চাবি বন্ধ করে এবং তুমি যে আমার জীবনে এসেছ ধরে দেয়। ভিটে থেকে একটা কুকুর উঠে এসেছে—ক্ষীণ চীৎকার করার চেষ্টা করছে। গলা যখন ফুটল না, ইনামের

গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সমস্ত পাছাটা দোলাতে শুরু করে। লড়েচড়ে গরম হতিছ শালা— ফেকু মন্তব্য করল এবং কেন তার জীবন নষ্ট হোল, কে কে নষ্ট করল তার পকেটমারার কৌশল, তার নিজস্ব নৈপুণ্য, সাফল্য এবং পিটুনী খাওয়ার অভিজ্ঞতা বলেই যেতে লাগল। করবটা কি কতি পারিস? লেহাপড়া শিখলি নাহয়—। লেহাপড়ার মুহি পেচ্ছাপ—ইনাম বলল। আবার অসহ্য লাগল ওর। তাহলি, ফেকু ভেবেচিন্তে বলল, উঁচো জায়গায় দাঁড়ায়ে সবির ওপর পেচ্ছাপ। কাজ কোঁয়ানে, জমি নেই খাঁটি, ট্যাহা নেই ব্যবসা করি—কি কলাডা করবানে?

পাখীদের কোন গান নেই এখন। শব্দ শোনা যাচ্ছে চাপা। কুয়াশা আর হিম জড়িয়ে আছে ওদের। সামনে বিড়ালটা যখন পার হয়ে গেল, শুধু দুটি জ্বলজ্বলে চোখ দেখা গেল তার। এখন সুহাস, ফেকু বা ইনাম কথা বন্ধ করেছে। সুহাসের বগলে ট্রানজিস্টার, ফেকু মাফলার মুখের উপর জড়িয়ে নিল—ইনাম হাতে হাত ঘষে একটু গরম করতে চেষ্টা করল। ডাইনে পালদের বাড়ী, মাটির হাঁড়িকুড়ি তৈরী করে, পরিচয় জিজ্ঞেস করলে রাস্তা থেকে হেঁকে জবাব দেয় পাল মশাই, তাঁদের বাড়ীর পলস্তরা খসা-দেওয়াল, কারণ বাড়ীটা আসলে সেনেদের। ওরা চলে গেছে পশ্চাশে। বাতাবি লেবু গাছটার পাশ দিয়ে যেতে চড়াং করে একটা পাতা ছেঁড়ে ইনাম আর ঠাণ্ডা উঠোনটার দিকে চেয়ে থাকে। পোড়ামাটির গন্ধ নাকে লাগে, কালো জালাগুলো ছড়িয়ে আছে দেখা যায়, ভাঙা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘুমজড়ানো গোঙানী ভেসে আসে, সব ঘুমিয়ে পড়েছে—সুহাস বলে। ফেকু সায় দেয় ঘোঁৎ করে। আজ না আসলেই হোত— সুহাস অভিযোগ করতে থাকে, ভয় করতিছে আমার। ফেকু ভ্যাংচায়, ভয় করতিছে, কচি ছ্যামরা, দুধু খাবা। সুহাস বলেই চলে, বুড়োরে দেখলি আমার ভয় করে। একবার মনে হয় মরে যাবেন এহুনি, একবার মনে হয় আমাদের সব কডারে খুন করবেনে। বাড়ির মধ্যি ঢোহার সময় মুখডা দেহিছিস? দেহিছি—তুই থো, তাচ্ছিল্য করে ফেকু, পয়সা পালি মুখডা কেমন হয় দেহিস একবার। ফেকু হারামজাদাটারে খুন করতি পারলি হোত—ইনাম ভাবল। সুহাস পরে ফেকুর দলে মিশল। সে বলছে, এট্টু এট্টু সর হইছে এমন ভাবের মতো লাগে মেয়েডারে। ঠিক কইছি না, ক। তোরেও খুন করতি পারলি হোত—ইনাম আবার ভাবল। ওরা এখন হাসাহাসি করছে, ঢলাঢলি করছে, কলবল করে আলাপ করছে। দু পা এগিয়ে ডাক্তারবাবু ভেতরে বসে আছেন— মোটা সাদা বিরাট শরীর, হারিকেন জ্বলছে, তাই খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল আর পুকুরের বাঁধা ঘাটে একটি মাত্র শুকনো পাতা ফর ফর করে পাক দিতে থাকল। বাঁ দিকের খোলা জায়গাটা এসে গেছে এখন, কুয়াশার সঙ্গে মিশে ঘোলা দুধের মত চাঁদের আলো খুদে খুদে মরা ঘাসের ওপর পড়েছে। পেছনে জামগাছটা কালো—তার পেছনে সব কালো এবং নির্জনতা। আর এইসব ছাড়িয়ে যেতে আরও নির্জনতা, পোড়ো জমি, জঙ্গল, পানের বরজটা, কাশ আর লম্বা ঘাস আর মজা পুকুর এবং বিল। এখন ডাইনে দড়ি দিয়ে ঝোলানো বাঁশের গেট। গেট পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জমি চিৎ হয়ে শুয়ে। কিছু ফলেনি সেখানে। ইনাম এখনও পিছনে আছে, অনেকটা পিছনে, এমনকি ফিরে যেতে হতে পারে হঠাৎ এমন মনে হচ্ছে। লাল আলোটা আসছে কাঠের রড লাগানো জানালা দিয়ে, মজা পুকুরে শিয়ালের চকচকে চোখ ঝিলিক দিচ্ছে কিছু খুঁজে। ঘোড়ার মতো চিঁহি চিঁহি করে ডেকে ডানা ঝটপট করে পুরনো ডাল ভেঙে বাজপাখিটা নড়েচড়ে বসল। ফেকু দড়ি ঝোলানো বাঁশগুলো তুলে ধরেছে, হাত নেড়ে ডাকছে সুহাসকে—সুহাস ট্রানজিস্টারটা হাতে নিয়ে অন্য হাতে ঠোঁট চেপে আছে, আর কিছুতেই এগোচ্ছে না। ইনাম চট করে সামনে এসে ফেকুর

কাছে টাকা চায়, দুড়ো ট্যাহা দে—কাল দিয়ে দেবানে। বাঁশগুলো ছেড়ে দেয় ফেকু, অ, খালি হাতে মজা মারতি আইছ? মুহূর্তে সোনালী হাত সামনের আবছায়ায় ভেসে ওঠে নীল পানিতে সাদা মাছের পেটের মতো। সেই হাত মাথায় রাখে। চুল সমান করে দেয়। আঙুলে তেল আগলে আঁচলে মোছে। ইনাম নিজে কিনে দিলেও মিলের শাড়িটা খুলে নেওয়া যায় না তখন। ব্যাকুল হয়ে ইনাম বলে, দুড়ো ট্যাহা দে, কাল দেবানে, সত্যি কচ্ছি। ট্যাহা লাফাচ্ছে, মোডে দুড়ো ট্যাহাই আছে আমার কাছে—ফেকুর মুলোর মতো দাঁতগুলো কড়মড় করে ওঠে। তা বলি সুহাস দে—দে সুহাস, কচ্ছি কাল দেবানে, ঠিক কচ্ছি দে সুহাস, তোদের মা কালীর দিব্যি, কাল দিয়ে দেবানে—ছটফট করে ইনাম। সুহাস বলে ফেকুকে, কিছু কয়নি এতক্ষণ, কেমন গুড়ি গুড়ি আসতিছিল দেখচিস, উরে, তুই কি ইস্টুপিট—সে হাসে, মাইরি কচ্ছি, পকেটে হাত দিয়ে দ্যাখ—দুড়ো ট্যাহা আছে মোডে, দাদার পহেট থে মারিছি, মাত্তর দুড়ো ট্যাহা। তখন ইনাম ক্ষান্ত হয়। গেটের কাছে ফেকু আর সুহাস গলাগলি দাঁড়িয়ে। জানালার কাঠের রডে মুখ লাগিয়ে বুড়োটা চিৎকার করে, কে, কে ওখানে গো—অ্যাঁ। লাল আলোটা সরে যায় জানালা থেকে, হড়াম করে দরজা খোলে, হাতে হারিকেন নিয়ে খোলা জায়গা পেরিয়ে গেটের কাছে আসে মানুষটা। সমস্ত উঠোনটায় বিরাট ছায়া, খাটো লুঙির নীচে শুকনো দুটো পা। এসে গেটের পাশে করবী গাছটার পাশে দাঁড়ায়। আলোটা মুখের কাছে তুলে ধরে লোকটা। বোশেখ মাসের তাপে মাটিতে যেন ফাটলের আঁকিবুকি—এমনি ওর মুখ। ঠাণ্ডা চোখে ইনামকে দেখে, ফেকুকে দেখে, সুহাসকে দেখে, দেখতেই থাকে, বিঁধতেই থাকে, হারিকেনের বাতিটা তোলে কাঁপা হাতে, এসো তোমরা, ভাবলাম কে আসছে এত রাতে। কে আর আসবে এখানে মরতে। জেগেই তো ছিলাম। ঘুম হয় না মোটেই—ইচ্ছে করলে কি আর ঘুমানো যায়—তার একটা বয়েস আছে—অজস্র কথা বলতে থাকে সে—মানে হয় না, বাজে কথা বকবক করেই যায়। এসো, বড্ড ঠাণ্ডা হে, ভেতরে এসো। কিন্তু ভেতরে কি ঠাণ্ডা নেই? একই রকম, একই রকম। দেশ ছেড়েছে যে তার আর ভেতর বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে। সবাই ভিতরে আসতে করবী গাছটার একটা ডাল ঝটকানি দেয়—পায়ের নীচে মাটি ঠাণ্ডা, শক্ত আর সেজন্যে ইনামের গোড়ালিতে ব্যথা করছে।

ভিতরে কালো রঙের চৌকিটা পড়ে আছে। ঘুমের মধ্যে মুরগীগুলো কঁ কঁ করে উঠল। আবার হু-উ-উ চিৎকার এলো। বিলে বাতাস উঠেছে শোনা গেল। ভাঙা চোয়ারে ভদ্রলোকটি বসে। হারিকেন মাটিতে নামানো। ওরা তিনজন চৌকিতে কাছাকাছি বসেছে। কেউ কথা বলছে না, বুড়োর অ্যাজমার কষ্টের নিঃশ্বাস পড়ছে। তুখোড় লোকটা এখন চুপ—ভসভস বাতাস ছাড়ছে মুখ দিয়ে। খোঁচা খোঁচা শাদা দাড়ি দেখা যাচ্ছে। শিরওঠা আঙুল চেয়ারের হাতলে পড়ে আছে। নোংরা নখ দীর্ঘদিন কাটা নেই। গলার কাছে শ্লেষ্মা এসে জমলে বাতাস যাওয়া-আসা প্রায় বন্ধ হয়ে এলো। ইনামের ইচ্ছা হোল একটা নল দিয়ে সাফ করে দেয় ফুটোটা। তারপর কি খবর, অ্যাঁ? সব ভালো তো? ঘড় ঘড় করে কথা এগিয়ে চলে। আক্ষেপ, বিলাপ, মরে গেলেই তো হয় এখন, কি বলো তোমরা? টক করে মরে গেলাম ধরো। তারপরে? আমার আর কি?—ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং, চলে গেলাম, বুঝে মরগে বুড়ি—ছানাপোনা নিয়ে বুঝে মরগে। এই তোমরা একটু আধটু আসো, যখন তখন এসে খোঁজ খবর নাও। সময় অসময় নেই বাবা তোমাদের। তোমরাই ভরসা, আমার পরিবার তোমাদের কথা বলতে অজ্ঞান। ফেকু ভয় পেয়ে গেছে এখন। বুড়োর মুখের দিকে বারবার চেয়ে

ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে আর সিঁটিয়ে যাচ্ছে। সুহাস চোখ দুটো গোল গোল করে চেয়ে আছে। বুড়োর মুখ এখন বহুরূপী। সুহাস ভাবছে, কেশো বুড়োটা খুন করবেনে মনে হতিছে আমার। আজ ক্যানো যে আলাম। না আসলেই ভালো হোত। তোমরা না থাকলে না খেয়ে মরতে হোত এই জংগুলে জায়গায়—বুড়ো বলছে, বাড়ীর বাগান থেকে অন্ন জোটানো আবার আমার কম্ম— হ্যাঃ। ও তোমরা জানো। আমরা শুকনো দেশের লোক বুইলে না—সব সেখানে অন্যরকম, ভাবধারাই আলাদা আমাদের। এখানে না খেয়ে মারা যেতাম তোমরা না থাকলে বাবারা। ছেলেমেয়েগুলো তোমাদের কি ভালোই না বাসে। এই দ্যাখোনা বড় মেয়েটা, রুকু এখন চা করতে যাচ্ছে তোমাদের জন্যে—একটা শ্লেষ্মার দলা শ্বাসনালীটাকে একেবারে স্তব্ধ করে দেয় আর চোখ কপালে তুলে কাশছে। কথার খই ফুটছিল অথচ এখন মরে যাবে নাকি? আমরা চা খাবো না—চীৎকার করে ওঠে সুহাস আর ফেকু। খাবে না? বুড়ো সামলে নিয়ে শান্তভাবে বলে, অ, ঠিক আছে। তাহলে তোমরা এখন চা খাবে না—অ্যাঁ—আচ্ছা, ঠিক আছে।

বিল থেকে বাতাসটা উঠে আসছে। এখন অশ্বথ গাছটার মাথায় ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, এগিয়ে আসছে, খঞ্জনীর বাজনাও এগিয়ে এলো সঙ্গে, খোলের চাঁটি আর কি বিশাখার কথা, কি তমালের কথা—সব এসে আবার দূরে চলে গেল। সুহাসের চাদরের মধ্যে নোট খড়মড় করে, সেগুলো নিয়ে ফেকু নিজের পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে—দলা পাকায়, ভাবে, ভয় পায়, শেষে বুড়োর দিকে ঝুঁকে পড়ে, সুহাস আর আমি দিচ্ছি।

চেয়ারের উপর লোকটা ভয়ানক চমকে ওঠে। পড়ে যাবার মত হয়। খটাখট নড়ে পায়াগুলো, তোমরা দিচ্ছ, তুমি আর সুহাস? দাও। আর কত যে ধার নিতে হবে তোমাদের কাছে, কবেই বা শুধতে পারব এই সব টাকা! সুহাস থেমে গিয়েছিল, এখন উঠে দাঁড়ায়, চলে যাবে এখন? এত তাড়াতাড়ি? রুকু রাগ করবে—চা করতে দিলে না ওকে। ওর সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলে আর কোনদিন কথা বলবে না। দাঁড়াও—হারিকেনটা রেখে বুড়ো বেরিয়ে যায়—ছায়াটি ছোট হতে হতে এখন নেই। মুরগীগুলো আবার কঁ কঁ করে ওঠে, রাত কথা বলে ওঠে বয়স্কা বৃদ্ধা হয়ে, তীক্ষ্ণ গালাগালি অন্ধকারকে ফাঁড়ে। চুপ চুপ মাগী, চুপ কর কুত্তী এবং সমস্ত চুপ করে যায়। বুড়োটা ফিরছে এখন—মাথা নামিয়ে, কাঁধ ঝুলিয়ে ঘরে এসে ফিসফিস করে, যাও তোমরা, কথা বলে এসো, উই পাশের ঘরে। ইনাম, তুমি বসো, এখখুনি যাবে কেন? এসো, গল্প করি।

বুড়োটা গল্প করছে, ভীষণ শীত করছে ওর গল্প করতে, চাদরটা আগাগোড়া জড়িয়েও লাভ নেই। শীত তবু মানে, শ্লেষ্মা কিছুতেই কথা বলতে দেবে না তাকে। আমি যখন এখানে এলাম, সে গল্প করেই যাচ্ছে, আমি যখন এখানে এলাম, হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁপতে কাঁপতে বলছে, বুঝলে যখন এখানে এলাম। তার এখানে আসার কথা আর কিছুতেই ফুরোচ্ছে না—সারারাত ধরে সে বলছে, এখানে যখন এলাম—আমি প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই—তখন—হু হু করে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ীর শব্দ আর অনুভবে নিটোল সোনা রঙের দেহ—সুহাস হাসছে হি হি হি—আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে—বলে থামলো বুড়ো, কান্না শুনল, হাসি শুনল—ফুলের জন্য নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্যে, বুঝেছ করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে। আবার হু হু ফোঁপানি এলো। আর এই কথা বলে গল্প শেষ না করতেই পানিতে ডুবে যেতে, ভেসে যেতে থাকল বুড়োর মুখ—প্রথমে একটা করবী লাগাই বুঝেছ, আর ইনাম মনে মনে তেতো তেতো—এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন কাঁদতিছ তুমি?

থুঃ থুঃ

মণি মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবী, পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলা, পশ্চিমবাংলার ভিতর জেলা চব্বিশ পরগণা, চব্বিশ পরগণার ভিতর সাত-গাঁ মিলিয়ে এক অঞ্চল, সেই অঞ্চলের মধ্যে এক গাঁ কাউখালি, কাউখালির মধ্যে এক ঘর, সেই ঘরের এক একদা বউ ফুলমণি।

ফুলমণিকে নিয়ে আর কি গল্প হবে!

আরে ছোঃ, একি একটা গল্পের চরিত্র হলো নাকি! ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে কার্জন পার্কের রেলিং ধরে মেয়েমানুষটা। একি একটা গল্পের পক্ষে বর্ণনাযোগ্য শরীর। পুরুষের বুকে যা মুহুর্মুহু ভূমিকম্পের ধ্বস্ নামায়, এই মেয়েমানুষটার শরীরে সেই রহস্যময় উচ্চাবচতার বাঁকানো নারী লীনা কোথায়। এতো স্রেফ্ ক'খানা হাড়ের সংযোগ মাত্র। সোজাসুজি হাড় ক'খানা উঁচিয়ে থেকে নারী শব্দটার প্রতি মন-আনচান-করা ভাবটার একেবারে বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। কদম-ছাঁট-করা চুলের তেলহীন রুখু জটে উকুনের রাজত্ব। যেন আগুনে আধপোড়া গায়ের চামড়া। পরতে পরতে ধূলো ময়লা। খোস-পাচড়ার অবাধ বিস্তার। এই মেয়েমানুষটাকে নিয়ে আর যাই হোক গল্প বানানোর কোন মানে হয় না।

তাছাড়া গল্পটা আমি কার জন্য বানাবো? যারা খেতে পায় না তারা নির্ঘাৎ গল্প পড়ে না। যারা খেতে পায় অথচ লেখাপড়া জানে না তারা গল্প পড়বে এটা ভাবাই বিড়ম্বনা। আর অল্পসংখ্যক একটা দল, যাদের অঢেল প্রাচুর্য তারা গল্পে মেয়েমানুষের শরীরের বর্ণনা পড়ে সময় নষ্ট করবে না। তারা ইচ্ছে হলেই তরতাজা মেয়েমানুষ পেয়ে যাবে যখন তখন, যেমন খুশি।

এসবের বাইরে আর যারা কোন রকমে দুটি খেতে পরতে পায়, লেখাপড়া জানে, ধর্মাধর্ম মানে, দেশের খোঁজখবর রাখার কথা ভাবে, সংস্কৃতি সংস্কৃতি করে জীবনপাত করে, সব টান ভেঙে হুট্ বলতে যত্রতত্র মেয়েমানুষের কাছে যাবার সাহস রাখে না, গল্পে নানারকম বর্ণনা টর্ণনা পড়ে তৃপ্ত হতে চায় তাদেরই মোটা অংশটা এখনকার প্রকৃত পাঠকগোষ্ঠী। এখন যা কিছু লেখালেখি সবই তাদের সুখ এবং বারোটা বাজাবার জন্য। মেয়েমানুষের বর্ণনার আর নতুন কিছু বাকী নেই বললেই চলে। সুতরাং এই কার্জন পার্কের রেলিং ধরে দাঁড়ানো মেয়েমানুষ ফুলমণিকে নিয়ে এদের জন্য কিছু গল্প বানাতে যাওয়া মানে ধাষ্টামো।

অবশ্যই এর বাইরে আরো কিছু পাঠক থাকতে হবে। তারা গল্পে বুদ্ধির সূক্ষ্ম মোচড় এবং শিল্পের বিকীর্ণ আলো-অন্ধকার পছন্দ করেন। তাদের জন্য অল্প কিছু লেখক থাকা দরকার। তারা বণিজ্যসফল লেখকদের দিকে ঈর্ষ্যামিশ্রিত করুণা ছোঁড়েন, সমকালের দরকারী কথায় শিল্পের ঘাট্‌তি খুঁজে বেড়ান।

ফুলমণিকে দিয়ে তাদের গল্পের আশাও তৃপ্ত হবার নয়।

আপাততঃ ফুলমণির মধ্যে পরস্পরবিরোধী কোন জটিলতাই নেই। মাত্র চাট্টি সাদা ভাতের জন্য তার সমস্ত চৈতন্য হাম্‌লে আছে। ক্ষুধার জ্বালায় সে এখন দারুণ একরোখা। তাকে নিয়ে ঐ ধরনের কোন জটিল গল্প বোনার কোন সুযোগই নেই।

তবে কি ফুলমণিকে নিয়ে নিতান্ত একটা দুঃখের গল্পও হয় না? হবে না কেন, হতে পারে। দুঃখের গল্প পড়ার মধ্যে এক ধরনের সুখ আছে। এক সীতার দুঃখে কেঁদে এই দেশের লোক তো কম সুখ পায়নি। ফুলমণিকে নিয়েও এরকম একটা গল্প হয় বৈকি। মাটির হাঁড়ি, ছেঁড়া কাঁথা, কার্জন পার্কের রেলিংয়ে মেলে দেওয়া শত ছিন্ন কানি, চারদিকে প্রবহমান নিস্পৃহ নিষ্ঠুর সভ্যতা। সিঁথি বুঝি একটা সিঁদূরের চিহ্ন, এখন আভাস।

কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ?

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কাউখালি। বাঁয়ে মোচড় নিয়ে মাত্‌লা নদী গেছে সাগর-সঙ্গমে। ইতিউতি ছড়ানো-ছিটানো গাঁ-ঘর। এমনি গাঁ কাউখালি। নোনা জলে চাটা মাটি, সুবিধের নয়। গরীব গুরবো মানুষের ঝুপরী ঝাপরা ঘর। কায়ক্লেশে দিন যায়। খালে বিলে মাছ ধরা, খেতে খামারে জনমজুর খাটা। রাতে দুটি মোটা চাল ফুটিয়ে শাকপাতা সেদ্ধ দিয়ে সূর্যাস্তের আগে সারা দিনমানে একবার খেয়ে নেওয়া। তেল জোটানো যায় না বলে সন্ধ্যে থেকেই তারা নিজেদের ঘুমের হাতে তুলে দেয়।

অঘোর মালোর বউ ফুলমণি। ফুলমণির তিন ছেলে এক মেয়ে। একবেলা চাট্টি শাক ভাত খেয়েও শরীর ভাঙেনি ফুলমণির। শামুক আর গুগ্‌লীর কৃপায় শরীরটা ডাঁটো আছে। কিন্তু সেটা ঐ একবেলা ভাত আছে বলেই। অন্ততঃ একবেলা ভাত না হলে শামুক-গুগ্‌লীতে শরীর টিকবে না।

অঘোর মানুষটা বোকাসোকা। খাটতে পারে, মাথা খাটাতে পারে না। ফুলমণির ছেলেমেয়েরা খালে ঝাঁপায়, রোদে ঘোরে, পাখির বাচ্চা পাড়ে। ফুলমণি শাকপাতা খোঁটে, শামুক-গুগ্‌লী তোলে, শুকনো কাঠকুটো জোগাড় করে, ফাঁকে ফোঁকরে ধান-তোলা গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে ভানাকোটা করে আসে। পরনের কানির প্রান্তে জড়িয়ে চাল আনতে গিয়ে গতরের ঢল নিয়ে বিষম হয়।

রাতের বেলা ছেঁড়া চাটাইয়ে শুয়ে অঘোর তাকে জড়িয়ে ধরে। এই এক রোগ মানুষটার। থেকে থেকে জড়িয়ে ধরবে। জড়িয়ে ধরে বলে : তুকে ছাড়া আমি বাঁচবনি ফুলমণি।

ফুলমণি মুখঝাম্‌টা দেয় : ঢঙ্, বাঁচতে কে বলেছে, মর গে'না!

এলোপাথারি ছেলেমেয়েদের ঠিকঠাক করে শোয়ায় ফুলমণি। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না বলে এক সময় ফিরে-শোওয়া অঘোরের পিঠে হাত রাখে। অল্পে রাগে অঘোর, অল্পে রাগ ভাঙে।

বলে : ও শালা তোর দিকে বড় ছোঁক ছোঁক করছে!

ও শালা যে কে তা ফুলমণি জানে। পাতা নড়লে যেমন বাঘ হুঁশিয়ার, তেমন লোকের চোখের পলক নড়লেই সতর্ক ফুলমণি। তা ছাড়া লোকটা ভেড়ীর মালিক, জমির মালিক, মহাজনী কারবারের মালিক, এখন ফুলমণির মালিক না হলে মানাবে কেন।

বাঃ বাঃ মশাইরা, দুঃখের গল্প তো জমে উঠবার মুখে!

কিন্তু না, ফুলমণিকে নিয়ে এ গল্পটাও বানানো যাবে না। দুঃখ দুঃখ করে করে এক ধরনের ছেনালী অন্ততঃ ফুলমণিকে নিয়ে করা যাবে না মশাই। এরকম কোন গল্পের জন্য ফুলমণি নয়। সে আপনাদের সব রকম গল্পের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, এই কলকাতা শহরে, কার্জন পার্কের রেলিং ধরে।

ফুলমণির কাছ থেকে আপনাদের শরীর বিষয়ক কিছু পাবার নেই। জটিল বুদ্ধি সংক্রান্তও কিছু দেবার নেই তার। আর আপনাদের যে সে দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে সুখ দেবে এমন আশাও অল্পই। তা হলে আপনারা কি পেতে পারেন ফুলমণির কাছ থেকে?

এ সময় ফুলমণি কার্জন পার্কের রেলিং ছেড়ে দিয়ে গলা বাড়িয়ে থু থু করে থুথু ছিটালো। মাথা চুলকিয়ে উকুন ছড়ালো। গা চুলকিয়ে পাঁচড়ার মামরী ঝরালো।

ক্ষেত্রমণি। ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দাও, পদীপিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটিয়ে দাও!...

ও সাহেব, ও কার্জন সাহেব, ও লর্ড কার্জন সাহেব, হাস্‌তিছ? হাস। ভাবতিছ, নীলকর রোগ সাহেবকে নিয়ে তো দেখি ক্ষেত্রমণির দুঃখে একখানা নীলদর্পণ লেখা হয়েছেল। আর এখন? এখন তো রোগও নাই, কার্জনও নাই, কিন্তু ক্ষেত্রমণি এলো কোথ্‌থনে? স্বাধীনতার সাতাশ বছ্ছর পরে?

এই সময় ফুলমণি আবার থু থু করে থুথু ছিটালো। মাথা চুলকিয়ে উকুন ছড়ালো। গা চুলকিয়ে পাঁচড়ার মামরী ঝরালো।

এক ঢ্যামনা ফুলমণিকে নিয়ে একখানা গল্প ফেঁদেছিলো। ফুলমণি তখন ষোল বছরের ছুকরী। ফুলমণিদের এলাকায় তখন জোত্‌দারদের সঙ্গে জমিজিরেত নিয়ে গণ্ডগোল। এলাকাটা বর্ধমান বাঁকুড়ার ধারাধারি কোথাও। কিন্তু বর্ধমান বাঁকুড়ার ফুলমণি ইতিপূর্বে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ফুলমণি হয়েছিলো কি প্রকারে? সে এক রহস্য হতে পারে মশাইরা। তাতে আমাদের কি ক্ষতি। ক্ষতি হতে পারতো গল্পের। কিন্তু ফুলমণির ব্যাপারটা তো আর গল্প নয়। সুতরাং ফুলমণি দক্ষিণেরই হোক, উত্তরেরই হোক, অথবা পুব কিংবা পশ্চিমেরই হোক তাতে কার কি যায় আসে!

তারপর সেই ঢ্যামনা লোকটা ফুলমণিকে নিয়ে একখানা গল্প ফেঁদেছিলো। আসলে খুব একটা লড়াই টড়াই এনে সবাইকে রাগাবার মহৎ ইচ্ছে ছিলো লোকটার। কিন্তু যাদের দিয়ে এই রাগাবার কাজটা সে করতে চেয়েছিলো সেই ফুলমণিদের সে জানতো সামান্যই। ফলে ফুলমণিদের গল্পটা ষোল বছরের ফুলমণির গল্প হয়ে যেতে লাগলো। ঢ্যামনা লোকটা গুড়ে মাছির মত আট্‌কে গিয়েছিলো আর কি। ফুলমণির শরীরে তখন বিদ্যুৎ জড়ানো মাংস ছিলো। সুতরাং লোকটা লিখেছিলো তুখোড়। সেই গল্পের চতুর্থ সংকলন যখন শেষ হবার মুখে ফুলমণি তখন হাওড়া স্টেশনের লাল ইঁটের দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে।

তার শরীরে তখন আর কোথাও গল্প নেই।

সব জটিলতার ঊর্ধ্বে সে শুধু চাট্টি সাদা ভাতের জন্য হাম্‌লে আছে। এখন হাওড়া স্টেশনের একলক্ষ লোকের একটি চোখও তার দিকে তারছা হয় না।

গলা বাড়িয়ে ফুলমণি থু থু করে থুথু ছিটালো। মাথা চুলকিয়ে উকুন ছড়ালো। গা চুলকিয়ে পাঁচড়ার মামরী ঝরালো। অথচ প্রকৃতির কাছ থেকে এক রূপসী শরীর পেয়েছিলো ফুলমণি!

নদীর বাঁধ কেটে নোনা জলের তোড়ে ফুলমণিদের ঝুপরী ঘর ভাসিয়ে দিয়েছিলো কারা? মশাই জানেন না বুঝি? সেটা বোঝাবার জন্য আর একটা গল্প লিখতে হবে নাকি এখন! হুঁ হুঁ মশাইরা, ফাঁকতালে গল্পটা গিলে ঘুমুতে যান আর কি! ঘরবাড়ী তো আর আপনার ভাঙেনি, ভেঙেছে ফুলমণির। আপনি কেবল গল্পটা পড়েছেন মাত্র। হুঁ হুঁ, এতেই বোঝা গেছে মশাই, ঢের বোঝা গেছে।

ঝুপরী ঘর খুইয়ে ফুলমণি একদম আপনাদের ভগবানের খোলা আকাশের নীচে হাজির হয়ে গেলো। তিনদিন উপোস দিয়ে হাঁটাপথে ক্যানিং স্টেশন। কোন হোটেলের ফেলে-দেওয়া পচা তরকারি খেয়ে পঞ্চম দিনের মাথায় ফুলমণির শিবতুল্য স্বামী অঘোর

মালো মারা গেলো। গেলো তো গেলো, ফুলমণির বয়েই গেলো। সে তখন মেয়েটাকে বেচে দেবার জন্য খদ্দেরের সঙ্গে কঁকিয়ে কঁকিয়ে কথা বলছে।

ফুলমণি বললো : পাঁচটা ট্যাকা দিয়ো বাপু। কুনদিন এ আপদটাকে আর ফেরত্ চাইমুনি।

ফুলমণির জীভ জড়িয়ে যাচ্ছিলো বলে, এবং খদ্দেরটার পেটে ভাত ও গতরে ক্ষমতা ছিলো বলে সে আরো সস্তায় মাল কেনার কথা ভাবলো। মেয়েটার গা পিঠ টিপে বললো: মাংস কোথায়? সবই তো হাড়।

ফুলমণি ভয়ে ভয়ে তিনটে আঙুল দেখালো।

না না, যা ভাবছেন মশাই, তা নয়। ভাবছেন মেয়ে বেচে ফুলমণির কি কান্না, ফুলমণির কি কষ্ট! কথাটা আপনি ভরপেটে ভাবছেন। ফুলমণি তো আর ভরপেটে মেয়ে বেচেনি যে তার সুখ দুঃখ থাকতে হবে। সে ঠিক তিন টাকা দিয়ে তার দুই ছেলেকে নিয়ে বেঁচে থেকে কলিকাতা শহরের উপকণ্ঠে হাজির হয়ে গেলো। প্রথম দিনেই মিষ্টির দোকানের ফেলে-দেওয়া শালপাতার জন্য প্রতিযোগিতামূলক দৌড় লাগাতে গিয়ে ফুলমণির একটি ছেলে ডবলডেকারের হাতে প্রাণ দিলো। শহর কোলকাতাকে মোটামুটি ভালোই উপঢৌকন দিলো ফুলমণি। আর পাবলিক যখন কাঁদবার জন্য সেই মৃতদেহের প্রকৃত মালিকের অনুসন্ধান করছে, ফুলমণি তখন এক সাঙ্গুভেলী মালিকের কাছে ছ'টাকায় তার অবশিষ্ট সন্তানটিকে বেচে দু'টি খাবার জোগাড়ে ব্যস্ত।

তখন নাকি তিনজন অন্ধ দেখেছিলো, ফুলমণির মাথার পিছনেই এক জ্যোতির্ময় বলয়, যা দেবতা এবং মহাপুরুষদের পিছনে সঙ্গতভাবে উপস্থিত থাকে। এবং সেই রাত্রেই দেবী ধর্ষিতা হইলেন।

ঘটনাটা সামান্য এক গাছতলায় শোয়া নিয়ে। পুলিশটা সোজা এসে বললো : গাছতলায় শোবার আইন নেই।

ছেলে-বেচা টাকায় দু'টি খেয়ে ফুলমণি প্রফুল্ল ছিলো। ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো : গাছতলায় আবার আইন কি গো! পুলিশ হয়তো ফুলমণির বাঁকানো ঠোঁটে কোন অভিপ্রেত সংবাদ পেয়ে থাকবে। সে তার নাকের নীচের পৌরুষে চাড়া দিয়ে নীচু গলায় গাছতলায় শোয়া আইনসঙ্গত করার পদ্ধতির কথা জানালো।

ফুলমণির আর কিছুতেই আপত্তি ছিলো না।

মাইকেলের কবরের পাশে, পঁচানব্বই বছর আগে মারা যাওয়া এক ডাকসাইটে মেমের কবরের উপর মিনিট পাঁচেক শুয়ে থেকে ফুলমণি ফুটপাথের গাছতলায় শোবার মহৎ অধিকার অর্জন করলো।

কিন্তু ধর্মাবতার, এই দক্ষিণের কিংবা উত্তরের, অথবা পুব কি পশ্চিমের ফুলমণি নামক রমণী ভয়ংকর কুৎসিত দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত। সে ভারতের দু'জন নাগরিককে, সেই নাগরিকদ্বয়ের মধ্যে ভারতের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতির প্রতিভা থাকিলেও থাকিতে পারিত, তাহাদের সে বিক্রয় করিয়াছে। এমতাবস্থায়—

ফুলমণি তখন থু থু করে থুথু ছিটালো। মাথা চুলকিয়ে উকুন ছড়ালো। গা চুলকিয়ে পাঁচড়ার মামরী ঝরালো।

সেই সময় বিদূষকদের কলমে মধ্যবিত্ত ন্যাকামীর বন্যা। গলায় বক্লসের দাগ নিয়ে কি প্রাণান্তকর কসরৎ। শিল্পের চিচিং ফাঁক দরজা খোলার জন্য কি চিল চেল্লানি। হাজারো রকমের বাহানা।

এদিকে ফুলমণি তার মাথার চুল এক বুড়ি মেমের কাছে পাঁচ টাকায় বিক্রী করে দিয়ে কার্জন পার্কের রেলিং ধরে দাঁড়ালো। এখন আর ফুলমণির কাছে বিক্রয়যোগ্য কিছু নাই।

সে মাথা গোঁজার ঘর, স্বামী, সন্তান, দেহ এবং অবশিষ্ট যে মাথার চুল তাও বেচে দিলো অনায়াসে। এখন আর ফুলমণি কি দিতে পারে?

ফুলমণি থু থু করে থুথু ছিটালো। মাথা চুলকিয়ে উকুন ছড়ালো। গা চুলকিয়ে পাঁচড়ার মামরী ঝরালো।

মশাই, এই বিবৃতি কি পাঠযোগ্য? শিল্পের আইন-কানুন তো গোল্লায় গেছে। তা ঠিক। তবে ফুলমণির কোন্‌টাই বা আইনসঙ্গত? কোন আইনে ফুলমণির ঘর, সন্তান, স্বামী যায়? ফুলমণির জীবনের চাইতে তো আর ফুলমণির জীবনের শিল্পসম্মত গল্প বড় হতে পারে না।

সত্যি কথা বলতে কি মশাই, আমি তো ফুলমণিকে নিয়ে সুন্দর একটা গল্পই লিখতে চেয়েছিলাম। ফুলমণির নানা হৃদয়বৃত্তির কথা। নানা সম্পর্কের সুতোয় জড়ানো তার জীবনযাত্রার ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্ত্বের ছবি, যার মধ্যে একটা তাজা জীবনের টান থাকবে যা অন্যের প্রতি ব্যক্ত।

কিন্তু এদেশে এখন সব গোলমাল।

ভাতের সাদা রঙ ছাড়া এখন ফুলমণির জীবন এবং জগৎ নীরন্ধ্র অন্ধকার। পৃথিবীর সব গল্প নিভে গিয়ে যখন ভাতের গল্প জেগে ওঠে তখন কাহিনী হয়ে যায় ক্রুদ্ধ এবং পেশীবহুল।

উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের ফুলমণি কার্জন পার্ক থেকে তার পদযাত্রা শুরু করলো। সে পাশ কাটিয়ে গেলো খাদ্য-বোঝাই গুদাম, আইনসভা এবং মহাধর্মাধিকরণ ভবন, বড় বড় সংবাদপত্রের অফিস, নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানকারী ভদ্রলোকদের পাড়া।

এই মহিয়সী ভারতীয় নারীর আর দেবার মত কিছু ছিলোনা বলেই...

ফুলমণি থু থু করে থুথু ছিটালো। মাথা চুলকিয়ে উকুন ছড়ালো। গা চুলকিয়ে পাঁচড়ার মামরী ঝরালো।

সম্পাদক

দিব্যেন্দু পালিত

খুব ভোরে উঠে খবরের কাগজ কিনতে বেরিয়েছিল উমাপতি। খরচ বাঁচাবার জন্য আজকাল আর নিজে কাগজ রাখে না। চা খেয়ে বাজার যাবার পথে পাড়ার লাইব্রেরিতে বসে পড়ে নেয়। আজ সে তরও সয় নি।

সাধারণত ভোরেই ঘুম ভাঙে তার। কাল তবু মেয়েকে বলে রেখেছিল দেরি হলে তুলে দিতে। উমাপতির অস্থিরতা লক্ষ করে মীরা বলেছিল, 'তোমার দেখছি রাতে ঘুম হবে না, বাবা। এত ব্যস্ত কেন! বুড়োবয়সে নতুন রোগ ধরল তোমাকে।'

বিছানায় হাত-পা ছড়াতে ছড়াতে উমাপতি বলেছিল, 'উদ্বেগ না থাকলে কি সাধনায় সিদ্ধি হয় মা! কি হল না হল দেখতে হবে তো!'

মীরা কথা বাড়ায় নি। এখন ভাঁজ-করা কাগজটা বগলদাবা করে উমাপতিকে ফিরতে দেখে আশ্বস্ত হল।

'কি বাবা! বেরিয়েছে?'

ঘরের সামনে এক চিলতে উঠোনে বসে তোলা উনুনে আঁচ দিচ্ছিল মীরা। ধোঁয়ার মধ্যে থেকে উঠে এল।

উমাপতি ঘামছিল। উৎসাহের আতিশয্যে এই পথটুকু ছুটেই এসেছে প্রায়। তক্তপোশে বসতে বসতে হাঁফ ছেড়ে বলল, 'বেরুবে না! নগদ একুশ টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়েছি!'

তারপর, একটু দম দিয়ে, ধুতির খুঁটে কপাল মুছে কাগজটা বাড়িয়ে ধরল মেয়ের দিকে, 'দেখ দিকি, কেমন হল?'

বাবার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে চোখ রাখল মীরা। পাতা জুড়ে ছোট-বড় হরেকরকম বিজ্ঞাপন—পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়—এইসব পেরিয়ে পত্রপত্রিকা কলামের নীচে ছ-সাত লাইনের ছোট বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল।

''কুড়ি বছর পরে প্রখ্যাত সম্পাদক উমাপতি রায়ের সম্পাদনায় 'বাণী' মাসিকপত্র পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। 'বাণী'র পুরাতন লেখকগণ এবং নবীনেরা যোগাযোগ করুন।'' তারপর উমাপতির নাম ও ঠিকানা।

পড়া শেষ করে মীরা বলল, 'ভালোই তো হয়েছে বাবা। তোমার কাগজের নামটাই যা একটু সেকেলে হল!'

'সেকেলে! কেন! ওই নাম কখনো পুরনো হয়!' চোখেমুখে দৃপ্ত ভাব ফুটিয়ে উমাপতি বলল, 'এক কালে ওই নামেই কত হাঁকডাক ছিল। কত লেখক গড়েছি নিজের হাতে। নিখিল সমাদ্দারের প্রথম গল্প আমিই ছেপেছিলুম ওই বাণীতে। তারপর ধর, আজ যারা খুব নাম-করা—প্রমথ মুখুজ্জে, ভূপেন মিত্র, সঞ্জয় বসু—এককালে সবাই ঘিরে থাকত আমাকে। তুই তখনো হোস নি। তোর মা বেঁচে থাকলে সে-সব গল্প শুনতিস!

মীরার তেমন উৎসাহ নেই। এ-সব কাহিনী আগেও অনেকবার শুনেছে। লেখক সাহিত্যিক মহলের ভালোমন্দ নানা কাহিনী শুনতে একসময় তার ভালোই লাগত। এখন লাগে না। কেমন যেন মনে হয় এইসব লোক ও পরিবেশ নষ্ট করে দিয়েছে উমাপতিকে। দুঃখের দিনে মা মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলত, ওই সাহিত্য-বাই না থাকলে তোর বাবা অনেক উন্নতি করতে পারত। টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়া কি হয় ওসব করে! মীরা এখন কথাটা বিশ্বাস করে।

প্রকৃতপক্ষে, উমাপতির জন্য এখন মাঝে মাঝে করুণা হয় মীরার। বয়স হয়ে গেছে, দিনকালও কি সেই কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার মতো আছে! এখন চারিদিকে বদলের হাওয়া। এর মধ্যে নামমাত্র পুরনো পুঁজি সম্বল করে উমাপতির আবার বেঁচে ওঠার চেষ্টা আহাম্মকি ছাড়া আর কি! ধার-কর্জ মিটিয়ে হাজার-ছয়েক টাকা সম্বল নিয়ে কলকাতায় এসেছিল। সংসারের খরচ জোগাতে এরই মধ্যে তার কিছুটা গেছে। উমাপতির নতুন খেয়ালে বাকিটাও বুঝি যাবে!

উমাপতি সে-কথা বুঝবে না। বিলাসপুর থেকে ফেরার পর চাকরির চেষ্টা করেছিল কিছুদিন। দিনকতক কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে এখানে-ওখানে দরখাস্ত করল, কাজ হল না কিছু। এই বয়সে কে আর কাজ দেবে! একটা চাকরি অবশ্য অনেক খোঁজাখুঁজির পর জুটেছিল, তেলকলে হিসেব লেখার কাজ। দিনসাতেক যেতে না যেতেই মাথা গরম করে ফিরে এল। 'এই বয়সে দাসত্ব আর ভালো লাগে না রে!' মেয়েকে বলল, 'কটা টাকার জন্য গঞ্জনা শোনা রোজ! নাঃ, এবার স্বাধীন কিছু করব।'

'বিলাসপুরে যেটা করতে সেটা কি দাসত্ব নয় বাবা!' ভেবেছিল বলবে। কিন্তু সাহস হয় নি মীরার। মা-র মৃত্যুর পর থেকেই কেমন অভিমান বেড়ে গেছে উমাপতির। অল্পেই ক্ষুণ্ণ হয়, আহত বোধ করে। বাবার এই স্বভাব মীরার অজানা নয়। মাথায় ঝোঁক চাপলে সে-ভূত নামায় কার সাধ্য!

'তোমার তো অনেক বড় বড় লেখকের সঙ্গে আলাপ আছে, বাবা', মীরা বলেছিল অবশেষে, 'তাঁদের ধরেটরে একটা কিছু করতে পার না! তাঁরা ইচ্ছে করলে তোমাকে তো একটা কাগজেটাগজে ঢুকিয়ে দিতে পারেন! হাজার হোক, ওঁদের ইনফ্লুয়েন্স আছে।'

'ভালো বলেছিস! মান খুইয়ে এখন আমি ওদের কাছে গিয়ে চাকরির উমেদারি করি!' ক্ষুব্ধ গলায় জবাব দিয়েছিল উমাপতি, 'এককালে আমি ওদের কম ইনফ্লুয়েন্স করেছি! জানিস, নিখিল ওর প্রথম বই উৎসর্গ করেছিল আমাকে—'

বুঝিয়ে লাভ হয় নি। চুপ করে গিয়েছিল মীরা। আর প্রায় সেই সময়েই আবার কাগজ করার কথাটা মাথায় এসেছিল উমাপতির।

কদিন খুব ঘোরাঘুরি করল। এককালে 'বাণী' বের করার সময় যাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা ছিল তারা এখন কে কোথায়! অর্থাভাবে কাগজ বন্ধ হবার পর চাকরি নিয়ে চলে যেতে হয়েছিল বিলাসপুরে। তারপরেও কিছুদিন সম্পর্ক ছিল, চিঠিপত্র বিনিময় চলত। সব যোগই ছিন্ন হয়েছে আস্তে আস্তে। ওরা খোঁজ রাখে নি, উমাপতিও তেমন গা করে নি। দেখতে দেখতে দীর্ঘ কুড়িটা বছর পার হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে প্রায় সকলেই ঠিকানা বদল করেছে। সাপ্তাহিক, মাসিকে বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখে উমাপতি প্রকাশকদের দোকানে, কাগজের অফিসে নিখিল সমাদ্দার, প্রমথ মুখুজ্জেদের ঠিকানা সংগ্রহের জন্য ধরনা দিল। তাদের মুখে নানা প্রশ্ন; কি চাই, কি দরকার ইত্যাদি। শেষ অবধি নিখিলের ঠিকানা পেয়ে পোস্ট কার্ডে চিঠি লিখল উমাপতি। উচ্ছ্বাস ও আন্তরিকতাপূর্ণ সে-চিঠি; আবার 'বাণী' প্রকাশ করছে সে-কথা জানিয়ে শেষে লিখল রবিবার সকালে মীরাকে সঙ্গে নিয়ে ওর বাড়িতে আসবে।

মীরা বলল, 'আবার আমাকে কেন এর ভেতর টানছ, বাবা। আমি এ-সবের কি জানি।'

'নিখিল তোকে দেখলে খুশি হবে।' স্নেহে উদার গলায় বলেছিল উমাপতি, 'হাত পুড়িয়ে তোর মা কম দিন খাইয়েছে ওকে! আজ তোর মা নেই, তুই তার প্রতিনিধি। তুই যাবি না তা কি করে হয়!'

প্রস্তাবটা তবু মনঃপূত হয় নি মীরার। বলেছিল, 'তাহলে আমি আর একদিন যাব। কাগজের কথাবার্তাটা তুমি আগে সেরে এস।'

'কেন, তুই কি কাগজের কিছু নোস!' উমাপতি বলেছিল, 'তোকে প্রুফ দেখা শিখিয়ে দেব। দেখবি কাজটা মজার। কতরকম বানান, কতরকম হাতের লেখা। নিখিলের বরাবরের দোষ ছিল হাসি বানানে চন্দ্রবিন্দু বসানো। তোর মা ওই নিয়ে কত ঠাট্টা করত। তাছাড়া, চিঠিপত্রের জবাব দেয়া, ফাইল গুছনো এ-সব কাজ আমি একা পেরে উঠব কেন!'

মীরা আর কিছু বলে নি। উমাপতির চোখ-মুখের জীবন্ত আহ্লাদ ও উৎসাহ মনে এক ধরনের করুণার সঞ্চার করে। হাল ছেড়ে দিয়ে ও ভেবেছিল, যা হচ্ছে হোক। সাময়িক খুশিটুকু থেকে বাবাকে বঞ্চিত করে লাভ নেই।

মীরার নানা কাজকর্মের ফাঁকে উমাপতি নিজে তৈরি হয়ে নিল। সারাক্ষণই সে ব্যস্ত বোধ করছিল। নিখিল চিঠিটা পেয়েছে কিনা জানা নেই। নিশ্চিত পাবে। নিজের হাতে ঠিকানা লিখে ডায়রিতে সযত্নে টুকে-রাখা ঠিকানার সঙ্গে বারকয়েক মিলিয়ে দেখেছিল উমাপতি। বয়স হলে অলক্ষে মগজে ঢুকে পড়ে কিছু ভুলভ্রান্তি। যদি সে-রকম কিছু হয়! নিশ্চিত থেকেও তবু সুস্থির হতে পারছিল না উমাপতি।

আজ যথাসম্ভব চেহারায় নিজেকে ভব্য করে তুলল উমাপতি। মাথার পাতলা হয়ে-আসা চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে মেয়েকে তাড়া দিল, 'কিরে, তোর হল!'

মীরা বুঝি কাপড় বদলাতে গিয়েছিল। আড়াল থেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি বড্ড তাড়া দাও, বাবা! ট্রেন তো আর ধরতে যাচ্ছি না যে ঘড়ি ধরে চলতে হবে। একটু দেরি হলে হয়েছে কি!'

'শুভকাজে বিলম্ব করতে নেই।' উমাপতি বলল, 'পথ কি কম! সেই কোন বরানগরে বাড়ি নিখিলের। যেতে যেতেই একঘণ্টা লাগবে।' তারপর একটু-বা অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'এখান থেকে ট্যাকসিতে কত পড়বে বলতে পারিস!'

'থাক, থাক। ট্যাকসির বাবুয়ানিতে আর কাজ নেই।' মীরা বলল, 'বাসেই দিব্যি যাওয়া যাবে।'

দরজায় তালা ঝুলিয়ে বাপ-মেয়ে রাস্তায় পা দিল।

একটু জোরে জোরেই হাঁটছিল উমাপতি। যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভুল হয়ে গেল। বিজ্ঞাপনের কাটিংটা সঙ্গে নিলে বোধহয় ভালো করতুম। নাকি রে?'

মীরা বলল, 'কেন? তোমার নিখিল সমাদ্দারের বাড়িতে বুঝি খবরের কাগজ আসে না!'

মীরার গলায় ঝাঁঝ ছিল, একটু-বা অপ্রসন্নতা। উমাপতি তা আঁচ করল। খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'কাগজের ব্যাপারটায় তুই কি খুব উৎসাহ পাচ্ছিস না! ভাবছিস বুঝি টাকাগুলো সব জলে যাবে। আমি অত কাঁচা নই। এ-কদিনে পুরো খোঁজখবর করেছি। জানিস, এক প্রেসঅলা আমাকে বলল নিখিল সমাদ্দারের উপন্যাস একটা যদি আনতে পারি তাহলে কাগজ বাবদ দাদন দেবে, সে-ই ফাইনান্স করবে। লাভের গুড় খেতে চায় আর কি! মুখের ওপর বলে দিয়েছি নিখিল দিলে আমাকেই দেবে। কাগজ বিক্রি হলে আমিই দাঁড়াব।'

উমাপতির দুঃখ কিছু কিছু অনুমান করতে পারে মীরা। এখন ভেবে দুঃখিত হল, কথাটা হয়তো এভাবে বলা উচিত হয় নি। বাবা তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না, তার কথায় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছে, ইত্যাদি ভেবে মন খারাপ হল তার। আবহাওয়া তরল করার জন্য বলল, 'লোকজন সব এমনিই হয়েছে আজকাল। যেখানে কড়ির শব্দ সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তুমি 'না' বলে ঠিকই করেছ।'

'করি নি।' উমাপতি হাসল, কৃতার্থের হাসি। যেন বুকের ভিতর থেকে একটা কঠিন ভার নামিয়ে দিল। হাসতে হাসতেই, ঈষৎ তন্ময় গলায় বলল, 'তাছাড়া, সাহিত্য নিয়ে আমি তো ব্যবসা করতে বসি নি। ওরা সে-কথা বুঝবে কি করে!'

মীরা চুপ করে থাকল। উমাপতির এইসব কথার অর্থ প্রায়ই তার বোধগম্য হয় না। বড্ড হেঁয়ালিপূর্ণ, ভীষণ অস্পষ্ট। শুধু এই ব্যাপারে কেন, সমস্ত বিষয়েই উমাপতি যেন আজকাল এড়িয়ে চলছে বাস্তবকে। মীরার কথা বাদ দিলেও উমাপতি কি জানে না সামনে পড়ে রয়েছে অনিশ্চিত দিনগুলি, হয়তো এখনো অনেক, অনেক দিন বাঁচতে হবে তাকে। সেইসব দিনের ভরসা কি।

উমাপতি কখনো এইসব ভাবে বলে মনে হয় না। ভাবলেও সে-ভাবনা এতই শিথিল যে মীরা কখনো তা ছুঁতে পারে না। বাসের সিটে একলা বসে উমাপতির কথা ভাবতে লাগল মীরা।

শ্রাবণ প্রায় শেষ হয়ে এল। আর দু-তিন দিনের মধ্যেই ভাদ্র এসে পড়বে। আকাশে তাকিয়ে মীরা শরৎকালের আবহ খুঁজল। গত দু-তিন দিন একেবারে বৃষ্টি হয় নি। আকাশ খুব পরিষ্কার, খণ্ড খণ্ড কিছু মেঘ ছড়িয়ে আছে ইতস্তত। ফুরফুরে হাওয়া ছুটে আসছিল মাঝে মাঝে। অন্যমনস্কভাবে এইসব দৃশ্য দেখতে দেখতে মীরার হঠাৎ মনে পড়ল, গতবছর এইরকম সময়ে মা মারা গিয়েছিল।

মা-র মৃত্যুর আগের সেইসব ভয়াবহ দিনগুলি মনে পড়ছিল মীরার। প্রতিরোধের শক্তি যত কমে আসছিল, ততই যেন ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিল মা। সংসারের দৈন্যের ছবিটি ততদিনে তার মনে স্পষ্ট। 'আমি মরে গেলে তোর বাবা নিশ্চয় কলকাতায় ফেরার চেষ্টা করবে।' মীরাকে বলেছিল, 'তুই ওকে বাধা দিস, বিলাসপুর ছাড়তে দিস না। এখানে থাকলে তবু তোদের দুমুঠো ভাত জুটবে।'

মীরা কোনো কথা খুঁজে পায়নি। কোনোরকমে বলেছিল, 'তুমি আমাদের জন্যে ভেবো না, মা। বাবাকে ভুল বুঝো না।'

'ওকে আমি চিনি যে! সংসারে ওর কোনোদিনই মন নেই। কি যেন ওকে টানে সবসময়।'

মা ভুল বলে নি। সেই অদৃশ্য টানই উমাপতিকে আবার ফিরিয়ে আনল কলকাতায়। অনুরোধ, বাধা, পরিচিতদের নিষেধ কিছুই ওকে নিরস্ত করতে পারে নি।

অন্যমনস্কতার মধ্যেই কখন পেরিয়ে এল অনেকটা পথ। পিছন থেকে উমাপতি ডাকল, 'মীরা, নামবি না এখানে!'

মীরা উঠল। ঈষৎ অলস, উদ্‌ভ্রান্ত ভঙ্গি। বস্তুত, এখন সে পরিষ্কার হতাশা বোধ করতে শুরু করেছিল।

উমাপতির কোনো ভাবান্তর নেই। নিখিল সমাদ্দারের বাড়ির রাস্তা খুঁজে রিকশায় উঠে আবার মেতে উঠল পুরনো দিনের গল্পে। নিখিল খুব পরিশ্রমী ছিল। চাকরি ছিল না, মাথার ওপর বিরাট সংসারের ভার। চার-পাঁচটা ট্যুইশন করত দিনে। লেখার সময় কই! তবু হাল ছাড়ে নি নিখিল। লিখত সারা রাত ধরে। 'বাণী'তে বেরুনো ওর একটা গল্প নিয়ে সমাজদ্রোহের অভিযোগ উঠেছিল। আদালতে কেস হল। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উমাপতি

বলেছিল, ওই লেখার কোনো মূল্য আছে কিনা তার জবাব দেবে ভাবীকাল। আজ যারা ওকে সমাজদ্রোহের অপবাদ দিচ্ছে একদিন তারাই ওকে মাথায় তুলে নাচবে। অভিযোগ দাঁড়াতে পারে নি।

মীরা কিছু শুনছিল, বেশিটাই শুনছিল না। সাহিত্য শিল্প সম্পর্কে তার বোধ বিশেষ কাজ করে না। শুধু একটা কথাই মাঝে মাঝে মনে হয়, পৃথিবীর সব গল্পই একরকম। শুনতে একই রকম লাগে, প্রধান অপ্রধানের বাছবিচার করা যায় না। উমাপতির স্মৃতিচারণে সে কোনো বৈচিত্র্য খুঁজে পায় না। বস্তুত, মীরার মনে হয়, সমস্ত ঘটনার মধ্যেই দীন, অক্ষম, প্রসিদ্ধির কাঙাল উমাপতির ব্যর্থ রূপটিই যেন পরিষ্কার ফুটে ওঠে।

নিখিল বাড়িতেই ছিল। বৈঠকখানায় বসে ভিতরে খবর পাঠাল উমাপতি। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল।

যে-কিশোরীটি দরজা খুলেছিল, সে আবার ফিরে এসে বলল, 'বাবা তো খুব ব্যস্ত। আপনাদের কি আজ দেখা না করলেই নয়!'

উমাপতি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আমার নাম বললে ও ছুটে আসবে। বলো, বাণীর সম্পাদক উমাপতি রায়। তোমার বাবা আমাকে খুব ভালো চেনে।'

মেয়েটি একটু-বা সন্দেহের চোখে তাকাল। তারপর আবার ভিতরে চলে গেল।

মীরা অস্বস্তি বোধ করছিল। উমাপতিকে নিশ্চিন্ত দেখে বলল, 'আজ আমরা বোধহয় না এলেই ভালো করতুম, বাবা। সামনে পুজো, উনি এখন লেখাটেখা নিয়ে ব্যস্ত। দেখলে না, তোমার চিঠির জবাবও তো উনি দেন নি!'

'তুই থাম তো!' সস্নেহে মেয়েকে ধমক দিল উমাপতি, 'নিখিলের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা তো তুই জানিস না, তাই এ-কথা মনে হচ্ছে।'

মীরা চুপ করে থাকল। অন্যমনস্ক চোখে এই ঘর, ঘরের আসবাব, দেয়াল ইত্যাদি লক্ষ করতে লাগল। উমাপতির মুখ প্রত্যয়ে ভরা।

নিখিল এল বেশ কিছু পরে। পরনে পায়জামা, গায়ে একটা চাদর কোনো রকমে জড়ানো। বারেক তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি টেনে সামনে এল।

'কী ব্যাপার! আপনি হঠাৎ!'

'তাহলে চিনতে পেরেছো!' উমাপতি সহাস্য হল। ব্যস্ত হয়ে বলল, 'মীরা, প্রণাম কর। প্রায় কুড়ি বছর পরে দেখা হল, কি বলো!'

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল উমাপতি। তারপর, একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে তো?'

'কোন চিঠি!' সামনের চেয়ারে বসতে বসতে অবাক ভাব দেখাল নিখিল।

'সে কি! আমি নিজে হাতে ঠিকানা লিখে পোস্ট করেছি। পৌঁছুবে না এমন হতে পারে না!'

'হতে পারে!' ঠোঁটের হাসিটুকু জিইয়ে রাখল নিখিল, 'এত চিঠি আসে আজকাল। সব তো আর হাতে পৌঁছোয় না!'

মীরা দেখল উমাপতির মুখ মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাশে, বিবর্ণ হয়ে গেল। একবার নিখিলকে দেখল, তারপর মীরাকে। ক-মুহূর্ত। আবার সামলে নিল নিজেকে।

'তোমার খুব সমৃদ্ধি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। কি বলো?'

'আর সমৃদ্ধি!' পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করল নিখিল, দেশলাই জ্বালল। একমুখ ধোঁয়া টেনে বলল, 'সেইসব দিনই ভালো ছিল, উমাদা। এখন লেখা ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচি! চব্বিশ ঘণ্টা কলম ঘষছি। এই তো, আধঘণ্টা পরে আসবে একজন উপন্যাসের শেষকিস্তি নিতে। দম ফেলার সময় নেই।'

ক্রমশ নিবে যাচ্ছিল উমাপতি। করুণার চোখে তাকাল মীরার দিকে। রাগ ও হতাশা মেশানো সেই দৃষ্টির অর্থ মীরা বুঝতে পারে। ও চোখ নামিয়ে নিল। উমাপতির সঙ্গে আজ সে না এলেই ভালো করত। সে সঙ্গে আছে বলেই উমাপতির দুঃখ আরো বেশি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। নিখিল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'উমাদা, আজ আমাকে ক্ষমা করবেন। মাসখানেক বাদে একদিন আসুন না! মেয়েকেও নিয়ে আসবেন। এখানেই খাওয়াদাওয়া করবেন। আপনার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে।'

যা বলার এখনই বলা উচিত উমাপতির। কিন্তু, উমাপতি যেন মূক হয়ে গেছে। খানিক হতভম্বের মতো ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল। শুকনো, জড়ানো গলায় বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা উঠি এখন। তুমি তো খুব ব্যস্ত!'

উমাপতি যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। মীরা ওকে অনুসরণ করল।

সামনে অবারিত পথ। উমাপতি হাঁটছিল, একটু-বা জোরে পা ফেলে। পিছন থেকে ওকে একটু কুঁজো দেখায়; অল্প পিছনে হাঁটতে হাঁটতে মীরা যেন এই প্রথম লক্ষ করল উমাপতির বয়স হয়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের খরতাপে ওর পাঞ্জাবির ওপর ঘাড় ঘামে ভিজে চকচক করছিল।

উমাপতির জন্য হঠাৎ আবেগ অনুভব করল মীরা। পিছন থেকেই আস্তে গলায় ডাকল, 'বাবা!'

উমাপতি দাঁড়াল। ওর চোখ ইতিমধ্যেই উত্তেজনায় রক্তবর্ণ হয়েছিল, ভুরু কাঁপছিল। মীরা কাছে এলে বলল, 'অপমানটা দেখলি, মা! ছিঃ, ছিঃ!'

গলা কাঁপছিল উমাপতির। দম নিয়ে বলল, 'সব অকৃতজ্ঞ, মানুষকে সম্মান দিতে জানে না!'

একপলক স্থিরচোখে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মীরা। যেন পরিমাপ করে নিল উমাপতির দুঃখের গভীরতা। তারপর আশ্বস্ত করার গলায় বলল, 'তুমি ভেঙে পড়ছ কেন, বাবা! উনি ছাড়া কি আর লেখক নেই! তুমি তো আরো অনেক লেখক তৈরি করেছিলে। সবাই কি তোমায় ফিরিয়ে দেবেন!'

উমাপতি যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না। সন্দেহগ্রস্ত ভাবে তাকাল মেয়ের দিকে। সামান্যক্ষণ। মীরা দেখল উমাপতির মুখের ভাব বদলে যাচ্ছে ক্রমশ।

'ঠিক বলেছিস, মা!' উমাপতি বলল, 'আমি প্রমথর কাছে যাব, ভূপেনের কাছে যাব। দেখি ওদের আমাকে মনে আছে কি না।'

উমাপতির সঙ্গে এই প্রবঞ্চনাটুকু করতে ভালো লাগল মীরার। উমাপতি যেন আবার পুরনো আস্থা ফিরে পাচ্ছে। বাবার সঙ্গে রিকশায় উঠতে উঠতে ও ভাবল, দিনকাল বদলে গেছে। নিখিল, প্রমথদের স্মৃতিতে কবেকার পুরনো এক অখ্যাত কাগজের সম্পাদকের কোনো মূল্য যদি না থাকে, কাউকে দোষ দেবার নেই। তবু, আর-একজনের কাছে অপমানিত, বঞ্চিত হবার আগে পর্যন্ত উমাপতির আত্মবিশ্বাসটুকু বেঁচে থাক।

কিডনি চাই

রমানাথ রায়

গতকাল সোনা ফোন করেছিল। আমার সঙ্গে ওর নাকি জরুরী কথা আছে। আমি যেন আজ সকালে বাড়ি থাকি।

আজ রবিবার । সাধারণত রবিবারের সকালে বাড়ি থাকি না। কোন বন্ধু বা আত্মীয়র বাড়ি যাই। কখনো কখনো সিনেমা কি থিয়েটারেও যাই। আমি বিয়ে-থা করিনি। তাই কোন অসুবিধে হয় না। কিন্তু আজ সোনার জন্যে বাড়িতে থাকতে হল। সোনাকে আমি একসময় ভালবাসতাম। তবে সোনা আমাকে বিয়ে করেনি। এক বড়লোকের ছেলেকে বিয়ে করেছে। শুনেছি ছেলেটি ভাল চাকরি করে। সুতরাং সোনার কোন আর্থিক সমস্যা নেই। তাহলে কিসের সমস্যা হঠাৎ দেখা দিল? আমি সোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু সোনা এল না। তার বদলে গিনি ঘরে ঢুকল। আমি গিনির কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। অনেকদিন পরে গিনিকে দেখে আবার গিনির কথা মনে পড়ল। গিনি এখনো গিনির মতই। এখনো তার মুখের চামড়া চকচক করছে। কোথাও ভাঁজ পড়েনি। কিংবা টোল খায়নি। এখনো টান টান হয়ে আছে । এখনো বয়সটাকে কুড়িতেই আটকে রেখেছে। আমি গিনির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

গিনি হেসে বলল, বসতে বললে না?

আমিও হেসে বললাম, বস।

কোথায় বসব? তোমার পাশে?

তোমার খুশি।

আমি একটা বড় সোফার মাঝখানে বসেছিলাম। গিনি আমার বাঁ পাশে এসে বসল। এই গিনি ছিল সোনার বন্ধু। আমি প্রথমে গিনিকেই ভালবাসতাম। কিন্তু গিনি যখন আমাকে বিয়ে না করে আর একজনকে করল তখন রেগে গিয়ে সোনাকেই ভালবাসতে শুরু করি। তারপর গিনির সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে দিই। সেই গিনি হঠাৎ আমার কাছে কেন? নিশ্চয় অকারণে আসেনি। বিশেষ কাজেই এসেছে। কিন্তু কাজটা কি?

গিনি জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ?

বললাম, ভাল।

গিনির কথাটা বোধহয় ভাল লাগল না। একটু যেন মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমার জন্যে তোমার মন খারাপ করে না?

না।

গিনি এতে রেগে গিয়ে বলল, সে ত করবেই না। কারণ....

গিনির মুখের কথাটা শেষ করতে না দিয়েই জানতে চাইলাম, কারণ কি?

কারণ সোনা। সোনাকে এখনো তুমি ভুলতে পারছ না।

বাজে কথা। সোনার জন্যেও আমার মন খারাপ করে না।

সত্যি?

বিশ্বাস কর।

গিনি একটু থেমে বলল, সোনাকে ভুলে গিয়ে ভাল করেছ। ওর মত অসভ্য মেয়ে পৃথিবীতে আর নেই। ওর সঙ্গে তোমার যদি বিয়ে হত তাহলে তোমার সর্বনাশ হত। তুমি খুব বেঁচে গেছ।

একথা শুনে হেসে জিজ্ঞেস করলাম, যদি তোমার সঙ্গে বিয়ে হত?

গিনি হেসে উত্তর দিল, তুমি স্বর্গলাভ করতে । কিন্তু সে তো তোমার কপালে নেই।

আসলে, আমার কপালে মেয়ে সহ্য হয় না। দু'দিন পরেই তারা চলে যায়।

এই কারণেই কি বিয়ে করনি? পাছে বউ পালিয়ে যায়।

অনেকটা তাই।

তবে যারা বিয়ে করে না তাদের বয়স হলে বড় কষ্ট।

তখন তো তোমরা আছ। মাঝেমধ্যে আসবে না?

বেঁচে থাকলে আসব।

তুমি ঠিক বেঁচে থাকবে।

কি করে জানলে?

মেয়েরা যে দীর্ঘায়ু হয়।

বাজে কথা।

বিশ্বাস কর। তুমি হিসাব করলেই দেখবে বিপত্নীকের চেয়ে বিধবার সংখ্যা বেশি।

গিনি হেসে উঠল। বলল, তুমি একটুও বদলাওনি। ঠিক আগের মতই আছ।

তুমিও বদলাওনি।

নাগো, অনেক বদলে গেছি। আমার মনে কোন সুখ নেই।

নিশ্চয় আমার জন্যে নয়।

ঠাট্টা রাখ। আমি খুব বিপদে পড়ে গেছি। আর সেই কারণেই তোমার কাছে ছুটে এলাম।

কেন, কি হল?

বলতে খুব খারাপ লাগছে।

তাহলে বলো না।

নাহ্ বলেই ফেলি। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই যে আমাকে এখন এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে। আমি কৌতূহলী হলাম। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। কারণ, জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। গিনি নিজেই কথাটা বলবে। এরই জন্যে সে আমার কাছে এসেছে। অকারণে দেখা করতে আসেনি।

গিনি একটু থেমে বলল, গোপাল খুব অসুস্থ। ও বোধহয় আর বাঁচবে না।

গোপাল কে? তোমার ছেলে?

গিনি বিরক্ত হয়ে বলল, ছেলে হবে কেন? আমার স্বামী।

আহ্। তা ওঁর কি হয়েছে?

দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে।

সর্বনাশ! কি হবে এখন?

এখন কেউ যদি একটা কিডনি দান করে তাহলেই ও বেঁচে উঠবে।

তা আমি কি করব?

আমি জানতে এলাম তোমার রক্ত কোন গ্রুপের?

'O' গ্রুপের।

পজিটিভ?

হ্যাঁ।

কি করে জানলে?

কিছুদিন আগে একজনকে রক্ত দিতে হয়েছিল।

গিনি প্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলল, আর তোমাকে ছাড়ছি না। তোমাকেই কিডনি দিতে হবে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, তুমি ওঁর স্ত্রী। তুমি থাকতে....

গিনি বলল, আমি দিতাম। আমারও ঐ গ্রুপেরই রক্ত। কিন্তু কিডনি দিতে গিয়ে যদি মরে যাই?

আমিও তো মরে যেতে পারি।

তুমি মরলে কারো ক্ষতি নেই। আমি মরলে গোটা সংসারটাই যে ভেসে যাবে।

তাহলে তোমার শ্বশুর, বা দেওরদের দিতে বল।

শ্বশুর বৃদ্ধ হয়েছেন। উনি দেবেন না। দেওররা বিয়ে-থা করেছে, ওরাও দেবে না। অবশ্য ওদের কারো রক্ত পরীক্ষা হয়নি।

তার আগেই ওরা বলে দিয়েছে দেবে না!

হ্যাঁ, আর সেইজন্য তোমার কাছে ছুটে এলাম। তুমি আমার স্বামীকে বাঁচাও। তোমার একটা কিডনি দান কর।

আমি এ কথায় কোন হ্যাঁ বা না করলাম না। চুপ করে বসে রইলাম। বুঝতে পারলাম গিনি কেন আমার কাছে এসেছে। কেন আমার গা ঘেঁসে বসেছে। কেন আমার প্রতি ওর হঠাৎ এই ভালবাসা। কিন্তু যে নিজের কিডনি দিতে পারে না, সে আর একজনের কিডনি কি করে চায়! ও মরে গেলে ওর সংসার ভেসে যাবে। আমার কোন সংসার নেই। আমি অবিবাহিত। অতএব আমি যদি মরে যাই কারো কোন ক্ষতি হবে না। চমৎকার!

গিনি এইসময় আমার গা ঘেঁসে আরও সরে এল। আমার গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে বলল, এই, চুপ করে আছ কেন? কিছু বল।

ভাবছি।—বলে আবার চুপ করে গেলাম।

গিনি এতে রেগে গিয়ে বলল, এতে ভাবার কি আছে? তুমি বিয়ে-থা করনি। দুটো কিডনি নিয়ে কি করবে? একটা দিয়ে দাও। আর দিতে গিয়ে যদি কিছু হয় হবে। তোমার জন্যে আমি ছাড়া ত কাঁদার কেউ নেই।

ঠিক এই সময় ঘরের দরজা ঠেলে সোনা ঢুকল। সোনাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। সোনাই এখন আমার ভরসা। সোনাই এখন আমাকে বাঁচাতে পারে। গিনির হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে।

সোনা গিনিকে দেখেই চমকে উঠল। গিনিকে জিজ্ঞেস করল, তুমি! কি ব্যাপার? গিনিও সোনাকে দেখে কম অবাক হ'লনা। সেও পাল্টা প্রশ্ন করল, তুমি! কি ব্যাপার?

গিনি আমার বাঁ পাশে বসেছিল। ডানপাশ খালি ছিল। সোনা সেখানে বসল। আমি দু'জনের মাঝখানে বসে রইলাম।

সোনা গিনির প্রশ্নের উত্তরে বলল, আমি ভাই খুব দরকারে এসেছি। তুমি?

গিনি বলল, আমিও ভাই খুব বিপদে পড়ে এসেছি।

তোমার কাজ হয়ে গেছে?

এখনো হয়নি।

আমি এবার সোনাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ?

সোনা মুখ কালো করে বলল, ভাল নেই।

কেন?

কর্তার খুব অসুখ।

কি হয়েছে?

দুটো কিডনিই প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সোনার এখানে আসার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হ'ল। আমি তাই একটু কৌতুক করেই জিজ্ঞেস করলাম, আমায় কিডনি দিতে হবে। তাই ত?

সোনা বলল, হ্যাঁ।

আমি মনে মনে এই ভেবে অবাক হলাম যে এই সোনার জন্যই সারা সকাল অপেক্ষা করে আছি। এমনকি এই সোনাকে দেখেই একটু আগে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম

সোনা আমার ভরসা। ভেবেছিলাম সোনা আমাকে বাঁচাবে। গিনির হাত থেকে উদ্ধার করবে। বিয়ে-থা না করলে মানুষ দেখছি বোকাই থেকে যায়।

সোনা একটু পরে বলল, দেখো, আমি তোমার কাছে কোনদিন কিছু চাইনি। আজ তোমার একটা কিডনি শুধু চাচ্ছি। তুমি আমাকে বিমুখ করো না। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। তোমার ব্লাড কোন গ্রুপের?

'O' গ্রুপের।

পজিটিভ?

পজিটিভ।

বাহ্! চমৎকার! আমার কর্তার গ্রুপের সঙ্গে মিলে গেছে। আর আমার চিন্তা নেই।

এই সময়ে গিনি যেন সামান্য উত্তেজিত হয়ে বলল, কিন্তু তুমি ত কিডনি পাবে না?

সোনা একথায় চমকে গিয়ে প্রশ্ন করল, কেন? পাব না কেন?

গিনি বলল, আগেই আমার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।

কি কথা হয়েছে?

একটা কিডনি আমি নেব।

তুমি কিডনি নিয়ে কি করবে?

আমার কর্তারও দুটো কিডনিই নষ্ট হতে বসেছে।

সত্যি?

হ্যাঁ।

সোনা তখন ছলছল চোখে আমাকে বলল, আমি তাহলে একটা কিডনি পাব না?

আমি বললাম, গিনি চেয়েছে বটে। কিন্তু আমি ওকে কোনও কথা দিইনি।

গিনি ফোঁস করে উঠল, তার মানে ? তুমি আমাকে কিডনি না দিয়ে সোনাকে দেবে?

আমি হেসে বললাম, আমি কি বলেছি যে সোনাকে দেব?

তাহলে তুমি কাকে দেবে?

একটু মজা করার জন্যেই বললাম, যে আমাকে বেশি ভালবাসে তাকে দেব।

আমি তোমাকে বেশি ভালবাসি।

সোনা একথায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মিথ্যেবাদী! আমি ওকে তোমার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি।

সোনা একথার প্রতিবাদ করে বলল, অসম্ভব। আকাশ যেমন পৃথিবীকে ভালবাসে, আমি তেমনি ওকে ভালবাসি।

সোনা সঙ্গে সঙ্গে বলল, আর আমি? সমুদ্র যেমন পৃথিবীকে ভালবাসে, আমি তেমনি ওকে ভালবাসি।

মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা! তোমার কথাই মিথ্যে।

এই! মুখ সামলে কথা বল।

তুমি মুখ সামলে কথা বল।

আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি।

আমিও রেগে যাচ্ছি।

তুমি চুপ কর।

তুমি চুপ কর।

তারপর দু'জনেই চুপ করে গেল। আমি দু'জনের মাঝখানে বসে রইলাম। আমার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোল না। আমি হতবাক হয়ে গেলাম। বুঝতে পারছি আমার কিছু একটা বলা উচিত। কিন্তু কি বলব? যদি বলি, কিডনি তোমাদের কাউকেই দেব না, তোমরা যে যার বাড়ি চলে যাও। তাহলে ওরা আমাকে ক্ষমা করবে না। হয়ত হিংস্র জন্তুর

মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি ওদের আর বিশ্বাস করি না। তাহলে কি করব? আমার মাথায় কিছু এল না।

গিনি এই সময় শান্ত গলায় সোনাকে বলল, কিছু মনে করো না ভাই। আমি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম। সোনাও নিজেকে শান্ত করে বলল, তুমিও কিছু মনে করো না ভাই। আমিও হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম। আসলে আমি যে ওকে খুব ভালবাসি।

আমিও ওকে খুব ভালবাসি।

তাহলে আমাদের মধ্যে কিসের ঝগড়া?

ঠিক, আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া থাকা উচিত নয়। আমরা দু'জনেই যখন ওকে ভালবাসি তখন ওর দুটো কিডনি আমাদের দুজনেরই প্রাপ্য। তাই না?

সোনা উৎসাহের সঙ্গে বলল, নিশ্চয়। কিন্তু....

কিন্তু কি?

দুটো কিডনি নিয়ে নিলে ও তো আর বাঁচবে না।

ওর বাঁচার কি দরকার?

আমি এবার আঁতকে উঠলাম। বললাম, কি বলছ? আমার বাঁচার দরকার নেই!

গিনি পরিষ্কার ভাষায় উত্তর দিল, না। তুমি বিয়ে-থা করনি। তোমার বাঁচার কোন দরকার নেই।

সোনাও গিনির কথায় সায় দিয়ে আমাকে বোঝাল, গিনি ঠিকই বলেছে। তুমি বিয়ে-থা করনি। তুমি বেঁচে থেকে কি করবে?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, কিন্তু...

গিনি বলল, কোন কিন্তু নয়। এখনি হাসপাতালে চল। তোমার দুটো কিডনিই আমাদের চাই।

সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে বললাম, আমি হাসপাতালে যাব না।

গিনি প্রায় ধমকের সুরে বলল, যাব না মানে?

তোমাকে যেতে হবে।

জোর করে নিয়ে যাবে?

হ্যাঁ, জোর করে নিয়ে যাব।

অসম্ভব।

মোটেই অসম্ভব নয়।

অসম্ভব নয় কেন?

তুমি যেতে না চাইলে আমরা চিৎকার করে লোক জড়ো করব। তোমার নামে মিথ্যে করে যাতা বলব। সবাই আমাদের কথায় বিশ্বাস করবে। তোমার জেল হয়ে যাবে। তুমি কি তাই চাও?

আমি গিনির মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। একি সেই গিনি, যাকে আমি একসময় ভালবাসতাম! যাকে নিয়ে একদিন সারা কলকাতা ঘুরেছি! যাকে নিয়ে কত সিনেমা দেখেছি! যাকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছি! আমি এই গিনি চিনি না। আমি কেমন ভয় পেয়ে গেলাম।

সোনা হঠাৎ বলল, গিনি! এভাবে নয়। ওকে বরং অন্যভাবে বোঝাও। ওকে বোঝাও আত্মত্যাগের মহিমা। ওকে বোঝাও ও মরে গেলে ওর ছবি আমরা কাগজে ছাপব। বছরে একবার ওকে স্মরণ করে সভা করব। নাম-করা লোকেরা সেখানে এসে বক্তৃতা দেবে। ওভাবে চাপ দিয়ে কাজ আদায় করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

আমি একবার সোনার মুখের দিকে তাকালাম। এ কোন সোনা! একেও আমি চিনি না। অথচ গিনি চলে গেলে একদিন আমি এরই স্বপ্ন দেখতাম। একদিন একেই বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ । আমি এই দুজনের হাত থেকেই বেঁচে গেছি। কিন্তু এখন কি করে বাঁচব? হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললাম, গিনি, তুমি ঠিকই বলেছ।

সত্যি আমার বাঁচার প্রয়োজন নেই, আমি তোমাদের দুই কর্তাকেই আমার দুটো কিডনি দিয়ে দেব। তোমরা অপেক্ষা কর। আমি এখনি আসছি।

গিনি জানতে চাইল, কোথায় যাচ্ছ?

বললাম, এক বন্ধুকে ফোন করব।

কেন?

তার সঙ্গে একটা দরকার ছিল।

কি দরকার?

সোনা এই সময় আমাকে বাঁচানোর জন্যে বলল, আহ্! অত জেরা করছিস কেন? ওকি পালাচ্ছে নাকি?

গিনি একথায় চুপ করে গেল।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে শোবার ঘরে ঢুকলাম। এঘরে ফোন। লোকাল থানার অফিসার আমার কলেজ জীবনের বন্ধু। তাকে খুব নিচু গলায় বললাম, খুব বিপদে পড়েছি। শিগগির চলে আয়।

এটুকু বলেই আমি আবার গিনি ও সোনার মাঝখানে এসে বসলাম। বসে নানা গল্প করতে লাগলাম।

একসময় গিনি বলল, এবার ওঠো।

সোনাও বলল, হ্যাঁ, আর বসে লাভ নেই।

আমি বললাম, চল!

আর ঠিক তখনি পুলিসের ইউনিফর্ম পরে আমার বন্ধু ঘরে ঢুকল। তাকে দেখেই গিনি ও সোনা ভীষণ ঘাবড়ে গেল, কি বলবে বা কি করবে তা বুঝতে পারল না। আমি খুব আনন্দের সঙ্গে বন্ধুকে বসালাম। বন্ধু বসেই জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

আমি তাকে গিনি ও সোনার সামনেই সব কথা খুলে বললাম। গিনি ও সোনা আমার কথার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। বন্ধুটি তাদের কড়া ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোর কোন গ্রুপের ব্লাড?

'O' গ্রুপের।

পজিটিভ?

হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুটি প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল, তুই আমায় বাঁচালি। আমি অনেকদিন ধরে আমার স্ত্রীর জন্যে একটা কিডনি খুঁজছিলাম।

এবার আমার গলা শুকিয়ে এল। বললাম, কিন্তু....

বন্ধুটি আমার কথা শেষ না করতে দিয়ে বলল, কোন কিন্তু নয়। তোর একটা কিডনি আমার চাই।

একথা শুনেই গিনি বলল, আর একটা কিডনি তাহলে আমার।

সোনা বলল, না, ও কিডনি আমার।

গিনি বলল, না, ওটা আমার।

সোনা বলল, না, ওটা আমার।

গিনি বলল, আমার।

সোনা বলল, আমার।

আমার মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না। ভগবানই এখন আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু ভগবানকে ডাকতেও সাহস হল না। কারণ, ভগবানেরও কিডনির দরকার হতে পারে।

জল

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈশাখ শেষ হতে চলল। বিকেলের আলো ফুরিয়ে দিগন্তে তখন সন্ধের অন্ধকার। ধূসর প্রস্তরময় প্রান্তরে কতগুলি তালগাছ এক পায়ে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। কেঁদ পলাশ শিমূল মহুয়া বহরা গামার গাছও কিছু কিছু চোখে পড়ে। মহুয়ার গন্ধে ম ম করছে চারিদিক। তবু সব কিছুই কেমন যেন রুক্ষ। ফাল্গুনের শেষ থেকে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি হয়নি বললেই চলে। পাথুরে জমি, কাঁকড়—সব মিলিয়ে চারিদিকে কেমন এক মরুভূমির আভাস। এরই মধ্যে উঁচু-নিচু রুক্ষ প্রান্তর পেরিয়ে ক্লান্ত পায়ে বাড়ি ফিরলে যুধিষ্ঠির। কুমীরডিহির ড্রিলিং সাইট থেকে নিজের গ্রাম হাতিরামগোড়ায়।

যুধিষ্ঠিরের খালি পা, খালি গা। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তরতাজা যুবক। শক্ত সমর্থ চেহারা। কিন্তু এখন ক্লান্তিতে পা যেন আর চলছে না। তবু কেবল মনের জোরে তাড়াতাড়ি পা ফেলা চলেছে যুধিষ্ঠির।

ওর আজ সারাদিনই কেটেছে বাবার শরীর নিয়ে নানা দুশ্চিন্তায়। সকালে কাজে আসবার সময় দেখে এসেছে, বাবা হাঁড়িরামের অবস্থা ভালো নয়। তবু কাজে আসতেই হয়েছে। কারণ কাজে না এলে একটা দিনের মজুরি কাটা যাবে। আজকের দিনে বারো টাকা কম নয়। এ টাকা মার গেলে সবাই মিলে না খেয়ে মরতে হবে।

'অ্যাঁই যুধিষ্ঠির—' পেছন থেকে কে হাঁক পাড়ে। পেছনে ফিরে দেখে, খুলারাম। ওদের পাশের গাঁয়ের ছেলে। কুইলাপালের হাট থেকে ফিরছে। সঙ্গে একটা ঝোলায় হাট থেকে সওদা-করা জিনিসপত্তর। যুধিষ্ঠিরেরও ইচ্ছে ছিল, আজ শুক্রবার কাজ থেকে একটু আগে ছুটি নেবে। তারপর কুইলাপালের হাটে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করবে। বউ পলাশীও বার বার বলে দিয়েছিল। কিন্তু যুধিষ্ঠির আজ ফুরসৎ পেল না একেবারেই। কারণ ড্রিলিংয়ের কাজ একবার শুরু হলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছুটি নেই। অবশ্য ড্রিলিংয়ের ইনচার্জ গাঙ্গুলী সাহেব লোকটা খারাপ নয়। গরীবের জন্য এখনো দুঃখ-দরদ আছে কিছুটা।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে খুলারাম ধরে ফেলে ওকে।

'যুধিষ্ঠির, তদের ডিরলিং আর কদ্দিন চলবেক রে?'

'হেই যদ্দিন না পাথরের ভেতর থাইক্যে জল বাইরবেক—'

অবাক গলায় খুলারাম বলে, 'পাথরের ভেতর থাইক্যে জল বাইরবেক? খুব মজার কথা বইলছিস বটে। ত কবে বাইরবেক জল?'

'কী কইরে বইলব বটে! ত একদিনও হইতে পারে, এক মাইসও হইতে পারে—'

'যতদিন ডিরলিং চলবেক, ততদিন তর চাকরি থাইকবেক বটে—'

খুলারামের কথার উত্তরে তৃপ্তি-মাখানো গলায় জবাব দেয় যুধিষ্ঠির, 'হ, যতদিন ডিরলিং চলবেক, আমিও ততদিন আছি রে—'

'অ—যুধিষ্ঠির ভাই, উখানে আমার জইন্য একটা কাজ কইরে দে না—'

'কিন্তুক অখন ত উয়াঁরা কোন লোক লিবেক নাই। তাছাড়া ইখানে কাজ কইরতে হলে অনেক কিছু জানতে হবেক—'

'তুই আমার জইন্য বুঝাই বল না তর সাহেবকে—'

'ঠিক আছে, তুই যখন এত কইরে বইলছিস তখন না হয় কাইল একবার শিধাব গাঙ্গুলি সাহেবকে—'

যুধিষ্ঠিরের আশ্বাসে প্রায় গদগদ গলায় খুলারাম বলে ওঠে, 'কামটা হলে আমি তর চাকর হইয়ে থাইকব রে যুধিষ্ঠির—'

খুলারামের কথার কোনো উত্তর দেয় না যুধিষ্ঠির। বাবার শরীর খারাপের কথাটাই মনে পড়ে যায় বারবার।

বিকেল শেষ হয়ে সন্ধে নামছে, অথচ বাতাস এখনো বেশ গরম। সত্যি বলতে কি, এবারের মতো এমন খরা এ অঞ্চলে আগে কখনো দেখে নি যুধিষ্ঠির। বৈশাখ মাসে একদিনই যা একটু কালবৈশাখী ঝড় উঠেছিল। সঙ্গে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি। কিন্তু তারপর থেকে আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘের দেখা নেই। সেই সকাল থেকে শুরু করে সারাদিন সূর্য একটা বিরাট আগুনের গোলার মতো উত্তাপ ছড়ায়। আর সে সর্বগ্রাসী আগুনে ঝলসায় মানুষজন, পশু-পাখি, ঘরবাড়ি, গাছপালা, পাহাড় ডুংরি।

যুধিষ্ঠিরের নিজেদের সামান্য ফসলের ক্ষেতও জ্বলে গেছে সে আগুনের কোপে। আশেপাশের গাঁয়ে যে দুয়েকটা কুয়ো আছে, তা সবই শুকিয়ে খটখটে। এক হাঁড়ি জলের জন্য গাঁয়ের মেয়েদের রোজ পাড়ি দিতে হয় এক মাইল দূরের টোটকো নদীর জোড়ে। সেখানে শুধু বালি আর বালি। সেই ঝুরো বালি খুঁড়ে এক হাড়ি জল বের করতেই সকলে গলদঘর্ম।

বান্দোয়ানের কে যেন বলেছিল, ওদের এদিককার কয়েকটা ব্লক নাকি খরাপীড়িত অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছে সরকার। যুধিষ্ঠির জানে, এ জন্য অবশ্য ওদের আশেপাশের গ্রামে থেকে অনেকে মিলে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করে গিয়েছিল পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনারের কাছে। খবরের কাগজে ছবিও ছাপা হয়েছিল। তার কিছুদিন পরেই তো গাঙ্গুলী সাহেব দলবল নিয়ে এলেন কলকাতা থেকে। ড্রিলিং মেশিনে পাথর ফুটো করে নাকি জল বের করবেন। যুধিষ্ঠিরের মনে পড়ে, ড্রিলিং মেশিন বসাবার আগে চাকরির আশায় যুধিষ্ঠির যখন কুইলাপালের ফরেস্ট বাংলোর গাঙ্গুলী সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন চেহারা দেখেই ওকে সঙ্গে সঙ্গে কাজে বহাল করেছিলেন। কাজটা পাকা নয়, তবে দু'তিন মাস চলতে পারে। বারো টাকা রোজ। এতো রাজার চাকরি। তাছাড়া গাঁয়ে-গঞ্জে এখন কাজ কোথায়! তাই চাকরি পেয়েই আনন্দে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরেছিল যুধিষ্ঠির। বউ পলাশীকে বান্দোয়ানের হাট থেকে কিনে দিল রঙিন পুঁতির মালা, রাঙ্গাজবা আলতা আর একটা সুন্দর চিরুনি।

পরের দিন কাজ থেকে ফিরে যুধিষ্ঠির দেখে, চুল আঁচড়ে হাতে পায়ে আলতা লেপে গলায় পুঁতির মালা পরে ওর জন্য খাবার তৈরি করে বসে আছে পলাশী।

পলাশীকে নতুন পোশাকে বেশ নতুন নতুন লাগছিল। সেই অনেকটা বিয়ের পর প্রথম প্রথম যেমন লাগত। যুধিষ্ঠিরের বিয়ে হয়েছে প্রায় বছর ছয়েক আগে। প্রেম ভালোবাসা করে বিয়ে। পলাশীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটা আজও স্পষ্ট মনে আছে। পৌষ মাস। এক রবিবারের সকাল। কুমারী নদীর কাছে দীঘি গ্রামে যুধিষ্ঠির গিয়েছিল বন্ধু মাখনের কাছে। মাখন আর ও যখন একটা বাঁশবাগানের কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, তখনই ও

প্রথমে দেখে পলাশীকে। কুমারী নদীতে টুসু ভাসিয়ে পলাশীরা এক দঙ্গল মেয়ে ফিরছিল গান গাইতে গাইতে। সেই গানটার দুটো লাইন এখনো স্পষ্ট মনে আছে যুধিষ্ঠিরের।

'মাগো আমার মন কেমন করে
যেমন চ্যাঙ মাছে উফাল মারে'।

সত্যিই পলাশীকে প্রথম দেখে যুধিষ্ঠিরের মনটা চ্যাঙ মাছের মতোই লাফিয়ে উঠেছিল।

কালো পুঁতির মতো ঝকঝকে রঙ। মাথায় ঘন কালো চুলের বেণী, ডাগরডোগর স্বাস্থ্য। হাসিটা কী সুন্দর রহস্যময়!

মাখন মুচকি হেসে বলেছিল, 'কি যুধিষ্ঠির, পলাশীকে দেইখ্যে তুর লব লাঁগছে? উয়াকে সিদাবি নাকি?'

মাখনের কথার উত্তরে যুধিষ্ঠিরের আর কিছু বলবার ক্ষমতা ছিল না। কোনো রকমে ঘাড় কাত করেছিল কেবল। মাখনের বোন ঘুমুই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল পলাশীর সঙ্গে। শেষমেশ বিয়ে। পলাশীদের অবস্থা তেমন খারাপ নয়। বিয়েতে একটা রেডিয়ো পেয়েছিল যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠিরের বিয়ের কিছুদিন পরে পলাশীর উদযোগেই বিয়ে হল যুধিষ্ঠিরের ছোট বোন মিতুনের। ওর বরের পান-বিড়ির দোকান আছে বান্দোয়ানে। অবস্থা ভালোই। দোকানের আয়ে মোটামুটি চলে যায় ওদের। এরপর থেকে যুধিষ্ঠিরের দিনও মোটামুটি ভালোই কাটছিল। অল্প জমিজমা ছিল ওদের। সেখানে চাষ করত যুধিষ্ঠিরের বাবা। আর যুধিষ্ঠির কাজ করত মানবাজারে এক মারোয়াড়ীর দোকানে। সেখান থেকে যা মাইনে পেত, তাতে কোনো রকমে চলে যাচ্ছিল ওদের সংসার।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অসুখে পড়ল যুধিষ্ঠিরের মা। সেই অসুখে বেশ কিছু টাকা খরচ হল। পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালে চিকিৎসা হল। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মায়ের ব্যামো কিছুতে ধরতেই পারল না ডাক্তাররা। অসুখে ভুগতে ভুগতেই একদিন শেষ নিঃশ্বাস ফেলল যুধিষ্ঠিরের মা। তবে মায়ের অসুখে পলাশী যা সেবাযত্ন করেছে তা দেখে গ্রামের সবাই পলাশীকে ধন্যি ধন্যি করেছে।

মা মারা যাওয়ার পর থেকে ঘরের সব দায়-দায়িত্বই পলাশীর। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই মা হল পলাশী। জন্ম হল ধনুর। সবকিছু ঠিকঠাক চলত, যদি যুধিষ্ঠিরের বাবা হাঁড়িরামের শরীরটা ঠিক থাকত। কিন্তু বউ মারা যাওয়ার পর থেকে হাঁড়িরামও অসুস্থ। বেশ টাকা-পয়সা খরচ হচ্ছে, তবু হাঁড়িরামের অসুখ সারছে না কিছুতেই।

এদিকে মিথ্যা অপবাদে মারোয়াড়ীর দোকানে চাকরিটা হঠাৎ একদিন চলে গেল। যুধিষ্ঠির নাকি দোকানের ক্যাশ বাক্স ভেঙ্গে পাঁচ টাকা চুরি করেছে।

আগরওয়ালের পা ধরে কেঁদেকেটে বারবার দিব্যি দিয়েছে যুধিষ্ঠির, 'মালিক, আমি চোর লই—।' তবু আগরওয়াল ওকে চাকরিতে ফের বহাল করে নি। সেদিন দাঁতে দাঁত ঘষে প্রতিজ্ঞা করেছে, এর প্রতিশোধ ও একদিন নেবেই নেবে।

মারোয়াড়ীর দোকান থেকে কাজ চলে যাওয়ার পর বহু ঘোরাঘুরি করেও আর কোনো কাজ জোগাড় করতে পারেনি যুধিষ্ঠির। এদিকে খরায় ফসলের ক্ষেত জ্বলে গেছে, তারপর বাবার অসুখ—সব মিলে যুধিষ্ঠিরের প্রায় পাগল-পাগল অবস্থা। সেই সময় হঠাৎ এই সরকারী ড্রিলিংয়ের কাজটা পেয়ে যুধিষ্ঠির যেন অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখতে পেল। একেক সময় যেমন হয়, এত খরা না হলে কি এই কাজটা পেত যুধিষ্ঠির।

অন্যমনস্কভাবে এসব নানা কিছু ভাবতে ভাবতে ডুংরির রাস্তায় হাঁটছিল যুধিষ্ঠির। কিছুক্ষণের জন্য ও ভুলেই গিয়েছিল যে সঙ্গে খুলারামও আছে। ওর হুঁশ ফিরল খুলারামের কথায়, 'চলি রে যুধিষ্ঠির। আমার কাজের কথাটা মনে রাইখিস বটে—'

যুধিষ্ঠির অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়, 'আইচ্ছা—'।

খুলারাম নিজের গাঁয়ের দিকে চলে গেলে যুধিষ্ঠির দেখল, নিজের গ্রামও আর দূরে নেই। সামনের বাঁশঝাড়টা পেরোলেই ওর বাড়ি। মাটির ছিমছাম ছোটখাটো বাড়ি, টালির চাল।

বাড়ির দাওয়ায় ঢুকে প্রথমেই ওর চোখ গেল রান্নাঘরের দিকে। ওখানে পলাশী উনোনে খড়কুটো জ্বালিয়ে কী যেন গরম করছে।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ায় যুধিষ্ঠির, 'বাপ ক্যামন আছে রে পলাশী—।'

'ভাল না—' পলাশীর গলার স্বর কেমন ক্লান্ত উপোসী।

পলাশীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ওপাশের ঘর থেকে বুড়ো হাঁড়িরামের শুকনো গলার স্বর ভেসে আসে, 'পলাশী, এক টুকুন জল দিবিন মা! গলাটা একেবারে শুখাইন গেল রে—'

উনোন থেকে বার্লির পাত্র নামিয়ে রেখে হাঁড়ি থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে পলাশী ছুটল শ্বশুরের ঘরে। তারপর মেঝেতে হাঁটু ভেঙ্গে বসে ও ধীরে ধীরে গ্লাসের জলটা ঢেলে দেয় শ্বশুরের গলায়। কিন্তু হাঁড়িরামের গলায় আজ যেন এক বিশাল মরুভূমি। যতই জল ঢালো, রুক্ষ শুষ্ক ভূমি তা শুষে নিচ্ছে নিমেষেই। শ্বশুরের জল খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র গ্লাস নিয়ে পলাশী তাড়াতাড়ি ফিরে এল রান্নাঘরে। উনোন থেকে নামিয়ে রাখা বার্লির পাত্রটা তুলে নিল পলাশী। ধনুকে খাওয়াতে হবে।

যুধিষ্ঠির পলাশীর পেছন পেছন নিজেদের ঘরে ঢুকে দেখে, একটা কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে আছে ধনু।

চিন্তিত গলায় যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করে, 'ধনুর আবার তাপ বাইড়লেক নাকি রে—'

'হুঁ, সেই দুপুর থাইক্যে—'

'সে কি রে', ধনুর কপালে হাত দিয়ে যুধিষ্ঠির দেখে, অল্প গরম।

অল্প জ্বর হলেও তখন থেকে একটানা ঘ্যানঘ্যান করছে ছেলেটা। জ্বর বলে পলাশী ওকে দুপুরে ভাত দেয় নি। বার্লি খাইয়েছিল। কিন্তু ধনু এখন আর বার্লি খাবে না কিছুতেই। অনেক চেষ্টা করেও পলাশী ব্যর্থ। 'ভাত ভাত' করে বায়না করতে করতেই মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ল ধনু।

ওদিকে হাঁড়িরামের ঘর থেকে আবার আওয়াজ ভেসে আসে,'অ পলাশী, অ যুধিষ্ঠির—'

ডাক শুনে যুধিষ্ঠির পলাশী দুজনেই ছুটে গেল। দেখল, বুড়ো হাঁড়িরামের হাঁপের টান ধরেছে। যুধিষ্ঠির বোঝে, বাবার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে।

যুধিষ্ঠির ফিসফিস স্বরে বলে,'অবস্থা ভাল লয় রে পলাশী। বাপটাকে হাইসপাতালে দিতে না পাইরলে বাইচবেক নাই। বাড়িতে রাইখলে—'

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনতে পেয়ে আঁতকে ওঠে হাঁড়িরাম,'না যুধা, তুই আমারে হাইসপাতালে নাই দিবিক। উখানে আমি বাইচব না রে—' বলতে বলতে কাশির দমকে ফেটে পড়ে হাঁড়িরাম।

বাবার কথা শুনে যুধিষ্ঠিরও চিন্তা করে, এই রাতে হাসপাতালে নিয়েই বা লাভ কী! ডাক্তার, নার্স কম্পাউণ্ডার— কাউকেই তো বান্দোয়ানের হাসপাতালে এখন পাওয়া যাবে না। একমাত্র পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালে নিতে পারলে হয়তো কিছুটা কাজ হতো। কিন্তু এই রাত্তিরে পুরুলিয়া যাবেই বা কী করে। পুরুলিয়া যাওয়ার শেষ বাস তো বেরিয়ে গেছে সেই বিকেল চারটেয়। এখন একমাত্র ভরসা শুধু বান্দোয়ানের অবিনাশ হোমিয়োপ্যাথ।

হাতিরামগোড়া থেকে বান্দোয়ান কম দূর নয়। প্রায় তিন-চার মাইল রাস্তা।

মুখিয়ার কাছ থেকে সাইকেলটা চেয়ে নিয়ে ও বেরিয়ে পড়ে। বান্দোয়ানের অবিনাশ হোমিয়োপ্যাথের কাছ থেকে কয়েকটা পুরিয়া নিয়ে যখন বাড়ি ফেরে যুধিষ্ঠির, তখন হাঁড়িরামের প্রায় শেষ অবস্থা।

গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে। কোটর থেকে চোখের মণির প্রায় বেরিয়ে আসার অবস্থা।

বৃদ্ধ হাঁড়িরাম শুধু একবার অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'জল—'

দরজায় দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠির দেখল, বাবার কাতর আর্তনাদ শুনেও পলাশী চুপচাপ ঠায় দাঁড়িয়ে।

যুধিষ্ঠির চেঁচিয়ে বলল, 'কি পলাশী! চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস যে! দে বাপকে জল দে—'

তবু পলাশী নিশ্চল স্থবির। নিজের জায়গায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই রইল। পলাশীর ঐ রকম ব্যবহারে যুধিষ্ঠিরের সমস্ত শরীর রাগে জ্বলে উঠল। হঠাৎ নিজের ডান হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে মারল পলাশীর দিকে। সেই লাঠি পলাশীর কপালে লাগামাত্র ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল পলাশী। জবাফুলের মতো টকটকে লাল রক্ত দেখে সম্বিত ফিরল যুধিষ্ঠিরের। ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটল জল আনতে।

কিন্তু রান্নাঘরে গিয়ে দেখে, মাটির হাঁড়ি ঠনঠন। একফোঁটা জলও নেই তাতে। যুধিষ্ঠির বুঝল, কেন তখন ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল পলাশী।

তক্ষুনি ছুটে ফিরে এল বাপের ঘরে। পলাশীর মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে যুধিষ্ঠির বলল, 'আমার পানে ভাইলে দ্যাখ। আমাকে তুই মাফ কইরে দে পলাশী। আমি বুঝতে পারি নাই—'

যুধিষ্ঠির দেখল, পলাশী ধীরে ধীরে চোখ মেলছে। ওদিকে বুড়ো হাঁড়িরাম কোনো রকমে উচ্চারণ করছে, 'টুকু জল—' কিন্তু যুধিষ্ঠির কী করবে, কী করতে পারে! ঘরে একফোঁটা জলও নেই যে বাবার মুখে তুলে দেয়। পাড়া-প্রতিবেশী কার ঘরেই বা জল চাইতে যাবে। সকলেরই এক অবস্থা। একমাত্র টোটকো নদীর জোড় থেকে জল আনা যেতে পারে। তাও যাওয়া-আসা নিয়ে ছ মাইল। অর্থাৎ প্রায় এক ঘণ্টার ধাক্কা। তবু জল তো আনতেই হবে এক্ষুনি।

ঘর থেকে বেরোতে যাবার আগেই যুধিষ্ঠিরের চোখে পড়ল, বাবার মাথাটা হঠাৎ একপাশে হেলে পড়ল। কী হল!

হাঁটু গেড়ে বসে বাবার ওপর ঝুঁকে পড়ল যুধিষ্ঠির। লণ্ঠনের অল্প আলোয় যুধিষ্ঠির দেখল, বাবার চোখটা বোজা। কিন্তু মুখে সেই যন্ত্রণার ছাপটা আর নেই। গলার ভেতর থেকে যে ঘড়ঘড় আওয়াজটা বেরিয়ে আসছিল, এখন তা একেবারে স্তব্ধ।

যুধিষ্ঠিরের মনে কেমন একটা সন্দেহ। নাকে হাত দিয়ে দেখল, নিঃশ্বাস পড়ছে না। তবে কি বাবা—

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল যুধিষ্ঠির, 'বাবা—'

যুধিষ্ঠিরের চড়া গলার আওয়াজে ধনু পর্যন্ত ভয় পেয়ে কেঁদে উঠল। আশেপাশের বাড়ি থেকে অনেকেই ছুটে এল ওর বাড়িতে। পলাশীও ততক্ষণে উঠে বসেছে।

ওর ঘরের ভেতরে তখন ছোটখাটো ভিড়। ফিসফাস শলাপরামর্শ। সহানুভূতি মেশানো কথাবার্তা। মানুষের আনাগোনা। সবকিছু মিলিয়ে কেমন অন্য রকম পরিবেশ। যুধিষ্ঠির হৃদয়ঙ্গম করল, বাবা আর বেঁচে নেই। চোখের জল মুছতে মুছতে যুধিষ্ঠির অনুভব করল, দুঃখ হচ্ছে। তবু ওরই মধ্যে নিজেকে হাল্কাও লাগছে।

গ্রামের সকলের পরামর্শে সে রাতে নয়, ভোর রাতে গ্রামের পাঁচ-ছ'জন জোয়ান ছোকরা মিলে হাঁড়িরামের মৃতদেহ নিয়ে রওনা হল টোটকোর শ্মশানঘাটের উদ্দেশে।

পুবের আকাশ হাল্কা ফিকে হতে হতে ভোর হচ্ছে। কাছে দূরের গ্রামগুলো সবই ঘুমে আচ্ছন্ন শুধু মাঝে মাঝে শ্মশানযাত্রীদের হরিবোলে সচকিত হয়ে উঠছে আশপাশ। ধূসর ক্ষেতগুলো শূন্য, ফসলহীন। এই ক্ষেতে ফসল ফলাবার জন্য কত পরিশ্রমই না করেছে হাঁড়িরাম। ফসল ফলিয়েছেও। এখন এই ফসলহীন শূন্য রুক্ষ প্রান্তরের ভেতর দিয়ে হাঁড়িরামের অনন্ত যাত্রা নিতান্তই আড়ম্বরহীন, সাদামাটা। শ্মশানঘাটে পাটকাঠি দিয়ে মুখাগ্নির পর আগুন দেওয়া হল হাঁড়িরামের মৃতদেহে। প্রচণ্ড খরায় শুকনো হয়ে আছে কাঠ। জ্বালানো মাত্রই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। ঘণ্টাখানেক জ্বলবার পর সব কাঠ শেষ।

কিন্তু হাঁড়িরামের শরীর পুরো পোড়ে নি, যদিও পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কিছু কাঠ কেনা দরকার।

গণেশ ডোম যুধিষ্ঠির কাচ্ছে মাথা চুলকোয়, 'আরো দশটাকা লাইগবেক রে।'

গণেশের কথায় যুধিষ্ঠির মনে মনে হিসেব করে, আর মাত্র দশটা টাকাই সম্বল। সপ্তাহের মজুরি পেতে আরো দুদিন বাকি। এখন দশটা টাকা খরচ করলে বাকি দুদিন তো উপোস করতে হবে।

হাঁড়িরামের আধপোড়া শরীরের দিকে খানিকক্ষণ নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যুধিষ্ঠির। তারপর বলে,'টাকা কুথায় পাব রে। মাপ কইরে দে গণেশ ভাই—'

আকাশে তখন অনেক শকুন। বারবার পাক খেয়ে নিচে নেমে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে গণেশ বলে,'ঠিক আছে। দু টাকাই দ্যে। বাকি কাজ শকুনেই কইরে দিবেক—'

শ্মশান থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে আটটা। বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ ঝিম মেরে বসে ছিল যুধিষ্ঠির। কাল রাতে ঘুম হয় নি। ক্লান্তিতে আজ আর শরীরটা নড়তে চাইছে না। কিন্তু ওকে আজ একবার অন্তত হাজির দিতেই হবে ড্রিলিং সাইটে। না গেলে পুরো টাকাটাই মার যাবে। কিছুক্ষণ থেকে তারপর না হয় গাঙ্গুলী সাহেবকে বলে আসলেই হবে। উনি যে ছুটি দেবেন, সে বিশ্বাস যুধিষ্ঠিরের আছে।

বেলা দশটা নাগাদ কুমীরডিহির ড্রিলিং ক্যাম্পে পৌঁছে যুধিষ্ঠির অবাক। ড্রিলিংয়ের কাজ চললেও চারিদিকে কেমন ঢিলেঢালা ভাব। খুশির আবহাওয়া, হালকা মেজাজ। সবাই বেশ হাসছে, গল্প করছে।

যুধিষ্ঠিরকে দেখে ছুটে এলো মুরলী। বলল,'ইখন বড় জবর খবর। ডিরলিংয়ের পাইপে জল বাইরছে। অনেক জল। গাঙ্গুলী সাহেব বড় খুশি। আজ রাইতে পার্টি হবেক ইখানে। বুইঝলি যুধিষ্ঠির—'

'সত্যি বইলছিস?'

'বিশাস কইরলি নাই! তবে শুন, গাঙ্গুলী সাহেব টাকা দিবেক। মুরগি হবেক, পরোটা হবেক, হাঁড়িয়া চইলবেক। যার যতয় খুশি খাও—' বলতে বলতে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠল মুরলী।

'কিন্তুক, আমার ইখন ত অশৌচ বটে!'

ড্রিলিংয়ের জায়গায় গিয়ে যুধিষ্ঠির দেখল, এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। পাথরের বুক ফেটে ড্রিলিংয়ের পাইপ বেয়ে উঠে আসছে জল। বন্যার প্লাবনের মতো। জ্যৈষ্ঠ মাসে এক সঙ্গে এত জলের ধারা আগে আর কখনো দেখেনি যুধিষ্ঠির। সেই বিশাল জলের ধারা পরম মমতায় ভিজিয়ে দিচ্ছে বহু যুগ ধরে শুকিয়ে-থাকা কুমীরডিহির রুক্ষ মাটি।

যুধিষ্ঠিরের চোখ ফেটে জল এল। ওর বাবা এত জল দেখে যেতে পারল না। কাঁধে হাত পড়তেই যুধিষ্ঠির দেখল, গাঙ্গুলী সাহেব। মাথায় খাঁকি টুপি। হাতে নোটবই আর পেনসিল।

'কি যুধিষ্ঠির! সকালে তো তোমাকে দেখি নি। কী ব্যাপার?'

যুধিষ্ঠিরের বাবা মারা যাওয়ার কথা শুনে বললেন, 'সত্যিই খুব দুঃখের কথা। কিন্তু কী করবে বলো। কারো বাবাই তো চিরদিন থাকে না—'

যুধিষ্ঠির চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'শোনো, আজ রাতে জল পাওয়া উপলক্ষে একটা পার্টি দিচ্ছি। কিন্তু তুমি কি আসতে পারবে? আর তোমরা সবাই খুব ভালো কাজ করেছ। সে জন্য সরকার তোমাদের সবাইকে একশো টাকা করে বোনাস দেবে—'

চিন্তিত গলায় বলে যুধিষ্ঠির, 'কিন্তুক বাবু, আমাদের কাজ?'

ড্রিলিং পাইপের মুখ দিয়ে বেরিয়ে-আসা প্রবহমান জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিকাশ গাঙ্গুলী বললেন, 'দেখো, জল বেরিয়ে গেছে। তাই আমাদেরও ছুটি এখন। পাইপ ফিট করবার কয়েকটা কাজ শুধু বাকি। তাতে দুয়েকটা দিন লাগবে। তারপরই আমরা সবাই ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়—'

বিকাশ গাঙ্গুলীর কথা শুনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত যুধিষ্ঠির। কিছুটা বিমর্ষ। কিন্তু জবাবে কী বলা যেতে পারে তা মনেই পড়ল না। শুধু মনে হল, এত তাড়াতাড়ি জল বেরোনোর কী প্রয়োজন ছিল। জল না পাওয়া গেলে চাকরিটা তো থাকত।

রাত্তিরে কুমীরডিহির ড্রিলিং ক্যাম্পে খাওয়া-দাওয়ার আসর বসল। বাবা মারা যাওয়ায় এখন অশৌচ চললেও যুধিষ্ঠির এসেছে। কিছু খাবে না, শুধু উপস্থিত থেকে দেখবে, পার্টির হালচাল, জৌলুস।

আসতে একটু দেরি হয়েছিল। এসে দেখল, কেবল ও ছাড়া আর সবাই এসে গেছে। ড্রিলিং পারটির কলকাতার কর্মীরা ছাড়াও এই অঞ্চলের প্রায় জনা পনেরো কর্মী। তাছাড়া বিকাশ গাঙ্গুলী তো আছেই।

খাবারের আয়োজন অঢেল। মুরগির ঝোল, গরম গরম পরোটা। তাছাড়া ওদের জন্য হাঁড়িয়ার বন্দোবস্তও রয়েছে।

ওকে দেখতে পেয়ে দূর থেকে ডাকল শ্রীপতি ও মুরলী। কাছে এসে শ্রীপতি বলল, 'অ্যাঁই যুধিষ্ঠির। থালা লিয়ে বইসে পড় ইখানে । গরম গরম পরোটা, মুরগির মাংস। বড় সুন্দর বানাইছে বটে। লে খা—'

'না ছিপতি। আমি খাতে লারব। বাপটা মইরেছে গতকাল। আমার অশৌচ চইলছে বটে—'

'বাপ মইরেছে, কি হইয়েছে। বাপ তো মইরবেই। কিন্তুক এত ভাল খাবার আর পাবিক লাই। লে, খায়ে লে। কিছু হবেক লাই। পুরুতকে একটা সিক্কা দিলেই হবেক—'

যুধিষ্ঠির একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল।

'ঠিক আছে, মুরগি না খাবি ত হাঁড়িয়া খাতে ত বাধা লাই বটে—'এই বলে শ্রীপতি এক গ্লাস হাঁড়িয়া এগিয়ে দেয় যুধিষ্ঠিরের দিকে।

ঢকঢক করে পুরো গ্লাসই শেষ করে ফেলে যুধিষ্ঠির। গলা দিয়ে নামতে নামতে সারা শরীরে জ্বালা ধরে যায়। মদের নেশায় দুলতে থাকে ওর শরীর। জ্বলজ্বল চোখে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে ও। চারিদিকে খোশ গল্প, খাওয়ার হুব-হাব শব্দ, কখনো বা দুয়েকটা হিন্দি গানের কলি—সব মিলিয়ে জমজমাট পরিবেশ।

এরই মধ্যে শ্রীপতি ও মুরলী উঠে এসে দুজনে মিলে হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের মুখে পুরে দেয় মুরগির আস্ত একটা ঠ্যাং।

'আরে কী কইরছিস কী কইরছিস—' বাধা দিতে চেষ্টা করে যুধিষ্ঠির। কিন্তু শ্রীপতি মুরলীকে আটকানো মুশকিল। মুহূর্তের জন্য একটা পাপবোধ ধাক্কা দেয় যুধিষ্ঠিরকে। কিন্তু এত সুন্দর সুস্বাদু খাবার বহুদিন ও খায় নি। তাই ক্ষণিকের মধ্যেই যুধিষ্ঠিরের দাঁত ও জিভ সক্রিয় হয়ে ওঠে। একটু পরেই কে যেন একটা প্লেটে সাজিয়ে দেয় গোটা চারেক পরোটা। সঙ্গে অনেকটা মুরগির মাংস।

পরোটা মাংসের সঙ্গে হাঁড়িয়াও চলতে থাকে যুধিষ্ঠিরের। বহুদিনের বুভুক্ষার পর আজ ওকে যেন খাওয়ার নেশায় পেয়ে গেছে। হঠাৎ কী যে হয়! আকাশের দিকে হাত দুটো জোড়া করে যুধিষ্ঠির বলে ওঠে, 'হেই বাপ. ইবারের মত মাপ কইরে দে। তুই জল না খায়ে মইরেছিস। এখন জল বাইরেছে। অনেক জল। আমরা খাঁয়েও শেষ কইরতে পারবক নাই। খাবার নাই, কাজ নাই, কিন্তুক জল আছে। আনন্দ কইরতে হবেক না! হেই বাপ, ক্ষমা কইরে দে ইবারের মত—'

হঠাৎ সেই মুহূর্তে চারিদিক যেন নিস্তব্ধ হয়ে যায়। শুধু শুনতে পাওয়া যায় ড্রিলিং পাইপের মুখ দিয়ে বেরিয়ে-আসা জলের একটানা কলরোল। এক অস্ফুট সঙ্গীতের মতো। কিন্তু যুধিষ্ঠির মনে হয়, আকাশ-বাতাস পেরিয়ে যেন ভেসে আসছে জলের জন্য বুড়ো হাঁড়িরামের অবিরত ক্রন্দন। সেই কান্নার শব্দটা বুকের মধ্যে একটা জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। যুধিষ্ঠিরের বুকের মধ্যে বড় কষ্ট বড় যন্ত্রণা বড় বেদনা। সেই যন্ত্রণাটা চাপা দিতেই ও যেন আবার হাঁড়িয়ার গ্লাসটা উপুড় করে দেয় নিজের মুখে।

সাদা পায়রা

সমীর রক্ষিত

ম্যাজিসিয়ান হাতের তালুতে কষে খৈনী ডলছে। তার পরনে হাতকাটা গেঞ্জি আর নীলচে বিবর্ণ তাঁতের লুঙ্গি। ম্যাজিসিয়ানের এরকম দেখতে ঠিক স্বাভাবিক লাগে না। বস্তুতঃ ম্যাজিসিয়ান পরিমল একটা গলাবন্ধ লম্বা কোট আর সাদা চুস্ত পরে যখন ম্যাজিক দেখায়, তখন আর মাথায় থাকে রাজকীয় মুকুট, হাতে যাদুদণ্ড ; চালচলনে তার কথার তুবড়ি ফোটানোর ভঙ্গিতে সে তখন যথার্থই রাজার মত স্মার্ট কিম্বা তারও চেয়ে বেশী, অনেকটা অবতারের মত। সে তখন যা-খুশী-তাই করতে পারে। তার হাতের তুকে জ্যান্ত পায়রা ডিম হয়ে যায়। এবং ডিমটা সে টেনে বের করে ডেকে স্টেজে তোলা কোন বালকের পেট থেকে। পরমুহূর্তেই ডিমটা ফের পায়রা হয়ে ডানা ঝাপটায় দুমুখ-খোলা টিনের ভেতরে। যেন সমস্ত পৃথিবী তখন ম্যাজিসিয়ানের আজ্ঞাধীন।

এমন যার অলৌকিক ক্ষমতা, সে হোটেলের বারান্দায় বসে হব-হব সন্ধ্যায় খৈনী টিপছে।

আর তখনই আরেক পশলা গোঁয়ার বৃষ্টি ঝেঁপে আসে, যেন দূর থেকে ঝাঁক ঝাঁক পঙ্গপাল ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে টিনের চালে। এমনি চলছে দিনকয়েক...ঝরছে, থামছে, ফের ঝরছে। আকাশের মুখটা হাঁড়িপানা।

বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে তারক বলে—'পরীবাবু ম্যাজিক দিয়ে বৃষ্টিটা বন্ধ করে দিতে পারেন না?'

প্রথম যেদিন ম্যাজিসিয়ান এল, তারক খুব পেছনে লেগেছিল—'ম্যাজিক; কী ম্যাজিক দেখান আপনি? ভোজবাজি? ভানুমতীর খেল?'

পরিমল পায়ের কাছ থেকে একটা খোয়া তুলে এগিয়ে দিয়ে বলেছিল—'নিন খান, কলকাতার ভীম নাগের সন্দেশ।'

তারক স্পষ্ট দেখল একটা নিটোল লোভনীয় সন্দেশ, তবু হাতে নিয়ে দ্বিধা করছিল। ম্যাজিসিয়ান তার চোখের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়েছিল—'খান। খেয়ে ফেলুন।'

তারক মোহাবিষ্টের মত খোয়া চিবুতে সুরু করেছিল। পাশে বসে হোটেল মালিক শৈলেন হাততালি দিয়ে উঠেছিল।

ফলে তারক আর তাকে খুব এলেবেলে ম্যাজিসিয়ান বলে উড়িয়ে দিতে পারে না।

'এই শালা পচাবিষ্টি মাইরি জ্বালাচ্ছে, দিন না বন্ধ করে? কী পরীবাবু?'

খৈনী মুখে পুরে বুদ হয়ে বসে আছে ম্যাজিসিয়ান। তারক তার কাঁধে হাত রাখে। মুখ ফিরিয়ে তাকায় পরিমল, তারক একটু থমকায়। হিপ্নোটাইজ করা চোখ নয়, মাছের চোখের মত, লালচে কাঁচের ডেলার মত নির্বোধ দুচোখ।

'কী দাদা, কী হল? মনটন খারাপ নাকি? বৌদির চিঠি এসেছে বুঝি আজ?'

ম্যাজিসিয়ান দেয়ালে মাথা হেলিয়ে দেয়, তার মুখটা হাড়উঁচু বড়সড়, চুলগুলিতে পাক ধরছে, গালও ভাঙা কিন্তু চোখদুটি কোটরগত হলেও টানা টানা বড়—স্বপ্নে দেখা চোখের মত বিষণ্ন।

ম্যাজিসিয়ান চাপা হাসি হেসে বলে—'মনটাকে তারকবাবু তুক করে দিয়েছি, এখন ওটা ঐ ফুলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।' —হাত টান করে বারান্দার বাইরে সুপুরী গাছের গোড়ায় লাল কলাবতী ফুল দেখায় সে।

ম্যাজিসিয়ানের ব্যাপার, তারক আধা-বিশ্বাসে ফুলের দিকে তাকায়। বৃষ্টিতে ভিজছে, টপ টপ করে জল ঝরছে হাওয়া-নাড়া ফুল থেকে, ঠিক জলে-ভেজা মানুষের চোখের মত। ফুলটা দেখে তারকের স্থির বিশ্বাস জন্মে যায়—ম্যাজিসিয়ানের আজ মন ভাল নেই।

আজ পরিমলের মনটা যথার্থই খারাপ। মোহিতনগর স্কুলে খেলা দেখাতে গিয়েছিল আজ সে।

হেডমাস্টার গতকাল তাকে প্রায় হাঁকিয়েই দিয়েছিল—'ছেলেরা না খেয়ে স্কুলে আসে, মুখ দেখলে বুঝতে পারি মশাই, ম্যাজিক দেখার পয়সা চাইতে পারব না।'

অনেক বলা-কওয়ার পরে দশটা করে পয়সা আনার জন্য ছেলেদেরকে বলেছিল শেষ পর্যন্ত হেডমাস্টার, কিন্তু দুচারজন ছাড়া কেউ আনেনি। বৃষ্টি ছিল; ছাত্রদের বেশীর ভাগ আসেনি। শেষ পর্যন্ত হেড-মাস্টার নিজের পকেট থেকে দশটি টাকা দিয়েছে।

আগে একটা স্কুলে কম করেও চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা হত।

'আপনাদের নর্থ বেঙ্গলের বৃষ্টির মা-বাপ নেই মশাই, যখন খুশী তখন নামে।' —পরিমল বৃষ্টির দিকে চোখ রেখে বলে।

'এবার লেটে নামল, কিন্তু দাপটখানা দেখুন, তিন দিনেই বন্যা, মণ্ডলঘাট ভেসে গেছে—বার্নেশ ঘাট, দোমোহিনীর অবস্থাও খুব খারাপ। আপনাকে বললাম ম্যাজিকের বাণ মারুন—'

উদাস গলায় পরিমল বলে—'ম্যাজিক ফ্যাজিকে আর চলছে না মশাই। পুরুলিয়া বাঁকুড়া গেলাম, সেখানে খরা আর এখানে বন্যা। দেশে গাঁয়ের কী হাল হয়েছে। আগে একেকটা শোতে নাই নাই করেও চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা উঠত, এখন ইস্কুলটিস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়, বলে—ম্যাজিক দেখাতে চাও দেখাও কিন্তু বাপু, পয়সা ফয়সার কথা বলো না।'

'পেটে ভাত জোটে না পয়সা দেবেই বা কোত্থেকে বলুন? আপনারা কলকাতার লোক, তাও র‍্যাশনটা পান ঠিক ঠিক মত, আমাদের তো না র‍্যাশন, না খোলাবাজার। সাড়ে চার চালের কেজি, আটা আড়াই।' —বলে নিভে-যাওয়া বিড়ি বৃষ্টির জলে ছুঁড়ে ফেলে তারক।

'সব জেলাতেই এক অবস্থা। আমি তো সারা বাংলা দেশ চষে বেড়াচ্ছি।'—ম্যাজিসিয়ান আনমনে বলে উদাস গলায়।

হোটেলের ভেতর-বারান্দা থেকে পায়রার বকবকম আর ডানা ঝাপটানোর শব্দ ওঠে, বৃষ্টি পড়ার পর থেকেই শব্দটা আসছে, অথচ তারক অবাক হয়ে লক্ষ করে ম্যাজিসিয়ান কোন গা করছে না।

এতদিন সে দেখছে পায়রাগুলোর একটু শব্দ হলেই ম্যাজিসিয়ান ছুটে গেছে, বলেছে—

'শালা একটা হুলো পেছনে লেগেছে বুঝলেন?'

তারক বলে—'আপনার পায়রাগুলো বোধ হয় ভিজে যাচ্ছে ম্যাজিসিয়ান।'

'ভিজুক, আর ভাল্লাগে না শালা পায়রাবাজি।' ম্যাজিসিয়ানের কথা শুনে শৈলেন হেসে ওঠে।

'কী হল ম্যাজিকবাবু! পায়রার ওপর এত রাগ?'—শৈলেন হোটেলের ভেতর থেকে বোধহয় রাতের রান্নার তদারকি করে ফেরে, ম্যাজিসিয়ানকে বলে—'আপনি

ব্যানার্জি সাহেবের মত ম্যাজিক সুরু করুন, দেখবেন খেলা কীরকম জমে।' —শৈলেন অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

তারকের দুচোখ ফুলের ওপরে বসা প্রজাপতির মত রঙ্গিন হয়ে ওঠে। বলে—'সুরু হয়ে গেছে?'

'আমার হোটেলে শালা পুলিশের ফুলিশের হুজুং হবে মাইরি, ব্যানার্জি আমাকে সুদ্দু ডোবাবে। মেয়েটাও তেমনি—ছেনালি সুরু করেছে—' শৈলেন পানমুখে দোক্তা ফেলে।

'কাজ বাজে হচ্ছে নাকি শৈলেন? একটু দেখে আসব?'—তারক উঠে পড়ে উত্তেজিতভাবে।

পানের রসে ভরা মুখে শৈলেন বলে, 'জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম মেয়েটা চিৎ হয়ে শুয়ে ছেনালের মত হাসছে আর ব্যানার্জি প্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরছে—'

'মাইরি, তার মানে এখন আসল কাজ হবে, আমি যাচ্ছি তাই—একটু চোখ জুড়িয়ে আসি।'—তারক প্রায় লাফ মারে।

শৈলেন কড়া ধমক দেয়—'রোস ব্যাটা, ব্যানার্জি শালা অত বোকা নাকি? দরজা জানালা বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে দেয়।'

তারক মুখ শুকনো করে বসে পড়ে। প্রথমতঃ শৈলেন তার বন্ধু হলেও হোটেলের মালিক, তার অমতে সে গিয়ে আড়ি পাততে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তারক যে চা-বাগানে টাইপিষ্টের কাজ করত, যে বাগানটা পনের দিন আগে বন্ধ হয়ে গেছে। বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে দাদার ঘাড়ে এসে চেপেছে তারক। পারতপক্ষে বাড়ি যায় না। শৈলেনকে তোয়াজ করে সারাদিন যদি কোন এক বেলা খাবারটা জুটে যায় হোটেলে। ফলে সে বসে ফের একটা বিড়ি ধরায়। কিন্তু তার মনটা পড়ে থাকে ব্যানার্জির ঘরে।

'ব্যানার্জির এলেম আছে এটা তোকে মানতেই হবে শৈলেন, মালটা কিন্তু ভাল পাটিয়েছে'—তারক দু ঠোঁটে বিড়িতে কড়া চাপ দিয়ে ধোঁয়া টানে।

'বিকাশ ডাক্তার যদি টের পায় না ব্যানার্জিকে হাজতে পুরবে।' —উঠে গিয়ে একমুখ লাল থুথু ফেলে শৈলেন বৃষ্টির মধ্যে। শুকনো মুখে বলে—'আমি বুঝি না, এত বড় একটা ডাক্তারের মেয়ে এরকম চট করে পটে যায় কী করে?'

'কেন?'—তারক সোজা হয়ে বসে, বলে—'কেন ব্যানার্জি ছেলেটা খারাপ কিসে? হিরোর মত ফার্স্ট ক্লাস চেহারা। তার ওপর বড় কোম্পানীর রিপ্রেজেনটেটিভ—পকেটভর্তি টাকা। আজকাল আসল জিনিসই তো অই বাবা, টাকা। টাকা থাকলে তুই যা খুশী তাই করতে পারিস।'

ফ্যা ফ্যা করে হাসে তারক, ম্যাজিসিয়ানকে আঙুলে খোঁচা দিয়ে বলে—'কী ম্যাজিকদা, ঠিক বলিনি?'

ম্যাজিসিয়ান লাল কলাবতী ফুলে জলপড়া দেখছিল, শুনছিল সব; এবার মুখ ঘোরায়। খৈনীর নেশায় বুদ চোখে তাকিয়ে বলে—'শুধু টাকা না, মেয়েরা গুণীলোকদের পছন্দ করে।'

'বাজে কথা, মেয়েরা ওসব গুণফুনের ধার ধারে না।'—তারক খেঁকিয়ে ওঠে।

শৈলেনের মুখে ফের লালা জমে উঠছে, সে নীচের ঠোঁট সামান্য উঁচিয়ে বলে, 'ম্যাজিসিয়ান খুব বেঠিক কথা বলেনি। তবে কী জানো ম্যাজিসিয়ান, শুধু গুণফুনও কিছু না, যদি ট্যাকে তোমার মাল না থাকে।'

কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল ম্যাজিসিয়ান কিন্তু থমকে যায়। কথাটি বলে না। শান্তির কথা মনে পড়ে।

আসলে এতক্ষণ সে শান্তির কথাই ভাবছিল। সেই তরুণী শান্তির কথা—কতকালের কথা। তবু মনে হয় এই তো গতকাল যেন ঘটে গেছে সব। পঁচিশটা বছর এর মধ্যে কখন হাতের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গেছে টের পাওয়া গেল না।'

পঁচিশ বছর আগে—তখন তার নিজের বয়েস কুড়ি-একুশ, ভরা যৌবন শরীরে, আর শান্তি পনের-ষোল বছরের তরুণী। সদ্য সদ্য যৌবনের সবুজ জমিতে পা দিয়েছে শান্তি। সারা শরীরে কুঁড়ি ফুটিয়ে পাপড়ি ছড়াবার জৌলুশ, কথায় আর চোখের ধারে যেন সৌরভ ছড়ায়। বিষ্ণুপুরের এক গাঁয়ের হেডমাষ্টারের বাড়িতে থেকে ইস্কুলে-ইস্কুলে ম্যাজিক দেখাচ্ছে পরিমল। তার হিপ্নোটিজম্-শেখা চোখের দিকে চোখ রেখে পাগল হয়ে গেল সেই সদ্যযুবতী মেয়ে শান্তি।

সে বছর নয়, তার পরের বছর আবার গেল পরিমল খেলা দেখাতে। কিন্তু সব খেলা দেখানো শেষ করার আগেই নিজে এক মাতাল-করা খেলায় ডুবে গেল। শান্তি ঘর ছেড়ে চলে এল গভীর রাতে তার হাত ধরে।

সেদিন কুয়াশাভরা গভীর শীতের রাতে, ফসলে উপচে-পড়া ক্ষেতের আলপথ ধরে দুজনে হোঁচট খেতে খেতেও মনে হয়েছিল এ-পৃথিবী বড় শান্তিময়—প্রেমের সুঘ্রাণে উত্তেজিত। আকাশময় অজস্র তারার চোখ জ্বলছিল সে-রাতে মিটমিট করে।

পরিমলের মনে হয়েছিল পৃথিবী নয়—সে ঘুমের মধ্যে স্বর্গের স্বপ্ন দেখছে। সে যেন সমস্ত পৃথিবীটাকে হিপ্নোটাইজ করে দিয়েছে। পরিমলের বুকজুড়ে তখন শুধু স্বপ্ন, সে আর গ্রাম শহরের ইস্কুলে নয় কিম্বা কলকাতার ফুটপাতে নয়, বড় বড় হলে শো দেখাবে, শুধু কলকাতা বম্বে না, যাবে ফ্রান্স ইংল্যান্ড আমেরিকা জাপানে। পি-সি-সরকার হবে সে। শান্তি তার খইফোটা ঠোঁটে চারবেলা চুমু খেত।

পঁচিশ বছরে স্বপ্নের সন্দেশ এখন খোয়া হয়ে পায়ের তলায় ফুটছে অহরহ। চোখ বেঁধে ছোঁড়া তীর এখন নিজের বুককে বিদ্ধ করছে। দিবানিশি টুপটাপ করে রক্ত ঝরে যাচ্ছে ফোঁটায় ফোঁটায়, কেউ দেখে না, কেউ জানে না, শুধু সে জানে। পরিমলের অন্তরটা জানে শুধু।

টালিগঞ্জের হরিপদ দত্ত লেনের খোলার চালের ঘরে দিনরাত শান্তির সঙ্গে তার অশান্তি হয়। চল্লিশ বছরের নয়, যেন ষাট বছরের বুড়ি এখন শান্তি। প্রতিমুহূর্তে গঞ্জনা দেয়, দাঁতমুখ খিঁচোয়, অভিসম্পাত দেয়।

'কী ম্যাজিক, এমন বেগুনবেচো মুখ কেন?' —শৈলেন কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে—'ব্যানার্জির প্রেমলীলা দেখবে নাকি চলো। কাঠের দেয়ালে ফুটো আছে—যুযুৎসু দেখবে ওঠ।' —জর্দার ঝাঁঝালো গন্ধ ভুরভুর করে জলো বাতাসে।

খৈনীর নেশাটা আজ বড় জাঁকিয়ে এসেছে, মাথার ভেতরে রক্তস্রোত বনবন করে ছুটে বেড়ায়। বুকের মধ্যে কলজেটা পাথরের মত ভারী হয় ঝুলে থাকে।

দুহাতে নিজের উরু দশ আঙুলে খামচে ধরে তারক বলে চিবিয়ে চিবিয়ে—গভর্মেন্ট যদি বাগানটা ন্যাশনালাইজ' করে নেয়, আবার যদি চাকরীটা ফিরে পাই না শৈলেন, দেখিস সালা, লাইফটা আবার নতুন করে স্টার্ট দেব, যা পাব হাতের কাছে সারা শরীরে চেখে দেখব।'—বলে নিজের শুকনো দুঠোঁটই চাটে তারক। তার চোখ-মুখ টসটসে। টান টান শিরা পেশী।

মেঘের থেকে বিদ্যুৎ-ঝলকে বজ্র লাফ মারে মাটিতে, মাটি কেঁপে ওঠে। হা-হা শব্দে হাওয়া ছোটে চারিদিকে এলোমেলো রক্তমুখ পিশাচের মত। তোড়ে বৃষ্টি পড়ে গলগলিয়ে, যেন আকাশ এখন বুকফাটা।

'অই আনন্দেই থাক, নিয়েছে তোমার বাগান! হাতের মোয়া।' —শৈলেন আবার একখিলি পান ছোট্ট টিনের বাক্স থেকে সোজা মুখে পোরে।

'কেন নেবে না, আমরা কী সালা বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি? চিরকাল বেকার বসে থাকব নুলো হয়ে?' —তারক রেগে উঠতে যায় কিন্তু সাহস করে না। তার গলার স্বর ফেঁসে যায়।

'এমনি এমনি নেবে নাকি? আপনারা আন্দোলন-টান্দোলন কিছু করছেন না?' পরিমল নেশা ভেঙে গাঝাড়া দিয়ে বলে। আড়মোড়া ভাঙে। ভেতরে কলজেটা নড়বড় করে।

তারক বলে—'করছে, মজুররা করছে।'

'আপনি কী করছেন? ঠুঁটো জগন্নাথ?' —পরিমল হিপ্নোটাইজ-করা চোখ দুটো পরিপূর্ণ খুলে তারকের দিকে তাকায়।

সহসা তারক আঁতকে ওঠে। কোন কথা বলতে পারে না। ভয়-ভয় মুখটা তার কাঁচুমাচু হয়ে যায়। আর তখন ম্যাজিসিয়ান চোখ সরিয়ে নিয়ে জলেভেজা কলাবতী ফুল দেখে। হাওয়ার নাড়া খেয়ে কাত হচ্ছে। জল গড়াচ্ছে লালপাপড়ির ওপরে সাদা মুক্তোবিন্দুর মত।

ঠুঁটো জগন্নাথ কথাটা পরিমলের ছেলে তাপসের কথা। পরিমলকে শুনতে হত হামেশা ছেলের মুখে। কুড়ি বছুরে ছেলে, বুকের পাটা চওড়া, সে বয়সে পরিমলের যেমন স্বপ্ন ছিল, তারও চেয়ে ধারালো স্বপ্ন দেখে ছেলেটা। দেশের সবার ভাবনা যেন ওর মাথায়। সবার খাওয়া-পরা স্বাস্থ্য নিয়ে ওর ভাবনা। কবে সবাই মানুষের মত বাঁচবে। নতুন করে জীবন সুরু করবে। আর ঠিক এজন্যই বনে না বাপের সঙ্গে। খিটিমিটি লাগে, যুদ্ধও বলা যায়। পরিমলের ইচ্ছে ছেলে চাকরী করুক। ছেলে বলে—চাকরি আমি একটা না হয় পেলাম, তারপর সারাজীবন নেই-নেই খাই-খাই। আর যেখানে লাখ লাখ বেকার, সেখানে একা একটা চাকরি পাওয়া যেন হায়েনার ছাগলছানা শিকারের মত নিষ্ঠুরতা। সে বস্তির হা-ভাতে হা-ঘর লোকজনদের নিয়ে মিছিল করত, দাবী করত, দাবী তুলত। দিনরাত স্বপ্নের ঘোরে ফিরত ছেলে। ডাকাবুকো ছেলেটা নাকি সমাজ পাল্টাবে। এখন সে জেলে। দু বছর।

একদিনও গিয়ে দেখে আসেনি সে ছেলেকে। শান্তি যেতে চেয়েছে। শান্তির সঙ্গে তুমুল খিস্তিখেউর ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে। পরিমলের জেদ কি নিজের ছেলের চেয়ে একবিন্দু কম? শান্তির চোখের জলে কি পরিমল গলে যাবে? সেদিন আর নেই, যখন একজনের আবদার রক্ষার জন্য আরেকজন সব কষ্ট স্বীকার যেত, সে টান নেই, মায়া নেই, সে প্রেম নেই; এখন কারো কিছু এসে যায় না, কারো চোখের জলে কারো মন ভেজে না; উল্টে খাঁ খাঁ করে বুক। আগুন জ্বলে রক্তের মধ্যে। মুখের কথা বিষ হয়ে ঝরে পড়ে।

বৃষ্টির ওপর বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে পড়ে, হাওয়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাওয়া, অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠে আলকাতরার মত; ঝলসানো আঁকাবাঁকা বিজলী মুখে নিয়ে অন্ধকার মেঘ দাপিয়ে বেড়ায় সারা আকাশ।

'একী দুর্যোগ করলে রে বাবা!' বলে শৈলেন ডানহাত দিয়ে সুইচ টিপে দেয়, বারান্দার আলো জ্বলে ওঠে।

চোখে আলো সূচের মত বেঁধে, ম্যাজিসিয়ান যন্ত্রণায় চোখ বোজে। দূরে কোথাও একটা গরু হামলাচ্ছে, কুকুর ডাকছে আকাশে মুখ তুলে।

তারক যেন আপনমনে অনেক দূর থেকে বলে—'এবারও দেখবি শৈলেন, সেবারের মত দারুণ বন্যা হবে, লোকজন গরুবাছুর অনেক মরবে। সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা হবে।'

'রাখ শালা তোর যত ভয়দেখানো কথা!' —শৈলেন ধমকায়, তারও ভয়পাওয়া মুখ।

আর ঠিক এসময় ভেতর-বারান্দা থেকে আর্ত বকবকম আর সন্ত্রস্ত ডানা ঝাপটানোর শব্দ ওঠে। ম্যাজিসিয়ান উঠে পড়ে, ভেতরে চলে আসে। যতটা না প্রাণের টানে, তারও চেয়ে বেশী অভ্যাসবশে।

দুদিকে তারের জাল আর চারদিক-বন্ধ প্যাকিংবাক্স বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যাচ্ছে। তাকে দেখেই জলেভেজা পায়রাগুলো গোল গোল চোখে চায়, গ্রীবা বাঁকায়। নিঃশব্দ ভঙ্গিতে যেন অভিমান ফুটে ওঠে,—'এতক্ষণ থেকে ডাকছি শুনতে পাও না? ভিজে যাচ্ছি আমরা।' যেন এরকম কথা ওরা পরিমলের দিকে চেয়ে বলে। আজ আর পরিমল জালের ভেতর দিয়ে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয় না, ওরাও আঙ্গুলে চুমু খাবার ভঙ্গিতে ঠোঁটে ঠোকরায় না, অন্যদিনের মত পরিমল ওদের বকাঝকাও করে না—'কীরে, একমুহূর্ত আমাকে শান্তিতে কোথাও বসতে দিবি না? বসেছি কি অমনি তোদের ডাকাডাকি সুরু হয়ে যায়? আমি কি তোদের কেনা গোলাম?' সাদা পায়রা দুটো জালের ভেতর দিয়ে ঠোঁট বাইরে বের করে দেয়। যেন বলে—'কই তোমার আঙ্গুল কই?' খাঁচাটাকে আলতো করে ধরে ঘরে আনে পরিমল। ফাঁক পেয়ে সাদা পায়রা দুটো তার গালে ঠোঁট ঘষে। আরো দুটো ছাইরঙের ছিট ছিট পায়রা আছে। ওরা বেশী এগোয় না। সাদা দুটোর আদর-আবদার বেশী; বেশী ন্যাওটা।

ওদের দিয়েই খেলা শেষ করে পরিমল। কালো চাদর শূন্যে ছড়িয়ে দেয় পরিমল জঞ্জালফেলার ভঙ্গিতে। কোথাও কিছু নেই কিন্তু সেই বস্তুহীন শূন্য থেকে চাদর যখন নেমে আসে, তখন তার ভেতর থেকে বের করে আনে ধবধবে দুটি সাদা পায়রা। তারপর দুহাতে দুটিকে ধরে নিজ সন্তানের গালে চুমু খাবার মত করে চুমু খায়—দর্শকের দিকে হিপ্নোটাইজ-করা চোখে তাকিয়ে বলে—'শান্তি আর মৈত্রীর দূত, আমাদের ভারত-আত্মার প্রতীক।

আধো-আলো আধো-অন্ধকারে মহাশূন্যে দু হাত উৎক্ষিপ্ত করে দেয় ম্যাজিসিয়ান, প্রথমে কিছুক্ষণ পায়রা অদৃশ্য হয়ে যায়, তারপর শান্তির মন্ত্র উচ্চারণ করে সে, তখন অকস্মাৎ শূন্যে আবির্ভূত হয় শান্তি আর মৈত্রীর দুই দূত সাদা পায়রা, দর্শকদের মাথার ওপরে ব্যালেনৃত্যের ভঙ্গিতে উড়ে যায়। ম্যাজিসিয়ান দুহাত ছড়িয়ে ভারতবর্ষের ম্যাপের আকারে দাঁড়িয়ে থাকে। পায়রাগুলো এরপর শূন্য থেকে টাল খেয়ে সাঁ করে নেমে আসে, বসে পড়ে ম্যাজিসিয়ানের দুকাঁধে দু দিকে। নতমস্তকে দু হাত কপালের কাছে এনে দর্শকদের অভিবাদন করে ম্যাজিসিয়ান। আর তখন হাততালির উল্লাসের তরঙ্গ বয়ে যায় তার শরীরের ওপর দিয়ে সমুদ্রের মত।

ওরা ঠোঁট দিয়ে জাল কামড়ে ধরে ঝুলে থাকে। আজ ছাতুটাতুও বিকেলে দেয়নি পরিমল। ওদের খিদে টের পায় পরিমল ওদের মুখ দেখে। তর্জনী ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে পরিমল—ওরা চুমু খাওয়ার ভঙ্গিতে ঠোঁট ঘষে। পরিমল ধমক দিয়ে বলে—'ঠুকরে দে, ঠুকরে খা দেখি আঙ্গুলটাকে।' ওরা অবাক হয়ে গ্রীবা বাঁকায়।

শান্তির মুখ মনে পড়ে পরিমলের। এসেই টাকা পাঠাবার কথা ছিল। কড়া চিঠি এসেছে আজ। একটা বৌকে পোষার মুরোদ নেই, অত ঢং করে তার জীবনটা নিয়ে কেন ম্যাজিক খেলেছিল সে?

গাছ নাড়লে টাকা আসে? যারা দেবার তাদের ট্যাঁক ফাঁকা হলে সে কী করবে? টাকা বানাবে? নানান ভাবনা ভাবে, কিন্তু সঠিক কিছু ভেবে পায় না পরিমল। তার হোটেল খরচ আর ফিরে যাবার টাকারই এখন টান। কিছু যা আছে তাতে কী হবে? দু আঙ্গুল ঢুকিয়ে পায়রার ঠোঁট সাঁড়াশীর মত চেপে ধরে পরিমল। পায়রাটা ডানা ঝাপটায়, অতর্কিতে তীক্ষ্ণ নখে আঁচড়ে দেয় পরিমলের হাত। সাদা আঁচড়ের দাগে কলাবতী ফুলের রঙের রক্তবিন্দু ফোটে। শেষ যেটুকু ছাতু ছিল এনে দেয় পরিমল রক্তাক্ত হাতে। চিনচিন করে জ্বলে যায় বুকের ভেতরটা। কেউ দেখে না, কেউ জানে না—অথচ সেখানে আরো কত রক্ত।

চড়াৎ করে মেঘ থেকে বাজ লাফিয়ে পড়ে মাটিতে, ভিতসুদ্ধ কাঁপিয়ে দেয়। শরীর ফুঁড়ে যেন বিজলি ছুটে যায় মাটিতে।

মেঝে কাঁপিয়ে ব্যানার্জি দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। লুঙ্গির ওপরে পায়ের ডিম অবধি লম্বা চকচকে নাইট গাউনে তার রক্তমাংসের শরীর ঢাকা।

'শৈলেনবাবু, রাত্রে দু প্লেট মুরগীর মাংস চাই। যা ফাইন ওয়েদার করেছে।' ছ ফুটি শরীরে, তার দু চোখ নেশাচ্ছন্ন।

'মুরগী? এই ঝড়বৃষ্টিতে এখন আমি মুরগী পাব কোত্থেকে?' শৈলেন হেসে অসহায়তা ফোটায় মুখে।

'আমি মশাই ক্যাশ পেমেন্ট করব। দেখুন না কাউকে পাঠিয়ে টাঠিয়ে যদি—'

'আমি একবার ঘুরে আসতে পারি শৈলেন'—তারক চকচকে চোখে তাকায়।

'তুই যাবি?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকায় শৈলেন—'গিয়ে কী ফয়দা? এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তোর জন্য মুরগীর দোকান খোলা রেখেছে?'

'প্লিজ শৈলেনবাবু। ম্যানেজ ইট সামহাউ। ওয়েদারটা দেখছেন না?'—বলে ব্যানার্জি নাইট গাউনের পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে।

পায়রার চেয়েও লম্বা গলা উঁচিয়ে ঝুঁকে পড়ে ম্যাজিসিয়ান। বলে—'আমি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

তিন জোড়া চোখ তার ঢাউস মুখে এসে আঠার মত আটকে যায়।

নিজের মুখের থুথু নিজে গিলে ম্যাজিসিয়ান বলে—'আপনি কুড়ি টাকা দিয়ে আমার চারটে পায়রা কিনে নিন, ব্যানার্জি সাহেব, পায়রার মাংস বেশ'—

'পায়রা? বিউটিফুল। খুব টেস্টি।' —ব্যানার্জি দুহাত এগিয়ে দেয় ম্যাজিসিয়ানের দিকে, যেন তার প্রাণ বাঁচিয়েছে সে। দুটো দশ টাকার নোট তুলে দেয় ম্যাজিসিয়ানের রক্তাক্ত হাতে।

শৈলেন তারক প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে—'সে কী ম্যাজিক, তুমি তোমার পায়রা বেচে দিচ্ছ?'

ম্যাজিসিয়ান হাসে, দুঠোঁট পায়রার মত লম্বা করে বলে— 'টাকার দরকার। আপনার হোটেলের বিলও তো মেটাতে হবে।'

'তাই বলে—।' শৈলেনের গলায় পানের রস আটকে যায়। অন্ধকারে কলাবতী ফুল জলে ভেজে।

শক্ত মুঠোয় টুঁটি চেপে ধরে ঝটাং টানে যখন সাদা পায়রার গলা ছেঁড়া হয়, তখন তাদের সাদা এবং ছাই রঙের পালক ফিনকি দিয়ে ছড়ানো রক্তে ভিজে যায়। চকচকে জলেভেজা মেঝেয় রক্তের ধারা গড়িয়ে যায়।

অদূরে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ তৃষ্ণার্ত চোখে তাকিয়ে দেখে ম্যাজিসিয়ান। বুকের ভেতরটা চিনচিন করে। শান্তির কথা ফুট্‌কুরি কাটে বুকের মধ্যে? সে ভাবে, এবার ফিরে গিয়ে শান্তিকে নিয়ে সে জেলে ছেলেকে দেখতে যাবে, যেমন করে গভীর এক কুয়াশাময় শীতের রাতে ফসলেভরা ক্ষেতের পাশে আল ভেঙে ভেঙে শান্তিকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে সে হেঁটেছিল, অবিকল তেমনি করে সে শান্তিকে নিয়ে ফাটক-বন্দী ছেলেকে দেখতে যাবে।

পতঙ্গ-বাসনা

নৃপেন্দ্রনাথ মহন্ত

নির্মেঘ আকাশ। রোদে সেঁকা গরম বাতাস। পৃথিবীর গায়ে এখন তীব্র জ্বর। একচল্লিশ ডিগ্রী সেলসিয়াস। জমাদার পাড়ায় জাতীয় সড়কের ধার ঘেঁষে নিষ্পত্র শিমূল গাছ। একটা শুকনো বিমর্ষ দীঘি। চোখে ছানি, কচুরী পানার। বট-পাকুড়ের মিলিত ছায়ায় গ্রাম-পঞ্চায়েতের বদান্যতায় প্যাসেঞ্জার শেড। সিমেন্টের বেঞ্চি। তাতে ধুলোর পুরু আস্তরণ। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণবাটীর শিপ্রা গাঙ্গুলী।

চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্যার কামড়ে ক্ষতবিক্ষত। পুরোনো ধ্যাড়ধেড়ে একটা প্রাইভেট বাস যক্ষ্মারোগীর মতো কাশতে কাশতে ধুঁকতে ধুঁকতে এসে থামে। ফুসফুস থেকে খানিকটা কার্বন মনোক্সাইড বের করে দিয়ে হাঁফায়। জনা তিনেককে উগরে দুজনকে গিলে কোনক্রমে আবার গতিমান হয়।

বাস থেকে নামে অতনু চৌধুরী। শিপ্রার পাশে এসে দাঁড়ায়। পরনে চাপা পাজামা, ঢোলা পাঞ্জাবী। ফুলের নকসা তোলা। গাল বেয়ে, ঘাড় বেয়ে ঘাম ঝরে ঝরে পড়ছে। জামা-গেঞ্জীর ফাঁক দিয়ে রোমশ বক্ষের একঝলক। চোখে সানগ্লাস। মুখে চকচকে হাসি এবং চারমিনার। কড়া গন্ধ। শিপ্রা নাকে রুমাল দেয়।

—সরি। অতনু তৎক্ষণাৎ এবং একান্ত অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে সদ্য-জ্বালানো সিগারেট। দু পা এগিয়ে পিষে দেয়। দিতে দিতে বলে, যাচ্ছ কোথায় ভরদুপুরে?

—শহরে। সংক্ষিপ্ত জবাব শিপ্রার। যেন শুধুই ভদ্রতাবোধে।

—শহরে! নাকি কলেজে? এখনও ক্লাস হচ্ছে? পরীক্ষা তো কদিন পরেই। অতনু সলতে পাকাতে শুরু করে। প্রদীপ জ্বালবার আগে যা একান্ত জরুরী। কিন্তু তার পাকানো সলতেয় জল ঢেলে দিয়ে শিপ্রা দীঘি, কচুরীপানা, শিমূল গাছ—এইসব দেখতে থাকে। যেন এসব দেখা এই মুহূর্তে একান্ত দরকার।

—আজ শহরে যেওনা। মহাদেব পাল আর মোহন সেনগুপ্তের দলের মধ্যে লড়াই বেধেছে। কখন কী হয় কে জানে? হয়তো দুম্‌দাম্ বোমাবাজি শুরু হয়ে যাবে। আমিই পালিয়ে এলাম। তোমার সাথে দেখা করব বলেই আগের স্টপেজে নামি নি।

ভেবেছিলাম, ভয় পাবে। বিস্তারিত শোনার আগ্রহ দেখাবে। অন্ততঃ দু-একটি প্রশ্ন করবে। করল না। বরং শিপ্রা এখন বিদ্বেষের কাঁটা উঁচিয়ে ফণীমনসার মতো ঋজু।

হাল ছাড়ে না অতনু। সে ঝানু শিকারী। বুনো ঘোড়ার মুখেও লাগাম পরাতে জানে। জানে, নারকেলের ছোবড়া তুলে শাঁস বের করতে সময় লাগে। তাই কঠিন ছোবড়ার ওপর ধারলো দা'য়ের কোপ বসায়,—তুমি রাগ করেছ, তাই না শিপু? মাইরি বলছি, যা শুনেছ তার সবটা সত্যি নয়। আমার কথাটা অন্ততঃ শোনো। খুনের আসামীরও তো আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে।

বাসের গোঁ গোঁ শব্দে তার কণ্ঠস্বর ডুবে যায়। এ বাস শহরগামী। শিপ্রা হাত তোলে। বাস থামে। কন্ডাক্টরের বেল বাজে। বাস চলতে শুরু করে। 'মহিলা' চিহ্নিত একটা ফাঁকা আসনে বসে চোখ রাখে জানালায়। অতনু তখনও দাঁড়িয়ে।

—জানোয়ার একটা। তার সে উপাংশু সংলাপ নিজের কানেই বিশ্রী ঠেকে। মুখ ফেরায়। চশমা খোলে। ব্যাগ থেকে ছোট্ট রুমাল বের করে মুখে আলতো করে বোলায়। চশমার কাচ দুটো ঘষে ঘষে ঝকঝকে করে তোলে। জানালা দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া, যেন জ্বরেপোড়া কপালে মায়ের স্নিগ্ধ হাতের ছোঁয়া। চোখ বুজে আসে আপনা-আপনি। কিন্তু সে সুখানুভূতির মধ্যেও অতনু বুকের ভেতর কাঁটা হয়ে খোঁচায়।

বাস এখন তীব্রগামী। এ দিকটার সড়কের ক্ষতে প্রলেপ পড়েছে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মিনিট বাসটা একটানা চলবে। না থেমে। যেহেতু দুদিকে কোনও লোকালয় নেই। গাড়ীর দুলুনিতে শিপ্রার বেজায় ঘুম পায়। এই নিয়ে অতনু এক সময় প্যাক দিত। পাশে থাকলে খোঁচা দিত কিম্বা সুর করে বলত,— দোল্ দোল্ দুলুনী, রাঙা মাথায় চিরুণী। সহযাত্রী বন্ধুরা হো-হো করে হেসে উঠত, যখন সে বলত, কেটে কেটে উচ্চারণ করত—বর আসবে, থুরি, ঘুম আসবে এখুনি...ই...।

—দিদি, টিকিট। শিপ্রা ঝিনুক-চোখের মোড়ক খুলে তাকায়। শিথিল ওড়না সামলায়। হাল্‌কা হাওয়ায় অলক কপালে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। বাঁ হাতে তাদের শাসন করে ডান হাতে ব্যাগ খোলে। একটা পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে।

—একটা স্টুডেন্ট...। কন্ডাক্টর নোটটা ফিরিয়ে দেয়—দুটাকা খুচরো দিন।

—খুচরো তো নেই। কন্ডাক্টর বিরক্ত হয়।

—সবাই পাঁচ-দশটাকার নোট দিলে অত খুচরো কোত্থেকে দেব, বলুন? ছাত্র-কনসেসন নিতে হলে খুচরো নিয়েই বাসে উঠবেন।

—কেন দাদা, ছাত্রদের দয়া করে কনসেসন দিচ্ছেন বুঝি? পাশের ছাত্রটি সঙিন ওঁচায়।

—খুচরো নেই, বলুন। অত মেজাজ কিসের? একণ্ঠ আরও ঝাঁঝালো।

—করিস্ তো কন্ডাক্টরি। তাও প্রাইভেট বাসের। কথা শুনে মনে হচ্ছে হাই স্কুলের হেডমাস্টার।

পেছনের দিকটায় গাদাগাদি এক দঙ্গল মানুষ। বালক-যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ। ওপরের রডে হাত রেখে গৌরাঙ্গ। সেই রক্ত-মাংসের ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে কেউ একজন ফুট কাটে।

শিপ্রা নিজেকে কন্ডাক্টরের এই অপমানের মূলীভূত কারণ ভেবে লজ্জিত হয়। সে অপাঙ্গে তার দিকে তাকায়। আঠাশ-ত্রিশের দোহারা দেহ-কাঠামোর ওপর পোলট্রির ডিমের আদলে গড়া মাথা। চুল ও চোখ রাবীন্দ্রিক। কাঁধে চামড়ার অর্ধচন্দ্রাকৃতি সাইড ব্যাগ। হাতের তালুতে একগুচ্ছ টিকিট। আঙুলের ফাঁকে লম্বাভাঁজের কাগজী মুদ্রা। পাঁচ-দশ-বিশ-পঞ্চাশের। এই মুহূর্তে মূক ও বধির। বাক্যের পরিবর্তে শব্দের আশ্রিত। বৃদ্ধা ও তর্জনীর যৌথ ক্রিয়ায় টিকিটের বান্ডিলে ছ্যাড়-ছ্যাড়-ছ্যাড়াং। শব্দ শুনে পকেটে কিম্বা বটুয়ায় হাত যাত্রীদের। ধাতব মুদ্রা সাইড ব্যাগে, নোট আঙুলের ফাঁকে ঢোকাতে ঢোকাতে চোখে প্রশ্নবোধক মুদ্রা ফোটায় কন্ডাক্টর। যার ভাষারূপ : কোথায় যাবেন?—সমসপুর। উত্তর শুনে বাম হাতের আঙুলের ফাঁকে নোট ঢোকায়, নোট টেনে বের করে। সাইড ব্যাগ তুলে ধরে ঝাঁকায়। ঝন্-ঝনাৎ। একবার। দুবার। প্রয়োজনে আরও একবার। দরকারী মুদ্রাটি খুঁজে পেয়ে যাত্রীকে হস্তান্তর করে। তারপর আর একদিকে হাত বাড়ায়। কিম্বা টিকিটের বান্ডিলে ছ্যাড়্-ছ্যাড়্-ছ্যাড়াৎ...।

বোবার শত্রু নেই। প্রবাদটিকে সত্য প্রমাণ করে ছাত্ররা একে একে নেমে যায়। কেউ বা কলেজের, কেউ বা আদর্শ বিদ্যালয়ের মোড়ে। শিপ্রার মহিলা কলেজ এখনও খানিকটা দূরে। শেষতম ছাত্রটি নেমে যাওয়ার পরে কন্ডাক্টর মুখ খোলে। —আমরাও ছাত্র ছিলাম। বড়দের এমন তুই-তোকারি, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিনি কখনও।

তার কথা অনেককে চেতায়। বিশেষজ্ঞের মতামত দেওয়া শুরু হয়। কেউ কেউ আড়চোখে শিপ্রাকে দেখে। কাঁচা চুল, পাকা গোঁফের একজন বলে,—এরা ভাই নব্যযুগের নায়ক-নায়িকা। আপনারে ছাড়া করে না কারেও কুর্নিশ।

নায়িকা। আজকের এবাসের যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র ছাত্রী শিপ্রা। বাক্যের খোঁচা অতএব তাকেই লক্ষ্য করে। এখন জানালা দিয়ে রোদ আসছে। হিলিয়ম গ্যাসের গোলকপিণ্ড ওর কাঁধের বাঁদিকটা তাতাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। ওর নীচেই তো হৃদয়ধারী হৃৎপিণ্ড। এবারে সেটাও তেতে উঠল।

—এই যে দ্যাদা। কন্ডাক্টর দ্যাদা। এই যে... হৃৎপিণ্ডের তাপে শব্দগুলো কেমন বেঁকেচুরে যায়। কণ্ঠের উগ্রতা দমনে সেও এখন অপারগ। —টাকা পাঁচটা রেখে দিন। এরপর যেদিন এবাসে উঠব, ফেরত দেবেন।

হাত বাড়িয়ে নোটটা নিতে নিতে কন্ডাক্টর বলে,—রাগ করবেন না দিদি। তখন সত্যি দুটাকার-একটাকার নোট বা কয়েন ছিল না। আজকাল খুচরোর কি অভাব তা তো জানেন। আঙুলের ফাঁক থেকে বেছে বেছে অপেক্ষাকৃত চকচকে দুখানা নোট বের করে আনে। টিকিটের বান্ডিল থেকে টিকিট ছেঁড়ে। তারপর অঞ্জলি দেবার ভঙ্গীতে ও নম্রতায় ডান হাত বাড়ায়। শিপ্রাও হাত পাতে। কোমল হাতের স্পর্শে কোনও রমণীপ্রদাহ অনুভব করেই কিনা কে জানে, কন্ডাক্টর বলে,—কপালের দোষ। নইলে এম.এ পাশ করে কন্ডাক্টরি!

তার সেই স্বল্পোচ্চারিত স্বগতোক্তি শিপ্রাকে বিদ্ধ করে। এম.এ পাশ! সে তো সবে বি.এ। তাও পার্ট ওয়ান। এম.এ পাশ করতে আর ক'বছর লাগবে কড়গুণে হিসেব করে। তারপর? কন্ডাক্টরি? এখন নাকি কলকাতায় মেয়ে কন্ডাক্টরও নিচ্ছে। স্টেটবাসে। এক রকম সরকারী চাকরি।

—চাকরি না পেলে আমি কন্ডাক্টরি করব। একদিন কথায় কথায় অতনু বলেছিল।

—কন্ডাক্টরি পাওয়াও অত সোজা নয়। মন্তব্য মণিময়ের।

—সরকারী বাসে না পেলে, প্রাইভেট বাসে...

—তা হঠাৎ কন্ডাক্টর হওয়ার স্বপ্ন কেন?

মুখে দুষ্টুমি হাসি। শিপ্রার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আলোর প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল অতনু,—ভিড়ের বাসে কত কত নরম দেহের ছোঁয়া। বুকে পিঠে অনুভবের অজস্র ঝিল্লি অনুক্ষণ। তাতেই বুঁদ হয়ে থাকা, আহ্! ...মুখের ঝোল টানে অতনু।

—তাহলে চুড়িওয়ালা কিম্বা শাঁখারী হও। টিপে টুপেও দেখবে।

শিপ্রার মন্তব্যে ছবি, আলো, মণিময়, পদ্ম, এমনকি অতনুও চকিত জলোচ্ছ্বাসের মতো হাসিতে উত্তাল। শব্দের ঢেউ আছড়ে পড়ে চারিদিকে। সমবায় সমিতির শূন্য গুদামে সে শব্দতরঙ্গ প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশে মেলায়।

সেদিন ওরা দল বেঁধে পাখিরালয় দেখতে গিয়েছিল। গাদাগাদি ভিড়ের বাস থেকে অতিকষ্টে নেমে ইঁটের খোয়াবিছানো পথে পক্ষীনিবাসের অবজারভেটরি টাওয়ারে। ওদের দাপাদাপিতে দোলনার ব্রিজের মতো দুলছিল টাওয়ারটা। ওদের থেকে-থেকে দমকা হাসি শব্দ প্রতিযোগিতায় হার মানাচ্ছিল পরিযায়ী পাখিদেরকে। হেরে গিয়ে ওরা

উড়ে উড়ে যাচ্ছিল একগাছ থেকে আর এক গাছে; কাছে থেকে দূরে দূরে। এরাও উড়ছিল এলোমেলো ইচ্ছের ডানায় ভর করে। মলের রিনিঝিনি আর জুতোর খটমট শব্দ ছাপিয়ে পঙ্খীরাজের ডানামেলার শব্দ কান পেতে শুনছিল কেউ কেউ।

—চল্, নদীর ধারে গিয়ে বসি। অতনু বলে মণিময়কে। পশ্চিম দিগন্ত শিপ্রার চোখ টানে। সূর্যটা শিমূলের মগডালে মাথা রেখে খানিক জিরিয়ে নিচ্ছে। বিদেশ পাড়ি দেবার আগে চাকুরে বাঙালের মতো পরম মমতায় ফেলে-আসা ঘরদোর দেখছে যেন।

—বেশিক্ষণ বসা যাবে না কিন্তু! সন্ধ্যার আগেই ফিরে যেতে হবে।

—আরে, সে হবে। চোদ্দ বছরের মেয়েদের মতো খালি বাড়ি বাড়ি করছিস। তুই তো এখন যথেষ্ট এডাল্ট। শিপ্রার কথায় মণিময় হামলায়।

—সে কথা বাবা-মায়েরা মানতে চায় না যে। আলো শিপ্রাকে সমর্থন করে।

—মানবে কী করে? আঠারোতে সব মেয়ে কি এডাল্ট হয়? এই দ্যাখ্ না রিক্তাকে। কেমন সিঁটিয়ে আছে। যেন এক দঙ্গল বাঘ-ভাল্লুক ওকে ঘিরে রেখেছে। চোখ পিট্ পিট্ করে অতনু বলে।

—সত্যি। ওকে জোর করে নিয়ে আসা উচিত হয় নি।

আলোর কথাটা ছবিকে ছ্যাঁকা দেয়। সে মুখিয়ে ওঠে।

—বাহ্‌রে! ওকে বিশ শতকে ফেলে রেখে স্বার্থপরের মতো তোরা একুশে পৌঁছে যাবি? বন্ধুকৃত্য বলে তো একটা কথা আছে, নাকি?

ওর কথা বলার ভঙ্গীতে সকলে একসাথে কৈ মাছের মতো খলবলিয়ে ওঠে। মণিময় চেঁচায়—থ্রি চিয়ার্স ফর ছবি সরকার। সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে—হিপ্ হিপ্ হুর রে...এ...এ। নিকটবর্তী পাখিরা উৎকর্ণ হয়ে গলা বাড়ায়। দু-একটা উড়েও যায়।

কূলিকের ধার ঘেঁষে শুকিয়ে-আসা ঘাসের বিছানায় ওরা গোল হয়ে বসে। পাখি দেখে। গাছ দেখে। নদী দেখে। বক দেখে। তারপর ছুতানাতায় একজন দুজন করে ওঠে। ঝোপঝাড় খোঁজে। তার আড়ালে গিয়ে জোড়ায় জোড়ায় বসে। আলোর সঙ্গে মণিময়। ছবির সঙ্গে মুখচোরা পদ্মলোচন। সবশেষে ওঠে অতনু।

নদীর ধারে রিক্তার পাশে শিপ্রা। বসে বসে দেখে, বকেরা তপস্যায় বসেছে। আকাশ গিরগিটির মতো রঙ পাল্টাচ্ছে। সূর্য শান্ত সমাহিত। পরিযায়ী পাখিরা পরস্পর গাত্র কণ্ডুয়নে ব্যস্ত।

একসময় হাল্কা সাদা মেঘ সূর্যকে আশ্লেষে জড়ায়। কালোপর্দার আড়ালে দুজনেই আত্মগোপনে উদ্‌গ্রীব। ব্যতিব্যস্ত-শিপ্রা ডাকে—আলো... ও... ও... ছবি... ই... ই... মণিময়! কারো সাড়া নেই।

নিঃশব্দে অতনু এসে দাঁড়ায়। বড় ক্ষুব্ধ সে। একা রিক্তাকে নদীর ধারে রেখে তার সাথে আড়ালে যেতে রাজী হয় নি শিপ্রা। ক্ষোভটা চাপা থাকে না।

—কার মুখ দেখে উঠেছিলাম। দিনটাই মাটি।

—লিচুতলা, লিচুতলা, গীতাঞ্জলি, মহিলা কলেজ, গেটে আসুন। টিকিট হাতে।

বাসকর্মীর চীৎকারে দ্রুত বর্তমানে ফেরে শিপ্রা। লিচুতলা থেকে মহিলা কলেজ হেঁটে তিন মিনিট।

বাস থেকে নেমে ফুল-ফুল ছাতা মাথার ওপর মেলে ধরে শিপ্রা। খাঁ-খাঁ রোদ্দুরের ঢেউ গায়ে-পায়ে আছড়ায়। ঘেমে নেয়ে ওঠে একেবারে। দেহের অসমতল উপত্যকায় ফিনফিনে কামিজ খাঁজে খাঁজে লেপটে গিয়ে জীবন্ত নারী-অবয়ব এখন চলন্ত খাজুরাহো। ওড়নাটা টেনে টুনে, বুকে থুতনি ঠেকিয়ে বার দুয়েক দেখে নিজেকে। তারপর রুমাল

দিয়ে কপালে-গালে-গর্দানে জমে-থাকা ঘামের পোখরাজ দানাগুলো ঘষে ঘষে তুলতে তুলতে গেট পেরিয়ে কলেজে।

অতনুর দেয়া খবরটা হয়তো ঠিক। পঁচিশ শতাংশ ছাত্রীও কলেজে আসেনি। শহরের তো প্রায় কেউই নেই। অতনুর কথায় বিশ্বাস রেখে কলেজে না এলেই ভাল করত। কিন্তু অতনুকে অগ্রাহ্য করবার দুর্বার ইচ্ছা তন্মুহূর্তে এমন পেয়ে বসেছিল তাকে।

—হাই, শিপ্রা....আ....আ.....। কমন রুমের দিক থেকে একটা প্লুতস্বর ওর কানের পর্দায় তরঙ্গায়িত হয়। সে ঘাড় ফেরায়। দেখে, টেবিলের ওপর বসা চন্দনা আইসক্রিম চাটছে। মাত্র গত ফাল্গুনে হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর। এরই মধ্যে চেহারাটা ভারী-ভারী ঠেকছে। ছবি থাকলে নির্ঘাৎ বলত,—কীরে চন্দনা, আর তর সইলো না? তারপর তার রোমাঞ্চকর সব অভিজ্ঞতার চাটনির স্বাদ পেতে তাকে ছেঁকে ধরত ছবি, আলো, বন্দনা, রত্না, পিংকি, অলকারা। শিপ্রা শুনতে হয় তাই শুনছে এমনি ভাব করে নিরাসক্ত দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থাকত পাশে। হাসিতে হাসিও মেলাত। এসব রসে সে কখনই অন্যান্যদের মতো ভিজে জ্যাবজ্যাবে হয়ে ওঠে না।

—তুই রিক্তার কোনও খবর জানিস? কেমন আছে এখন সে?

—জানি না। ওর বাড়ি তো সুভাষগঞ্জে। নদীর ওপারে। তুই কবে এলি শ্বশুর বাড়ি থেকে? শিপ্রা প্রসঙ্গ পাল্টাতে সচেষ্ট।

—এই তো ক'দিন হ'ল। ভাবলাম যাই, ডি. জি আর-এর সাজেশনটাও নেব, বন্ধুদের সঙ্গে দেখাও হবে। কে জানতো আজ কলেজের এই হাল হবে। সঙ্গে সঙ্গে চন্দনা প্রসঙ্গে ফেরে, —সত্যি, রিক্তাটা কি বোকা, না? শিপ্রা কোনও উত্তর দেয় না। উত্তরের অপেক্ষাও করে না চন্দনা.—অবশ্য রিক্তারই বা কী দোষ? অতনুদার মতো ছেলেকে স্বামী হিসেবে কে না চায়?

বাক্যটায় ইলিশ মাছের গাদার মতো থুকথুকে কাঁটা। শিপ্রা গায়ে না লাগার ভান করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতের আঙুলে ওড়নার খুঁট পেঁচায়। —কিন্তু আমি তোর কথা ভেবেই আশ্চর্য হচ্ছি। এতদিন ঘনিষ্ঠভাবে মিশছিস। অথচ...। নিজের প্রসঙ্গ আসতেই শিপ্রা তপ্ত বালি। তাই কথাগুলো খই হয়ে ফোটে। —আমার কথা তোকে ভাবতে হবে না। তুই নিজেরটাই ভাব। বলে হন্ হন্ করে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। চোখেমুখে জলের ছিটে দিয়ে ঠাণ্ডা হতে গিয়ে অনুভব করে, একদলা যন্ত্রণা বুকের ভেতর জমে-থাকা শ্লেষ্মার ন্যায় ঘড় ঘড় করছে।

চন্দনাকে এড়িয়ে কলেজের পেছনের গেট দিয়ে শিপ্রা এখন গলি-রাস্তায়। এ পথে খানিক এগোলে নবনির্মিত পার্ক। প্রেমিকের মুগ্ধ চোখের মতো চকচকে পুকুর। লেক। ধারে ধারে সারে সারে কংক্রিটের বেঞ্চ। মাথার ওপর কৃষ্ণচূড়ার ছাতা। এখানে কতদিন অতনু তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে। বিনিময়ে স্নিগ্ধ রমণীপ্রবাহে সেও বিদ্ধ করেছে অতনুকে। স্নায়ুস্থিত স্রোতস্বিনীর উথাল পাথাল স্রোতে দুটি মনের সংযোগকারী সেতু থরথর করে কেঁপে উঠেছে বারে বারে। সংযমের বাঁধ দিয়ে তাকে আর বেশিদিন বেঁধে রাখতে পারত না হয়তো। রিক্তার মতো সেও হয়তো একদিন একমুঠো সুগন্ধী ফুলের শরীর অতনুকে উপহার দিয়ে আত্মসমর্পণ করে বসতো। কী হ'ত তা হলে? তাকেও কি শিলিগুড়ির কোন নার্সিং হোমে...নিজের পতঙ্গ-বাসনার কথা স্মরণ করে আঁতকে ওঠে। গলি রাস্তা ছেড়ে সে প্রশস্ত রাজপথে পা বাড়ায়।

দুপুরের নির্জনতায় শহরটা ঝিমুচ্ছে। শহরের এদিকটা অপেক্ষাকৃত শান্ত। শিক্ষিত ভদ্রপাড়া। এখনও মস্তানদের লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে নি। বকুলতলা লেনের সংকীর্ণ

গলিতে পা রাখতেই আকাশবাণী ঃ আরে, শিপ্রা তুই! আয়, আয়। আকাশমুখী হয়ে শিপ্রা দেখে, দোতলার রেলিং ধরে এলো চুলে ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সদ্যস্নাতা ছবি সরকার। শিপ্রা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে।

—বাব্বা! কতদিন তেলালাম। একদিনও এলি না। আজ হঠাৎ?

শিপ্রা হাসলো। ঠিক হাসলো নয়, হাসি ফোটাবার চেষ্টায় দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁটের আবরণ সরালো। সে হাসিতে বিদ্যুতের ঝলকের বদলে এক খাবলা অন্ধকার। ছবি ওর চোখে চোখ রাখলো। দেখলো, চোখ তো নয়, চায়ের চামচে এক চামচ জল। শিপ্রার কাঁধে আলতো হাত রেখে বলল, চল্, ভেতরে চল্। ঘেমে নেয়ে উঠেছিস যে।

ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে দিয়ে ছবি বলল, আগে ঠাণ্ডা কিছু খেয়ে নে। কী খাবি? কোল ড্রিঙ্কস, না লস্যি? দই খাবি?

—সে সবের দরকার নেই। এক গ্লাস জল দে। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

টিপয়ে জল আর সন্দেশের প্লেট রাখতে রাখতে ছবি বলল,

—জানিস, আজ সকালে অতনুদা এসেছিল।

কথাটা শিপ্রার কানে অকস্মাৎ বাজি পটকার মতো ফাটে। এখানেও অতনু। চারদিকে জাল ছড়িয়ে আড়ালে বসে তপস্বী অষ্টপাদ। ছুটে আসছে পতঙ্গেরা। জালের সূক্ষ্ম সুতোয় টান পড়তেই ছুটে গিয়ে ঘাড় মটকায়। হাড়-মাংস চিবিয়ে খায় অবলীলায়। কিম্বা রসরক্ত শোষণ করে ছিবড়ে করে ফেলে দেয়। একটার পর একটা। উপমাটা সহসা মনে এসে গেল শিপ্রার। পতঙ্গ পুরুষ নয়, নারী। নারীর রূপের আগুনে পুরুষ পতঙ্গের আত্মাহুতি—পুরুষকবির কল্পনা। ওকে নিরুত্তর দেখে ছবি বলে,—অতনুদা খুবই অনুতপ্ত। তোকে সব বলতে চায়।

—বলার কী আছে? আমি সবই জানি। শিপ্রা ঝংকৃত হয়।

—জানিস্ না, সবটা জানিস্ না। রিক্তাটা বোকার হদ্দ। মূল্যবান নারী-সম্পদ বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগে পর্যন্ত সামলে সুমলে রাখতে হয়। তা দিয়ে পুরুষ মানুষকে উস্‌কালে বিপত্তি ঘটবেই।

—তুই থাম্‌তো। কারও সাফাই গাইতে হবে না। শিপ্রা বিরক্ত হয়।

—রিক্তার মতো মেয়ে, ছেলেদের সঙ্গে যে কথাই বলে না, সে ওকে উস্‌কিয়েছে? একথা বিশ্বাস করতে বলিস?

—বিশ্বাস আমারও হত না! অতনুদার কাছে শুনে এখন বিশ্বাস হচ্ছে। নির্জনে একা পেয়ে, ওটা পুরুষ মানুষের স্বভাব, কোনো মেয়েকে একটু আধটু আদর করতে গেলেই সে যদি গলে জল হয়, পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে বসে, তাহলে নিজেকে ধরে রাখতে পারে এমন পুরুষ কোটিতে গুটিক। যা হ্যাবলা মেয়ে রিক্তাটা!

—তা না হয় হ'ল। তাই বলে শিক্ষিত মানুষের এতটুকু আত্মসংযম থাকবে না? তার ওপর নিজের পাপ স্খালনের জন্য বিবশ মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যাবে এক হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে? তাও ঘটনার চারমাস পরে? আয়ু ছিল তাই বেঁচে উঠেছে।

—শিপ্রা, প্লিজ, তুই অতনুদার কথাটা একবার ভাব্। তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ের কথা ও ভাবতেই পারে না। নইলে রিক্তাকেই বিয়ে করত। কেবল তোর কথা...

—থাম তো। শিপ্রার ধমকে ছবি চিত্রার্পিত। ওর মতো লুচ্চাকে বিয়ে করতে বয়েই গেছে আমার। একটা মেয়ের সর্বনাশ দেখেও মেয়ে হয়ে ঐ পশুটার পক্ষ নিতে লজ্জা করছে না তোর? নাকি তুইও ওর ফাঁদে পড়েছিস?

শিপ্রার হৃদয়ের পাড় ভাঙার শব্দ শুনছে ছবি। এখন সেখানে বাঁধ দিতে যাওয়া বৃথা। সে ধীরে ধীরে ওর পাশে বসে। ওর পিঠে হাত রাখে। হৃদয় ছুঁয়ে ঘনিষ্ঠ হয়। সান্ত্বনা দেবার নাম করে যন্ত্রণাটাকে উস্কে দিতে চায় না। তাই চুপচাপ।

পড়ন্ত বেলায় ছবি আত্মস্থ শিপ্রাকে বাসটার্মিনাস পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। টার্মিনাসে একটা বাস দাঁড়িয়ে। সেই বাসটা। যাতে করে সে এসেছিল। ড্রাইভারের পেছনে একটা আসন খালি। জানালার ধার ঘেঁষে একখানা লাল রুমাল পাতা। দখলদারীর নিশান। তার ওপর দিয়ে জানালায় মুখ গলিয়ে সে ছবির উদ্দেশ্যে হাত নাড়ে। —চলিরে। সীট পেয়ে গেছি।

বাস গোঁ গোঁ গর্জায়। চাকায় চাকায় গতি সঞ্চারিত হয়। পঁচিশ-ছাব্বিশের এক যুবক ওকে সরতে বলে হাতের ইশারায়। শিপ্রা পা সরিয়ে তাকে পথ করে দেয়। সে জানালার ধারে বসে। ছবির উদ্দেশ্যে শেষবার হাত নাড়া সম্ভব হয় না। ডিঙি মেরে দেখল, ছবি ঘরমুখো।

চলমান ভিড়ের বাসে ডানে বামে পুরুষ-প্রবাহ। নরম অঙ্গের স্পর্শ কামনায় তাদের উদগ্রীব চোখ লালসার রসে পিচ্ছিল। শিপ্রা কঠিন চোখে বার দুয়েক ডানে-বামে তাকায়। অবশেষে দহনক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

—এই যে, একটু ভদ্রভাবে দাঁড়ান। বাড়িতে মা-বোন নেই?

—কী হয়েছে ম্যাডাম? কন্ডাক্টরের প্রশ্ন। শিপ্রা নিরুত্তর।

—এই যে দাদারা, পেছনে যান। পেছনটা ফাঁকা পড়ে আছে। সামনের দিকটা মহিলাদের জন্য ছেড়ে দিন। যান, দয়া করে পেছনে যান। কন্ডাক্টরের কথায় কাজ হয়। শিপ্রার পাশে দাঁড়ান মধ্যবয়সী লোকটি খানিক পিছিয়ে যায়। ডান দিকের আসনে বসা যুবকটি আনমনা হয়ে গাছ-পালা, মাঠ-পুকুর, বাড়ি-ঘর এই সবে নিবিষ্ট হয়। বাসের দুলুনিতেও এখন আর গায়ে-গায়ে ঠোকা-ঠুকি হচ্ছে না।

কন্ডাক্টর নরম চোখে তাকায়। কৃতজ্ঞতা দাবি করছে কিনা কে জানে! দুটাকার একখানা নোট তার দিকে এগিয়ে দিয়ে শিপ্রা নিজেকে সামলায়। মাকড়সার জাল পাতা সারা ভুবনময়। সে পতঙ্গ হতে চায় না।

দিন সাতেক নিজের সাথে বিস্তর ধস্তাধস্তি করে শিপ্রা একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে অতনুর জমাদার পাড়ার বাড়িতে ঝোড়ো হাওয়া হয়ে ঢোকে।

—শিপ্রা। অতনুর কণ্ঠে উল্লাস। —এসো, বসো।

—বসতে আসি নি। দুটো কথা বলেই চলে যাব। কণ্ঠস্বরে যুযুধান অসুরদলনী। অতনু চমকায়। গলা শুকিয়ে সাহারা, চেহারা যেন মিয়োনো মুড়ি।

—রিক্তাকে কবে বিয়ে করছেন, বলুন।

—বিয়ে! রিক্তাকে? বসো, বসো। সবটা শোনো আগে। রিক্তাই...

—থাক। সে সব নোংরা কথা শুনতে চাইনে। রিক্তা নিজে থেকে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, এই তো বলবেন? আপনার মতো পয়সাওয়ালা বাপের ছেলের ফাঁদে পড়ে গরীব মুদির মেয়ে আকাশের চাঁদ পেল ভেবে যদি বিবশ হয়, তাহলে সম্পূর্ণ দোষ তার একার? চারদিকে জাল পেতে দিব্যি তপস্বী মাকড়সা সেজে বসে আছেন। তাতে দোষ নেই। যত দোষ পতঙ্গের?

একসাথে এতগুলো কথা বলে শিপ্রা হাঁফায়। মাথা নীচু করে অতনু রাহুগ্রস্ত সূর্যের মতো নিষ্প্রভ। তার সে ক্ষয়গ্রস্ত রূপ দেখে আহত গিরগিটির মতো মুহূর্তে রং পাল্টায় শিপ্রা।

—মেয়েটা বহু ভাগ্যে বেঁচে এসেছে। জানি, সেও তোমারই টাকায়। নইলে শিলিগুড়ির অত বড় নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়ার কথা রিক্তার বাবা কল্পনাও করতে পারত না। ভদ্রলোকের হাতেও তুমি মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছ, জানি। টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করা যায় কিন্তু তাতে কি সব ক্ষত, সব ক্ষতি পূরণ হয়, অতনু? শিপ্রা চোখ বোজে। বুকের হাপর থেকে গরম হাওয়া বের করে দিয়ে খানিকটা শীতল হয়।

—অতনু, প্লিজ, কোনোদিন যদি তুমি আমাকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে রিক্তাকে তুমি বিয়ে কর। ওর কলঙ্ক মোচন করে আমার ভালোবাসার মর্যাদা দাও।

শিপ্রা লক্ষ্য করল, অতনুর মধ্যেও একটা দহনক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। সেই প্রতিরোধহীন দহনক্রিয়ায় অতনুকে দগ্ধ হতে দিয়ে শিপ্রা এক পা, দু পা করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সূর্যটা তখন রং পাল্টাচ্ছে। হলুদ রোদ গোলাপী হয়ে উঠেছে। সেই ক্ষয়াটে রোদ্দুরের এক চিমটে শিপ্রার মনের আতশী কাচে কেন্দ্রীভূত হয়ে সহসা জ্বলে ওঠে। ভস্মীভূত হতে হতে অতনুর একদা প্রেমিকা বাসে গিয়ে ওঠে। যে বাসে টিকিট-হাতে দাঁড়িয়ে এম. এ. পাশ কন্ডাক্টর। নাকি আর এক অষ্টপাদ?

যেভাবে চুরি হয়ে যায়

বিশ্বজিৎ চৌধুরী

এ এক অদ্ভুত রাত। ঠা ঠা জ্যোৎস্নায় আলোকিত আকাশ। কাক-জোৎস্নাকে ভোরের আলো ভেবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে শ'য়ে শ'য়ে কাক। অর্থহীন ওড়াওড়ি শুধু নয়, বাচাল প্রাণীটি প্রায় অপ্রয়োজনে কা কা চিৎকারে সচকিত করে তুলেছে প্ররিবেশ। সব মিলিয়ে যেন গা-ছমছম করে-ওঠা একটা আবহ্।

অবশ্য আকাশ যখন আলোকিত, ভয়-সঞ্চারের সময় তখন তো নয়। সে কী বরং স্বচ্ছন্দ বোধ করে অন্ধকারে? কিংবা দিনের জন্যে আলো, আর রাতের জন্য অন্ধকার—নিয়মের এই নির্ধারণই তার কাছে অধিকতর স্বস্তিদায়ক।

তবে রাতটা সত্যিই অস্বাভাবিক।

তার মনে হল, যে বাড়িটির দিকে তার বিশেষ নজর, অফ-হোয়াইট রঙের যে বাড়িটি ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার জলে, তাকে কেন্দ্র করেই যেন কাকের ওড়াওড়ি ও চিৎকার সবচেয়ে বেশি।

ছেলেবেলায় শুনেছিল রাতে কাক ডাকার মানে নাকি অমঙ্গলের ইঙ্গিত—অমঙ্গলটা কার? ভেবে হাসি পায় তার, চোরের না গৃহস্থের? এ বাড়িতে এখন প্রবেশের চেষ্টা বৃথা। যে কারণে অতিক্রান্ত মধ্যরাতে তার পথে নামা, অন্ধকারের সেই আড়ালটাই নেই আর। অথচ এই একটা বাড়ি, তার গৃহকর্তা থেকে গৃহভৃত্য পর্যন্ত প্রত্যেকটি লোককে সতর্ক পর্যবেক্ষণ করে কী নিপুণভাবেই না আজকের রাতটাকে বাছাই করেছিল সে।

হতাশা ক্রমে ক্লান্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল তার। কিন্তু প্রয়োজনটা এর চেয়ে বেশি বলে অন্য উপায় খুঁজছিল হাঁটতে হাঁটতে।

পথঘাট নির্জন হয়ে পড়েছে আরও আগে। একটি-দুটি রিকশার টুং টাং শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। রাস্তার মোড়ে যেখানে পুলিশ দু'একজন দাঁড়িয়ে আছে, তা এড়িয়ে সে গলি ঘুপচির পথ ধরে। একটা এম্বুলেন্স সাইরেন না বাজিয়ে, সংকেত বাতি না জ্বালিয়ে চলে গেল হুশ্ করে। গাড়ির ভেতর কেউ কাঁদছিল বোধহয়, চলতি গাড়ি থেকে ক্রন্দনের একটা ভাঙা অংশ এসে ধাক্কা দিল তাকে। রাতটাই যেন কেমন!

আসলে নতুন করে উদ্যোগ নেয়ার মতো উদ্যম তার মধ্যে নেই একেবারেই। কিন্তু আজ খালিহাতে ফেরার উপায় নেই। পাঁচ বছর বয়সী মেয়েটার মুখ মনে পড়লে তার বুকের ভেতরটা এলোমেলো হয়ে যায়। মেয়েটা এখন বুঝতে পারে অনেক কিছু, বাপের দিকে তাকায় কেমন হাঁ করে।

তার স্ত্রী অবশ্য ইদানীং একেবারেই অভিযোগহীন। ছ-সাত বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামীর অযোগ্যতা তার কাছে প্রমাণিত। দায়-দায়িত্ব নিয়ে কথা বলে, তাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলার চেষ্টাও এখন প্রায় অর্থহীন মনে করে তার স্ত্রী। কিন্তু তাকে চমকে

দেয়ার মতো কাজ যে সে একেবারে কখনওই করে নি তা তো নয়। এমন বিস্ময়কর ভোরবেলা তরুণী স্ত্রীর জীবনে এসেছে, যখন স্বামী তার হাতে তুলে দিয়েছে দুর্লভ সোনার অলংকার। হয়তো তখন 'সোনার হাতে সোনার কাঁকনের...' মতো কাব্যবোধে উথলে উঠেছিল তরুণ তস্করের মন। কিংবা স্ত্রীর বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে সে তখন যে কোনও পাড়ামহল্লার এক শাহজাহান; বিত্তহীন প্রেমিকের পক্ষ থেকে এ উপহার বস্তুত তাজমহল নির্মাণ!

তবে এর মালিকানা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সুদ-আসলে ফিরিয়ে দেয়ার মতো বিলাসের সাথে সচ্ছলতাও ত্যাগ করতে হয়েছে তাকে। এদিক থেকে বলা চলে বেশ একটি উত্থান-পতনের সংসার তার।

আসলে পেশা পরিবর্তনের পরম্পরায় স্কুলশিক্ষক থেকে সিঁধেল চোর হওয়ার উদাহরণ বিশ্বসংসারে দুর্লভ। এই ঘটনাটিই ঘটেছে শেষ পর্যন্ত হরপ্রসাদের ক্ষেত্রে। অথচ একজন পণ্ডিতের সাথে সাযুজ্য রেখে পুত্রের নামকরণ করে বড় তৃপ্তি পেয়েছিলেন স্বর্গীয় উমাশংকর। সব অর্থেই স্বল্প-আলোকিত একটি মানুষ তিনি। ক্ষীণ স্বাস্থ্যের এই ছেলেটির বুদ্ধিমত্তা এবং লেখাপড়ায় যথেষ্ট মনোযোগ দেখে উন্নত ভবিষ্যতের একটা ইঙ্গিত পেয়েছিলেন শুরুতেই।

উমাশংকরের নিজের জীবনেও বৈপরীত্য কম ছিল না। তিনি ছিলেন শিল্পী ও শিক্ষক। গ্রামের স্কুলের শিক্ষকতার পাশাপাশি যাত্রাদলে ক্লারিওনেট বাজাতেন। এ নিয়ে সংসারে অশান্তির শেষ ছিল না; আপত্তি ছিল চেনা মহলের প্রায় সকলেরই। তারা উমাশংকরের শিল্পীসত্তার তৃষ্ণাটুকুকে আমলে নেয়ার বদলে, যাত্রাদলের সাথে তার সংস্রবকেই অমর্যাদাকর বলে তিরস্কার করেছে চিরকাল।

হরপ্রসাদ পিতার মনের আকুতিটা বুঝতে পারত, সে দেখেছে নিশি-পাওয়া মানুষের মতো বাদ্যযন্ত্রটা বগলে নিয়ে অন্ধকারের ভেতর হারিয়ে যাওয়া। যখন ভোররাতে বাড়ি ফিরত, দরজা খোলার জন্য কাউকে জাগাত না, সকালে মা দরজা খুলে দেখত দাওয়ার কোণে বসে ঝিমুচ্ছে।

মা'র ব্যাপারটা আবার বোঝা যেত না পরিষ্কার। তার সুন্দর মুখটায় সর্বক্ষণ বিষাদের ভর।

শুধু একবার, এই একবারই শুধু মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে কিশোর হরপ্রসাদ দেখেছিল দাওয়ায় বসে ক্লারিওনেট বাজাচ্ছে বাবা, তার সামনে একমাত্র শ্রোতা তার শিল্পশিক্ষাহীন মা চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। অদ্ভুত সেই দৃশ্য, হরপ্রসাদ আর কখনও এরকমটি দেখেনি। এখনও সে ভুলতে পারেনি সেই দৃশ্য।

যে যাই বলুক, সে নিজে গুণমুগ্ধ ছিল বাবার। না-বোঝা বয়স থেকে বাবাকে নিয়ে একটা অহংকারের ব্যাপার ছিল মনে।

তবে দুম করে মরে যাওয়াটা ছিল তাঁর সবচেয়ে অবিবেচকের মতো কাজ। এটা শিল্পীসুলভ বটে, কিন্তু ক্ষমা করা যায় না কিছুতেই। দুটো প্রাণীকে জলে ফেলে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন উমাশংকর। বাস্তব বোধ-বুদ্ধির সঙ্গে অমানুষিক শ্রম আর যুদ্ধ করার শক্তি দিয়ে সংসারটাকে শুধু ভাসিয়ে রাখা সম্ভব ছিল একজন গ্রাম্য মহিলার পক্ষে। তার বেশি নয়।

ফলে একমাত্র সন্তানটিকে স্কুলের চৌকাঠ পার করে দিয়ে, এমনকী প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের পদে বলা চলে তাকে 'অভিষিক্ত' করে তিনি যখন মারা গেলেন, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল পাড়াপ্রতিবেশীরা। অবশ্য মা যতদিন বেঁচে ছিলেন

তার নামে দু'একটা কথা যে চালুর চেষ্টা হয়নি তা-ও নয়। কারণ হরপ্রসাদের মা ছিলেন যথেষ্ট সুন্দরী। একমাত্র পুত্রের জন্মের পর তিনি কোনও কারণে সন্তান ধারণক্ষমতা হারিয়েছিলেন, সেই কারণে তাঁর দেহলাবণ্য ছিল অটুট—এসব কথা বালক বয়সেই হরপ্রসাদও জেনেছে কানাকানির সূত্রে। কত বড় বানানো কথা!

মার মৃত্যুর পর বছর দুয়েক গ্রামে ছিল সে। এর মধ্যে প্রাথমিক স্কুলটি থানা সদরের সরকারী স্কুলের সাথে এক হয়ে গেলে তার চাকরি যায়। বড় স্কুলের জন্য তার শিক্ষাগত যোগ্যতা যথেষ্ট ছিল না।

জলের দামে বাড়ি-ভিটে বিক্রি করে প্রায় নতুন বউটিকে নিয়ে পাড়ি জমিয়েছিল শহরতলীতে। তার পেশাজীবনের ডিমোশনের শুরু তখন থেকে। শিক্ষক থেকে বস্ত্রকলের শ্রমিক।

ধীরে ধীরে মেঘলিপ্ত হচ্ছে আকাশ। এতে নিজের দুর্ভাগ্যটা অনুভব করল সে। এই অন্ধকারের দিকেই তাকিয়ে ছিল; আর যখন জ্যোৎস্না ঢাকা পড়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে, তখন অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে সে। সেই শাদা বাড়িটার কাছে ফিরে যাওয়ার জোর নেই আর মনের মধ্যে।

নিজের অজ্ঞান্তেই এবার সে দাঁড়িয়ে পড়ল নীল গেটের একটা বাড়ির সামনে। পথের শেষ বাড়ি। গেটের সামনের গলিটা বাড়ির ডানপাশ ঘেঁষে বাঁক নিয়েছে বলে ডানদিকে অন্য কোনও বাড়ি নেই।

রাস্তার পাশে বাড়ি অথচ সীমানা পাঁচিল অনুচ্চ, বাড়ির মালিকের সতর্কতাবোধের অভাব বেশ বোঝা যায়। দোতলা বাড়িটার বেলকনি-সংলগ্ন ঘরটাতে মৃদুশক্তির একটা নীল আলো জ্বলছে। প্রায় অনায়াসে সে পাঁচিল টপকালো। দেয়াল ঘেঁষেই একটা নারকেল গাছ, তাতে নিজেকে আড়াল করল। পাশেই গাছপালার একটা ছোট ঝোপের মতো, লেবুর গাছ আছে নিশ্চয়, এখন লেবুফুলের গন্ধে খিদেটা চাগিয়ে ওঠে তার।

দ্রুত পায়ে হেঁটে মূল দরজার কাছে এল। মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে মনে হল বেশ ভারি পাল্লা। মেহগনি কাঠের। সামান্য ঘুরপথে পাওয়া গেল সিঁড়িঘরের দরজা। ভেতর থেকে ছিটকানি দেয়া। হরপ্রসাদ তার মোটর-মিস্ত্রি-মার্কা প্যান্টের পকেট থেকে সরু একটা শিক বের করে নিল। দরজার সামান্য ফাঁকটুকু দিয়ে শিক ঢুকিয়ে ছিটকিনিতে একটা চাপ দিতেই ঝটাং করে খুলে গেল দরজা। শব্দের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্য কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ সময় কাটাতে হল তার। কোনও সাড়া না পেয়ে বিড়াল-পায়ে কয়েকধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে উঠে এল দোতলার বেলকনিতে।

এবার শিকারি কুকুরের মতো সজাগ চোখ-কান। স্নায়ুর মধ্যে তোলপাড়। এতদিনের অভ্যাস, তবু এ সময়গুলোতে সহজে কিছুতেই নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না হরপ্রসাদ। স্নায়ুর জোরের অভাবেই তো এ লাইনেও কিছু হল না তার।

একটু এগোতেই গানের শব্দ শুনতে পেল। ক্যাসেট প্লেয়ার বাজছে, তুমি আজ কতদূরে...। যা ভেবেছিল তা-ই। এ বাড়ির মালিকের সতর্কতাবোধ যথেষ্ট নয়। দোতলার ঘরের দরজা খোলা, কমশক্তির একটি নীল আলো জ্বলছে। সে একটি থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাড়ি ও বাসিন্দাদের বর্তমান অবস্থাটা বুঝে নেয়ার চেষ্টা করল। বেলকনিতে বেতের চেয়ারে পা, অন্য চেয়ারে আধশোয়া হয়ে গান শুনছেন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক! অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তার মতো কঠিন চেহারা। ভারি গোঁফ, ছোট করে ছাঁটা চুলে কানের পাশে শাদা রঙের ছোপ। আর এখন এই অতিক্রান্ত মধ্যরাতে, তুমি আজ

কতদূরে! বোঝা যাচ্ছে, এ বাড়ির সদস্য-সংখ্যা বর্তমানে বেশ কম। নিচের তলায় দু'চারজন ঝি, মালি, দারোয়ান হয়তো আছে, যারা মালিকের ঔদার্য বা দুর্বলতাকে উপভোগ করছে মহাসুখে। ওপরতলায় এরা দুজন—নীল আলোর ঘরে বিশাল বিছানায় শুয়ে থাকা বিগতযৌবনা, আর নিদ্রাহীন এই বিরহ-বিলাসী।

এখন 'চিঠি'র প্রথম পর্বের শেষ দিক। হরপ্রসাদের ধারণা, যেমন জেগে ঘুমানো মানুষকে জাগানো কঠিন, তেমনি সংগীতরসে যার চক্ষু নিমীলিত তার তন্দ্রা বা রসভঙ্গও কঠিন। সে নিঃশব্দে, কিন্তু প্রায় নির্ভয়ে ঢুকে পড়ল ম্লান নীল আলোর ঘরে। ফর্সা স্থূল মহিলা শুয়ে আছেন অবিন্যস্ত হয়ে। এ ধরনের মহিলারা সাধারণত ঘুমান কাদা হয়ে। বেশ অভিজাত চেহারা, গোলগাল মুখে এখন গভীর প্রশান্তি।

সে একবার চোখ বুলোল সারা ঘরে। মূল্যবান দ্রব্য বাছাইয়ের আগেই তার চোখে পড়ল প্রসাধন টেবিলের ওপর রাখা এক অদ্ভুত জিনিসের ওপর। বড়সড় একটা শাদা সামুদ্রিক শামুক। মুগ্ধ হয়ে গেল সে। নীল আলোতে ঐ শাদা শামুক তাকে সমুদ্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। সমুদ্র-নীল অনুভব করতে পারে সে। এমনকী ঝাউয়ের ওপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া হাওয়া আর ঢেউ ভাঙার শব্দও যেন তার বোধে একাকার হয়ে যায় মুহূর্তের জন্য। যে হাতে তুলে নেয় শামুকটি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে যেন এক আচ্ছন্নতার মধ্যে। কিন্তু হঠাৎ, মুগ্ধতার রেশ না কাটতেই ক্যাসেট প্লেয়ার বন্ধের শব্দ হল বেলকনিতে, 'চিঠি' শেষ হওয়ার আগেই।

ভদ্রলোক এবার ঘরে আসবেন, ঘুমানোর আয়োজন করবেন স্ত্রীর পাশে। হরপ্রসাদের কাজের কাজ কিছু তো হলই না, উল্টো এখন হাতেনাতে ধরা পড়ার ঝুঁকি।

শামুকটা হাতে নিয়েই সুরুৎ করে দরজা পেরিয়ে বেলকনিতে বেরিয়ে এল সে। অনেকটা চোর-পুলিশ খেলার মতো; বলা চলে গৃহকর্তা ভদ্রলোকের অসতর্ক স্বভাবের সুবাদেই নিরাপদে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল সে। কিন্তু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরে সুখ হল না তার। বিষাদে মন ভরে গেল বরং। প্রচণ্ড রাগ হল নিজের ওপর। দু'দশটাকায় বিকোবে না এমন একটা জিনিসের প্রতি তার আদেখলেপনার জন্যেই নিশ্চিত সুযোগ হাতছাড়া হল।

বাড়ির পথে পা বাড়িয়ে মেয়েটার কথা মনে পড়ল তার। সকালে কাতরাচ্ছিল। জয়া তার ঠিকা কাজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে এনেছিল। জয়া এখন টুকটাক কাজকম্মো করে দিয়ে আসে পাশের একটি বাসায়—সুন্দর করে বললে এরকমই, আর নিরেট কথা সোজাসাপ্টা করে বললে, ঠিকা ঝি, কাজের মেয়ে।

গ্রামের বেশির ভাগ মেয়ে ভুল করে ক্লাস নাইন-টেনের বয়সে। জয়া, মানে জয়শ্রীও করেছিল। অবস্থাপন্ন ঘরের চোখে-লাগা মেয়েটি প্রাইমারি স্কুলমাস্টারের প্রেমে পড়ে কুলহারা হয়েছিল। তার যথার্থ খেসারত এখন দিচ্ছে। এখন তার স্বামী যায় নাইট শিফটের চাকরিতে (!) আর সে দিনের বেলা 'টুকটাক কাজে' সাহায্য করতে যায় প্রতিবেশীর ঘরে।

প্রতিবেশী ভদ্রলোক ডাক্তার, বিপত্নীক ও নিঃসন্তান। ফলে জয়ার মেয়েটা এটা-ওটা বাড়তি পায়। ভদ্রলোক সকালে চাকরিতে যান বলে ও-বাসার একটা ডুপ্লিকেট চাবি থাকে জয়ার কাছে। এ কথাটা জানার পর থেকে মনের ভেতর কুচিন্তা আকুলি-বিকুলি করছিল। জয়াকে আকারে-ইঙ্গিতে এটা জানিয়ে প্রচণ্ড মুখ-ঝামটা খেতে হয়েছে। এমনিতে তার স্ত্রী একেবারে কম কথা বলার লোক, কিন্তু রেগে গেলে সাংঘাতিক, হরপ্রসাদ ভয় পায়। এক্ষেত্রে জয়ার যুক্তিটা খুবই সংগত, ভদ্রলোক সময়ে-সময়ে সাহায্য না করলে তাদের মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখা যেত না হয়তো।

আসলে জীবিকা বা পেশার ব্যাপারে কখনও যুৎ করতে পারল না হরপ্রসাদ। বিদ্যার পরিধি আর দু'এক কদম এগোলে স্কুলের মাস্টারি বহাল থাকত, হল না। মা তার কায়ক্লেশে দিনযাপন করে ছেলের একটা হিল্লে হয়েছে ভেবে চোখ বুজলেন; আর অল্পদিনের মধ্যেই যে ছেলে ঝুলে গেছে সে খবরটা নিয়ে যেতে পারলেন না। ভালোই হল, শান্তির মৃত্যু তাঁর জন্যে নিয়তি-নির্ধারিত ছিল।

এরপর গ্রামের পাট চুকিয়ে আসা, বস্ত্রকলের চাকরিতে উদয়াস্ত পরিশ্রম—হরপ্রসাদ চেষ্টা কম করেনি। ফ্যাক্টরি লে-অফ হওয়ার পর তিনজন সহকর্মীর মৃত্যু দেখেছে, কিন্তু নিজে মরেনি। সহজে মরবে না বলে বেঁচে আছে।

ফ্যাক্টরিতে চুরির পেশায় হাতেখড়ি হয়েছিল তার। অন্য ক'জন চাকরিচ্যুত সহকর্মীর সঙ্গে রাতে মিল এলাকায় ঢুকে এটা-ওটা চুরি করে বেচতে শিখেছিল। নিম্নবিত্তের মাঝারিমানের বিবেকও তখনই বিক্রি হয়েছে। কিন্তু হল না তো। এ দিয়েও তেমন কিছু করা হল না। একটু সাহস টাহস থাকলে হত। কতজনকেই তো দেখল এক-আধটু ছোরাচাকু চালিয়ে, দু-একটা ফুটুস ফাটুস ফুটিয়ে বেশ দাঁড়িয়ে গেল।

সত্যি কথা বলতে কি, সবচেয়ে ভুলটা করেছিল ক্লাস নাইনের মেয়েটাকে বিয়ে করে। বয়স তো এমন কিছু ছিল না, বিয়ে-বাচ্চা এসব না হলে অন্যরকম করে ভেবে দেখা যেত সবকিছু। তবে হরপ্রসাদ মানুষটা কোথায় যেন একটু কাঙাল ধরনের। বউ-বাচ্চার কথা মনে এলে বুকের তলা সজল হয়ে থাকে।

এখনও তার হাতে ধরা আছে শামুকটা। হাঁটতে হাঁটতে আরেকবার এটাকে উল্টোসোজা করে দেখে নিলে সে। কানের কাছে নিয়ে পরখ করল, না, ঝাউয়ের হাওয়া বা সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ, কিছুই শোনা যাচ্ছে না আর। একটি বিত্তবান পরিবারের শোবার ঘরে ঢুকতে পেরে কেন যে তার এই অদ্ভুত জিনিসটার দিকেই প্রথমে চোখ পড়ল বুঝে উঠতে পারে না কিছুতেই। তার নজরটা কি চিরকাল এরকমই থাকবে! শূন্যহাতে এখন বাড়ি ফেরাটাই অর্থহীন হয়ে ওঠে।

মেয়ের মুখ মনে পড়লে দুর্বলচিত্তের হরপ্রসাদের চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। আর তখনই সে পথের পাশে ছুঁড়ে ফেলে দেয় তার হাতের অমূল্য বস্তুটি।

পথঘাট এখন একেবারেই নির্জন ও নীরব। রাতের এই শেষ দিকটাতে নিশাচর মানুষ বা রাতপাখিরাও একটু বিশ্রাম নেয়। ভ্যাপসা গরমের দিনেও একটু ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায় এ সময়টাতে। এখন সেই হাওয়ায় ঘাম শুকোচ্ছে হরপ্রসাদের, শরীর জুড়ে ভর করেছে অবসাদ। কিন্তু একটা ব্যর্থতার বোধ মনকে তার জুড়োতে দেয় না। দু'কাঁধে অশান্তির বোঝা নিয়ে হনহন করে পথ অতিক্রম করে হরপ্রসাদ।

বাড়ির কাছাকাছি এসে হঠাৎ মরিয়া হয়ে ওঠে সে। ভাবল, আরও একবার চেষ্টা করা যেতে পারে, রাত এখনও কিছুটা বাকি। এবং এসব ব্যাপারে বিবেককে একেবারেই উপেক্ষা করা উচিত বলে এ মুহূর্তে তার মনে হল।

সে তার প্রতিবেশী ডাক্তারের বাড়িটাকেই বাছাই করল। কেননা কৃতজ্ঞতাবোধের ব্যাপারটা বাদ দিলে প্রায় জনহীন এ বাড়িতে প্রবেশ ও প্রস্থানই তো সবচেয়ে সুবিধাজনক। তার মনে একটু ফুর্তি এল এবার। পুকুরঘাটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বড়শি-হাতে বসে থাকার পর ছিপটা হঠাৎ নড়ে উঠলে এ রকম একটুকরো ফুর্তি আসে মনে। অনায়াসে দেয়াল টপকে বাড়ির আঙিনায় পৌঁছে গেল সে। এ বাড়িতে নিজে আসেনি কখনও, শুধু গল্প শুনেছে। বাইরের ঘরটাতে চেম্বারের মতো, যদিও খুব ঘনিষ্ঠ দু'একজন ছাড়া বাড়িতে রোগী দেখেন না ডাক্তার। স্ত্রীর মৃত্যুর পর শুধু নিজের

শোবার ঘরটা ব্যবহার করেন, আর বাড়ির সামনের একফালি বাগানটাতে ইজিচেয়ারে বসে কখনও বই পড়েন, কখনও চোখ বুজে বিশ্রাম করেন।

বাগানটা ছোট, বেশ পরিপাটি। ভাবতে ভালো লাগছে, এর পরিচর্যা করে তার স্ত্রী জয়া। নিজের নেই বলে অন্যেরটা নিজের মতো করে সাজিয়ে রেখেছে। হরপ্রসাদেরও ফুলের বাগান নিয়ে একটু দুর্বলতা বা আদিখ্যেতা আছে। তবে এ মুহূর্তে বাগান নিয়ে বিলাসের সময় নেই তার।

পানির পাইপ বেয়ে কার্নিশে উঠে এল তরতর করে। কিন্তু পাশাপাশি দুটো ভেন্টিলেটরে চোখ রেখে জমাট অন্ধকার ছাড়া দেখা গেল না কিছুই। এখান থেকেই তৃতীয় ভেন্টিলেটরটা দেখা গেল; কয়েকটি সরু নলের মতো আলোর রেখা বেরিয়েছে তার মধ্য দিয়ে।

একটু কসরৎ করে আরেকটি কার্নিশে এসে পৌঁছে গেল সেই ভেন্টিলেটরের কাছে। আলো জ্বলছে ঘরটাতে, সে চোখ রাখল ভেতরে। প্রথমেই চোখে পড়ল একটি খাটে শুয়ে আছে দুটি নারী-পুরুষ। নারী উপুড় হয়ে পায়ের বেষ্টনী দিয়েছে চিৎ হয়ে শোয়া পুরুষের শরীরে। পুরুষটি নিশ্চয়ই ডাক্তার সাহেব, এত ওপর থেকে খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবে এটুকুতেই সে নিশ্চিত হতে পারল, ডাক্তার সাহেবই।

কিন্তু তিনি তো বিপত্নীক। এরমধ্যে বিয়েও করেননি আর। এবার ক্ষীণ হাসি ফুটল হরপ্রসাদের মুখে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ-মেশানো রহস্যভেদ করতে পারার সেই হাসি।

কিন্তু হাসি দীর্ঘস্থায়ী হল না তার, ডাক্তারের শরীরলগ্নাকে চিনতে পেরে থরথর করে কেঁপে উঠল সে। নিজের চোখকে নিজের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ঘরের ভেতর; এবং নিশ্চিত হল যে তার ভুল হয় নি।

যেটুকু কার্নিশের ওপর সে বসেছিল, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের পক্ষে তা মোটেই সুপরিসর নয়। এ মুহূর্তে শরীরে এক ধরনের কাঁপুনির ফলে ছিটকে পড়ার আশংকা হল মনে। কোনওভাবে পাশের কার্নিশে আসতে পারল, তারপর পানির পাইপ বেয়ে অনায়াসে নেমে এল নিচে।

নির্বিঘ্নে বাড়ির আঙিনা পেরোনোর পর পুরো ব্যাপারটা আরেকবার মনে করতে চাইল হরপ্রসাদ। চিৎ হয়ে শোয়া ডাক্তারের শরীরে একটা উরু তুলে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে তার স্ত্রী জয়া। এ দৃশ্যে যেমন এতটুকু অসামঞ্জস্য নেই, অনভ্যাসের আড়ষ্টতাও নেই। হাঁটতে হাঁটতে টের পেল এখন সে উত্তেজনা বোধ করছে না আর, বরং শরীর জুড়ে নেমে আসছে ক্লান্তি। অভ্যাসের বশে সতর্ক পায়ে এসে দাঁড়াল নিজেরই ঘরের সামনে। যে বিশেষ কৌশলে স্বামী-স্ত্রী বাইরে থেকে দরজা খোলে, সেভাবে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখতে পেল বেঘোরে ঘুমোচ্ছে তার মেয়েটা।

খুব কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার মুখের দিকে তাকাতেই তুমুল বর্ষায় পাড় উপচে পড়া খালের খলবল শব্দ সে শুনতে পেল বুকের ভেতর। দু'এক মুহূর্তের জন্য কি সম্বিত হারিয়েছিল হরপ্রসাদ? তার চোখের সামনে প্রতিভাত হল মৃত মায়ের মুখ, চোখের জলে একাকার হয়ে মা ডুবে আছে ক্লারিওনেটের সুরের মধ্যে। সেই সুর শুনতে পেল হরপ্রসাদও—বহুকালের দূর থেকে ফিরে আসা সুর। কিন্তু শিল্পীকে, মানে বাবাকে কোথাও দেখতে পেল না হরপ্রসাদ। দু'এক মুহূর্ত মাত্র, তারপর খুব দ্রুত সে ফিরে এল বর্তমানে। তার মনে হল, এখনই তার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। জয়া এসে সবকিছু গুছিয়ে নিলে আবার ফিরে আসবে সে। অন্তত জয়া যেন জানতে না পারে সে জেনেছে সব কিছু।

সেদিন পূর্ণিমা রাত

শুকদেব চট্টোপাধ্যায়

'হত্যাকারীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ মৃত্যু'—চারু মজুমদার

(১)

মাত্র দু'মিনিটের জন্য ট্রেনটা ফেল করল পাঞ্চালি। এর পরের ট্রেন আধঘণ্টা পরে। যদিও অন্যান্য দিনের দু'মিনিটের সঙ্গে আজকের দু'মিনিটের তফাৎ রয়েছে। আজ স্কুলে আসতে না আসতেই ছুটি হয়ে গেছে। স্কুলের প্রাক্তন হেড মিস্ট্রেসের মৃত্যুতে শ্রদ্ধা আর শোক জানাতে ছুটি ঘোষিত হয়েছে। ছোট স্বল্পক্ষণের একটি শোকসভা শেষ হবার পর বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছে পাঞ্চালি। কিন্তু দু'মিনিট দেরিতে স্টেশনে পৌঁছানোয় ট্রেনটা ফেল করল সে।

জ্যৈষ্ঠ মাস। গরম পড়েছে প্রচণ্ড। এবারের গরমের চরিত্রটা আগের বারের তুলনায় অস্বাভাবিক। কয়েকদিন ধরে চলেছে তাপপ্রবাহ। নামগন্ধ নেই বৃষ্টির।

পাঞ্চালি চারপাশে তাকালো। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের কোনো বেঞ্চে বসে সময় কাটানো ছাড়া এই মুহূর্তে তার আর কিছু করণীয় নেই। লোক বেশি নেই প্ল্যাটফর্মে। অফিস টাইম পেরিয়ে গেছে। পাশাপাশি প্ল্যাটফর্মগুলো যেন ভোর থেকে কাজ করে এখন ক্লান্তিতে গা এলিয়ে দিয়েছে।

ঘামছিল পাঞ্চালি। গায়ে জড়ানো আঁচল খুলে, ঘাড়, কপাল আর গলার ঘাম মুছল। প্ল্যাটফর্মের সিলিংফ্যান চলছে না। গলাটা শুকিয়ে গেছে। রাস্তায় জ্যাম থাকায় অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে এই রোদে। এসব অনেকদিন হল গা-সওয়া। তবু তৃষ্ণা রয়েছে। জলের খোঁজে চোখের নজরকে সংহত করতে দেখল— এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেয়াল-কল থেকে এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে জল পড়ছে। তীব্র আলো থেকে এসে এখন শেডের গায়ে, বড় বড় লোহার থাম ঘিরে-থাকা ছায়ায় চোখ অভ্যস্ত হয়ে উঠল। উঁচু খিলানের মতো ঢেউ-খেলানো শেডের গা থেকে যে অদ্ভুত এক ছায়া-ছায়া ফিকে আলো ঠিক্‌রে পড়ে তাতে গোটা স্টেশন চত্বরকে, তার অতিকায় দেহ আর প্ল্যাটফর্ম-সুদ্ধ প্রাচীন এক জলজ প্রাণীর মতো মনে হয়। অবাস্তব—সবই অবাস্তব। অর্থহীন।

পড়ন্ত জলের ফোঁটার দিকে নজর রেখে হাঁটতে হাঁটতে, বাঁ হাতের মনিবন্ধে রিস্ট-ওয়াচের কাঁটায় চোখটাকে বুলিয়ে নিল সে। অনেকটা সময় রয়েছে হাতে। ব্যস্ততা তাড়াহুড়ো—যা প্রতিদিন বিকেলে ফেরার সময় তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে থাকে—তারা আজ অনুপস্থিত।

কলের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খানিকটা জল খেল। তলার বেসিনে পুরু ময়লার আস্তরণ, গায়ে শ্যাওলা জমে রয়েছে। একটা আঁশটে গন্ধ উঠে আসছে বেসিন থেকে। জলও বিস্বাদ। ব্লিচিং পাউডারের মতো একটা তীব্র গন্ধ। কিছুই করার নেই। ইচ্ছা না হলেও যাত্রীরা এ জল

খায়, এটাই অভ্যাস। পাঞ্চালি মুখে চোখে গলায় আঁজলা আঁজলা জল দিল। কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুছে নিল ভিজে গলা মুখ। সামান্য স্বস্তি। তৃপ্তি কয়েক বিন্দু। এই তৃপ্তির শরীরও অভ্যাসের চুন-সুরকিতে তৈরি। কতক্ষণ? প্ল্যাটফর্মের ধূসর আলো আর শেডের পুরনো করোগেট ফুঁড়ে ঢুকে পড়ছে গরম—তার ধারালো নখ বিস্তার করে।

আলগা খোঁপাটাকে টেনে শক্ত করে বেঁধে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে পা বাড়িয়ে পাঞ্চালিকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। দূরে দেয়াল ঘেঁষে যে ভিখিরি মেয়েছেলেটা শুয়ে ঘুমোচ্ছে বলে তার মনে হয়েছিল, আসলে সে মরে গেছে। একপাশে কাত হওয়া দেহটাকে দূর থেকে দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক— পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। মুখটা ওপর দিকে তোলা। আধখোলা ঠোঁট। ঈষৎ বোজা দুচোখেই এক নির্লিপ্ত বিস্ময়। দু'তিনটে মাছি স্থির বসে রয়েছে নাকের ডগা আর ঠোঁটের কোণে। পাঞ্চালির মনে হল—ঘুম আর মৃত্যুর সীমান্তরেখা মুছে গেছে ঐ মুখে।

আমার কি দায় পড়ল যে আমি ঐ ভিখিরি প্ল্যাটফর্মবাসী বৌটা বেঁচে আছে না মরে গেছে তা জানার জন্যে দাঁড়ালাম? নিজেকে তিরস্কার করে পাঞ্চালি হেঁটে ফিরে গেল নির্ধারিত প্ল্যাটফর্মে— যেখান থেকে তার ট্রেন ছাড়বার কথা। অনেকগুলো প্যাকিং বাক্স জড়ো করা রয়েছে। একটার ওপর সে বসে পড়ল। মৃত্যু আর জীবন তার কাছে অভিন্ন অবস্থায় পাশাপাশি বসবাস করে। এখন পথে-ঘাটে, দুর্ঘটনায়, রোগে, আত্মহত্যায়, পুলিশের গুলিতে মানুষের মৃত্যু অনেক বেড়ে গেছে। এসব তার মনে এখন আর কোনো দাগ কাটে না। পাঁচটা বছরের এক যান্ত্রিক অভ্যাসের জীবনযাপনে সব স্বতন্ত্র অনুভব— যা মানুষের জীবনকে এক সময় পূর্ণ করে তোলে—ভেঙেচুরে সর্বব্যাপ্ত ধূলায় ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দিনরাত্রির কোনো আলাদা রঙ নেই তার কাছে। তার গোটা অস্তিত্ব, তার অভিজ্ঞতার জগতে আর জীবনে, এখন একটাই রঙ— তা পাঁশুটে নির্জীব; চিমনির ধোঁয়াচ্ছন্ন বিবর্ণ আকাশের মতো!

তবে হ্যাঁ, ক্লান্তি আছে। মাকড়সার সূক্ষ্ম জালের মতো জড়িয়ে আছে তার সমগ্র অস্তিত্ব। আছে মাকড়সার নিঃশব্দ সঞ্চরণ।

এই হঠাৎ-পাওয়া খণ্ড সময়টা, অসময়ে বাড়ি ফেরার পর অতিরিক্ত সময়টাতে, সাংসারিক কোন বাকি কাজ, যা সরিয়ে রাখা আছে সামনের রবিবারের জন্য, করে ফেলা যায়? তন্ন তন্ন করে খুঁজতে আরম্ভ করল সে। এই হঠাৎ-পাওয়া খণ্ড সময়ের ভার থেকে তার মুক্তি পাওয়াটা জরুরি। সামনের দূর-প্রসারিত রেল লাইন। চোখের দৃষ্টির সীমানা অতিক্রম করে বাঁক নিয়ে কোন অনির্দিষ্ট অঞ্চলে সরে গেছে। সেখান থেকে ঘন উত্তাপ সাপের মতো বুক ঘষে ঘষে উঠে পড়ছে, এই আধো-ছায়া আধো-আলোর সামিয়ানার তলায় শুয়ে-থাকা প্ল্যাটফর্মগুলোয়। পাঞ্চালির মনে হল তার চোখের মণিতে কুয়াশা জমছে। রোদ-পোড়া রেল লাইনের ওপর হিল-হিল করছে উত্তাপের অদৃশ্য সর্পিল দেহ।

সময়ের ট্রেন ছাড়ল অসময়ে। বেশ দেরি করে। শেষের দিকের একটা কম্পার্টমেন্টে উঠে জানালার ধারে বসল পাঞ্চালি। কামরাটা ছোট। বাঙ্কগুলো ভাঙা। ফ্যান নেই। লেখা রয়েছে 'স্টোলেন'। হাতলগুলোকেও চুরি করে নিয়ে গেছে কেউ। জল, আনাজের খোসা, পাউরুটির ঠোঙা, বাদামের খোসা আর সিগারেটের খোল চতুর্দিকে ছড়ানো। অপরিবর্তিত প্রত্যহের পরিচিত ছবি। জনাকয়েক আনাজ-বিক্রেতা উঠল খালি ঝুড়ি নিয়ে। এক সময় হর্ন বাজিয়ে ছেড়ে দিল ট্রেন। কিছুটা অবসাদে, অনেকটা ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ করে রইল পাঞ্চালি। ছুটন্ত সময়ের হাতে আপাতত নিজেকে সমর্পণ করেছে সে। মহানগরের সান্নিধ্য ছিঁড়ে ট্রেন ক্রমশ সঞ্চার করছে গতি। পরস্পর সংলগ্ন জটিল শিকড়ের মতো রেললাইনের ওপর রেলের

চাকার সংঘর্ষে শব্দ উঠছে। এই শব্দ, এই গতি—এই সমস্ত কিছুই পাঞ্চালির ভাবনার দৈনন্দিনতায় মুখস্থ। এও ধারাবাহিক অভ্যাসের অভিজ্ঞতায় পাওয়া। এই মুহূর্তে বাইরে মাঠ-ঘাট, বাড়িঘর, নিঃশব্দে পুড়ছে জ্যৈষ্ঠের হিংস্র রোদে। সেদিকে দৃষ্টি দিলে চোখ পুড়ে যাবার অনুভূতি। পাঁচটা বছর কয়লার মতো পুড়ে ঢেকে আছে চেতনার আকাশ। পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে বিবর্ণ ছাই—সর্বত্র। পূর্ণ যৌবনের দীপ্ত দুপুরের বয়েসে তার সারা মুখে, স্নিগ্ধ সারল্যের লাবণ্য-মাখা সৌন্দর্যকে হটিয়ে চেপে বসেছে এক অসময়ের রুক্ষ কাঠিন্য। চুলে অনিয়ম আর অযত্নে একটা গেরুয়া রুক্ষতা। দু'গালের হাড় প্রকট হয়ে থাকায় তার পানের মতো মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে ছিরিহীন করে তুলেছে। শুধু সৌন্দর্যটুকু নির্বাসিত নয় ঘন পালক-ঘেরা চোখের মধ্যে। তবে সে চোখের মণির দিকে মনোযোগ দিয়ে কেউ লক্ষ করলে সহসা আবিষ্কার করবে এক বন্য আগুনের দীপ্তি।

একবার চোখ খুলে রিস্ট-ওয়াচের কাঁটার দিকে চেয়ে সময় দেখে নিল পাঞ্চালি উদ্দেশ্যহীন চোখে। ট্রেন মাঝেমাঝেই গতি কমিয়ে থেমে যাচ্ছে। অন্যদিনের মতো ফেরার অভ্যস্ত তাড়া না থাকায় এই দেরি-হওয়া সময়ের এই হিসেবহীন খরচ পাঞ্চালির মনে আজ কোনো অসন্তোষ, কোনো বিরক্তি বা ক্রোধের জন্ম দেয় না। সময় এখন বন্ধ্যা তার কাছে। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির স্রোতে সে গলা ডুবিয়ে দীর্ঘকাল একা, নিঃসঙ্গ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার দুপাশে খাঁখাঁ করছে রুক্ষ অনুর্বর প্রান্তর। কাঁটাঝোপ আর বুনো গুল্মের দিগন্তব্যাপী বিস্তার। তার বর্তমানে পৌঁছানোর শেষ পাঁচ বছরের জীবন, তাকে বেঁধে রেখেছে অভ্যাসের অন্তহীন ধীর গতির চাকায়। এই মুহূর্তে রোদে-পোড়া বাতাস, রুক্ষ প্রান্তরের গরম ধুলো, সারা শরীরে মেখে লুটোপুটি খেয়ে লাফিয়ে উঠছে চলন্ত ট্রেনের শরীরে। আবার ট্রেন ছেড়ে ঝাঁপ দিচ্ছে ধুলোর ঘূর্ণি মেখে লাইনের ধারের মাঠ-ঘাটে। এলোমেলো। উদ্দেশ্যহীন।

চোখ বুজেই বন্ধ চোখের পাতা ঠোঁট চিবুক আর বিশৃঙ্খল চুলের কিছু অংশ যা তার কপাল আর ভুরুর ওপর ছড়িয়ে পড়ছিল—হাওয়ার ধারালো নখ থাবা বসাচ্ছে, টের পাচ্ছিল পাঞ্চালি। মুখে শেষ কবে সাবান মেখেছিল মনে নেই তার। জানলা দিয়ে আসা ধুলো আর গরম মাখা বাতাস যেন সময় সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেবে—যেন কেউ তার ওপর অদৃশ্য হাত চাপা দিয়ে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের পথকে বন্ধ করতে চাইছে—এ রকম ভাবল একবার।

কতক্ষণ? একটা ঝিমুনি যেন তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলার মতো বেঁধে ফেলছিল—যদিও লাইন বদলের বহু পরিচিত, নিয়মিত টের-পাওয়া ঝাঁকানি, পাঞ্চালি সচেতন করছিল। স্টেশন আর বেশি দূরে নয়। এই ঝাঁকুনি তার মুখস্থ। অন্য সহযাত্রীরা, যারা আরো দূরে যাবে, এখন ঘুমোচ্ছে।

ট্রেন থামলে নেমে পড়ে পাঞ্চালি। প্ল্যাটফর্মের শেডের তলায় ছায়া ছড়িয়ে রয়েছে সতরঞ্জির মতো। দু'ধারে কয়েকটা বড় বড় অর্জুন, শিশু আর সজনে গাছ। চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে রইল থেমে-যাওয়া ট্রেনের পাশে। এখন সে কি করবে এইরকম ভাবছে—ট্রেনটা ছাড়ল। নড়ে উঠল একটা বড় লম্বা পোকার মত। তারপর হঠাৎ গতি বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ বা চুম্বন করার মতো প্রায় লাফ দিতে দিতে অপসৃত হল। লাইন আর চাকার ঘর্ষণের শব্দ সরে যেতে হঠাৎ স্তব্ধতা দুপুরের খর রৌদ্রের নির্জনতার কোলে চেপে, চলে এল শেডের ছায়ায়। পাঁচ বছর আগের বা তারও আগে, যখন সে সদ্য কলেজে ঢুকেছে, সে সময় হলে দুর্ঘটনা বা মৃত্যুভয় তাকে আগেই সতর্ক করে সরিয়ে আনতো প্ল্যাটফর্মের ওপর বিপদজ্ঞাপক টানা সাদা লাইনের বাইরে—যা এখন নিশ্চিহ্ন মানুষের পায়ে পায়ে—নিরাপদ দূরত্বের প্রথাসিদ্ধ জমিতে। নিরাপদ দূরত্ব। এখন এসব ছোট-খাট অসতর্কতা, বা অমনোযোগিতার ধারণাগুলো তার কাছে, প্ল্যাটফর্মের বাউন্ডারি রেলিংয়ের রড যেন, অনেক যাত্রীর পেচ্ছাবে জঙ ধরে তলার দিকে ভেঙে গেছে, তার দু'পাশে ইতস্তত পড়ে-থাকা চায়ের ভাঁড়ের মতো।

চারদিক দেখল পাঞ্চালি। ডাউনে কোনো গাড়ি আসবে না। লাল হয়ে আসে সব ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল। পশ্চিমে নোংরা আবর্জনা ছড়ানো বিশ্রাম ঘরের মান্ধাতার আমলের কাঠ আর লোহার তৈরি বেঞ্চের তলায়। আরামে ঘুমোচ্ছে দুটো কুকুর। ওভারব্রিজের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াতে হল তাকে। ট্রেনের মাথার দিকে প্ল্যাটফর্মের শরীর দিয়ে হেঁটে আসছে দু'জন যাত্রী। এই সদ্য ছেড়ে যাওয়া ট্রেন থেকেই নেমেছে। হেঁটে আসছে ওভার-ব্রিজের দিকে। পাঞ্চালি ফের চলা শুরু করল। খুব চেনা লাগছে হাঁটার ধরন। ভেতরে ভেতরে হাতড়াতে হাতড়াতেই ও পৌঁছে গেল প্রথম সিঁড়ির ধাপে। অন্ধকার মেঘ ঢাকা আকাশে চকিত বিদ্যুতের ঝলকের মতো পাঞ্চালির স্মৃতির আকাশে ঝল্‌সে উঠল একটি মুখ। যাত্রী দু'জন এসে গেছে। পাঞ্চালির দু'পা কে যেন আটকে দিয়েছে মাটিতে। কেউ যেন এক টুকরো পাথর ছুঁড়েছে পুকুরে। ঢেউ ক্রমাগত ছড়িয়ে যাচ্ছে কিনারার দিকে। রঘু! সত্যিই কি রঘু! একটি নাম অসংখ্য স্মৃতি, গাছের ডাল থেকে খসে-পড়া পাতার মতো উড়তে শুরু করল পাঞ্চালির ভাবনার মধ্যে। রঘু, কাজল।

রঘু আর কাজল ওভার-ব্রিজের ওঠবার মুখে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল। ওরাও চিনতে চেষ্টা করছিল পাঞ্চালিকে। মিলছিল না, কষ্ট হচ্ছিল চিনতে। শুধু চিনতে পারল দুটো চোখ দেখে।

মুখোমুখি দেখার দ্রুত ধাবমান মুহূর্তগুলোয় পাঞ্চালির মনে হল, চোখের পলক ফেলার মতো দ্রুত পার হয়ে গেল একটা যুগ। এই মুহূর্তে তাদের সঙ্গী নির্জন প্ল্যাটফর্ম, সংলগ্ন গাছপালা, মাঠ আর ঝোপঝাড় থেকে নিঃশব্দ পায়ে উঠে আসা খাঁ খাঁ শূন্যতা- মেশানো বাতাস, যা আলোর সঙ্গে মিশে রয়েছে। কাছে কোন গাছের ডাল থেকে একটা ঘুঘুর ডাক ভেসে আসতেই পাঞ্চালি সচেতন হল। তার গলা থেকে অস্ফুট বেরুলো—'রঘুদা, তুমি'!

'তুমি পাঞ্চালি!' রঘুর গলায় বিস্ময়। 'তোমাকে চিনতে পারছিলাম না, এত বদলে গেছ!'

রঘুর মনে পড়ল অনেক কথা। আরো কিছু কথা বলতে চাইল। পারল না। খেই হারিয়ে ফেলল। সাত বছরের জেলখানার অন্ধকারে মাকড়সার একনিষ্ঠ প্রত্যয়ে সে চিন্তার জাল বুনে এসেছে। অথচ এখন—দ্বিধা। অনিশ্চয়তা। এই সঙ্কোচকে দীর্ঘকালের বন্ধ জানলার কপাট খোলার মতো সজোরে ধাক্কা মারল রঘু।

আসলে সে প্রস্তুতিই ছিল না এই হঠাৎ দেখা হওয়ার জন্য। পূর্ণদৃষ্টিতে দেখল পাঞ্চালিকে। সব লাবণ্য উধাও তার মুখ আর শরীর থেকে। এক কঠিন নির্লিপ্ততার আবরণে উদাসীনতার আগুনে পোড়া তার মুখ। সারা অবয়বে কাঁকুরে মাটির রুক্ষতা ছড়িয়ে রয়েছে। শুধু আশ্চর্য জীবন্ত—পাঞ্চালির দুটো চোখ। ধারালো ক্ষুরের ফলায় ঝল্‌কানো সূর্যের রশ্মির মতো এক ধরনের অস্বাভাবিক দীপ্তি দুচোখের মণিতে। ভাল করে সরাসরি তাকালে মনে হয় নিঃশব্দে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে সব অনুভূতি।

'তোমরা বাড়ি যাবে তো?' অবস্থাকে সহজ করতে পাঞ্চালি বলল।

বাড়ি! রঘু ভাবল এক মুহূর্ত। একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল তাকে। যেন বাড়ির ছবিটা এখনও কুয়াশায় ঢাকা। কপালে সূক্ষ্ম কয়েকটা রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

'হ্যাঁ, আপাতত এখন আমার গন্তব্যস্থল বাড়িই। চল একসঙ্গেই যাই।'

'কবে ছাড়া পেলে?' পাঞ্চালি বলল। ওরা ওভারব্রিজ দিয়ে উঠতে লাগল।

'পরশু। কাল কলকাতায় এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম।'

'কাজলদা আর তুমি একই জেলেতে ছিলে?'

মাথা নাড়ল রঘু, 'হ্যাঁ।'

স্টেশনের গেটে টিকিট নেবার কেউ ছিল না। ওরা সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এল। স্টেশন চত্বর ফাঁকা। কোনো রিক্সা নেই। স্টেশন সংলগ্ন প্রকাণ্ড শিশুগাছটার তলায় জমে থাকা ছায়ায় গিয়ে ওরা দাঁড়ালো।

'তোমরা যে আসবে, বাড়ির লোক জানে?' পাঞ্চালি জানতে চাইল। শহর এখান থেকে অনেকটা দূর।

'হ্যাঁ, আমি খবর পাঠিয়ে দিয়েছি'। কাজল বলল।

এই সময় দূর থেকে সাইকেল চেপে আসতে দেখা গেল একটি তরুণকে। মোড় ঘুরে গাছের কাছাকাছি এসে ব্রেক চেপে নেমে পড়ল সে। বয়েস বছর পনেরো। পায়জামা আর সার্ট পরা। ঘামে ভিজে বুকে লেপ্টে রয়েছে জামা। সদ্য গোঁফ উঠেছে।

আমার ভাই সোনা। কাজল বলল। সোনা তখন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। বার বার পা থেকে মাথা অবধি কাজলকে দেখছে। রঘুকেও দেখছে। চোখে প্রশ্নের ছটা।

'তুই তাহলে চলে যা ওর সঙ্গে'। রঘু কাজলকে বলল।

'তোমরা যাবে কি করে? একটা রিক্সাও তো নেই।'

'সে যা হয় করব। তুই আর দেরি করিস না। যাবার পথে বাড়িতে বরং খবরটা দিয়ে চলে যা। ঠিক আছে? সন্ধ্যের দিকে চলে আয় আমার ওখানে।'

সাইকেলের রডে উঠে বসল কাজল। প্যাডেলে চাপ দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সোনা।

ছায়া থেকে রঘু আর পাঞ্চালি ফের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের মধ্যে নেমে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে এল বাস রাস্তায়। পশ্চিম থেকে সোজা পূর্বে চলে গেছে রাস্তাটা। রাস্তার ধারেই কয়েকটা স্টেশনারি, চা আর মিষ্টির দোকান। গাঁ আর শহর থেকে আসা যাত্রীরা এখানে চা জল-খাবার খায়। বাস ষ্টপেজ।

'চা খাবে? গলাটা শুকিয়ে রয়েছে'। পাঞ্চালির উদ্দেশে বলে, একটা দোকানের দিকে তাকালো রঘু। 'শ্রী চরণদার দোকানটা রয়েছে দেখছি'! রঘু বলল।

দোকানের কাছে পৌঁছে ওরা দেখল---ভেতরে মেঝেতে বসে হ্যারিকেনের ভুষোপড়া চিমনি সাফ করছে শ্রীচরণ। দোকানে ওদের ঢুকতে দেখে হাতের কাজ বন্ধ করে তাকালো। দোকানে আর কোন খদ্দের নেই।

'দুটো চা শ্রীচরণদা।' নড়বড়ে বেঞ্চিতে বসতে বসতে পাঞ্চালি বলল।

রঘু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল ঘরটাকে। তন্ন তন্ন করে। এই ঘরের সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

হ্যারিকেনটা দেয়ালের কাছে সরিয়ে রেখে শ্রীচরণদা উঠে এল উনুনের কাছে। নির্লিপ্ত ভাবলেশহীন মুখে কেটলি থেকে ফুটন্ত জল নিয়ে কাচের গেলাস দুটো ধুয়ে, কৌটো থেকে চা বার করে ঢেলে দিল ছাঁকনিতে। কেটলির গরম জল ঢেলে লিকার করে দুধ মেশালো।

রঘু বুঝতে পারল তাকে চিনতে পারেনি শ্রীচরণ। স্বাভাবিক। সাত-আট বছর কোন মানুষ চোখের আড়ালে থাকলে, স্লেটের খড়ির দাগ মুছে যাবার মতই, স্মৃতির চোখ থেকে মুছে যায় অস্তিত্বের দাগ। এতে মনে দুঃখ, বা বেদনা বোধ করে লাভ নেই।

কিন্তু চায়ের গেলাস দুটো সামনের টেবিলে রেখে, দুজনের মুখের দিকে অভ্যাসবশতঃ তাকাতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো শ্রীচরণ। রঘুর চোখমুখে বাইরের উত্তাপ-মাখা আলো আর ঘরের স্যাঁতানো অন্ধকার মাখামাখি হয়ে রয়েছে। একসঙ্গে বিস্ময় আর অনিশ্চিত জিজ্ঞাসা একাকার হয়ে খানিকটা বিমূঢ় করে তুলল শ্রীচরণকে। দোকানের পিছনে সজনে গাছে বসে একটা মাছরাঙা তীক্ষ্ণ গলায় বৃষ্টি চেয়ে ডেকে উঠল। 'শ্রীচরণদা, আমি। রঘু। ছাড়া পেয়েছি।'

উত্তরে শ্রীচরণ প্রথমে তার একডাঁটিওলা, যার অন্যটায় কার বাঁধা, ময়লা ঝাপ্‌সা চশমা আর চশমার পেছনে থাকা দু'চোখ আর মুখটাকে কাছে এগিয়ে আনল। ব্যাপারটা সত্যি কি না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে, তার বলিরেখা-ঢাকা খরায় ফাটা মাঠের মতো মুখটা, কেটে নিয়ে

যাওয়া ধানের গোড়ার মতো খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফসুদ্ধ মুখটা, এক লহমায় হঠাৎ ভেতর থেকে উঠে-আসা এক স্নেহ আর আবেগে প্লাবিত হয়ে, নরম হয়ে উঠল মাখনের কোমলতায়। নাকের ডগায় চশমাটা ঠিক করে অস্ফুট স্বরে কি যেন বলল বিড়বিড় করে। রঘু বুঝতে পারল শ্রীচরণদার চোখে জল এসে গেছে। বুঝতে পারছিল তার ওই বুকের মধ্যে চলছে একটা ভাঙচুর। ও উঠে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। দু'হাত দিয়ে ধরল শ্রীচরণের দুই কাঁধ। ঠোঁট দুটো কাঁপছিল শ্রীচরণের। কথা বলতে পারছিল না। রঘু ধরে বসালো তার পাশে, বেঞ্চিতে। পাঞ্চালি সরে জায়গা করে দিল।

শ্রীচরণ বলল, 'কোনো দিন তো ভাবিনি তুমি ছাড়া পাবে, ফিরে আসবে। বেঁচে থাক, দীর্ঘায়ু হও।'

ধুলোর ঝড় তুলে একটা বাস শহর থেকে এসে দাঁড়ালো দোকানের সামনে। যাবে দূর গ্রামাঞ্চলে। জনাকয়েক যাত্রী নেমে চলে গেল ষ্টেশনে, বাস ছেড়ে দিল।

চা খেতে খেতে অনেক খবর পেল রঘু। শ্রীচরণের বৌ কলেরা হয়ে মারা গেছে তিন বছর আগে। বাস চাপা পড়ে মারা গেছে বড়জামাই। বড়মেয়ে এসে রয়েছে কোলের দুটো বাচ্চা নিয়ে—বাবার কাছে। শ্রীচরণের সংসার দেখাশোনা করে সেই-ই। সাত বছর আগের সেই দিনগুলোর গন্ধ যেন ফিরে আসছে ঘ্রাণে। আবার ডাকল মাছরাঙা পাখিটা। বৃষ্টির প্রার্থনায়। কত বছর পাখির ডাক শুনতে পায়নি রঘু। তার সমস্ত সত্তা যেন তৃষণায় কাঠ হয়ে আছে—পাখির গলার আওয়াজ তৃষিতের মতো পান করল রঘু।

'চল, যাওয়া যাক'। হাত-ঘড়ি দেখে পাঞ্চালি উঠে দাঁড়ায়।

'চলি চরণদা। আবার আসব। তখন কথা হবে।' রঘু বলল। পাঞ্চালি মানিব্যাগ থেকে পয়সা বার করে দিতে প্রথমে আপত্তি করছিল শ্রীচরণ, পরে পয়সা রাখল।

'তোমার টাকা-কড়ি লাগবে? তাহলে দশটা টাকা রেখে দাও।'

দ্বিরুক্তি না করে টাকাটা হাত পেতে নিল রঘু। সত্যিই তার পকেট প্রায় শূন্য। ট্রেনের, বাসের টিকিট কিনে যৎসামান্য পকেটে পড়ে আছে। পাঞ্চালির সাংসারিক জ্ঞানের বাস্তব চেহারাটা ধরা পড়ে রঘুর কাছে। যে পাঞ্চালিকে আগে সে চিনত, সেও বদলে গেছে সময়ের এই তীব্র টানে।

ওরা হাঁটতে শুরু করল। সামনের পড়ে আছে কালো বিশাল মরা সাপের মতো রোদে-পোড়া পিচের রাস্তা। দু'পাশে ধানক্ষেত। এবড়ো-খেবড়ো। আদিগন্ত। সব পুড়ছে জ্যৈষ্ঠের প্রবল দহনে। ডান দিকে মাঠের মধ্য দিয়ে একটা আলপথ। ডানদিকে দূরে মাঠের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে-থাকা বড় বাগানটা দেখতে পেল রঘু। যেন দূর থেকে পরিচিতের ভঙ্গিতে ডালপালার হাত মেলে ধরে গাছেরা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। এর মাঝখান দিয়ে একটা শর্ট-কাট পথ আছে। রঘু পাঞ্চালি আলপথে নামার জন্য পা বাড়ালো। আর তখনই অনেক দূরে তাদের বিপরীত দিক থেকে তীব্র গতিতে ছুটে এল একটা মোটর বাইক। চালকের পেছনে বসে দু'জন। সকলের চোখে দামী বিদেশি সানগ্লাস, জিনসের প্যান্ট আর চোখ-ধাঁধানো রঙিন নাইলনের গেঞ্জি-পরা একমাথা ঝাঁকড়া চুল। গাল অবধি নামা মোটা জুলফি।

পাঞ্চালি রঘুর পাশে সরে দাঁড়ালো। গাড়িটা ওদের পাশ কাটিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাইকের মুখ ঘুরিয়ে ওরা চলে এল এদের পাশে। লাফ দিয়ে নামল চালক, আর তার দুই সঙ্গী।

লালটু! রঘু চিনতে পারে। পাঞ্চালি নিষ্পলক।

কোমরে দুহাত রেখে কয়েক সেকেন্ড লালটু রঘুকে দেখল। রঘুও স্থির শান্ত চোখে নিঃশব্দে নজর করতে লাগল লালটুর গতিবিধি। তারপর চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলল লালটু।

'তাহলে জেল থেকে বেঁচে ফিরে এলি?'

প্রথম কথা বলল লালটু। রিষ্ট-ওয়াচের ব্যাণ্ডটা খুলে আঁট করে পরল। ভারি মাংসল মুখ আর কপালে কয়েকটা কুঞ্চন দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ঠোঁটের দু' পাশে কাঁকড়াবিছের লেজের মতো ঝুলে-থাকা গোঁফে বোলালো।

তাই তো মনে হচ্ছে। রঘুর উত্তরে ঠাণ্ডা পাথরের মতো কাঠিন্য, আর উদাসীনতা। বুক-খোলা টাইট নাইলন গেঞ্জির খোলা অংশ দিয়ে ডান হাতটা ঢুকিয়ে পাঁজরের সঙ্গে চামড়ার ব্যাণ্ডে আটকানো রিভলবারটা বার করে আনল লালটু। বাঁ হাত দিয়ে কপাল থেকে গড়িয়ে-আসা জট-পাকানো ঘুড়ির সুতোর মতো ঘামের ধারাগুলো মুছে ফেলে হাসল। কালো পাকানো তারের মতো মোটা ভ্রূর তলায় চোখ দুটোয় একটা ঘৃণার নীল আগুন জ্বলে উঠল।

'তোকে এখনি খতম করে দিতে পারি। পুলিশ জানলেও কিছু বলবে না। বরং খুশিই হবে। আমার ইচ্ছাটাই এখন এ অঞ্চলের আইন। বুঝেছিস।'

রঘু উত্তর দিল না। তার চোখ স্থির নিবদ্ধ লালটুর হাত আর অস্ত্রটার ওপর।

নীরবতা। মোটর বাইকের চালু-থাকা ইঞ্জিনের শব্দটা ফাঁকা রাস্তা আর মাঠের নির্জনতাকে গভীর করে তুলছিল।

'তোকে একটা সুযোগ আমি দেব। আর, আমার দলে পেলে তো কথাই নেই। ওসব লাল বিপ্লব আর শ্রেণীশত্রু খতম হটিয়ে দে মাথা থেকে। এখন সবুজ টিপ আর গৈরিক সেলামের যুগ। মনে রাখিস কথাটা'। বলা শেষ করে রিভলবারটা লালটু যথাস্থানে রেখে দিল।

'আর কিছু বলার আছে?' খুব ধীর স্বাভাবিক গলায় রঘু জিজ্ঞাসা করে।

'এসে যখন পড়েছিস, তখন নতুন করে ঝামেলা পাকাতে চেষ্টা করিস না। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে বলে বেশি নিশ্চিন্ত হলে বোকামি করবি।'

'শুনে রাখলাম।'

'এটা এখন আমার এরিয়া। এখানে থাকতে হলে আমার কথামতো চলতে হবে। আমার দলে চলে আয়। টাকার অভাব হবে না। মিনিবাস, পারমিট সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'শুনলাম।'

'বিয়ে-থা করে সংসারী হ।' জীবনটাকে ভোগ কর। ওসব বিপ্লব-টিপ্লবের পাগলামি ভুলে যা, তাতে তোর ভাল হবে।'

লাফ দিয়ে মোটর বাইকে উঠে পড়ল লালটু। সঙ্গী দু'জনও নিঃশব্দে উঠে বসল কেরিয়ারে। মোটর বাইকের মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত স্পীড তুলে বেরিয়ে গেল রেল-কালভার্টের তলা দিয়ে গ্রামের দিকে।

রঘুর চোখ আর মাথার মধ্যে যেন ঘন কুয়াশা ঢুকে পড়েছে। খোলা আকাশ আর দু'পাশের মাঠের হা হা শূন্যতার মধ্যে তীব্র রোদও যেন ম্লান ধূসর মনে হল। পরিস্থিতি তার নিজস্ব উপস্থিতি জানান দিয়ে গেল।

'চল, যাওয়া যাক।' পাঞ্চালির গলার আওয়াজে সম্বিত ফিরে আসে রঘুর।

'হ্যাঁ, চল।'

ওরা পীচের রাস্তা ছেড়ে ফাঁকা ধানক্ষেতে নেমে পড়ল। উঁচু নিচু, এবড়ো খেবড়ো আলপথ ধরে নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়ল বড় বড় গাছে-ঢাকা ঝোপঝাড় আর মানুষ-সমান উঁচু বনতুলসি-ঢাকা বিরাট বাগানটার মধ্যে। জায়গাটাকে প্রায় অরণ্য বলা চলে। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে পায়ে-চলা একটা সরু রাস্তা। ছায়ার মধ্যে এসে রঘু স্বস্তি পেল। বহু-পরিচিত এই বাগান অরণ্য যেন সাদরে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নিল। পরিচিত ঝোপ, আগাছা, আর বুনো গাছের গন্ধ তাকে জড়িয়ে ধরল আষ্টেপৃষ্টে। অনেকক্ষণ দু'জনে কথা বলল না। গরমের কষ্টটা অনেকটা কমে গেছে। বড় বড় গাছের ঘন ডালপালা আর পাতা ছুঁয়ে যে হাওয়া বইছে, তাতে রয়েছে এক ধরনের ভেজা ঠাণ্ডা ভাব। আরাম বোধ করছিল দু'জনে। ওরা হেঁটে চলল বেশ কিছুক্ষণ।

'গলাটা বড্ড শুকিয়ে গেছে। আশেপাশে কল আছে?' রঘু জিজ্ঞাসা করল।

'আছে আর একটু এগিয়ে। একটা টিউকল'।

সামান্য এগিয়ে ডান দিকে চওড়া মাটির রাস্তায় এসে পৌছাল ওরা। পাশে টিউকল।

'এক পেট জল খাব। গলাটা খুব শুকিয়ে গেছে'।

ঝুঁকে দু'হাত জড়ো করে টিউকলের মুখের কাছে মুখটাকে নিয়ে এল রঘু। টিউকলের হাতল ধরে টিপতে লাগল পাঞ্চালি। জল খেয়ে বেশ করে মুখ,গলা, ঘাড় ধুয়ে নেয় রঘু। চোখে জলের ঝাপটা দেয়।

'তুমি খাবে না?'

'খাব', যেন কথাটা বলে অনিশ্চিত হয়ে কলের মুখের কাছে এগিয়ে এল পাঞ্চালি। অনেকটা প্রার্থনার ভঙ্গিতে দু'হাতের অঞ্জলিতে মুখ রাখল। রঘু হাতলের চাপ দিয়ে জল তুলে আনল। অনেকটা জল খেল পাঞ্চালি। খুবই তৃষিত ছিল—বোঝা যায় জলপানের ভঙ্গিতে। অথচ ভ্রূক্ষেপহীন নির্দয়তায় তার এই আত্মপীড়ন। নিজেকে আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত করা। রঘুর গলায় কি একটা কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠল। রঘু জানে কেন পাঞ্চালির এই আত্মদহন।

দু'জনে আবার হাঁটতে শুরু করল। এখন রাস্তার দু'পাশে আম, অশ্বত্থ, বট আর সজনে গাছের ছায়া ছড়ানো রয়েছে। এখনও অনেকটা সময় হাঁটতে হবে ওদের। এবার মুখ খুলল রঘু। অনেকদিনের বন্ধ মরচে-পড়া তালার মধ্যে কেউ চাবি ঢুকিয়ে জোরে চাপ দিয়ে খুলে দিয়েছে। এলাকার গত সাত-আট বছরের পরিস্থিতির রিপোর্ট রঘুর জানা হয়ে গেল। এই জানাটাই ছিল তার প্রথম জরুরি কাজ। লালটুর আকস্মিক আবির্ভাব আর কথাবার্তায় যথেষ্ট ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই মিলে গেছে রঘুর। একটা সম্পূর্ণ বৈরী প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। সাত বছরের জেলখানার জীবন তার অতীত আর বর্তমানের মধ্যে যে নতুন করে জমি জুড়ে দিয়েছে তা এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ অপরিচিত। যে অতীতের, যা সাত বছর আগে বর্তমান ছিল, হাত ধরে সে জেলে ঢুকেছিল, সে আজ এক নতুন জমিতে হাত ধরে পৌছে দিল—সে পা বাড়িয়েছে সাত বছর আগেকার জীবন থেকে।

'সাবধান', কথাটা উচ্চারণ করেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাঞ্চালির হাতটা ধরে ওকে থামিয়ে দিল রঘু। একটা গোখরো সাপ আকস্মিকভাবে রাস্তার ডানধারের ঝোপ থেকে চকিতে বেরিয়ে এসেছে। একবার ফণা তুলেই মাথা নামিয়ে দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে বাঁ দিকের আমবাগানে ঢুকে গেল। আর একটু হলেই সাপটার গায়ে পা দিয়ে ফেলত পাঞ্চালি।

'মানসিক সতর্কতাকে এখনও হারিয়ে ফেলিনি দেখছি'। বুকের মধ্যে হঠাৎ আটকে-যাওয়া নিঃশ্বাস বার করে দিল রঘু। ঘটনার আকস্মিকতায় পাঞ্চালিও ক্ষণিকের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল।

'জেলখানা একজন মানুষের বেঁচে থাকার অনেক মূল্যবান উপাদান নষ্ট করে দিয়ে তাকে ছিবড়ে করে দেয়। আমার ক্ষেত্রে পারেনি মনে হচ্ছে।' লঘু স্বরে খানিকটা কৌতুকের ভঙ্গিতে কথাটা বলল রঘু। পাঞ্চালির হাতটা সে ছেড়ে দিল।

'কি আর হত আমার? সাপটা ছোবল দিলে বড় জোর মরতাম। তার বেশি....' কথাটা শেষ না করে স্বরটা পাল্টে ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সাপের বিষে মৃত্যু নাও হতে পারে। আমার শরীরে অনেক বিষ জমে রয়েছে।'

নিজের মৃত্যুর সম্ভাব্যতাটা এত ঘন উদাসীনতা আর নির্লিপ্ততা মাখিয়ে উচ্চারণ করল পাঞ্চালি যে, রঘু ভেতর থেকে একটা ধাক্কা খেল। অনেকটা অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে পথ চলতে চলতে আচমকা হোঁচট-খাওয়া মানুষের মতো। যেন জগৎ জীবন আর ঘিরে-থাকা পারিপার্শ্বিকতা থেকে, নিজেকে নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনো মানুষ অনেক

দূরে দাঁড়িয়ে, জীবন থেকে আর কিছু পেতে অনাগ্রহী—সেই মানুষের গলা শুনল রঘু। জীবন যাপন যার কাছে তুচ্ছ আর অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এমন হবার কথা ছিল না।

পাঞ্চালির শেষ কথাগুলো আগুনে পোড়া ছুঁচের মতো রঘুর বুকের মধ্যে যন্ত্রণা সৃষ্টি করল। মনে পড়ল একটু আগে দেখা লালটুর মুখ। সাত বছর আগে দেখা আর এক পাঞ্চালিকে মনে পড়ল। একটা স্বপ্নের সেতুতে তারা পরস্পর বাঁধা ছিল। এ পাঞ্চালিকে চিনতে তার কষ্ট হচ্ছে। ওর তাকাবার ভঙ্গী, ভ্রূ-কুঞ্চন, কথা বলার মধ্যে ইচ্ছাকৃত নিস্পৃহতার সুর—সমস্ত মিলে তার পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে একজন— যে চেনা দিয়েই অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে সহসাই। সময় বয়ে গেছে। সময়। টের পেল রঘু।

একটা খালি রিক্সা দেখতে পেল ওরা আরো কিছুদূর হেঁটে। দু'জনে উঠে পড়ল রিক্সা থামিয়ে। আরো কিছুটা গেলেই বাঁ দিকে পাঞ্চালিদের বাড়ির রাস্তা। ডান দিকের রাস্তা ধরে আরো চল্লিশ মিনিট হাঁটলে রঘুর বাড়ির পাড়ায় পৌঁছানো যাবে।

পাঞ্চালি নেমে পড়বার সময় রঘু ঝুঁকে পড়ে বলল—'আমি কয়েকদিন বাদে তোমাদের বাড়িতে যাব। তোমার তো ফিরতে-ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়?'

'হ্যাঁ', মাথা নেড়ে উত্তর দেয় পাঞ্চালি। রঘু চলে গেল। ওর চলে যাওয়ার দিকে সামান্য সময় তাকিয়ে থেকে বাড়িমুখো হয় পাঞ্চালি। পরস্পরবিরোধী অনেকগুলো ঘটনা তার স্বাভাবিক চিন্তাস্রোতকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। একটা চিন্‌চিনে জ্বালা ঘাড় কপাল আর মাথার মধ্যে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

অসময়ে পাঞ্চালিকে ফিরে আসতে দেখে কিছুটা বিস্ময় আর শঙ্কা নিয়ে পাঞ্চালির মা পুষ্পময়ী বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

'স্কুলের ছুটি হয়ে গেল। প্রাক্তন হেড-মিস্ট্রেস কাল রাতে মারা গেছেন।' বারান্দায় উঠে দেয়ালের ধারে চটি খুলতে খুলতে বলল পাঞ্চালি। দেয়ালের হুকে টাঙিয়ে দিল ব্যাগটা। বসে পড়ল রঙচটা পুরনো চেয়ারটায়।

'একটা হাত-পাখা দাও তো। একটু জিরিয়ে আগে স্নান করব।' তারপর বলল, 'রঘুদা ছাড়া পেয়েছে—দেখা হল। একই ট্রেনে এলাম।'

উঠোনেই সান-বাঁধানো কুয়োতলা। সূর্য মাঝ-আকাশ পেরিয়ে গেছে। বড় শিউলিগাছটার ছায়া বেঁকে এসে ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে। এ পাড়ার এটাই শেষ বাড়ি। এরপর কোনো বসত-বাড়ি নেই। খোলা ধানক্ষেত। দূরে রেল লাইন দেখা যায়।

কোমর-সমান উঁচু পাড়-বাঁধানো কুয়োর পাড়ে দড়ি-বালতি রেখে, ভেতরে স্থির জলের দিকে তাকালো। দেয়াল ঘেঁষে পুঞ্জ পুঞ্জ ঠাণ্ডা অন্ধকার। নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে নজর পড়ল পাঞ্চালির। পেছন থেকে আলোর ছটা এসে জলের মধ্যে তার মুখের ছবিকে কেমন অপরিচিত করে তুলেছে। নিজের মুখ চোখ নাক দেখতে পেল না। শুধু মাথার ওপর নীল আকাশটা গোল বড় থালার মতো যেন লেগে রয়েছে তার প্রতিবিম্বের ওপর। একাগ্র তন্ময় হয়ে নিজের মুখের ছবি দেখতে দেখতে বালতিটাকে দড়ি ধরে ছুঁড়ে দেয় সে স্থির জলে। দেখল—ঢেউয়ের মধ্যে তার গোটা মুখ নীল আকাশের টুকরো সমেত ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেল এক-লহমায়। দ্রুত বালতি ভরে জল তুলে মাথায় ঢালতেই একটা আরামের মধুর অনুভূতি তার তাপদগ্ধ গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। এই স্নান যেন অন্য দিনের মতো নয়। আজ অন্য রকম লাগছে। কিন্তু ভেতরের মরুভূমির তপ্ত বালির মতো হল্‌কা ছড়ানো ঝল্‌সে-যাওয়া সত্তাটার জ্বালা যেন বাইরের এই ঠাণ্ডা জলে কমবে না।

(২)

কয়েকদিনের মধ্যে রঘু বুঝতে পারে সাত বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে। একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে—কয়েকদিনের মধ্যে তা টের পেল। তবে আপাতত সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখাই মনস্থ করল। গোটা অবস্থাটা খতিয়ে দেখা দরকার। মাঝে মাঝে সে বিব্রত আর অস্থির হয়ে পড়ত। রাস্তায় হাঁটলে, বাজারে বাজার করতে গেলে, আর পরিচিত সেলুনে দাড়ি কামাতে গিয়ে, তার জেলখানায় ঢোকা আর বেরিয়ে আসার মধ্যেকার চলে যাওয়া সাত বছরের পরিবর্তনের চাপটা টের পাচ্ছিল সে। অবশ্য অন্য আর একটা টেন্‌শন্ ছিলই, তা হল বাম দলগুলো নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা দখলের ফলে যে রাজনৈতিক ভারসাম্য পাল্টেছে তাতে কংগ্রেসী সমর্থকদের সঙ্গে একটা রক্তাক্ত সংঘর্ষ আসন্ন বলে মনে হচ্ছিল গোড়ার দিকে। তবে সেটা ঘটল না। নতুন সরকার শান্তি অক্ষুণ্ন রাখতে আবেদন করেছে। সর্বজনীন ক্ষমা প্রদর্শন ঘোষিত হয়েছে।

রঘু দেখল—তার উপর পুলিশের নজর অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় থানা থেকে এস.বি-র লোক ডেকে নিয়ে গিয়ে যা বলল তার মানে দাঁড়ায়—সে যেন কোনো রাজনৈতিক কার্য-কলাপে নিজেকে আর না জড়ায়। তার প্রতিপক্ষের লোকেদের চোখেমুখে ঘৃণা,ভয়, সন্দেহ আর অবিশ্বাস-মেশানো সতর্কতাও টের পাচ্ছিল রঘু। তবে প্রতিটি গতিবিধির ওপর নজর রাখার চেষ্টা চলছে। জল থিতিয়ে আসা দরকার। সেই সময়টুকু সে দেবে। তার উপস্থিতিকে স্বাভাবিক করে সহজ স্রোতে মিশিয়ে দিতে হবে প্রথমে।

অন্যদিকে গোপনে বহু মানুষ, একদা যাদের মধ্যে, যে পাড়ায়, যে বাড়িতে ছিল তার সাবলীল নিশ্চিন্ত ঘোরাফেরা, ছিল আশ্রয়, স্বচ্ছন্দ অবস্থান—সেখান থেকে পৌঁছতে লাগল সাত বছরের এক রক্তমাখা প্রতিবিপ্লবী নৃশংস অত্যাচার, ধর্ষণ আর দমন-পীড়নের ইতিবৃত্ত, খণ্ড খণ্ড পাতার মতো যা ক্রমাগত জমা হতে লাগল তার সামনে, একটা বইয়ের মতো। সর্বত্রই একটি নাম। লালটু। যে নেতৃত্ব দিয়েছে। পুলিশের সহায়তায় খুন করেছে বহু কমরেডকে। ঠাণ্ডা মাথায়। ধরিয়ে দিয়েছে বহু কর্মীকে।

লালটু ঢুকে পড়েছিল তাদের পার্টিতে। ছদ্মবেশে। তখন জানা যায়নি। এখন সে এই শহরের মুকুটহীন সম্রাট। এই ক'বছরে বিপুল সম্পত্তি আর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে। ডি.এম. থেকে শুরু করে থানার ও.সি আর সবশেষ কনস্টেবলটিও তার অনুগত প্রজা। তিনটে মিনিবাস, দুটো দূরপাল্লার বাস খাটছে বিভিন্ন রুটে; শহরের জনবহুল বাজার এলাকায় তিনটে দোকান। লাল মোটর বাইকে চেপে বডিগার্ড সঙ্গে নিয়ে শহর, আর শহর ঘেরা গ্রামাঞ্চল দাপিয়ে বেড়ায়। কারুর টু-শব্দ করার সাহস নেই।

লালটুর উত্থানের গোপন ইতিহাসটা খুব দ্রুত সংগ্রহ করতে পারল রঘু। পার্টি বিপর্যয়ের মুখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠেছিল লালটু—শহরের অধিবাসীদের চোখের সামনে। এ শহরে 'অ্যান্টি-নকশাল' নাগরিক প্রতিরোধ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। বহু 'অ্যাক্‌শন' করেছে পুলিশি সহায়তায়, তাদের পার্টি-সমর্থক আর কর্মীদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির বিশাল জাল ছড়ানো রয়েছে তার। লালটু মানে 'টেরর'। একাত্তর থেকে ছিয়াত্তর—এই ক'বছরে দ্রুত সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে চলে এসেছে শীর্ষস্থানে। লালটুকে চ্যালেঞ্জ করার মতো একজন লোকও নেই এই অঞ্চলে। অথচ সেই লালটু রঘুর বেঁচে ফিরে আসায় বিচলিত। শঙ্কিত।

একমাস চলে গেছে। রঘুর অস্তিত্ব এখন, আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের কাছে সহনীয় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কেউ আর তেমন করে লক্ষ করছে না সন্দেহ-মেশানো কৌতূহল নিয়ে। চারদিকের আবহাওয়া আর পরিস্থিতির তেমন কোনো নজর পড়ার মতো পরিবর্তন ঘটেনি। নতুন ফ্রন্ট সরকার তীক্ষ্ণ নজর রাখছে যাতে রক্তপাত না ঘটে। কেননা বদলা আর

প্রতিশোধ নেবার নিঃশব্দ সংলাপ মফঃস্বল শহর-আর শহর-ঘেঁষা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছিল ক্রমাগত।

বাইরে লোক-দেখানো নিষ্ক্রিয়তা দেখিয়ে রঘু কাজলের সঙ্গে আস্তে আস্তে নড়াচড়া শুরু করল। যে ভূমি তারা তৈরি করেছিল, সেই ভূমি কি অবস্থায় আছে সেটা জানতে হবে। পুরনো সমর্থকরা কি অবস্থায় কতটা বদলেছে তাও জানতে হবে। তাৎক্ষণিক আবেগের বশে ঝাঁপিয়ে পড়লে চলবে না। অনুসন্ধান করে রঘু জানতে পেরেছে বহু অঞ্চল আর গোপন আশ্রয়স্থল এখনও অটুট রয়েছে। পুলিশ জানতে পারেনি। তবে, সর্বত্রই একটি নাম শুনতে পেল—লাল্টু। গোটা অঞ্চলে তার সাঙ্গোপাঙ্গ—যার নাম নাগরিক প্রতিরোধ বাহিনী—নৃশংস অত্যাচার আর নিপীড়ন চালিয়েছে। পেছনে পুলিশ নিয়ে। যে কোন বাড়ি থেকে, পথ থেকে মেয়েদের তুলে নিয়ে গেছে লাল্টু—বাধা দেবার মতো কেউ ছিল না। মুখ বুজে থেকেছে মানুষজন। রঘুর কাছে একটা জিনিস স্পষ্ট হল—সর্বব্যাপ্ত শ্বেত-সন্ত্রাসের আতঙ্ক মানুষের জীবনের পথঘাট—সমস্ত কিছুকে ঢেকে রেখেছে। দম-বন্ধ-করা এক অসহনীয় অবস্থা। ছোট ছোট গোপন মিটিংয়ে মুখ খুলছে মানুষজন। দাবি করছে—পুনরুজ্জীবিত করা হোক পার্টিকে। এই গলা-টিপে-ধরা প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাসের রক্তমাখা হাতকে আলগা করতে দরকার পাল্টা আঘাত। অতিষ্ঠ মানুষজন মনে-প্রাণে তাই-ই কামনা করছে।

বর্ষা শেষ হয়ে হেমন্ত এসে পেরিয়ে গেল প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির পালাবদলের তীব্র উত্তেজনা-ভরা মধ্যবর্তী সময়ের অনিশ্চয়তা, আর কি-হয় কি-হয় অবস্থার টান্‌টান্ অবস্থাটা স্থিমিত হয়ে এল ক্রমশ। কেন্দ্রেও ক্ষমতা দখল করেছে এর আগে জনতা দল। আপাত স্বস্তির ভাব ফিরে আসছে জনজীবনে। মফঃস্বল শহরের জীবন আবার তার ধঁরাবাঁধা রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছে মন্থর পায়ে। রঘু গোটা দুই টিউশনি জোগাড় করে নিয়েছে এর মধ্যেই। পরিচিত অনেকেই তার সঙ্গে কথাবার্তায় সহজ হতে পারতো না, এড়িয়ে চলতো নানা ছল-ছুতোয়—বুঝতে পারতো রঘু! এর জন্য তার মধ্যে কোনো ক্ষোভ বা দুঃখবোধ জন্মাতো না। মনে হত এটাই স্বাভাবিক। গোটা অঞ্চলে তার নাম ফিরতো ঘরে ঘরে, মুখে মুখে। লুম্পেন, চোর, আর হরেক রকম দুষ্কৃতকারীরা উৎখাত হয়েছিল তাদের 'এ্যাক্‌শনে'। যমের মতো ভয় করতো তাদের। বিশেষ করে তাকে। তাই, ফিরে আসার পর ছ'মাস কেটে যাবার পর, প্রকাশ্যে তার কোনো কাজ দেখতে না পেয়ে, কোনো ঘটনা না ঘটায় পুরনো দিনের মতো তার অস্তিত্ব অজ্ঞাতসারেই ফের স্বীকৃত হয়ে গেল। দীর্ঘ সময়ের আত্মগোপন-করা জীবনের কষ্টকর অভিজ্ঞতায় পোড় খেয়ে আবার প্রকাশ্য জীবনের আটপৌরে ক্লান্তিকর গতানুগতিকতায় নিজেকে সমর্পণ করা যে কত কঠিন আর যন্ত্রণাময় তা মর্মে মর্মে অনুভব করছিল রঘু আর তার বন্ধুরা।

এই সময়ের মধ্যে কয়েকবার পাঞ্চালিদের বাড়িতে ঘুরে এসেছে রঘু। এই যাওয়ার পিছনে ছিল এক ধরনের আত্মগ্লানি। এক একটা অসহনীয় মুহূর্তে তার মনে হত, হয়তো পাঞ্চালির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললে তার মানসিক যন্ত্রণার উপশম হবে। পাঞ্চালিকে ভালোবাসতো রঘু। হঠাৎ ধরা পড়ে জেলে আটক না হলে হয়তো বিয়ে করার সিদ্ধান্তে যেত সে। সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। পাঞ্চালির বর্তমান মানসিক অবস্থা আর ভাবনার হদিস করাও ছিল তার উদ্দেশ্য। তবে ঘুণাক্ষরেও পাঞ্চালির ব্যক্তিজীবনের বিপর্যয়ের ইতিহাসকে অতীত থেকে খুঁড়ে আনতে চেষ্টা করেনি রঘু। বরং চেষ্টা করেছে নানাভাবে তাকে রাজনৈতিক আলোচনায় অংশীদার করতে। কিন্তু কোনো সাড়া মেলেনি পাঞ্চালির তরফ থেকে। কিন্তু ভাঙতে পারেনি পাঞ্চালির সত্তার মধ্যে গেড়ে বসে-থাকা বরফের চাইয়ের মতো এক হিমশীতল কঠিন উদাসীনতাকে। পাঞ্চালির মা পুষ্পময়ী খুশি হতেন রঘুকে দেখে। কিন্তু কঠিন নীরবতার পাঁচিল ঘেরা পাঞ্চালিকে একদিনও স্বাভাবিকতায় পা ফেলতে দেখল না রঘু। অথচ পাঞ্চালি

চা করে পৌঁছে দিয়ে যেত টেবিলে। চৌকির এককোণে বসে নিঃশব্দে শুনতো পুষ্পময়ীর সঙ্গে রঘুর আলোচনা। হয়তো কথা বলল কোনো প্রসঙ্গে—তবে তা একান্ত মামুলি। তার মধ্যে জীবনের কোনো উত্তাপ নেই। রঘুর মনে হত যেন হঠাৎ বাজের আগুনে পাঞ্চালির মনের সব অনুভূতিগুলো পুড়ে ঝল্সে গেছে। তাই পাঞ্চালি এত নিরুত্তাপ, এত নিষ্প্রাণ। এ জীবন থেকে যেন আর কিছু পাবার নেই তার। শুধু জ্বল জ্বল করে চোখের কালো মণি দুটি।

একদিন সবে শীত পড়তে শুরু করেছে, কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেছে। শীত করছিল রঘুর। টেবিলে হ্যারিকেন জ্বলছিল। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল দূরে বিস্তৃত মাঠ। আকাশে সরু একফালি চাঁদ।

'আমি আন্ডার-গ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছি। তোমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়তো হয়ে উঠবে না।' রঘু বলল।

হাঁটুর ওপর দু'হাত জড়ো করে বসে ছিল পাঞ্চালি। নিচু মুখ দ্রুত তুলে দেখল রঘুকে।

'আবার শুরু করবে?'

'হ্যাঁ, ঘরটা গুছিয়ে ফেলা দরকার ছিল। যে-সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তা জুড়ে ফেলার কাজ শেষ হয়েছে। এলাকার মানুষ চাইছে, যাতে আমরা নতুন করে রাজনৈতিক কাজ শুরু করি। পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। 'এ্যাক্‌শন' না করলে ভয় ভাঙবে না মানুষের। এক এক সময় মনে হয় যে জেলখানায় সাত-সাতটা বছর কাটিয়ে এলাম, যে অত্যাচার হত্যা দেখে এসেছি, এ যেন তার থেকেও আরো ভয়ঙ্কর এক অদৃশ্য জেলখানায় এসে পড়েছি। যত অত্যাচার নিপীড়ন আর মা-বোনেদের ওপর পাশবিকতার, বর্বরতার বিবরণ মানুষেরা তুলে ধরেছে, তুমি বিশ্বাস কর পাঞ্চালি, শুনতে শুনতে প্রতিদিন নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি, চাবুক মেরেছি নিজের অসহায়তাকে, রাতের পর রাত ঘুমোতে পারিনি। শুধু আমি একা নই, আরো আরো অনেকে। এক নিঃশ্বাসে তীব্র যন্ত্রণায় কথাগুলো বলে দম নিল রঘু। ওর গলার মধ্যে একটা যন্ত্রণা দলা পাকাচ্ছিল।

'আমরা তো কেউ বেঁচে নেই। কেউ না। আমরা সব নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছি। এখানে মানুষের পাশে কেউ নেই। নিজের হাতে নিজেকে মারা চরম কাপুরুষতা, তাই খিদে পেলে দুটি খেতে হয়। মানুষের দেহগুলো টিকে রয়েছে অভ্যাসের যন্ত্রে'। পাঞ্চালি বলল। গলায় সেই বরফের মতো ঠাণ্ডা শীতলতা। যে উচ্চারণে কোনো রক্তের উষ্ণতা নেই।

'আমি চাইছিলাম তুমি অন্তত কিছু অভিযোগ কর। 'চার্জ' কর আমাকে। আমার আত্মকষ্ট আর আত্মগ্লানি অন্তত কিছু কমে যেত। তুমি তো কোন কথাই বললে না! আজও। একদিন আমরা যৌথজীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমাদের সেই স্বপ্নের জীবন অনেক, অনেক দূরে সরে গেছে। জেল থেকে ফিরে দেখলাম জীবনের চারদিকে কালো পোড়া ছাই ছড়িয়ে রয়েছে। ছাই সরিয়ে মাটির মুখ খুঁজে বার করতে হচ্ছে। অনেক সময় লাগবে। অনেক ধৈর্য দরকার।'

রাত বাড়ছিল। খোলা জানালা আর বারান্দা দিয়ে অল্প অল্প হাওয়া আসছে। ঝিঁঝিঁর ডাক ভেসে আসছে। দুটো জোনাকি, ঘরে উড়ে এসে, দেয়াল আর কড়িকাঠের আশপাশে উড়ছে। আর আছে দুজনের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

'আমি উঠি।' রঘু উঠে পড়ল। পাঞ্চালি ওকে এগিয়ে দিতে গেল। পুষ্পময়ী দু'তলার ঘরে শুয়ে পড়েছেন অনেকক্ষণ।

রঘু নেমে এল মাঠের আলপথে। আকাশে ফালি চাঁদ থেকে ঝরে-পড়া ঘষা কাচের মতো ম্লান জ্যোৎস্না, রঙ-উঠে-যাওয়া কাপড়ের মতো ছড়িয়ে রয়েছে মাঠের মধ্যে। মাঝামাঝি পৌঁছে চকিতে মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকালো রঘু। দরজায় শরীরের ভর দিয়ে পাঞ্চালি দাঁড়িয়ে রয়েছে চিত্রার্পিতের মতো। মনে হচ্ছে, ভেতর থেকে ক্রমাগত শুকিয়ে যেতে থাকা

একটা গাছের দেহ। রঘুর বুকের মধ্যে অস্থির যন্ত্রণার এক পাখি পাখা ঝাপ্‌টে উড়তে শুরু করেছে। অনেক দূরে মাঠের শেষপ্রান্তে রাস্তা লক্ষ্য করে যথাসম্ভব দ্রুত হাঁটতে শুরু করল রঘু। অত্যাচারী ঘাতক সময় নিঃশব্দে হাসছে। ঐ হাসিটাকে পাল্টে দিতে হবে।

দেখতে দেখতে অঘ্রাণ শেষ হয়ে পৌষ মাস এসে পড়ল। লিফলেটিং করে দিয়ে শুরু হল প্রাথমিক কাজ। পার্টির নামে পোষ্টার পড়ল সর্বত্র। মানুষের কাছে আহ্বান রাখা হল অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। বেশ কয়েকটি হত্যার আর ধর্ষণের ঘটনার উল্লেখ করে, লিফলেটে নাম করে বলা হল—কারা দায়ী।

পৌষের মাঝামাঝি সেদিন। মধ্য রাত। গোটা শহর নিঝুম। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে। আকাশ সোনার তরমুজের মতো পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ। নির্জন রাস্তা দিয়ে মোটর বাইক নিয়ে দ্রুত আসছিল লালটু। পেছনে দুই সঙ্গী। পথের ওপর আড়ে আড়ে পড়ে থাকা পিচের ড্রাম পড়ে থাকতে দেখে জোরে ব্রেক কষে নেমে পড়ল লালটু। অশ্রাব্য গালাগাল বেরিয়ে এল মুখ থেকে। একদিকে কয়েকটা মাটির আর করোগেটের ঘর। তিনজনে নিচু হয়ে ড্রামে হাত দিতেই আশপাশ থেকে ছুটে এল কয়েকটা বুলেট। লালটু মাথা নিচু করে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাস্তায়। সঙ্গী দু'জন গুলি খেয়ে নিঃশব্দে কাটা গাছের মতো পড়ে রইল রাস্তায়। লালটুর আঘাত লাগেনি। এড়িয়ে গেছে।

কয়েকজন বেরিয়ে এল আশপাশের সেই বাড়ি আর গাছের ছায়া ভেঙে। দু'পাশে চাঁদের আলোয় দুলছে গাছের ছায়া।

লাফ দিয়ে মাঠে পড়ল লালটু। তারপর এঁকে-বেঁকে দূরের বাড়িগুলোর দিকে দৌড়তে লাগল সমস্ত শক্তি দিয়ে। তার অনুসরণকারীরাও সমান গতিতে বৃত্তাকারে গোটা মাঠ ঘিরে অনুসরণ করে চলল তাকে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে লালটু। একটা নিরাপদ জায়গা যে-ভাবেই হোক, দরকার। আবার গুলির শব্দ হল। এবারেও এড়িয়ে গেল সে আশ্চর্যভাবে। একটিমাত্র কথা তার মগজে—তাকে লুকিয়ে পড়তে হবে এদের চোখ এড়িয়ে।

সামনে মিউনিসিপ্যালিটির বড় কাঁচা ড্রেন। প্রচণ্ড শক্তিতে লাফ দিয়ে নর্দমা পেরিয়ে কাঁচা রাস্তায় পড়ল লালটু। ফের কয়েকটা বুলেট তার শরীরের আশপাশ দিয়ে বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেল। এবারও লাগল না। চারদিকে বড় বড় গাছের ঘন জমাট ছায়া। একটা পাড়া। দেখল সামনে দু'তলা একটা বাড়ি। বাউণ্ডারি পাঁচিল—বুক সমান। একবার ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গা ঢাকা দিতে পারলে...তখনি তার নজরে পড়ল—গাছের ছায়ায় গা মিশিয়ে কে একজন দাঁড়িয়ে। চাঁদের টুকরো আলোয় তার হাতের ধারালো অস্ত্র ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। লাফ দিয়ে পাঁচিলের মাথা দু'হাতে আঁকড়ে ধরল লালটু। নিঃশব্দে সে ঘেরাও হয়ে পড়ছে। ক্রমশ বৃত্ত ছোট হয়ে আসছে। ক্রমশ। পায়ের শব্দ ভয়ঙ্কর তারের বাজনার মতো কানের মধ্যে আছড়ে পড়ছে। কোনো মতে ভারি শরীরটা ঘষটে তুলে আনল পাঁচিলের মাথায়। এই পাঁচিল এই মুহূর্তে তার দরকার ছিল। বাইরে মৃত্যু, ভেতরে জীবনের অস্পষ্ট হাতছানি।

শরীরটাকে আলগা করে হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল লালটু। চারদিকে গাছের ঘন ছায়া। এলো-মেলো চাঁদের আলোর খণ্ড খণ্ড অংশ এদিক ওদিক ছায়ার শরীরকে ছিন্ন করেছে। লালটুর হৃদপিণ্ড যেন লাফাতে লাফাতে গলায় চলে এসেছে। ভয়ে, উত্তেজনায় ফেটে যেতে চাইছে ফুসফুস। চোখে যেন অন্ধকার কুয়াশা জমছে। একটা সিমেন্ট-বাঁধানো কুয়োতলা। পাঁচিল লাগোয়া দরজা বন্ধ। একটা লম্বা দালান দেখা যাচ্ছে।

বাইরে কার গলা—এ বাড়িতেই ঢুকেছে। সামনে আলো আর আঁধারের সতরঞ্চি-মোড়া দালান। দু'তলায় যাবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন এক প্রৌঢ়া মহিলা। হাতে হ্যারিকেন। —'কে?'

বন্ধ দরজায় করাঘাতের শব্দ।

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে মহিলার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লালটু। চেনা মুখ। বুকের মধ্যে আবার হিমস্রোত। জল থেকে তোলা মাছের মতো ফুসফুসে নিঃশ্বাস লাফাচ্ছে।

'মাসিমা, আমায় বাঁচান। আপনার পায়ে পড়ি।' লালটু গলায় জন্তুর গোঙানি। দু'পা পেছিয়ে গেলেন মহিলা। দু'চোখে বিস্ময়, আতঙ্ক, ঘৃণা ফুটে উঠল। বারান্দার তলায় বাঁধানো উঠোনে থৈ থৈ করছে পৌষের হিম-মাখা চাঁদের আলো। হিম ঝরছে আকাশ থেকে। ঝরা শিউলির গন্ধ মেখে ভারি হয়ে উঠছে বাতাসের শরীর।

বন্ধ দরজায় ধাক্কার শব্দ।

একটা চাপা বিকৃত শব্দ বেরিয়ে এল লালটুর গলা থেকে। মুখ ভর্তি ঘাম। ঘাম সারা শরীরে। দালান সংলগ্ন ঘরের আধ-ভেজানো পাল্লা ঠেলে অন্ধকারে সাপের মতো বুক ঘষটে ঢুকে পড়ল। সামনে একটা বড় চৌকি। তার তলায় সেঁধিয়ে দিল শরীরটাকে।

ওরা পাঁচিল টপকে, গাছের ছায়া মাড়িয়ে এসে পড়ল বাঁধানো উঠোনে। প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্র।

রঘু!

পুষ্পময়ী হ্যারিকেনটা দালানের মেঝেতে নামিয়ে রেখে উঠোনে নেমে এলেন।

সব চেনামুখ। রঘুর হাতে ষ্টেন।

'লালটু এ বাড়িতে ঢুকেছে।' দৃঢ় শান্ত গলা রঘুর।

পুষ্পময়ী মাথা ঘুরিয়ে দালানের লাগোয়া অন্ধকার ঘরের দিকে তাকালেন। কোনো শব্দ বেরুলো না গলা থেকে।

রঘু, আর অন্য সকলে লাফ দিয়ে চলে এল ঘরের সামনে। লাথির ধাক্কায় দরজা খুলে ফেলল।

'লালটু, বেরিয়ে আয় ঘর থেকে। পালাতে পারবি না। ভেবেছিলিস, আমরা সব খতম হয়ে যাব। চাকাটা ঘুরতে শুরু করেছে আবার।' ঠাণ্ডা শান্ত গলায় বলল রঘু।

কোনো শব্দ নেই।

'বেরিয়ে আয়। সামনে দাঁড়া। ভেবেছিলিস, এভাবেই নিশ্চিন্তে বাকি জীবন কাটিয়ে দিবি, তাই না? অসহায় মেয়েদের সর্বনাশ করেছিস—ভেবেছিলিস প্রতিকার করার কেউ নেই। আজ সেই সময়।'

চৌকির তলা থেকে বিকৃত অনুনয়ভরা কয়েকটি শব্দ বেরিয়ে এল।

রঘু ইশারা করল। দুটো টর্চের জোরালো আলোয় উদ্ভাসিত হল চৌকির তলাটা। হাঁটু গেড়ে বসে ষ্টেন চালালো রঘু। একটা আর্তনাদ ভেসে এল। ওরা সব উদ্যত অস্ত্র হাতে ঢুকে পড়ল চৌকির তলায়। চোখ তীক্ষ্ণ সতর্ক। পা ধরে টানতে টানতে এনে ফেলল দালানে। শরীরের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছিল লালটুর। লম্বা চুলের গোছা ধরে হিঁচড়ে উঠানে নামিয়ে আনা হল ওকে।

পাঞ্চালি ওপরের ঘর থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছিল মায়ের পাশে। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল রক্তমাখা একটা দেহের ওপর। একই সঙ্গে ভয়, বিস্ময়, আর বিমূঢ়তা ফুটে উঠে ওর মুখচোখে। এই সময় উঠানের শিউলি গাছ থেকে ডেকে উঠল একটা বিনিদ্র পাখি। ঝরে পড়ল কয়েকটি শিউলি ফুল। জ্বাল দেয়া ঘন দুধের সরের মতো জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে রয়েছে উঠোন আর গাছপালা।

'দরজাটা খুলে দাও পাঞ্চালি। আমরা সামনের মাঠে যাব। তুমি উপস্থিত থাকবে। শেষ বিচার হবে সেখানে।' রঘু বলল।

কোনো কথা বলল না পাঞ্চালি। নিঃশব্দে খুলে দিল উঠোনের বন্ধ দরজা। কেটে-ফেলা গাছের ডালের মতো মাটির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে টেনে লালটুকে নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল। সান বাঁধানো উঠোনের এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে-থাকা শিউলি ফুল পিষ্ট হয়ে যায়। রক্তের দাগ পড়ে গতিপথে।

পাঞ্চালির দৃষ্টি পড়ে পুষ্পময়ীর মুখের দিকে। দেখল, পাথরের তীক্ষ্ণ কোণের মতো অসমান ভাঙা মুখের, দীর্ঘকালের কঠিন রেখাগুলো, সহসা এই হিমার্ত জ্যোৎস্না-ভেজা রাতে কোনো এক গোপন উত্তাপ পেয়ে নরম হয়ে উঠেছে। শৈশব থেকে দেখা মায়ের সেই চিরপরিচিত ভালবাসায় টল-টল করা হারানো মুখটা, গত কয়েক বছরের কঠিন অপরিচিত মুখটাকে সরিয়ে দিয়ে, আবার ভেসে উঠেছে। পাঞ্চালি টের পায়, তার বুকের কোন গভীর স্মৃতির তল থেকে উঠে আসছে হারানো ঢেউ—একের পর এক। তার ঘ্রাণে সহসা ঝাপ্‌টা দেয় শিউলির বিষাদমাখা স্নিগ্ধ সুরভি। দূরের কোনো এক গাছ থেকে একটি পাখির কণ্ঠ মাঠের নির্জনতার সিঁড়ি ভেঙে তার কানে এসে পৌঁছল।

'ওরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।' পাঞ্চালির ভাবনায় বলে উঠল কে এক অপরিচিত কণ্ঠ।

'তুমি ভিজে ন্যাতা দিয়ে রক্তের দাগ মুছতে শুরু কর, আমি ফিরে এসে সাহায্য করব।' গায়ের চাদরটাকে ভাল করে জড়িয়ে সে বেরিয়ে গেল।

কাঁচা ড্রেন পেরিয়ে বাঁ দিকে চলে গেছে একটা সরু পায়ে-চলা পথ। দূরে রেল লাইন অবধি। চারদিকে এলোমেলো কাঁটাঝোপ, শুকিয়ে-যাওয়া কালকাসান্দা আর আসশ্যাওড়া গাছ। রেল লাইনের গা ঘেঁসে লম্বা একটা পুকুর। পাঞ্চালি দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল।

ওরা অপেক্ষা করছিল। মাটিতে পড়ে-থাকা দেহটা নড়ছে থেকে থেকে। গলা থেকে বেরিয়ে আসছে গোঙানি।

'ওর পোশাক খুলে নে।' শান্ত গলায় বলল রঘু।

ভোজালির ধারালো টানে খণ্ড-বিখণ্ড কাপড়ের টুকরোগুলো দূরে ছুড়ে ফেলে দিল ওরা। মনে হল, একটা লোমশ বুনো শুয়োর মাটিতে পড়ে আছে।

'লালটু, তুই আমাদের বহু কমরেডকে খুন করেছিস ক'বছরে। পার্টির মধ্যে ঢুকে গোপনে খবর পাচার করা ছিল তোর কাজ। আমরা ধরতে পারিনি। মনে কর সেই সব কথা। ধরিয়ে দিয়েছিস সেই বন্ধু কমরেডদের, যারা পার্টি-কমরেড বলে বিশ্বাস করেছিল তোকে। পুলিশ, এনকাউন্টারের নামে তাদের খুন করেছিল ঠাণ্ডা মাথায়। আজ তার শেষ বিচার।' দম নিল রঘু। তারপর ফের বলল—

'আমাদের গোপন শেলটার থেকে ধরা পড়ার কারণ তুই-ই। ধরা পড়ার পর জানতে পারলাম সব। তখন তুই খোলাখুলি নেমে পড়েছিস ময়দানে। এই অঞ্চলে পুলিশি মদতে তৈরি করেছিস 'এ্যান্টি-নকশাল নাগরিক এ্যাক্শন স্কোয়াড'। মনে কর কয়েক বছরের ইতিহাস।' দম নেবার জন্য থামল রঘু। বৃত্তাকারে সকলে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেহের ছায়া চাঁদের আলোয় ধারালো তরবারির মতো ফালা ফালা করছিল লালটুর নগ্ন দেহ।

'বাধা দেবার, প্রতিবাদ করার কেউ ছিল না, তাই না? তারপর সরকারের ইনাম পেয়ে এ এলাকার রাজা বনেছিলিস। একের পর এক নিরীহ মেয়েরা তোর পাশবিক লালসার শিকার হয়েছে। আত্মহত্যা করেছে চরম লজ্জায় কয়েকজন। মনে পড়ছে তাদের মুখগুলো? সব তোলা থাকে ইতিহাসের খাতায়, এটা তোর জানা ছিল না, ভেবেছিলিস জীবন কেটে যাবে এইভাবে। ইতিহাস বড় ক্ষমাহীন, বড় নির্মম, তার হিসেব সময়ের কাছে একদিন মেটাতেই হয়। যেমন আজ তোকে মেটাতে হবে। তাই তোকে বেঁচে থাকতে দেয়া চলে না। এটা পার্টি আর স্থানীয় মানুষদের সিদ্ধান্ত। কেননা আমরা জানি, হত্যাকারীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ মৃত্যু।'

রঘু থামল। তার কণ্ঠস্বর নিঃস্তব্ধ মাঠের নির্জনতাকে ঘন করে তুলল। কাজলের হাত থেকে ভোজালিটা নিয়ে এগিয়ে এল লালটুর কাছাকাছি। সুতীব্র ঘৃণা নিয়ে বলল, 'যে পুরুষত্বকে বর্বর পশুর মতো ব্যবহার করেছিস, আগে তার মৃত্যু হোক।' বলার সঙ্গে সঙ্গে ভোজালির এক কোপে পুরুষাঙ্গ ছিন্ন করে চূড়ান্ত ঘৃণায়, মরা টিকটিকি ফেলার মতো, রুক্ষ কঠিন ফাটা মাটিতে সেটাকে ছুড়ে ফেলল রঘু। একটা ভয়ঙ্কর জন্তুর গোঙানি লালটুর গলা থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে ছুটে গেল বিশাল ফাঁকা মাঠের ধূ ধূ বিস্তারে।

স্তব্ধতা। ক্ষণিক।

একাগ্র দৃষ্টিতে পাথরের অনমনীয়তা নিয়ে পাঞ্চালি অপলক দৃষ্টিতে দেখছিল ঘটতে থাকা ঘটনাগুলোকে। দেখল, মরা সাপের ছিন্ন বিষাক্ত মাথার মতো এক খণ্ড মাংসপিণ্ড পড়ে রয়েছে হিম-সিক্ত কঠিন জমিতে।

'তোমরা আরো কাছে এসে পাশাপাশি দাঁড়াও। এখন এই রাতে আমরা স্মরণ করব, সেই সব শহিদ বীর কমরেডদের—যাঁরা বিপ্লবের জন্য, জনগণের স্বার্থে আত্মদান করেছেন। কেননা কোনো জীবনদান ব্যর্থ হবে না। আমাদের সামনে রয়েছে এক ঘৃণিত প্রতিবিপ্লবী, যে নিজের হাতে খুন করেছে বহু কমরেডকে। আজ সেই সব কমরেডদের নামে শপথ নিয়ে আমরা সমস্ত হত্যার বদলা নেব। এই লালটু আজ সমস্ত প্রতিবিপ্লবী বর্বরতার প্রতীক। জনগণ দাবি করেছে এর চরম শাস্তি।'

হাত মুঠো করে ওরা নীরবতার মাধ্যমে লাল সেলাম জানালো শহিদ কমরেডদের উদ্দেশে। তারপর, একের পর এক আঘাত করতে লাগল বুনো শুয়োরের মতো লালটুর নগ্ন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। এই সময় দূরে রেল লাইন দিয়ে দু'পাশের প্রান্তরের হিম-নির্জনতার নৈশ সরোবরে ঢেউ তুলে শেষ ট্রেন চলে গেল।

পাঞ্চালি আচ্ছন্নতায় ডুবে যাচ্ছিল ক্রমাগত। চাঁদের আলোয় ঝল্‌সে-ওঠা অস্ত্র থেকে ঠিক্‌রে-পড়া অদৃশ্য আগুনের-ফুলকি তার বুকের মধ্যে জমা শুকনো কাঠে যেন আগুন ধরালো। 'দাঁড়াও।' তার গলা থেকে যেন অন্য কেউ কথা বলে উঠল। জড়ানো চাদর খুলে ফেলে দিল মাঠের বুকে। হাত বাড়ালো, 'একটা অস্ত্র দাও আমাকে।'

রঘু, কাজল, আর অন্যরা তাকালো পাঞ্চালির মুখের দিকে। কোমরে আঁচলটা শক্ত করে গুঁজে, রঘুর হাত থেকে ভোজালিটা প্রায় ছিনিয়েই নেয় পাঞ্চালি। তার পায়ের কাছে পড়ে আছে লোমশ একটা দেহ। অপলক চোখে ক্ষণিক দেখল দেহটাকে। মাথার মধ্যে ভেসে উঠল ছ'বছর আগের সেই ভয়ঙ্কর রাতের স্মৃতিটা। এই দেহটাই সেদিন রিভলবার বুকে ঠেকিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল এক পরিত্যক্ত বাড়িতে। পশুর বর্বরতায় তাকে অচৈতন্য করে তার নারীত্বকে ধ্বংস করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছিল। কেননা রঘুকে সে ভালোবাসতো। আজ তার পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা কেন্নোর মতো। পাঞ্চালির সত্তার কোনো গভীর গর্ভ থেকে এক তীব্র অগ্নিপ্লাবন উঠে এল, চেতনার দু'কূল প্লাবিত করে পৌঁছে গেল মাথায়। মধ্য আকাশে পূর্ণ চাঁদ স্থির অপলক দৃষ্টির তলায়, এক চূড়ান্ত অমোঘ নির্দেশে পাঞ্চালির হাত ঝল্‌সে উঠল। হাঁটু মুড়ে বসে সমস্ত শক্তি দিয়ে সে আঘাত করল শায়িত দেহটার কণ্ঠনালিতে। ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মাথা।

পাঞ্চালি পিছিয়ে এল। তার সারা শরীরে ধমনিতে ধমনিতে শিহরণ। চোখের মণিতে বন্য আগুনের দীপ্তি। কাজল ওর হাত থেকে অস্ত্রটা নিয়ে নেয়। রঘু পাঞ্চালির কাছে এল। দৃঢ় হাতে ধরল পাঞ্চালির একটা হাত।

'তোরা চলে যা যে যার জায়গায়। আমি পাঞ্চালিকে বাড়ি দিয়ে যাব।' রঘু বলল।

ওরা চলে গেল নিঃশব্দে। যে যার ঠিকানায়।

'চল', রঘু বলল পাঞ্চালিকে। 'এবার আমাদের যেতে হবে।'

পাঞ্চালি তাকালো রঘুর চোখের দিকে। এক অপার নীরবতা, অস্ফুট সঙ্গীতের মতো, তাদের দেহকে জড়িয়ে ধরল। হিম জ্যোৎস্নার নিঃশব্দ ধারায় সিক্ত হয়ে দু'জনে তখন খুঁজে পায় পরস্পরকে।

ছ'বছরের নিরুদ্ধ একটা গোপন কান্না, পাঞ্চালির বুকের মধ্যে অনড় যন্ত্রণার পাথুরে দেয়াল ফাটিয়ে, তার হৃদয়ের বিস্তৃত উপত্যকায় তোলপাড় করে ঝড়ের উদ্দামতায় উঠে এল গলায়। ফুঁপিয়ে উঠল পাঞ্চালি। রঘু, ওর দু'কাঁধ তার দু'হাতে বেষ্টন করে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'পাঞ্চালি! এই কান্নার বড় প্রয়োজন ছিল তোমার।'

কথা বলতে পারছিল না পাঞ্চালি। তার সমস্ত শরীরে, নদীতে আসা জোয়ারের মতো শিহরণ, ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। ওর চিবুক, কম্পিত ঠোঁট আর গাল এক পরম নির্ভরতায় রঘুর দীর্ঘকালের রোদ-জল-খাওয়া পুরনো শালবল্লার মতো শক্ত চওড়া কাঁধে রাখল সে। রঘু অনুভব করল, ফোঁটায় ফোঁটায় পাঞ্চালির অশ্রু, রাতের শিশিরের মতো ঝরে পড়ছে তার কাঁধে। জ্যোৎস্না আর শিউলির গন্ধে নিষ্কলুষ সেই চোখের জল।

'আর দেরি নয়। চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।' মাটিতে পড়ে-থাকা চাদরটা তুলে পাঞ্চালি হেঁটে চলেছে। পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে। দূরে পড়ে রইল একটা দুঃস্বপ্নের খণ্ডিত দেহ। যে নীল সাপ অতর্কিতে ঢুকে পড়েছিল পাঞ্চালির জীবনে, পাকে পাকে আপাদমস্তক জড়িয়ে তিল তিল করে খেয়ে নিচ্ছিল তার জীবনের নির্যাস—তার ক্লেদাক্ততা থেকে সে মুক্ত। অশুচিতার গ্লানি সরে গেছে। সে উৎকর্ণ হয়ে শুনল, দূরে কোনো গাছের পাতার আড়াল থেকে ভেসে এল, এই তীব্র শীতের অবরোধ ভাঙা এক কোকিলের সুর। আর সেই মুহূর্তে তার সারা সত্তার তৃষ্ণার্ত অনুভবে, তার জীবন থেকে নির্বাসিত সমস্ত রূপ রস, গন্ধময় অনুভব ফিরে এল ফোটা ফুলের মতো।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁছায় ওরা। আর সেই সময়, সীমাহীন বিস্তৃত আকাশের উত্তরের এক অগোচর প্রান্ত থেকে ঈগলের মতো নেমে এল দুরন্ত উত্তরের হাওয়া। কেঁপে উঠল আশপাশের গাছ-গাছালির প্রাচীন শরীর। নড়ে উঠল মাটির গভীরে প্রোথিত শিকড়। ডালের সংলগ্নতা ছিঁড়ে মানুষের অন্তিম নিঃশ্বাসের অনিবার্যতার মতো ঝরে পড়ল পাতা। রঘু আর পাঞ্চালি সেই মাটিতে পড়ে-থাকা মৃত পাতার ওপর পা ফেলে হাঁটছে। পাঞ্চালির সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল দ্বিতীয় জন্মের মুহূর্তে।

টাঙ্গি

শেখর বসু

শুকনো ঘাসপাতা আর গাছের ডালের স্তূপ থেকে আগুনের শিখাটা মাথার ওপরে লাফিয়ে উঠতেই ওরা চারজন হৈ-হৈ করে উঠল। আর নিববে না। এবার বসা যাক। বারান্দা থেকে চারটে চেয়ার টেনে এনে আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে পড়ল ওরা।

মলি বলল, 'পাঁপরপোড়া খাবে?' বলেই ঘর থেকে পাঁপরের প্যাকেট নিয়ে এল। পাঁপর পোড়ানোর পরে চা হল। টি-পট্‌টা পাশের ছোট্ট টুলের ওপর রাখতে গিয়ে রূপা চেঁচিয়ে উঠল, 'টাঙ্গিটা এবার সরাও তো, দেখলে ভয় লাগে।'

টাঙ্গির কথা বিকেল থেকেই হচ্ছিল। বিকেল মানে সত্যেন যে মুহূর্তে বাঁ কাঁধে টাঙ্গি আর ডান হাতে দুটো মুর্গী ঝুলিয়ে বাংলোয় ফিরেছিল তখন থেকেই। ছ'মাইল দূরের আদিবাসীদের বাজারের সওদা। মুর্গী দারুণ শস্তা। তবে টাঙ্গি ওরা যাকে-তাকে বেচে না। সত্যেন কত করে বন্ধুত্ব পাতিয়ে কিনেছে।

টাঙ্গি মন্ত্রপড়া। কড়ি, সিঁদুর আর শিকড় দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে টাঙ্গির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তারপর সেই বুড়োটা টাঙ্গিতে ঠোঁট ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস করেছে—তুমি এর কাছে যাবে? টাঙ্গি নাকি বলেছে—হ্যাঁ। বুড়োটা টাঙ্গির দিকে তাকিয়ে ঠিক-ঠিক বলে দিয়েছে, সত্যেনরা ক' ভাই ক' বোন; সত্যেন বড় চাকরি করে—এইসব। তবে কড়া নির্দেশ আছে, যতবার চান করবে ততবার টাঙ্গিকেও করাবে। যতবার তেল মাখবে ততবার টাঙ্গিকেও মাখাবে। টাঙ্গি গৃহস্থের মঙ্গল করে, তবে—। আগুন ধরাতে সবাই এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, 'তবে'র পরেরটুকু সত্যেনের আর বলা হয়নি।

সেই জের টেনে সত্যেন এখন বলল, 'আসল কথাটাই তোমাদের বলা হয়নি।' কাপে ঠোঁট লাগিয়ে রেখেই ও চা শেষ করল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে বসেই রইল। ঘাসপাতা জ্বলে গিয়ে কাঠে আগুন লেগে গিয়েছিল ভালভাবে। গনগনে আগুন। তিনটে লালচে মুখ সত্যেনের লালচে মুখের দিকে তাকিয়ে। আর্চ-করা গাছের সারি বাংলোর মুখে একটুখানি। চারদিকে শাল, কাঁঠাল, নিম, আম আর বুনো গাছের জঙ্গল। গ্রাম এখান থেকে কয়েক মাইল। আরো কয়েক মাইল দূরে পিচের সড়ক। কান পাতলে ট্রাকের শব্দ মাঝেমধ্যে শোনা যায়। গাছের মাথায়, মাটিতে চাঁদের আলো ফেটে পড়ছিল।

'কী কথা?' মলির গলাটা কেমন অস্বাভাবিক ঠেকল।

'টাঙ্গিকে প্রথম রাতে, মানে আজ রাতে রক্ত খাওয়াতে হবে, না হলে—'

'না হলে?'

'টাঙ্গি আমাদের ক্ষতি করবে।'

সত্যেনের কথাটা শেষ হতে না হতেই রঞ্জন হো-হো করে হেসে উঠল। রূপা হাসল, মলিও। কিন্তু হাসিটা কেমন যেন দপ্‌ করে নিবে গেল।

রঞ্জন বলল, 'কুসংস্কার।'

সত্যেন বলল, 'সেটা ঠিক, তবে বুড়োটা টাঙ্গি দেখে আমার সম্পর্কে অনেক কথা ঠিক-ঠিক বলে দিয়েছে।'

'আন্দাজে বলেছে, স্রেফ আন্দাজে। আমি তো হাত দেখতে জানি না, কিন্তু একজনের হাত দেখে অনেক কথা মিলিয়ে দিয়েছিলাম।'

'টাঙ্গিটা নাকি স্ত্রীলিঙ্গ।'

'ওহ্ সেইজন্যেই—'

মলির কথায় হেসে উঠল সবাই। এবার আর হাসিটা দপ্ করে নিবে গেল না। হাসতে হাসতে কেউ আয়েশ করে বসল, কেউ শুকনো পাতা কুড়িয়ে এনে আগুনে ঢেলে দিল। ওই আগুন থেকে সিগারেট ধরালো রঞ্জন। সপ্তর্ষিমণ্ডল আর কালপুরুষ চেনা নিয়ে তর্ক চলল খানিকটা। এইভাবেই চলছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে রঞ্জন হঠাৎ টাঙ্গিটা মাথার ওপর ঘুরিয়ে কী একটা যাত্রার পদ আওড়াতেই রূপা আহ্ বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'ওটা রাখো তো, তোমার বেশি-বেশি।'

রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে ওটা টুলের ওপর রেখে দিয়ে বলল, 'তুমি বড্ড ভীতু।'

সত্যেন বলল, 'দাঁড়াও, রক্ত খাইয়ে টাঙ্গিটাকে শান্ত করি'। বারান্দা থেকে হারিকেন নিয়ে ও কোণের ওই রান্নাঘরে ঢুকল। তারপরেই চিৎকার—'আরে! মুর্গী দুটো কোথায় গেল?'

তাই নাকি! ঈশ্! এ মা ! বলতে বলতে বাকি সবাই রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। রঞ্জন ছিল সবার শেষে। ওর পায়ে লেগে টুল উলটে টাঙ্গিটা মাটিতে পড়ে গেল ঝন-ঝন করে। ও টাঙ্গিটা তুলতে গিয়েও তুলল না। প্রায় দেড় বিঘত লম্বা ইস্পাতের ফলাটা ঝকঝক করতে লাগল চাঁদের আলোয়।

রান্নাঘরের আনাচে-কানাচে, মহুয়া গাছের নীচের জঙ্গলে অনেকক্ষণ ধরে খোঁজ করেও মুর্গীদুটোর কোনো হদিশ পাওয়া গেল না। বিরক্ত হয়ে এ তাকে, সে তাকে দুষল। রান্নাঘরের খিল কেন ভাঙ্গা? পচা দড়ি দিয়ে মুর্গী বাঁধা হয়েছিল কেন? এমন ধরনের প্রশ্নও উঠল কয়েকটা। চৌকিদার ছুটি নিয়ে মেয়ের বাড়ি গেছে জেনেও সত্যেন গলা ফাটিয়ে চৌকিদার-চৌকিদার বলে চেঁচাল কয়েকবার। বাংলার প্রকাণ্ড চৌহদ্দি, চতুর্দিকের নির্জন গাছপালা গমগম করে উঠল। পাশের কাঁঠালগাছে ডানা ঝাপটানোর ঝট্পট্ শব্দ উঠল। এতক্ষণ ঝিঁঝির ডাক ছিল না, শুরু হল এইমাত্র।

মলি বলল, 'ভালই হয়েছে, রোজ-রোজ মুর্গী খেয়ে ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। আজকের মেনু ভাত, মাখন, আলু সেদ্ধ, পাঁপর ভাজা আর সবুজ কাঁচা লঙ্কা।'

রঞ্জন বলল, 'যাবে কোথায়? ব্যাটাদের কাল সকালেই ধরব।'

উনুন জ্বালানো ছিল, মলি চট করে ভাত চাপিয়ে দিয়ে এল। আবহাওয়া সহজ হয়ে গেল আবার।

কাঁঠালগাছের গুঁড়িটা শানবাঁধানো। সেখানে বসে একথা-সেকথা হতে না হতেই ভাত হয়ে গেল। পোর্সিলিনের বাসনে সুখাদ্যের প্রশংসা করতে না করতেই ভাত শেষ। গোগ্রাসে খেল সবাই। দারুণ হয়েছে। বেশ খিদে পেয়েছিল। জলহাওয়ার গুণ। ঢেকুর তুলল সবাই। শব্দ করে আঁচাল। সুপুরির টুকরো মুখে দিয়ে সিগারেট ধরাল রঞ্জন আর সত্যেন।

ওদিকটা বোধ হয় উত্তর দিক। উত্তর দিক দিয়ে হাওয়া আসছিল হু-হু করে। শীতের শেষ। হাওয়া তত অসহ্য না হলেও বেশ শীত-শীত লাগছিল সবার। ভাত খাওয়ার পরে গায়ের চাদরে কান-মাথা ঢেকে নিল প্রত্যেকেই। তারপর ওপাশের আমগাছ ঘুরে আগুনের কাছে ফিরে এল। মোটা-মোটা সব ক'টা কাঠেই আগুন ধরে গিয়েছিল। এ আগুন চট করে আর নিববে না।

চেয়ার টেনে বসার পরেই সত্যেন বলল, আরে টাঙ্গিটা ওখানে গেল কী করে?

'আমি মানে, আমার পায়ে লেগে...।' থেমে থেমে এমনভাবে রঞ্জন উত্তর দিল যেন ও কিছু গোপন করছে।

কাঁচা কাঠে আগুন লেগে ফটফট করে শব্দ উঠছিল। মলির হঠাৎ মনে পড়ল, কে যেন তখন বলছিল চিতায় শোয়ানো মড়ার মাথা ঠিক এইভাবেই ফাটে।

একটু পরে সত্যেন বলল, 'টাঙ্গিটাকে ঘরে রেখে আসি।' মলি চেঁচিয়ে উঠল, 'না'।

'না কেন?'

মলি কোনো উত্তর দিল না।

সত্যেন আরো কিছুক্ষণ ওইভাবে বসে থাকার পরে টাঙ্গিটা ঘরে রেখে এল আস্তে আস্তে।

চাঁদ এখন ঠিক মাথার ওপর। বাংলোর বাঁকানো টিনের চাল চকচক করছিল। চালে অনেক শুকনো পাতা। শুকনো পাতা মাঝেমধ্যে উড়ে যাচ্ছিল খড়খড় করে।

সত্যেন মৃদু গলায় বলল, 'টাঙ্গি দিয়ে মুর্গী দুটো কাটব ভেবেছিলাম। আমরা মাংস খেতাম, আর টাঙ্গি রক্ত খেত।'

'ওসব নিয়ে এখনো ভাবছ নাকি?' হাসতে হাসতেই রঞ্জন বলল। একটু থেমে আবার হাসল। কিন্তু, আর কেউ হাসল না। রঞ্জন অপ্রস্তুত হয়ে সিগারেট ধরাল।

'একটা গান ধরো তো।'

'কী গান?'

'বেশ তালের।'

সত্যেন দুই ভুরুর মাঝখানে আঙুল দিয়ে টোকা মারতে লাগল।

মলি বলল, 'বিকেলেই মুর্গীদুটো কাটলে পারতে।'

'বিকেলেই কাটলে পারতে। বেড়াবার শখ উঠেছিল কেন তখন?'

গলার স্বর সরু করে সত্যেন যখন এভাবে কথা বলে হেসে ওঠে সবাই। এখন কিন্তু কেউ হাসল না। মলি পালটা কোনো জবাবও দিল না। সবাই চুপ।

উত্তুরে হাওয়ার জোর কমে গেছে বেশ। গাছের ডালে কোনোরকম শব্দ নেই। মাঝেমধ্যে বহু দূরের পিচের রাস্তা থেকে ট্রাকের শব্দ ভেসে আসছিল, তাও শোনা যাচ্ছে না অনেকক্ষণ। শাল, নিম, বুনো গাছপালার জঙ্গল আরো যেন নির্জন হয়ে উঠেছে। পাশের বটগাছের পাকা ফল নীচের শুকনো পাতার ওপর খসে পড়ছিল টুপটুপ করে। সেই শব্দে রূপা চমকে উঠে বারকয় পেছনে তাকাল।

এমন সময় ঠন্‌ন্‌ন্‌ন্‌ করে শব্দ উঠল ঘরে।

'টাঙ্গির শব্দ?'

'টাঙ্গির শব্দ!'

'দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখেছিলে বোধহয়?'

'হ্যাঁ, কিন্তু পড়ল কী করে?'

'ইঁদুর-টিঁদুর থাকতে পারে।'

'অত ভারি জিনিসটা!'

'ইঁদুরগুলোও বড়-বড়।'

'ইঁদুর দেখলে কোথায়?'

'মাঠে।'

'মাঠের ইঁদুর ঘরে ঢোকে না।'

'হয়ত টাঙ্গিকে রক্ত খাওয়াতে গেছে।'

'ইয়ার্কি কোরো না—।'

নেড়া নিমগাছের ফাঁক দিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল না কালপুরুষ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে রঞ্জন বলল, 'তোমরা এগুলো সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করো নাকি?'

'কোনগুলো?'

'এই টাঙ্গির রক্ত খাওয়া-টাওয়া।'

'না।'

'তবে ভয় পেয়েছ কেন?'

'কে বলল ভয় পেয়েছি!'

'চুপ করে আছ কেন?'

'কোথায় চুপ করে—মাথা ধরেছে।'

'সবার?'

'তুমিও তো চুপ করে আছ।'

একটু পরে 'দাঁড়াও' বলে রঞ্জন হারিকেনটা হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠল। বারান্দা থেকে ঘরে। ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'যা বলেছি তাই, টাঙ্গিটা পড়ে গেছে।' কিন্তু ঘর থেকে বেরোবার মুখে দরজার পাল্লায় ধাক্কা লেগে হারিকেনটা ভেঙে গেল। তবে, এ নিয়ে কেউ কোনো কথা বলল না। রঞ্জন এসে নিজের চেয়ারে বসে বলল, 'টর্চটা কোথায়?'

'ঘরে।'

'ঘরে কোথায়?'

'জানি না।'

'মোমবাতিটা?'

'ঘরে।'

'ঘরে কোথায়?'

'জানি না।'

কালও বোধহয় এই সময়, এই সময় না আর একটু পরে, চাঁদটা ঠিক এইভাবে ওদিকে হেলে পড়েছিল। ঠিক এই সময়েই আমগাছের দিক থেকে তক্ষক ডাকতে শুরু করেছিল। মাপা বিরতিতে অদ্ভুত তীক্ষ্ণডাক। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক এখন আর কানে লাগছিল না কারও।

আগুনে পুড়ে-পুড়ে অনেকগুলো কাঠ কয়লা হয়ে গেছে। বাকি কাঠগুলোয় ভাল রকমের আগুন। কাঁচা কাঠ ফাটার শব্দ উঠছিল না আর। হাওয়ার জোরও তেমন নেই। শুকনো পাতা আর খড়খড় শব্দে উড়ে যাচ্ছিল না। এই ভয়ংকর নিস্তব্ধতার মধ্যে তক্ষকের ডাক পৌঁছে যাচ্ছিল বহুদূর পর্যন্ত। ওই যে দূরের ভাঙা ইঁদারাটা, তার পাড়ে দাঁড়িয়েও বোধ হয় পরিষ্কার শোনা যাবে।

কাল ওরা ওখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পেয়েছিল। শুনতে পেয়ে মাঠ থেকে বাংলোর রাস্তায় উঠে এসেছিল তাড়াতাড়ি। পড়ে-থাকা লম্বা ঘাস, শুকনো ডাল দেখে চমকে ওঠা, ভয় পাওয়া—গলা ফাটিয়ে একসঙ্গে হেসে উঠে ভুল শুধরে নেওয়া চলেছিল কতক্ষণ ধরে। তার মধ্যেই ছিল কত রকমের কথা আর গান। পথের ওপর আর্চ-করা গাছের ছায়ায় যে জাফরি তৈরি হয়েছিল তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল সবাই। নিবন্ত আগুন ঘাসপাতা, কাঠকুটো এনে জ্বালাবার সমান উৎসাহ ছিল সকলের। আজ ঠিক তার উল্টো। কেউ কোনো কথা বলছিল না। হাঁটু মুড়ে, পা ছড়িয়ে যে যেমনভাবে বসেছিল, ঠিক তেমনিভাবে বসে থাকল।

তক্ষক ডেকে চলেছিল একইভাবে। ডাকগুলো আগের চেয়েও তীক্ষ্ণ। এ-নিয়ে আজ আর কোনো কথা উঠছিল না। তক্ষকের বাসাটা কোথায়, দেখতে কেমন, তক্ষক কামড়ালে বাঁচে কি না—এ-সব নিয়ে কেউ কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছিল না। ওই তো কাছেই পথের ওপর অসামান্য জাফরি, কিন্তু তা নিয়েও কেউ কোনো কথা বলছিল না। আরও কয়েকটা কাঠ জ্বলতে জ্বলতে কয়লা হয়ে গেল।

আবার ঠন্ন্ন্ন্ করে শব্দ উঠল ঘরের মধ্যে।

'ইঁদুর বোধ হয়।'

'হ্যাঁ, ইঁদুরই।'

গাছের পাতা দুলছিল না একটুও। একটা লম্বা মেঘ চাঁদটাকে ঢেকে দিল এইমাত্র। আগুনের জোরও তেমন নেই। চারপাশে চারজন অন্ধকার হয়ে গেছে। পথের ওপরের জাফরি আর নেই। সব অন্ধকার। ইঁদারার সাদা পাড়, বাংলোর চকচকে টিনের চালেও অন্ধকার।

আবার ঠন্‌ন্‌ন্‌ন্‌ন্ করে শব্দ উঠল ঘরের মধ্যে।

'কালকেই ফিরছি তো?'

'হ্যাঁ কালই। অনেক দিন হয়ে গেল এখানে।'

বাংলোর কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে কী যেন একটা ভেতরে এসে ঢুকল। কুকুর। কুচকুচে কালো রঙের। কিছুটা পথ নিঃশব্দে এগিয়ে এসে পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে বসল। অন্ধকারেও চোখদুটো জ্বলজ্বল করছিল। কিছুক্ষণ বসে থেকে আমগাছের তলায় ঘুরতে লাগল। শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ উঠতে লাগল খড়খড় করে। তারপর বারান্দার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। কী যেন শুঁকল। শুঁকে লাফিয়ে উঠল বারান্দার ওপর।

ঠিক এমনসময় ঠন্‌ন্‌ন্‌ন্‌ন্ করে শব্দ উঠল ঘরের মধ্যে।

অমনি কুকুরটা বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে তীরের মতো ছুটে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে দূরের ওই অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল।

কিছুক্ষণ পরে শুকনো পাতার ওপর পাকা বট পড়ার শব্দে রূপা চমকে উঠল আবার।

'ঘুম পাচ্ছে না?'

'না।'

'ঠাণ্ডা লাগবে, চলো শুয়ে পড়ি।'

'না।'

'কেন?'

'ভাল্ লাগছে।'

চাঁদটা পাতলা মেঘের সারি থেকে বেরিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে ওপাশের ঘন কালো মেঘের মধ্যে ঢুকে গেল। সবাই, সব কিছু আবার অন্ধকার। হাওয়া ছিল না একদম। হাওয়া উঠল। প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে, ঝড়ের মতো। শুকনো পাতাগুলো টিনের চালে, বারান্দায়, গাছের তলায় খড়খড় শব্দে উড়তে লাগল। চারপাশের গাছপালা দুলতে লাগল। দুলতে-দুলতে এ-গাছের ডাল সে-গাছে, সে-গাছের ডাল এ-গাছে। কয়েকটা পাখি ঝটপট করে উঠল। অনেকগুলো পাকা বট টুপটুপ করে খসে পড়ল শুকনো পাতার ওপর। তক্ষকের ডাক থেমে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে, আবার শুরু হল। এবার অনেক জোরে। ধারকাছেই এগিয়ে এসেছে বোধহয়। গাছপালাগুলো দুলছিলই, দুলতে-দুলতে আরও এগিয়ে এল। তারপর যেন ডালপালা ছড়িয়ে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল ওদের।

আগুন নিবে গেছে প্রায়। থেকে-থেকে দু'একটা ফুলকি হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছিল। কাঁটাতারের বেড়ার ধারে কালো মতন কী যেন একটা! কুকুরটা, সেই কুকুরটা।

হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল আবার। গাছপালাগুলো দুলতে-দুলতে যে যার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে চুপ হয়ে গেল। নেড়া নিমের সরু কালো ডালগুলো আবার টানটান হয়ে গেল। শুকনো পাতাগুলো যে যেখানে যেমনভাবে ছিল থেমে গেল। তক্ষকের ডাক থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালো কুকুরটা ঠিক আগের মতো তীরবেগে ছুটে দূরের অন্ধকারে মিশে গেল আবার।

সবাই, সব কিছু উৎকর্ণ হয়ে থাকল, যেন এক্ষুনি কিসের শব্দ শোনা যাবে।

ইতিহাসের ধারা

কালী নাগ

আমি শ্রীঅমল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক। কলকাতার কোনও নামী দামী কলেজে ইতিহাস পড়াই। ইতিহাসে সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং আমার বিশিষ্ট বাচনভঙ্গীর গুণে ছাত্র-ছাত্রী মহলে আমি খুবই পরিচিত ও সমাদৃত। এমন অনেক দিনই হয়, যেদিন বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা আমার ক্লাসে এসে বক্তৃতা শোনে, নোট নেয়।

যদিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়েই আমি প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি, কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষ, প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাসও আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। মুঘল পাঠান যুগেরও বহু বহু আগে, সেই বৈদিক যুগকেও ছাড়িয়ে যদি আরও অনেক শতাব্দী আগে দৃষ্টি প্রসারিত করি— কি দেখব সে ধূসর অতীতে? সেই অসভ্য বর্বর যুগের মানুষরাই যখন আমার চিন্তাজগতের সাথী হয়ে থাকে, তখন দাবাগ্নি দেখে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের বনজঙ্গল ছেড়ে পলায়নের দৃশ্য আমি মানস-নয়নে দেখতে পাই। শিকাররত বন্য মানুষের ভাষাহীন জান্তব চিৎকার শুনতে পাই পড়ার টেবিলে বসে।

অনু বলে, ইতিহাস নিয়ে পাশ করেছ, ভাল একটা চাকরীও যখন পেয়ে গেছ, তখন ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করার কি দরকার! তার চেয়ে তুমি বরং—

জানি, অনু কি বলতে চায়। আমার সহধর্মিণী ও সহমর্মিণী অনুর যথার্থ অধিকার আছে আমাকে সঠিক পথ বাৎলে দেবার।

প্রতিমাসেই দু'একটা সেমিনারে আমাকে যেতে হয়। বক্তৃতা দিতে হয়। বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ওপর পড়াশুনো করতে হয়, নোট নিতে হয়। এবং বক্তৃতা দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে যখন বাড়ি ফিরি, শ্রোতাদের হাততালির রোমাঞ্চকর অনুভূতি তখনও জড়িয়ে থাকে দেহে-মনে।

মাঝে মাঝে অনু জিজ্ঞেস করে, আজ যেন কি ছিল সাবজেক্টটা?

আমি বলি, ইতিহাসের বিবর্তন।

— বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সরকারী সেমিনারে বলার জন্যেও তো তোমাকে ডেকেছে, যাবে না?

— নিশ্চয়ই, হাজার কাজ থাকলেও যাব। আমরা যারা সমাজ-সচেতন, প্রত্যেকের উচিত বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। নইলে ভারতবর্ষ আবার টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। অনেক নোট নিয়েছি, অনেক ইনফরমেশন আছে এই ডায়েরীতে।

অনু আমার হাত থেকে ডায়েরীখানা নিয়ে প্রথমেই যে পাতাখানা খুলে ফেলে তাতে স্পষ্টই লেখা আছে বিচ্ছিন্নতাবাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা।

একটু চোখ বুলিয়ে ডায়েরীখানা সে ফিরিয়ে দেয় আমার হাতে। জিজ্ঞেস করে, এই সেমিনারে গগনবাবুও তো বলবেন?

—হ্যাঁ, তাই তো শুনেছি। দারুণ বলেন কিন্তু।

—ওঁদের দলই তো একদিন ভারত বিভাগে মদত জুগিয়েছিল। আশ্চর্য, আজ ওঁরাই আবার বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে!

ব্যাপারটা যে না জানি এমন নয়, তবু চুপ করে থাকি।

রাজনৈতিক জগতের গূঢ় রহস্য, উত্থান পতন, আগুপিছু গমনাগমনের উপলব্ধি অনুর নেই। রাজনীতিতে শত্রু-মিত্র বলে চিরকালীন কেউ নেই, এ পরম সত্যটি ধরতে পারলে অনু হয়ত এসব কথা বলত না।

যাক, অনুকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। ওর এসব মুরুব্বিয়ানা আমি সাধারণত মুখ বুজেই হজম করি। এসব নিয়ে তর্ক জুড়ে দিয়ে আমি নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান প্রমাণ করতে চাই না, বরং বুদ্ধিমান স্বামীদের মত হেরে গিয়ে জয়লাভের আনন্দ উপভোগ করতে চাই।

প্রতিদিনের 'দিনলিপি লিখে রাখি আমি। দৈনিক কর্মসূচীও টুকে রাখি ডায়েরীর পাতায়। অতীত জীবনের বিক্ষিপ্ত অনেক কাহিনী খুঁজে পাওয়া যাবে সেই খাতা খুঁজলে। কখন মাথায় কোন্ চিন্তা আক্রমণ করে আমাকে উন্মনা করে দিয়েছিল, ডায়েরীতে আঁকাবাঁকা অক্ষরের মাঝে চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে তা। অনু আমার ডায়েরী পড়ে নিয়মিত। আর অনু পড়ে বলে উপকারই হয়। অনেক সময় কোনও কর্মসূচী ভুলে গেলে অনু মনে করিয়ে দেয়, বল তো আজ কত তারিখ?

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আমি বললাম, বারোই সেপ্টেম্বর।

—আজ দুটোয় প্রগতি লেখকদের বৈঠকে তোমার যাওয়ার কথা। এই দেখ—, ডায়েরীর পাতাখানা সে মেলে ধরে আমার চোখের সামনে।

—এখন প্রায় বারোটা বাজে, আর কখন স্নান করবে, খাবে দাবে?

অতএব তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সেরে বিশ্রাম না নিয়েই ছুটতে হয় সাহিত্য সভায়। ইতিহাসের অধ্যাপক হলেও বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমার আবাল্য আকর্ষণ। শুধু একনিষ্ঠ পাঠকই আমি নই—লেখকও বটে। আমি লিখি—প্রায় প্রতিদিনই কমবেশি লিখি এবং কলকাতা শহরের এবং মফস্বলের অনেক লিট্‌ল ম্যাগাজিনে তা প্রকাশিতও হয়।

অনুর ইচ্ছে, আমি বাকি জীবন সাহিত্য সাধনায় কাটিয়ে সারা দেশে সুধীসমাজে সশ্রদ্ধ ব্যক্তিরূপে সমাদৃত হই। বিশেষ করে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একখানা দৈনিক পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনার কলমে আমার গল্পের উচ্চ প্রশংসায় অনু আরও উৎসাহিত। আমার রচনা যখন ছাপার অক্ষরে নিয়ত বহুজনের মধ্যে প্রচারিত হয় তখন সম্ভবত আমার চেয়েও বেশি গর্ববোধ করে অনু। পাড়া-প্রতিবেশীদের সাগ্রহে ডেকে সেটি পড়ায় এবং প্রায়ই আক্ষেপ করে বলে, ওর কত কাজ, কলেজে পড়াতে হয়, সেমিনারে যেতে হয়, বক্তৃতা করতে হয়, নইলে এ্যাদ্দিনে আরও কত লিখত!

তারপর আমাকে তাগিদ দিয়ে বলে, কলেজে পড়ানো ছাড়া আর সব ছেড়ে দাও। ওসব সেমিনারে টেমিনারে যেতে হবে না। প্রতিদিন সকাল বিকেল বসে শুধু লিখবে, আর কিছু করতে হবে না তোমায়।

সংসারের সব দায়দায়িত্বই এখন অনুর কাঁধে। আমি মাস-মাইনের টাকা কটা ওর হাতে গুঁজে দিয়েই খালাস। অধিকাংশ সময়েই আমাকে পড়তে হয়, লিখতে হয়—নিয়মিত সাপ্তাহিক আর মাসিক পত্রিকায় লেখা পাঠাতে হয়।

আমি লিখি, নিত্য নতুন সৃষ্টির সুখ উপভোগ করি। সম্পাদক বা সমালোচকরা সমালোচনা করেন। তাতে ভালমন্দ দুই-ই থাকে। সেদিন বাংলাদেশের ঢাকা শহর

থেকে জনৈক আমানুল্লা মুন্সীর প্রশংসাসূচক চিঠি পেলাম আমার প্রথম বই, সাতটি গল্পের সংকলন, 'এপার ওপার' সম্বন্ধে। অনুর আনন্দ আর ধরে না। কি করে পূর্ব বাংলার একজন পাঠকের হাতে গিয়ে পৌঁছল আমার বই, তা একান্তই আমার অজ্ঞাত। অনু গর্ব করে বলে, দেখ, আমার কথামত যদি লেখা নিয়েই থাকতে, তবে এ্যাদ্দিনে আরও প্রচার হত তোমার। আমি ডায়েরীতে টুকে রাখি তারিখটা।

১৭ই মার্চ—বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহর থেকে জনৈক সাহিত্যরসিক আমানুল্লা মুন্সীর প্রশংসাসূচক পত্র আমার সৃষ্টির প্রেরণা হয়ে রইল।

অনু বলে, পাঠকদের এভাবেই উচিত লেখকদের উৎসাহিত করা।

অর্থাৎ ওর ইচ্ছে এভাবে আরও অনেক চিঠি আমি পাঠকদের কাছ থেকে পাই।

তারপর বলে, যাই বল না কেন, ঢাকার ছেলেরাই কিন্তু প্রাণ দিয়েছিল বাংলা ভাষার জন্যে। মাতৃভাষার কদর ওরা বোঝে।

এরপর এরকম আরও অনেক প্রশংসাসূচক চিঠি পেয়েছি এদিক ওদিক থেকে। কলকাতা, বোম্বে, কটক, আসামের বাংলা ভাষাভাষী অনেকেই আমার গল্পে মুগ্ধ হয়ে আমাকে অভিনন্দিত করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের বরিশাল জেলার মাউলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা শ্রীযুক্তা নূরজাহান চৌধুরীর চিঠিখানা আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে। আমার লেখা গল্প 'রক্তের অক্ষরে' পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন সেই ভদ্রমহিলা। জীবনে এ পর্যন্ত যত চিঠি আমি পেয়েছি, যত সুসংবাদ আমাকে পুলকিত বা রোমাঞ্চিত করেছে, তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি আনন্দ বহন করে এনেছে শ্রীযুক্তা নূরজাহান চৌধুরীর চিঠিখানা। কারণ এ নয়, আমার 'রক্তের অক্ষরে' গল্পের ভূয়সী প্রশংসা তিনি করেছেন বা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আমার আরও গল্প পাঠের। কারণ অন্য। মাউলতলা আমার জন্মস্থান। ঐ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আমার বাবা স্বর্গীয় কমলেশ ভট্টাচার্য। ঐ বিদ্যালয়ে বাল্যকালে আমিও পড়েছি। আজও মনে আছে গ্রামের স্মৃতি। সেই বটগাছ, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, ঘোলা জলের খাল— আর খালের ওপারে মাউলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আমি ডাকলাম, অনু, অনু, শিগ্‌গির এস।

রান্নাঘর থেকে অনু ছুটে আসে। হলুদ-মাখা হাত, কোমরে কাপড় জড়ানো।

—কি গো, কি হল?

চিঠিখানা এগিয়ে ধরলাম অনুর দিকে। দ্রুত চিঠিখানা পড়ে অনু বলল, মাউলতলা।

—হ্যাঁ।

সেই মুহূর্তে আমার মনে হল আমি যদি জীবনে কোনদিন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকও হই, ভূষিত হই অনেক পুরস্কারে, আজকের মত এত আনন্দ হয়ত জীবনে দ্বিতীয় বার আর পাব না।

অনু বলল, এ চিঠির কিন্তু উত্তর দিও। বেশ ভাল করে জবাব লিখবে।

নূরজাহান চৌধুরী চিঠিটার উপসংহারে লিখেছেন, কাঞ্চন চৌধুরী নামে বাংলাদেশ হাই-কমিশনার অফিসের একটি ছেলে যাবে আপনার সাথে দেখা করতে—আলাপ করতে।

অনু আবার জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁগো, কাঞ্চন চৌধুরী কবে আসবে, তারিখ তো দেয়নি?

আমি জবাব দিলাম, না, চিঠিতে কোনও তারিখ নেই।

—তাহলে তুমিই বরং বাংলাদেশ হাইকমিশনার অফিসে ফোন করে জেনে নাও। ওকে আসতে বল, উঃ কী যে আনন্দ হচ্ছে আমার! তোমাদের মাউলতলার ছেলে। শ্বশুরবাড়ী তো আর জীবনে দেখতে পেলাম না—কত গল্প এবার শুনতে পাব।

হ্যাঁগো, এখনও গ্রামের সব কথা তোমার মনে আছে? রাস্তাঘাট, হাটবাজার, ইস্কুল, হরিখোলা—সব! সব!

—তুমি আজই হাইকমিশনার অফিসে কাঞ্চন চৌধুরীকে ফোন কর। আর তোমার যদি অসুবিধে থাকে তো আমাকে ফোন নাম্বারটা এনে দিও, পোস্ট অফিস থেকে আমিই ফোন করে দেবখন।

আমি ইতিহাসের ছাত্র—ইতিহাসের শিক্ষক। ঐতিহাসিক যে কোনও ঘটনার প্রতিই আমার সীমাহীন আকর্ষণ। আমার নিজের জীবনের ইতিহাসও কম রোমাঞ্চকর বা বেদনাদায়ক নয়। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আজ আমরা সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত, সমাদৃত। কিন্তু এই স্বাধীনতার পেছনে লুকিয়ে আছে অনেক বিচ্ছেদ ও বিয়োগান্ত ইতিবৃত্ত—আমার বাবা মা আমি আমরা সকলেই সে রঙ্গমঞ্চের পাত্র-পাত্রী। সে ইতিহাস আমি যতদূর সম্ভব লিখে রেখেছি। লিখে রেখেছি আমার ডায়েরীর পাতায়।

অনু রান্নাঘরে চলে গেল। আমি আলমারি থেকে একখানা ডায়েরী এনে খুলে বসলাম। সমগ্র পৃথিবীর যে কোন আকর্ষণীয় ইতিহাসের চেয়ে মাউলতলার ইতিহাস আমার কাছে কোনদিনই কম লোভনীয় কম আকর্ষণীয় নয়।

যে কাহিনীগুলো আমি নিজেই লিখেছি—বার বার পড়েছি, আবার তাই পড়তে শুরু করলাম। শ্রীযুক্তা নূরজাহান চৌধুরীর চিঠি আমাকে নিয়ে গেল কোন্ সে সুদূরে——প্রায় বিস্মৃত অতীতে।

নিজেই জানিনা কখন পড়া বন্ধ করে লেখা শুরু করে দিয়েছি।

....সেদিনের দাঙ্গাবিধ্বস্ত পূর্ব বাংলায় ক্ষয়-ক্ষতির যথাযথ হিসাব নিকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমার বাবাকে যে আমি হারিয়েছিলাম এ সত্য চিরকালের। দাঙ্গাবাজদের হাতে বাবা নিহত হন আরও অনেকের সাথে। সেই সঙ্গে আরেকটি স্মরণীয় সত্যও সেই ছোট্টবেলাতেই আমার চোখের সামনে এসে ধরা দিয়েছিল। ইদ্রিস চৌধুরীর মত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লোকও সেদিনকার পূর্ববঙ্গে ছিলেন, আর এঁরাই ছিলেন সারা দেশ জুড়ে আলোর দিশারী।

....এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে দাঁড়িয়ে আমি কলকাতা শহরের এক খ্যাতনামা ইতিহাসের অধ্যাপক, প্রতিষ্ঠার পথে উদীয়মান সাহিত্যিক শ্রীঅমল ভট্টাচার্য আজও যখন তখন দুহাত জোড় করে প্রণাম জানাই সে মহামানবকে যিনি সেদিন ভারতবর্ষের জটিল কুটিল রাজনৈতিক ঘোলা জলে নিজের আদর্শ বিসর্জন দেননি, বরং তাকে পরাজিত পর্যুদস্ত করে বাঁচিয়েছিলেন শত সহস্র অন্য সম্প্রদায়ের লোকের প্রাণ। —তাঁরই নাম ইদ্রিস চৌধুরী।

....আজকাল প্রায়ই কেন যেন মায়ের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে তাঁর দেবী প্রতিমার মত সুন্দর মুখ, গৌরবর্ণ দেহ, নিটোল হাত পা, মাথায় এক প্রস্থ কালো কুচকুচে চুল, কপালে সিঁদুরের বড় টিপের শান্ত স্নিগ্ধ দীপ্তি।

....বাবা নিহত হওয়ার পর মা'কে অপহরণের দৃশ্য দেখি চোখ বুজলেই। মায়ের সেই ভয়কাতর মুখ—আর উন্মত্ত দানবের বিকট মূর্তি প্রায়ই আমাকে অন্যমনা করে দেয়। স্বাধীনতা লাভের জন্যে অনেক শহীদ প্রাণ দিয়েছেন, অনেকে ঝুলেছেন ফাঁসীকাঠে—তাঁদের সবাইকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। কিন্তু আমার মত একজন সাধারণ নাগরিক স্বাধীনতা লাভের জন্যে চিরদিনের মত হারিয়েছে তার বাবা-মাকে——এ ঘটনাও তো ঐতিহাসিক।

....ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে দেখা যাবে যখনই কোনও সম্প্রদায় বা দল ক্ষমতা অধিকার করেছে, তখনই বিজিত সম্প্রদায়ের নারী হয়েছে লাঞ্ছিতা, অপহৃতা। দ্রব্যসামগ্রীর মতই তারা হয়েছে লুণ্ঠিত। তাদের চোখের জলের ধারা উষ্ণ প্রস্রবনের মত ভিজিয়েছে দেশের মাটি। সে ইতিহাসের ধারা আজও বহমান।

আরও পাঁচ-সাতজন যুবতী মহিলার সাথে মা'কে যখন দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, মা তখন চিৎকার করে আমাকে বলে উঠলেন, খোকা তুই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়—সাঁতরে ওপারে চলে যা। নইলে তোকেও ওরা কেটে ফেলবে। আমি গ্রামের ছেলে—ঐ সাত-আট বৎসর বয়সেই সাঁতারে পটু ছিলাম। মা'র কথামত জীবন বাঁচাতে সেদিনের উত্তাল উন্মাদ মুলাতি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

....'জননী জননী ভরা বাংলা দেশে' আমারও জননীর অভাব হল না। নৌকোর মুসলমান মাঝিরা আমাকে সঁপে দেয় নিঃসন্তানা বিধবা সরলা মণ্ডলের হাতে। সরলা মণ্ডলের স্নেহকাতর বুকে মুখ রেখে কেটেছে আমার প্রথম জীবন শিয়ালদা স্টেশন-প্লাটফর্মে, পরে সরকারী রিফিউজি ক্যাম্পে। নদী থেকে আমাকে টেনে তুলেছিল মাঝিরা —নিশ্চিন্ত আশ্রয়টুকু খুঁজে দিয়েছিল তারাই। কমলেশ ভট্টাচার্যের ছেলে অমল ভট্টাচার্য সরলা মণ্ডলের পুত্রত্ব লাভ করার গৌরবে আজও গৌরবান্বিত।

আমার পাঠ্য জীবনে মায়ের তত্ত্বাবধান ছিল কঠিন, কঠোর। আমি ভাল ছাত্র বলে মা আমাকে সবকিছুর আড়ালে রেখে শুধু পড়াশুনোয় মগ্ন রাখতেন। যেবার আমি এম এ পরীক্ষায় পাশ করে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান পাই—বহু ঘটা করে মা অনেককেই নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিলেন।

....মায়ের ছিল সুচিন্তিত পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনা মত তিনি এগুচ্ছিলেন ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে। তখন আমার চাকরী হয়নি। কলেজে কলেজে ইন্টারভিউ দিচ্ছি। আমার চাকরী হলে আমাকে বিয়ে দিয়ে ঘর-সংসার করে দিয়ে তিনি কাশী চলে যাবেন। তার আগে প্রায়শ্চিত্ত করে পৈতে দেবেন—আমি খাঁটি ভট্টাচার্য বামুনের ছেলে।

...আমি তীব্র আপত্তি করেছিলাম। অন্তরের অন্তস্থল থেকে এক বোধশক্তি জাগ্রত হয়ে বাধা দিয়েছিল আমাকে ব্রাহ্মণের দণ্ডী ধারণ করতে। সরলা মণ্ডলের মাতৃত্বকে অস্বীকার করে খাঁটি ভট্টাচার্য বামুন হতে রাজী হইনি। এই পৃথিবীতে সরলা মণ্ডলের যুগল চরণ পবিত্র তীর্থস্থানের চেয়েও লক্ষ গুণ পবিত্র আমার কাছে।

...এর কিছুদিন পরই আমার কোলে মাথা রেখে হঠাৎ হার্টফেল করেন বামুনের ছেলে অমল ভট্টাচার্যের স্নেহকাতর বিধবা জননী শ্রীযুক্তা সরলা মণ্ডল।

...আমি প্রায়ই ভাবি, আজ সারা দেশব্যাপী বর্ণে বর্ণে, ধর্মে ধর্মে, প্রদেশে প্রদেশে যে দ্বন্দ্ব ঝগড়া মারামারি—যার ফলে আমার মত অনেক অমল ভট্টাচার্যই অসময়ে পিতামাতাকে হারিয়ে সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ভাসমান। এই সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক দাঙ্গা দমন ও নির্মূল করার জন্যে নতুন পথের অন্বেষণ দরকার। তা না হলে ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে কোনদিনই নির্মল, উজ্জ্বল, সতেজ সূর্যের আবির্ভাব ঘটবে না। দাঙ্গায় বিধ্বস্ত আমার মত অনেককেই আজও স্বজনহারা হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ অবশ্যই দরকার—যার নেতৃত্বে থাকবেন ইদ্রিশ চৌধুরীর মত মহামানবেরা।

আজ বারোই নভেম্বর। কাঞ্চন এল। চমৎকার ছেলে। উন্নত নাক, ফর্সা রং, কালো কুচকুচে সারা মাথা ভর্তি ঘন কোঁকড়ানো চুল, মেদহীন সুঠাম দেহ—বড় ভাল লাগল ছেলেটিকে। বাংলায় এম.এ। বয়স কোনও অবস্থায়ই ছাব্বিশের বেশি নয়। সাদা ধবধবে পায়জামা-পাঞ্জাবীতে ওকে মানিয়েছে চমৎকার।

কাঞ্চনই সেদিন আমাকে ফোন করে আজকে আসার কথা বলে। কোথা থেকে ও আমার কলেজের ঠিকানা সংগ্রহ করেছে জানি না।

ও আসবে শুনে অনু অনেক রান্নাবান্না করে রেখেছে। শুধু দেশের নয়, আজ ওর শ্বশুরবাড়ির গ্রামের ছেলেকেও প্রাণভরে আপ্যায়ন করবে অনু।

কাঞ্চন এসে আমাকে-অনুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। বড় ভাল লাগল। প্রাণভরে আশীর্বাদ করলাম কাঞ্চনকে।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক ভালো গল্প তুলে দিলাম ওর হাতে। ওকে পড়ে মতামত দিতে বললাম। কারণ ও নাকি শিগ্‌গিরই হাইকমিশনার অফিসের চাকরী ছেড়ে বরিশাল বি এম কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেবে। সুতরাং ওর মতামতের মূল্য যথেষ্ট। আর অনুরোধ করলাম, দেশে ফিরে গিয়ে নূরজাহান দেবীকে যেন গল্পগুলো পড়ায়।

আমার আগ্রহ দেশের কথা জানার। লতা, হিজলা, মাউলতলা, মুলাদির বিশদ বর্ণনা শোনবার। কাঞ্চন বলল, আমাদের ফেলে-আসা গ্রামের গল্প। মুলাদি নদীর জলধারা আগের মতোই প্রবাহিত। মেঘনা সরে এসেছে আরও সামনে। গ্রামের রাস্তাঘাট আরও উন্নত ও প্রশস্ত হয়েছে। মুলাদি বাজারে তিন-চারখানা পাকাবাড়ি উঠেছে। আগেও এ এলাকায় হিন্দু কম ছিল, এখন আরও কমে গেছে—নেই বললেই চলে। কাঞ্চন বলল, মাউলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন আর টিনের নেই, রীতিমতো পাকা।

কাঞ্চন দেখলাম সব ঘটনাই জানে। আমার বাবার নাম—স্কুল প্রতিষ্ঠার সব কাহিনীই তার জানা। বাবার বীভৎস মৃত্যু সম্বন্ধেও সে ওয়াকিবহাল। স্বাভাবিকভাবেই, আরও একজন—যিনি চিরদিনের মত সরে গেছেন পর্দার অন্তরালে—আমার গর্ভধারিণী জননী—তাঁর সম্বন্ধে নিজেই উল্লেখ করে কাঞ্চন বলল, যারা দাঙ্গা করে, লুঠ করে, নারীহরণ করে, সব সময় সব দোষ আমি তাদের দিই না। যারা এ কু-কাজে তাদের ইন্ধন জোগায়, উৎসাহিত করে, আসল দোষী তারাই। অথচ তারাই দেশ শাসন করে, দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেজে বসে।

ছেলেটির চিন্তাধারায় যথেষ্ট প্রগতিশীলতার ছাপ। কাঞ্চনের ভাষায়, যে বন্দুক দিয়ে গুলি করা হয় দোষ কি সেই বন্দুকের?

কোনও ভূমিকা না করে কাঞ্চন বলে চলল, আরও জনা সাতেক মহিলার সাথে আপনার মাও অপহৃতা হয়েছিলেন। ইদ্রিস চৌধুরীর কানে যেতেই তিনি দলবল নিয়ে সবাইকে উদ্ধার করে পাঠিয়ে দিলেন তাদের নিজের নিজের বাসস্থানে। বিপদ দেখা দিল আপনার মা'কে নিয়ে। কোথায় পাঠাবেন তাঁকে? ইদ্রিস চৌধুরীর বাড়ি গিয়ে কাটালেন তিনি পাঁচ বছর—তারপর বাকী সমস্ত জীবন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মানে?

—কলকাতায় আপনাদের কোনও আত্মীয় ছিল না। আসামে নাকি কে ছিল—আপনার মা তার ঠিকানা জানতেন না। আর দেশে তো ছিলই না কেউ। স্বামী হারিয়ে, পুত্র হারিয়ে আপনার মারও মানসিক শক্তি ছিল না। তবু দেশের অবস্থা শান্ত হলে ইদ্রিস চৌধুরী কলকাতায় লোক পাঠিয়ে রিফিউজী ক্যাম্পে খোঁজ নিয়েছেন আপনার। বহুদিন আশায় বুক বেঁধে ছিলেন—হয়ত আপনি জীবিত আছেন। কিন্তু যখন আপনাকে পাওয়াই গেল না, তখন এক বিরাট শূন্যতা আক্রমণ করল আপনার মাকে। ভাবুন তো ভাইসাব, স্বামীপুত্রহারা এক নিঃসঙ্গ রমণীর সেই শূন্যতার দিনগুলোর কথা।

আমি হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম আমার মায়ের মানসিক অবস্থা। কাঞ্চনের মুখে শুনলাম, আমার মায়ের সেই মানসিক শূন্যতাকে দূর করতে হিজলার নিবারণ মাস্টারকে নিয়োগ করেছিলেন ইদ্রিস চৌধুরী মাকে পড়াবার জন্যে। যদি তাঁর মন কিছুটা শান্ত হয় এই আশায়। চার-পাঁচ বছর বাদে ম্যাট্রিক পাশ করার পরই মা পেলেন আমার বাবার প্রতিষ্ঠিত মাউলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার পদ।

—তারপর?

—দু বছর পর কমলেশ ভট্টাচার্যের বিধবা স্ত্রী রত্না ভট্টাচার্য হয়ে গেলেন নূরজাহান চৌধুরী।

—মানে? লাফিয়ে উঠলাম আমি।

—ইদ্রিস চৌধুরী রাজী ছিলেন না। তীব্র আপত্তি ছিল তাঁর। আপনার মা নিজেই মৌলভী ডেকে ইসলাম মতে নিকা করলেন তাঁকে। কোনও অন্যায় তিনি করেন নি। নিঃসঙ্গ জীবনে নিশ্চিন্ত আশ্রয় জুটল তাঁর। তাঁর আবার সংসার হল। স্বামী পেলেন, একটি ছেলেও হল—

এ সংবাদ আমাকে দিশেহারা করে দিল না। বরং মানসিক অপূর্ণতা ঠেলে সরিয়ে দিল মন থেকে। এ পৃথিবীতে আমি একা নই। আমার মা এখনও জীবিতা, আমারও ভাই আছে। নতুন চিন্তায় আলোকে উদ্ভাসিত আমার মন, উত্তেজনায় প্রায় পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলাম আমি—কি বলছ তুমি? কোথায় সেই ছেলে? কি নাম আমার ভাইয়ের?

সামনে বসে-থাকা সুদর্শন যুবকটির কণ্ঠে মৃদু অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে ধ্বনিত হল, কাঞ্চন চৌধুরী।

অনুশাসনীয়

অমল চক্রবর্তী

বাবা, ও বাবা?

সকালবেলা একটু সময় করে পরীক্ষার খাতাগুলো নিয়ে বসেছিল কান্তি। মেয়ের ডাকে একবার চোখ তুলে চাইল। তারপর আবার খাতা দেখতে দেখতে বলল, পড়াশুনা হয়ে গেল?

হ্যাঁ। বলে মাথা ঝাঁকাল দীপা।

তাহলে রান্নাঘরে যাও। দেখতো মা কি করছে।

মা রান্না করছে। বাবা, ও বাবা?

কান্তি খাতা-দেখা বন্ধ রেখে হাসল। আট বছরের একমাত্র মেয়ে তার। বলল, ব'ল।

অনুশাসন কাকে বলে বাবা?

অনুশাসন? কান্তি অবাক হ'ল, এ কথা তুই কোথায় পেলি?

বারে, কাল আমাদের ক্লাসে বড় বড় ছাপা কাগজ আঠা দিয়ে লাগিয়ে গেল না? তাতেই তো লেখা আছে।

কান্তি বুঝল। তাদের স্কুলেও ঐ সব ছাপানো কাগজ লাগানো হয়েছে। হেড মাষ্টার মশাই পিওনদের সাথে নিয়ে ক্লাসে ক্লাসে সেগুলো দাঁড়িয়ে থেকে লাগিয়ে দিয়েছেন। কান্তিকে দেখে হেসে বলেছিলেন, বুঝলেন কান্তিবাবু, যস্মিন দেশে যদাচার। আমার কাজ লাগিয়ে দেবার, দিলাম।

দীপার দিকে চেয়ে কান্তি হাসল, কেনরে, তোদের দিদিমণি বলে দেয় নি?

বারে, আমাদের ছোট স্কুল না। রাণীদিদিমণি কি তোমার মত বড় স্কুলে পড়ায় যে জানবে! বল না তুমি।

কান্তি ভাবল, মেয়েকে কি বলবে সে। সে-ও কি ছাই বুঝতে পেরেছে সব। 'জরুরী অবস্থা হল অনুশাসন পর্ব'—তার মানে। রামায়ণ-মহাভারতে অনেক পর্ব আছে। কিন্তু অনুশাসন পর্ব তো কোথাও নেই। অন্য কোথাও যদি থেকেও থাকে তার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি। শেষমেশ কান্তি অনেক ভেবে চিন্তে বলল, অনুশাসন মানে জরুরী অবস্থা।

জরুরী-অবস্থা কি বাবা?

জরুরী অবস্থা মানে ইমারজেন্সী। ওটা তো ইংরাজী শব্দ, তুমি এখন ঠিক বুঝবে না। বড় হয়ে যখন আরো বড় বড় বই পড়বে তখন বুঝতে পারবে।

জরুরী অবস্থা কি খুব জরুরী নাকি বাবা?

হ্যাঁ, ভীষণ জরুরী, এখন যাও তো খেলা কর গে। আমি কাজ করি। কান্তি আবার পেন্সিলটা হাতে তুলে নিল।

জান বাবা, আমাদের স্কুলের দারোয়ান রামুকে কাজের কথা বললেই ও জরুর জরুর বলে। জরুর আর জরুরী কি এক বাবা?

আমি তোমাকে পরে বুঝিয়ে বলব। এখন লক্ষ্মী সোনা মেয়ে তুমি, খেলা কর গে, যাও।

পরে বলবে তো বাবা? পরে বলে আমার মা'র মত ভুলে যাবে না তো?

বলব বলব। এবার তুমি যাও।

দীপা খুশী হয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। মেয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কান্তি গুছিয়ে বসল পেন্সিল হাতে নিয়ে। দু'দিনের মধ্যেই খাতা দেখাটা শেষ করতে হবে। বড্ড গাফিলতি হয়ে যাচ্ছে। খাতা দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হল কান্তি। মেয়েটার মাথায় সব ছেড়ে ঐ শব্দটাই বা ঢুকল কেন? কান্তি নিজেই কি ছাই জানে বা বোঝে এসব ব্যাপার? কেনই বা এই জরুরী অবস্থা, কেনই বা এর নাম অনুশাসন পর্ব, এ সবের ব্যাখ্যা এখন কি করে মেয়েকে বুঝিয়ে বলে কান্তি? তমালটা থাকলে ও বেশ সহজ করে দীপাকে বুঝিয়ে দিতে পারত। সকালের কাগজ দেখে যেদিন কান্তি বিশ্বাস জেনেছিল ব্যাপারটা, সেদিনই বাজার করে ফেরার পথে তমালের সাথে দেখা হয়েছিল। সেই শেষ দেখা। তমালকে দেখে বাজারের থলে হাতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কান্তি। তমাল বলেছিল, কাগজ দেখেছেন তো দাদা?

দেখলাম তো। কিন্তু কি ব্যাপার বল তো ভাই?

তমাল সরে এসেছিল কাছে। ওর চোখেমুখে একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ করেছিল কান্তি। তমাল বলেছিল, ইন্দিরাজীর শেষ অস্ত্র দাদা। আজ থেকে ভারতবর্ষের বুকে এক ভয়ংকর রাজত্ব ঘনিয়ে এল। আপনার আমার সমস্ত অধিকারকে ছিনিয়ে নেবার জন্যেই এই জরুরী অবস্থা।

যাবে নাকি বাসায়? কান্তি চারপাশে তাকিয়ে বলেছিল।

না দাদা। কাজ আছে। আমি বরং পরে যাব। তবে ভয় নেই দাদা। ইন্দিরা গান্ধী বাঁচার জন্য মরীয়া হয়ে শেষ রাস্তা ধরেছে। আপনি তো জার্মানী ইতালীর ইতিহাস জানেন দাদা। ইতিহাসই এদের ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট করে রেখেছে। এরা শত চেষ্টাতেও তার হাত থেকে পার পাবে না। আমাদের দুঃসময় তো সাময়িক দাদা। ভরসা রাখুন। আমি সময় করে যাবো।

চলে গিয়েছিল তমাল। আর তমালের কথাগুলোই ভাবতে ভাবতে সেদিন বাড়ি ফিরেছিল কান্তি। সেদিনই রাতে পুলিশ বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তমালকে। সেই তমাল আজও জেলে।

কি হ'ল, তোমার কি স্কুল নেই আজ? স্ত্রী নীলিমার ডাকে চমক ভাঙে কান্তির। হাতের পেন্সিল হাতেই ধরা আছে। নীলিমার দিকে তাকিয়ে হাসল কান্তি। কি, মেয়ে গিয়ে জ্বালাচ্ছে তো?

কেন, আমার মেয়ে কি অমন নাকি?

কান্তি হাসে। বলে, না, তা কেন, তোমার মেয়ে হ'ল একটি জিজ্ঞাসার নদী। তা তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করেনি।

কি যেন বলছিল একটা, কিসের শাসন না কি। বলছে তুমি নাকি পরে বুঝিয়ে দেবে বলেছ।

অনুশাসন, বুঝলে, যার নাম জরুরী অবস্থা। তোমার মেয়ের মাথায় এখন সব জিজ্ঞাসা খেলা করছে।

ওমা সে কি গো! অতটুকুন মেয়ে এত সব শিখল কোথায়? তা তুমি আবার এসব কথা বুঝিয়ে বলবে নাকি ওকে?

আমি? হো হো করে হাসে কান্তি। পাগল হলে নাকি তুমি! আমি এর কি বুঝি যে বলব? তমাল থাকলে বুঝিয়ে দিত ঠিক।

তমালের কথায় নীলিমার গলায় সমবেদনার সুর কেঁপে উঠল। বলল, হ্যাঁগো, তমাল ঠাকুরপোর খোঁজখবর নাও তো তুমি। আহা অত সুন্দর ছেলেটা!

কান্তি মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে বলল, জেলের ভেতর যেমন থাকে তেমনই আছে।

কবে ছাড়া-টাড়া পাবে শুনেছ কিছু?

এর নাম মিসা আইন বুঝলে? অপরাধী জানিতে পারিবে না কি তাহার অপরাধ। একবার এর কব্জায় এলে সহজে কি ছাড় পাবে?

কি যে ছাই রাজত্বি চলেছে, মাথামুণ্ডু এর কিছুই বুঝি না।

কান্তি বলে, আমিও বুঝি না। তবে এটা বুঝি, তমালরা একদিন ফিরবেই।

নীলিমা কান্তির দিকে তাকিয়ে বলে, তাই যেন হয় গো।

স্কুলে অঙ্কের ক্লাস কান্তির। নাইনের খাতায় রোল কল ক'রে কান্তি চক পেন্সিল হাতে বোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। এমন সময় শুনতে পেল কে যেন বলছে, স্যার, একটা কথা বলব স্যার?

লেখা থামিয়ে কান্তি ঘুরে দাঁড়াল। দেখল ছিপছিপে রোগা ফর্সা মত ছেলেটি, সম্ভবতঃ দীপক ওর নাম, দাঁড়িয়ে রয়েছে। কান্তি ভুরু কুঁচকে একবার তাকাল। কি বলতে চায় ও? বলল, কি বলছিলে তুমি?

স্যার, ঐ যে দেয়ালে পোষ্টার সাঁটা আছে স্যার, অনুশাসন পর্ব মানে কি স্যার?

কান্তি এমনিতেই যথেষ্ট গম্ভীর। ছেলেটির প্রশ্ন শুনে আরো গম্ভীর হ'য়ে বলল, বাজে কথা রেখে যে জন্য ক্লাসে বসে রয়েছ তাই কর। বলেই আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে এ্যালজ্যাবরা-ফর্মুলা লিখতে শুরু করল। লিখতেই কান্তি অনুভব করল ঠিক এই ব্ল্যাকবোর্ডটার উপরেই দেয়ালে সাঁটা রয়েছে সেই পোষ্টারটা। কান্তি চোখে দেখতে পাচ্ছিল না, তবু মনে হচ্ছিল লেখাটা যেন নেমে এসে এই ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর ফুটে উঠছে। কান্তি লেখা থামিয়ে ওপরে তাকাল। কৈ, না তো। ঠিকই সাঁটা রয়েছে পোষ্টারটা। অনর্থক তাহলে ভাবছে কেন কান্তি? আসলে সকালে দীপার ঐ প্রশ্নটার আর এখন ক্লাসের ঐ ছেলেটার জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কান্তি কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে বোধ হয়। মরুক গে ওসব ভাবনা। চক-পেন্সিলটা হাতে নিয়ে কান্তি আবার লিখতে শুরু করে। এবার কান্তির কানে এল আর একটা আওয়াজ, আপনি দীপকের কথাকে বাজে কথা বললেন কেন স্যার?

সাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল কান্তি। ছেলেটার নাম বিভূতি। ওর দিকে তাকিয়ে বলল, কি বলছ?

আপনি পোষ্টারটাকে অপমান করতে পারেন না স্যার। সে রাইট আপনার নেই।

চট করে কান্তির মুখে কথা এল না। অবাক হয়ে গেছে কান্তি। কতই বা বয়েস হবে ছেলেটার? ষোল সতের খুব জোর। বছরখানেক হল ছাত্র-রাজনীতি নিয়ে বেশ হৈ হৈ করছে। সে যা খুশী করুক। কিন্তু একটা বেড়ে গেছে ভাবেনি কান্তি। আবার জিজ্ঞেস করল, কি বললে তুমি?

বলছিলাম ওই লেখাটাকে আপনি অপমান করতে পারেন না স্যার।

অপমান? কিসের অপমান?

দীপককে বলেছেন আপনি এইমাত্র। ওটা কি বাজে কথা? আপনি জানেন না ওটা কার কথা? লেখাই তো রয়েছে। বিনোবাজীকে সবাই শ্রদ্ধা করে। আপনি তাঁকে কিছুতেই অপমান করতে পারেন না স্যার।

কান্তি হাঁ হ'য়ে চেয়ে ছিল। বুঝতে পারছিল মাথার দু'পাশের শিরা বেয়ে তিরতির করে রক্ত চড়ছে। ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ ফেটে পড়ল কান্তি, বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও ক্লাস থেকে। রাসকেল, ইডিয়ট কোথাকার। আমায় তুমি নীতিকথা শোনাতে এসেছ? গেট আউট।

কান্তির অস্বাভাবিক চিৎকারে পাশের ক্লাশ ছেড়ে ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছেন বাঙলার মাষ্টারমশাই অবনীবাবু, কি হল কি কান্তি?

আপনি জানেন না অবনীদা এই রাসকেলটার কি দুঃসাহস। ও আমায় জ্ঞান দিতে আসে। বলতে বলতে মাথা ঘুরে পড়ে যায় কান্তি। আর তখনই চারপাশ থেকে সমস্বরে জল, পাখা, হাওয়া, ধর ধর, নিয়ে চল ইত্যাকার কথাবার্তা অস্পষ্ট শুনতে শুনতে ঝুঁকে-পড়া অবনীবাবুর হাত দু'টো ধরে জ্ঞান হারাল কান্তি।

জ্ঞান ফিরে আসতে কান্তি ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল। মাথার ওপর সিলিং ফ্যানটাকে খুব জোরে ঘুরতে দেখল। অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে এল। কান্তি ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, আমি কোথায়?

ফিরেছে ফিরেছে, জ্ঞান ফিরেছে।

কথা বলেছে?

বলল তো এইমাত্র।

ঐ তো ডাক্তারবাবুও এসে গেছেন।

কান্তি আবার জিজ্ঞাসা করল, আমি কোথায়?

আর তখনই অবনীবাবুর মুখটা ঝুঁকে পড়ল সামনে, তুমি আমাদের টিচার্স কমনরুমে কান্তি। ভয় নেই, ডাক্তারবাবু এসে গেছেন।

কান্তির মনে এল সব। ছেলেটির তেরিয়াভাবের কথা আর নিজের সেই চিৎকার। মনে হতেই ভয় হ'ল কান্তির। তবে কি স্ট্রোক হ'ল তার? যদি তাই হয়, তাহলে? তার মেয়ে, তার স্ত্রী, তার সংসার—এসবের কি হবে? কান্তি হাত নাড়িয়ে দেখতে চাইল শরীরের কোথাও কিছু হল কিনা।

উঁহু, হাত নাড়বেন না। চুপচাপ শুয়ে থাকুন।

কান্তি তাকিয়ে দেখল গলায় স্টেথো-ঝোলানো ডাক্তার। হাতের নাড়ি ভালভাবে দেখে ডাক্তারবাবু বলল, আপনার পেটে গ্যাসট্যাস হয়? অম্বল আছে? কান্তি ঘাড়টা নাড়তে গেল। পারল না। বলল, হ্যাঁ, আছে। সব সময়ই পেটে উইন্ড ফর্ম করে।

আর কিছু প্রশ্ন করল না ডাক্তার। একটা কাগজে খসখস করে লিখতে লিখতে বলল, ঘাবড়াবার কারণ নেই। এই ওষুধটা সকাল বিকাল দু'চামচ করে পনের দিন খাবেন। এবার উঠে পড়ুন তো। বলে কাগজটা টেনে ফরফর করে ছিঁড়ে পাশে দাঁড়ানো অবনীবাবুর হাতে দিয়ে কান্তিকে একটানে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, এক কাপ গরম চা খেয়ে নিন, উঠে পড়ুন। কিচ্ছু ভয় নেই।

ডাক্তার চলে গেলে সবাই ঘিরে ধরল কান্তিকে। কান্তি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল। ধীরে ধীরে যা ঘটেছিল বলে আবার চুপ করল। ইংরেজির মাষ্টার মশাই তরুণবাবু বললেন, থাক, তোমার আর কথা বলতে হবে না। খানিক বিশ্রাম নিয়ে তুমি বাড়ি চলে যাও। সঙ্গে বরং কেউ যাক।

কান্তি হাসতে চেষ্টা করল। বলল, আমি একাই যেতে পারব মাষ্টারমশাই। ডাক্তারবাবু ঠিকই বলে গেছেন, কিছুই হয়নি আমার। আসলে ছেলেটার ঐ বেয়াড়া ধরনের কথাবার্তা শুনে মাথাটা ঠিক রাখতে পারি নি।

না না, তুমি ঠিকই করেছ কান্তি। আমি হলে চাবকে ওটার পিঠের ছাল তুলে নিতাম। পড়াশুনার নামে লবডংকা, ওদিকে জরুরী শাসনের ভক্ত হনুমান সব।

এমন সময় বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। মনে হচ্ছে হেডমাষ্টারের ঘরের সামনে একটা কিছু, বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন তরুণবাবু। যেতে যেতেই গোলমালটা টিচার্স রুমের দোরগোড়ায় এসে গেল। ততক্ষণে টিচার্স রুমের প্রায় সব মাষ্টারমশাইরাই এগিয়ে গেছেন দরজার কাছে। ওদিক থেকে হেডমাষ্টার মশাইও এসেছেন।

বিশ্রী ধরনের জামাপ্যান্ট পরা ঘাড় অবদি-চুল একটি যুবক তরুণবাবুকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল, সে কান্তিমাষ্টার কোথায়?

তরুণবাবু থমকে দাঁড়ালেন। বুঝতে চেষ্টা করলেন ব্যাপারটা। তারপর হেড-মাষ্টারমশাইকে প্রশ্ন করলেন, এরা কাকে চাইছে নির্মলবাবু? কারা এরা?

সে খবরে আপনার দরকার নেই। আমরা কান্তি মাষ্টারকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।

ওদের ঠেলেঠুলে ইতিমধ্যে হেডমাষ্টার নির্মলবাবু এসে গেছেন ভেতরে। তরুণবাবু আবার প্রশ্ন করলেন, এরা কারা নির্মলবাবু?

আর বলবেন না। এখানকার ছাত্রনেতা। কান্তিবাবুর ঐ ঘটনাটা নিয়ে এরা কান্তি বাবুর সাথে কথা বলতে চায়।

বাঃ বাঃ বেশ। আর আপনি সেটা এলাও করছেন? কি আশ্চর্য।

হেডমাষ্টারমশাই অসহায়তার ভঙ্গিতে বলেন, কি করব বলুন, কিছুতেই শুনতে চাইছে না।

আপনার তো ফোন আছে। থানায় ফোন করুন। কি, ভেবেছে কি এরা? ছাত্র হয়ে শিক্ষকের—ছিঃ ছিঃ! ঘেন্নায় রাগে মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে তরুণবাবুর।

এবার সেই চুলওয়ালা ছেলেটার পাশের ছেলেটা বলে ওঠে, এও যে দেখছি একই কেসের পেসেন্ট গুরু!

গুরু অর্থাৎ সেই বিচিত্রদর্শন যুবক চুলটা ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে, ওসব থানার ভয় আমাকে দেখাবেন না। আমার নাম পানু। পানু বোস। পানু বোস যা বলে তাই করে। কোথায়, সে কান্তি মাষ্টার কোথায়?

এই যে আমি, আমারই নাম কান্তি বিশ্বাস। বল, কি বলতে চাও।

অবনীবাবু হাঁহাঁ করে ওঠেন, তুমি আবার উঠে এলে কেন? ডাক্তার তো তোমায় শুয়ে থাকতে বলে গেল।

আপনি চুপ করুন অবনীদা। এরা কি জানতে চায়?

এ যে দেখছি লাল লংকা গুরু। একটু রগড়ে নেব নাকি?

গুরু নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনাকে বাইরে যেতে হবে।

কেন?

কথা আছে।

কি কথা?

বলছি, বাইরে চলুন, ধমকে ওঠে গুরু।

কান্তি দাঁতে দাঁত চেপে বলে, যদি না যাই?

ঠিকই তো, ও বাইরে যাবে কেন? কেন যাবে? যা বলার এখানেই বল। সবার সামনে বল। তরুণবাবু বলে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে অবনীবাবু এবং আরও কেউ কেউ বলে ওঠে, ঠিকই তো, কেন? যা বলবার এখানেই হোক। হেডমাষ্টার মশাইও চিঁ চিঁ করে কি যেন বললেন। চারপাশে তাকিয়ে গুরু অর্থাৎ পানু বোস বলল, তাহলে এখানেই হোক। শুনুন, আপনাকে বিভূতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সকলের সামনে।

ক্ষমা চাইতে হবে? কান্তি ভাবতে পারে না কি বলছে ছেলেটি।

হ্যাঁ। এবারে ক্ষমা চাইলেই ছেড়ে দেব আপনাকে। ফিউচারে সাবধানে থাকতে চেষ্টা করবেন।

কান্তি চারপাশে তাকাল। একপাল ছেলে ঢুকে পড়েছে ঘরে। এদের অধিকাংশই কান্তির অচেনা। কারা এরা? কি করতে চায় ওরা তাকে নিয়ে? তরুণবাবু, অবনীবাবু, সুভাষ, প্রশান্ত সবার দিকে তাকায় কান্তি। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, ক্ষমা চাইব কেন? কিসের জন্য ক্ষমা?

হ্যাঁ, ঠিকই তো? এতে ক্ষমা চাইবার কি আছে? এটা তো স্কুলের ব্যাপার। ক্লাসের ব্যাপার।

চুপ করুন আপনি। ধমকে ওঠে গুরু। আপনি জানেন উনি জাতির জরুরী অবস্থাকে অপমান করেছেন! এ অপমান তো জাতীয় অপমান। মানে আমাদের জাতীয় নেত্রীর অপমান। আলবৎ ক্ষমা চাইতে হবে।

তোমরা মিছিমিছি জেদ করছ। কান্তি সে রকম ছেলেই নয়। ও কোন রাজনীতিই করে না। ও কেন এসব ব্যাপার নিয়ে বলতে যাবে? অবনীবাবু ওদের বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেন।

সে আমরা সব জানি। লাল পার্টির ছেলেরা ওর বাসায় গিয়ে আড্ডা মারে। হ্যাঁরে পটলা, খবর পাকা তো?

পাকা খবর গুরু। সে তমালের সাথে এর খুব রসবস গুরু।

শুনুন তাহলে। শুনছেন তো সব? মাথা ঝাঁকিয়ে পানু বোস বীরদর্পে চারপাশে তাকায়। যেন কান্তির অপরাধ সবটাই সে প্রমাণ করে দিয়েছে। নিন এবার বলুন আপনারা। পানু বোস প্রমাণ ছাড়া কাজ করে না।

তরুণবাবু কান্তির দিকে তাকাল, কি ব্যাপার কান্তি? কি বলছে এরা?

কান্তির চোখদুটো চশমার আড়ালে দপ্ দপ্ করে জ্বলছিল। তমাল আর ওর বন্ধুরা তো আসতই তার বাড়ি। তাতে কার কি হয়েছে? ওদের সাথে এই গুণ্ডা গুলোর তুলনা? তমালের মুখটা মনে পড়ল কান্তির। ঘাবড়াবার কিছু নেই দাদা। আমরা তো আছিই। কান্তি আস্তে আস্তে বলল, ক্ষমা আমি চাইব না। ক্ষমা চাইবার মত কোন অন্যায় আমি করিনি। ক্লাসের মধ্যে বাঁদরামি করলে এবার থেকে ঘাড় ধরে বের করে দেব।

কথা শেষ হবার আগেই একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ল কান্তি। মাথাটা গিয়ে বাড়ি খেল দেওয়ালে। সেখানেই পড়ে গেল কান্তি। মুহূর্তে ঘটে গেল ঘটনাটা, কেউ বুঝবার আগে, বাধা দেবার আগে।

হাতটা ঝেড়ে গুরু পানু বোস চারপাশে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসল। তারপর দলবল নিয়ে চলে গেল। তরুণবাবু যেখানে ছিলেন সেখানেই মাটিতে উপুড় হ'য়ে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কঁকিয়ে উঠলেন, ছেলেটা বোধহয় আর বাঁচবে না, ওকে দেখ।

সেই অবস্থা থেকে ডাক্তারখানা। সেখান থেকে বাড়ি। মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা কান্তিকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে নীলিমা, ও মাগো, এ কি হল তোমার?

সঙ্গে সবাই ছিল। অবনীবাবু কান্তিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললেন, এখন কোন কথা নয়। যা হবার হ'য়ে গেছে। এই ওষুধপত্র রইল। দেখে নাও। ডাক্তার কাল এসে আরেকটা ইনজেকশান দিয়ে যাবে।

তরুণবাবু কান্তির মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, আমরা তো আছি কান্তি। ভয় পেও না। বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে উঠল তার। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের পরাজয়টা তাকে যে ছুঁয়ে আছে এখনও।

কান্তি হাসতে চাইল। হাতটা তুলে বলল, ঠিক আছি আমি। আপনারা ভাববেন না।

অবনীবাবু বললেন, দেখতেই তো পেলে, থানা কোন এ্যাকসানই নিল না। ফোন করা সত্ত্বেও এল না একবারও।

তরুণবাবু দু'হাত নেড়ে বললেন, অনুশাসন পর্ব। বুঝলে না ভায়া, ইমারজেন্সি। ব্রিটিশ আমলের লোক আমরা। এ শাসন আমরা দেখিনি কখনো।

কান্তি এবারে হাসতে পারল। বলল, জীবনের শেষদিন অবদি আমাদের বোধ হয় আরও অনেক কিছু দেখতে হবে মাষ্টারমশাই।

সবাই চলে গেলে বিছানায় পাশ ফিরে চোখ বুজে শুয়ে থাকল কান্তি। নীলিমা গিয়েছে রান্নাঘরে দুধ গরম করে আনতে। হঠাৎ শব্দ শুনে চোখ খুলে কান্তি দেখল দরজার পর্দা ধরে দীপা দাঁড়িয়ে আছে বড়বড় চোখ করে। কান্তি ডাকল, আয়, এদিকে আয়।

দীপা এগিয়ে এসে বিছানার ধারে দাঁড়াল। কান্তি ওর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একরাশ চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, কিছু বলবি?

তোমায় খুব মেরেছে বাবা?

কান্তি হাসল। বলল, কে বলল তোকে?

ঘাড় ঝাঁকাল দীপা, জেঠু যখন মাকে বলছিল, আমি সব শুনেছি। ওরা খুব গুণ্ডা, না বাবা?

খুব।

দীপা আস্তে আস্তে বিছানার পাশে বসে পড়ল। বলল, ওদের তুমি পুলিশে ধরিয়ে দিলে না কেন? তাহলে পুলিশ ওদের পেটাত।

তাই নাকি?

তাই না? তুমি যে বইটা সেদিন আমাকে কিনে দিয়েছিলে সেটাতে গল্প আছে তো, যারা চোর গুণ্ডা ডাকাত তাদের পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে আর খুব মারে। তুমি ওদের ধরিয়ে দিলে না কেন বাবা?

কান্তি মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর চোখের কোণে জল এল। বলল, ওদের তো পুলিশে ধরবে না মা!

কেন বাবা? ওরা যে তোমায় মারল? মাথা ফাটিয়ে দিল?

না, তবুও ধরবে না।

কেন ধরবে না বাবা?

কান্তির চোয়াল শক্ত হ'ল। বলল, এখন যে জরুরী শাসন মা!

জরুরীতে কি চোরগুণ্ডাদের পুলিশ ধরে না বাবা?

না মা, ধরে না।

তাহলে তমাল কাকুকে যে ধরে নিয়ে গেল? তমাল কাকু তো ভাল লোক। জরুরীতে কি শুধু ভাল লোকদেরই পুলিশ ধরে, বাবা?

কান্তির হাতটা যেন কেমন করে ওঠে। বিছানাটা খামচে ধরে কান্তি বলল, হ্যাঁ মা।

দীপা এক মুহূর্ত কি ভাবল। আস্তে আস্তে কান্তির আরও কাছে সরে এল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আমি তাহলে কাল স্কুলে গিয়ে দেয়ালের সেই কাগজটা ছিঁড়ে দেব, হ্যাঁ বাবা?

কান্তি শুধু দু'হাত দিয়ে দীপার ছোট ছোট হাত দু'টো নিবিড় করে আঁকড়ে ধরল।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে

আশিস ঘোষ

এই বাড়িটা মৃদুলার ঠিক পছন্দ নয়। দেড়খানা ঘরে ইচ্ছেমত চলাফেরা করা যায় না। জিনিসপত্রে ঠাসা। বাইরের কেউ এলে, থাকা তো দূরের কথা, বসতে দেওয়ারও জায়গা নেই। মেয়েরা বড়ো হচ্ছে। ওদেরও তো একটু আলাদা জায়গা দরকার।

ফ্ল্যাট বাড়িটা এমনিতে মন্দ নয়। সরকারি আবাসন। ভাড়াও সামান্য। বাড়িওলার ঝামেলা নেই। যে যার ফ্ল্যাটে থাকে। দরজা বন্ধ করে দিলে, কারুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তুমি খাও, না খাও, যা খুশি কর—কেউ দেখতে আসবে না। দেওয়ালের বাইরের দিকে ছোট একফালি ঝুল বারান্দা। ওখানে বসে আমরা গল্পগুজব করি। রাতে খাওয়ার পর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাই। অন্যান্য ফ্ল্যাটে কোনটায় আলো জ্বলে, কোনটা বা অন্ধকার। চারদিক নির্জন হয়ে যায়।

কিন্তু মৃদুলা এতে খুশি নয়। কিছুতেই এখানে থাকতে চায় না।—দূর, এ আবার একটা বাড়ি নাকি। পায়রার খোপ। ইচ্ছেমত কিছু একটা কিনে রাখার জায়গা নেই। দম বন্ধ হয়ে আসে—

ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি।—জান, এই শহরে কত লোকের একটু থাকারও জায়গা নেই। আমাদের তবু দেড়খানা ঘর। এর চাইতেও কম জায়গায় লোকে কত কষ্ট করে থাকে—

মুখ বিকৃত করে মৃদুলা,—কষ্ট করে থাকে! কই, একবারও তো বল না, কত লোকে কত ভালভাবে থাকে?

রাগ হলেও, চেষ্টা করে মুখে হাসি আনি।—তা বল না, কী করতে চাও—

আর কিছু না বলে মৃদুলা পাশের ঘরে গিয়ে খুটখাট কীসব করতে থাকে। রাতে খেতে বসে হয়ত বলে, তোমার কোনও চেষ্টা নেই। একটু খুঁজলেও তো পার। অন্য কোথাও আর একটু ভাল ব্যবস্থা করা যায় না?

হয়ত যায়। কিন্তু সাধ্যমত পাই কোথায়? অনেক চেষ্টা করে এক বন্ধুর দয়ায় এই ছোট ফ্ল্যাটটা পেয়েছি। মৃদুলা আগে দেখেনি। প্রথম দিন এখানে এসেই মুখ গম্ভীর। —শেষ পর্যন্ত এই?

—কেন, বেশ তো নিজেদের মত থাকা যাবে। পরিবেশও ভাল। কত চেষ্টা করেও লোকে পায় না।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মৃদুলা বলতে থাকে—হ্যাঁ, বলে যাও—কাছেই বাজার—বাস রাস্তা— নিচে কতটা ফাঁকা জায়গা—পুকুর একটা—আরও কতকি—হাত নেড়ে মৃদুলা বলে, —তবু যদি একটু নড়া-চড়ার জায়গা থাকত— কি আর বলি? অগত্যা ওর তাগাদাতে মাঝে মাঝে বাড়ি খুঁজি। একে-ওকে বলি। কিন্তু কোথায় বাড়ি? এটা কলকাতা শহর। ইচ্ছে করলেই এখানে পছন্দমত বাড়ি পাওয়া যায় না। পেলেও যা

ভাড়া বা অগ্রিম, তা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ওকে বোঝানোর চেষ্টা করি—একটু ধৈর্য ধর। সুবিধেমত কোনও ব্যবস্থা হলেই চলে যাব—

মৃদুলা অদ্ভুত চোখে আমাকে দেখে। বিড়বিড় করে বলতে থাকে, —সবই আমার কপাল। বিয়ের আগে কত স্বপ্ন ছিল, নিজের মত ঘর সাজাব। জায়গাই নেই, তো সাজাব কী?

জানি ওর আসল কষ্টটা কোথায়। কিন্তু নিজের বাড়ি হবে ভাবলেই কি আর বাড়ি হয়ে যায়? মৃদুলা এত বোঝে না, বা বুঝতে চায় না। মন খারাপ করে। অক্ষম বলে আমার ওপর চটে যায়। ও প্রায়ই একটা সুন্দর বাড়ির কথা বলে। ছোট বাড়িটার চারদিকে বাগান থাকবে। সামনের লনে থাকবে সমান করে ছাঁটা সবুজ ঘাস। লনের একপাশে বড় একটা পাখির খাঁচা। মেয়েরা ছুটোছুটি করে খেলা করবে। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আমরা গল্প করব।

এক-একদিন ওর যেন কী হয়। বাড়ির কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বাইরের ঝুলবারান্দায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। সারাদিন খাটাখাটনির পর আমার তখন ঘুম পেয়ে যায়। মেয়েরা তো আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃদুলা একাকী বাইরের বারান্দায় বসে থাকে। পাড়ার রাতজাগা কুকুরগুলোর তখন ডাকাডাকি ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়। মৃদুলা চুপচাপ বসে থাকে।

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখি। লাল কালির দাগ দিই। ওকে দেখাই। আমাদের আলোচনা হয়। হিসেব করি। কখনও তর্ক করে বলি—তোমার তো কোনটাই পছন্দ নয়। রাজভবনে থাকবে? যদি দেখি ও খুব গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে, এখুনি হয়ত আগুন জ্বলে উঠবে, তাড়াতাড়ি জল ছেটানোর চেষ্টা করি। —দেখ, তাড়াহুড়ো না করে, ধীরেসুস্থে কাজ করা ভাল। বাড়ি করলে পছন্দমত করব —ঠোঁট বেঁকিয়ে মৃদুলা বলে,—তোমার দৌড় বোঝা গেছে—

একদিন আমার এক বন্ধু এল। গড়িয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে। চাকরি-বাকরি করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি করার কী ঝামেলা, বন্ধু তাই বলছিল। চা খেতে খেতে বেশ তৃপ্তির হাসি হেসে বলল,—যাই বল, বুড়ো বয়সে নিজের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই তো হল। আর জায়গা? তোমাদের এই ভাড়া ফ্ল্যাটের চাইতে কম করেও দ্বিগুণ হবে। আজকালকার বাজারে এটাই বা কম কী?

মৃদুলার খুব আগ্রহ। খোঁজখবর নিচ্ছিল। ক'খানা ঘর। উত্তর-দক্ষিণ খোলা কিনা। সামনে পেছনে বারান্দা আছে তো? থাকলে কতটা বড়। ডাইনিং স্পেস্ কতটা। সব শুনেটুনে মুখ কালো করে বলল—এই পোড়া কপালে আর কিছু হবে না—

—কেন হবে না? আমাদের আবাসন যারা করেছে তারা তো আরও ফ্ল্যাট করছে। কিনবেন?

মৃদুলা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল,—ঐ যে আপনার বন্ধুকে বলুন—

আমিও চটপট বললাম—বেশ তো, চল না একদিন কথা বলে আসি—

মৃদুলা প্রায় লাফিয়ে উঠল—যাবে? সত্যি যাবে?

—বললাম তো—

কয়েকদিন পর অফিসের এক বন্ধুর কাছে খবর পেয়ে একটা জমি দেখতে গেলাম। সোনারপুর স্টেশনের কাছে। স্টেশন থেকে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। জমি মানে জলা জায়গা ভরাট করা হয়েছে। তিরিশ হাজার টাকা কাঠা। স্টেশনের কাছে নাকি আরও বেশি। দরদাম শুনে, জায়গা দেখে খুব একটা উৎসাহ পেলাম না। মৃদুলাও

কেমন চুপসে গেল। কিছুদিন আর জমি বাড়ি নিয়ে কোনও কথাবার্তা হল না। ভাবলাম যাক গে, গরিবের আবার ঘোড়ারোগ কেন? মৃদুলাও বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। ওসব সাধ-আহ্লাদের কথা আর বলে না। বারান্দায় কয়েকটা ফুলের টব লাগিয়েছে। রোজ ভোরে উঠে জল দেয়। একদিন দেখলাম খাঁচায় কয়েকটা মুনিয়া পাখি কিনে আনল। কিছু বলি না। কি বললে, কি উত্তর দেবে কে জানে। চুপচাপ থাকাই ভাল। টবে জল দিতে দিতে মেয়েদের বলে—কি আর করব বল? আমার এতেই শান্তি—

বড় মেয়েটার আবদার বেশি। পাখির খাঁচা নাড়তে নাড়তে বলে,—মা, দুটো সাদা খরগোশ কিনবে?

আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে মৃদুলা হাসতে থাকে।

—খরগোশ? কোথায় রাখবি শুনি?

—কেন, ঘরেই থাকবে, খাটের নিচে শোবে।

আমার দিকে দেখিয়ে মৃদুলা বলে,—তোর বাবাকে বল্। শুধু খরগোশ কেন, গোটা কয়েক কুকুরের বাচ্চাও যেন নিয়ে আসে। যত্তো সব—

দমদম করে আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় মৃদুলা। অফিসের দেরি হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করি। আমাদের যেমন স্বপ্ন বা ইচ্ছে আছে, তা ভুলে যাওয়ার কৌশলও জানা আছে। এটা কাউকেই শিখিয়ে দিতে হয়না। আমিও বাড়ি করার স্বপ্নটা আলমারির লকারে বন্ধ করে রাখলাম। এখন তোফা আছি। খাই দাই। অফিসে যাই। সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে মেয়েদের একটু পড়াতে বসাই। মৃদুলাও কিছু বলে না। রণাঙ্গনে এখন শান্তি বিরাজমান। কিন্তু ঐ যে। স্বপ্ন কখনও শেষ হয়ে যায় না। দূরে সরে গেলেও, আবার বর্ষার মেঘের মত এসে জমা হয়।

একদিন বাড়ি ফিরে দেখি, কাগজের একটা বিজ্ঞাপন সামনে রেখে, ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে মৃদুলা। সারাদিন পর আমি যে বাড়ি ফিরেছি, সেদিকে হুঁশ নেই।

—কী ব্যাপার? অত মনোযোগ দিয়ে কী দেখছো?

কোনও একটা নতুন আবাসনের ছবি। হয়নি এখনও। হবে। চশমা-পরা বোকা বোকা একটা লোক অবাক চোখে পেল্লায় বাড়িটার দিকে চেয়ে আছে। নিচে লেখা—'সুখের স্বপ্ন।'

হেসে বললাম—ফ্ল্যাট কিনবে?

মৃদুলা সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠল,—কেন, সেটা কি খুব অসম্ভব? তোমার বন্ধু যদি পারে তো, তুমি পারবে না কেন?

খুব উৎসাহে মৃদুলা বোঝাতে শুরু করল—দেখেই ঘাবড়ে যাবে না। প্রথমে বেশ কিছু দিতে হবে। তারপর সহজ কিস্তিতে—দেখ না, আজকাল তো কত রকমের লোন পাওয়া যায়—

মাথা নেড়ে বললাম—কথাটা মন্দ বলনি। চেষ্টা করা যেতে পারে—

আমি রাজি বুঝে, মৃদুলা উৎসাহে উঠে দাঁড়ায়। —খোঁজ নাওনা। আমারও কিছু সোনাদানা আছে। দেখি না কি হয়—

পরের রোববার দুজনেই সেই আবাসন অফিসে গেলাম। মোটামুটি বড় মাপের একখানা ঘর। মাঝখানে প্লাইউডের পার্টিশন। বাইরের ঘরে খান দুয়েক সোফা পেতে বসার ব্যবস্থা। ওপরে পাখা ঘুরছে। নিচু টেবিলে কয়েকখানা ম্যাগাজিন। খবরের কাগজ। অ্যাশট্রে। পার্টিশনের ওপাশে অফিস।

ভেতরে কথা হচ্ছে। মৃদুলাকে এদিকে বসিয়ে ভেতরে গেলাম। ঢুকতেই অল্পবয়সী এক ছোকরা চেয়ার ছেড়ে উঠে এল—বলুন, কি করতে পারি?

চারদিক চেয়ে ঘরটা একবার দেখে নিয়ে বললাম,—কিছু জানার ছিল।

হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসা টাই, স্যুট পরা আর একজন বলে উঠল,—সব জানতে পারবেন। তবে আমাদের একটা প্রসিডিওর আছে—

লোকটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম,—বলুন কি করতে হবে?

লোকটা বাঁদিকের আর একটা টেবিল দেখিয়ে বলল, যান—ওদিকে যান—

গেলাম ওদিকে। এই লোকটা একটু বয়স্ক। আমার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে বলল—বলুন, কী জানতে চান? —বসুন না, এই চেয়ারটায় বসুন—সামনের খালি চেয়ারটা দেখাল।

না বসেই বললাম.— আপনাদের বিজ্ঞাপন দেখলাম। ফ্ল্যাট কিনলে মোট কত দিতে হবে? প্রথমে কত, তার পরের কিস্তিগুলোই বা কত?

উঠে দাঁড়াল লোকটা। পেছনের প্লাইউডের পার্টিশনে মাঝারি মাপের একটা ব্লু-প্রিন্ট সাঁটা। ওদিকে আঙুল দেখিয়ে লোকটা বলল, — এই দেখুন আমাদের আবাসনের প্ল্যান। বড় একটা পুকুর আছে। পুকুর বুজিয়ে বাড়ি তৈরি হবে। তাছাড়া চিলড্রেন পার্ক, রিক্রিয়েশন সেন্টার, গ্যারেজ—সব ব্যবস্থা থাকবে। কাছেই তো বাইপাস। কোনও অসুবিধেই হবে না। তাছাড়া—

ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—ওসব পবে শুনব। আগে বলুন, প্রথম কিস্তির টাকা কবের মধ্যে দিতে হবে—ফ্ল্যাটের মোট দাম কত?

একটু থতমত খেয়ে লোকটা আগের লোকটাকে দেখাল—ওর কাছে যান—সব জানতে পারবেন—লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা জাবদা খাতা এগিয়ে দিল,

—নিন, এতে নাম, ঠিকানা লিখে ফেলুন—

লিখলাম। টেবিলে কিছু কাগজ-পত্তর পুস্তিকা ছড়ানো। ওগুলো দেখিয়ে বলল—এতে সব পাবেন। তবে দু'শ টাকা দিয়ে আগে নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে—

একটা পুস্তিকা তুলে নিয়ে বললাম, —এখানে দেখলে?

লোকটা অমায়িক হেসে বলল,—তা দেখতে পারেন।

মলাটে বিজ্ঞাপনের ছবিটা ছাপা। আর একবার দেখলাম ভাল কবে। পাতা উল্টে প্রথমেই যে দামটা চোখে পড়ল, আগামী চার বছরে আমার সব মাইনে-পত্তর যোগ করেও, তার ধারেকাছে যাবে না। টাকার অঙ্কটা ভাবতে ভাবতে পাতা ওল্টাতে থাকলাম। দেখে আর কি করব? আমি তো আমি, আমার বাপ-ঠাকুর্দাও বোধহয় একসঙ্গে এত টাকা দেখেনি—

লোকটা আমার দিকেই চেয়ে ছিল। পুস্তিকা ফেরত দিতেই বলল,—বলবেন কিছু?

পেছন ফিরে দেখলাম, অন্য দুজনও আমার দিকে চেয়ে আছে। ওরা কিছু বুঝতে না পারে, তাই যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বললাম—দামটা বড্ড বেশি—

লজ্জা পেয়েছে, এমনভাবে হাসল লোকটা।—কি যে বলেন স্যার—জিনিসপত্তরের দাম যা বাড়ছে—এরপর তো আরও বেশি দিতে হবে—

পুস্তিকা টেবিলে রেখে দিলাম। অস্বস্তি হচ্ছে। বললাম— আজ তো প্রস্তুত হযে আসিনি। অন্যদিন আসা যাবে। জায়গাটা একবার দেখতে পারি?

—নিশ্চয়ই— আমাদের এই অফিসের পেছনেই আছে। দেখবেন অনেকটা জলা জায়গা। অবশ্য মাটি ফেলা হচ্ছে। আচ্ছা আসুন এবার—

লোকটা টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্র গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

নমস্কার করে বাইরে এলাম। মৃদুলা এদিকে চেয়েই বসে ছিল। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। দুচোখে অজস্র প্রশ্ন। ইশারায় ওকে বাইরে আসতে বললাম। বাইরে গিয়েই মৃদুলা হাত ধরল। —কথা হল? কী বলল ওরা?

—কী বলবে? কাগজপত্র সব দেখলাম—দরদাম জানলাম।

—কত, দাম কত গো?

ওর গলার স্বরে চাপা উত্তেজনা। হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে বললাম— প্রায় তিন লাখ—

থমকে দাঁড়ায় মৃদুলা। অ্যাঁ, বল কি গো?

এবার আমিই ওর হাত ধরলাম—ঘাবড়াচ্ছো কেন? টাকা দিলেই হয়ে যায়। তবে—

— তবে কী?

— অত টাকা কোথায় পাব? ভাবছি—

মৃদুলা গা ঘেঁষে হাঁটতে থাকে। এদিকে বসতি কম। একটু এগলেই বাইপাস। ছাড়া ছাড়া কিছু বাড়ি। সবই প্রায় কাঁচা। ওদিকের জলা জায়গাটার দিক থেকে ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। মাটি ফেলা মেশিনের চাপা শব্দ। চলতে চলতে মৃদুলা বলল—জমিটা কোথায়? এখানে কোথাও?

জলা জায়গাটার দিকে দেখিয়ে বললাম—ঐ তো ওখানে। মাটি ফেলা হচ্ছে। —চলো, এখন আর দেখে কাজ নেই—

কথা বলতে বলতে আমরা বাস স্টপের দিকে এগচ্ছি। চড়া রোদ। বেশিক্ষণ হাঁটা যাচ্ছে না। ওপর দিকে চাইলাম। একটা শকুন পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে। উঁচু— আরও উঁচুতে ঘন নীল আকাশে এক টুকরো সাদা মেঘ। মৃদুলাকে বললাম—চল, এবার ফেরা যাক্—ও কিচ্ছু বলল না। মুখ নিচু করে হাঁটছে। কেমন যেন গম্ভীর। অন্যমনস্ক। কিছু একটা বলার জন্যই বললাম—আচ্ছা, হঠাৎ যদি লটারিতে অনেক টাকা পেয়ে যাই, কেমন হয়?

মৃদুলা আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলল—কথাটা ভাবতে বেশ ভালই লাগে, তাই না?

রাস্তা কাঁপিয়ে কর্পোরেশনের একটা ময়লা ফেলার খালি গাড়ি চলে গেল। প্রায় গা ঘেঁষে।

এক ঝটকায় মৃদুলার হাত ধরে রাস্তার ধারে সরে গেলাম। নিচেই চওড়া কাঁচা ড্রেন। পরিষ্কার টলটলে জলের স্রোত।

আমরা বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

জ্যোতিপ্রকাশ একা এবং একা

অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত

বিষণ্ণ মনে আকাশ দেখেন জ্যোতিপ্রকাশ। দিন ফুরনোর আভাস। ভেতরের তারে আঙুল ছুঁয়ে যায় অনিবার্য এক বাস্তবতা। পেশিগুলো এমন শিথিল ছিল না একবছর আগে।

জ্যোতিপ্রকাশের বয়স পঁয়ষট্টি। এমন বয়সে পাড়ার কমলাকান্ত কলকাতায় নিত্য যাতায়াত করে। একবছর আগেও বয়োকনিষ্ঠরা বলতো, 'দাদা আপনি বয়স-চোর। দেখে মনে হয় না পঁয়ষট্টির কাছাকাছি।'

ধবধবে ফর্সা রঙ। কাঁচা-পাকা চুল। সৌম্য শান্ত ভঙ্গি। অকস্মাৎ ব্যাধিতে ভেঙেছে। এখন নিষ্প্রাণ অসহায় দৃষ্টি। তবু মাঝে মাঝে চেষ্টা করেন সতেজ থাকতে।

মেয়েটির সঙ্গে সকালে-বিকেলে বেড়াতে বেরোন। পাড়ার রাস্তায় হাঁটেন। কখনও একটু দূরে মাঠ পর্যন্ত শান্ত। পরিচিতজনদের সঙ্গে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে কথাবার্তা। সময় বাঁধা। মেয়েটিই মনে করিয়ে দেয়, 'চলুন এবার ফেরা যাক'।

দেখাশোনার জন্য রাখা হয়েছে পদ্মকে। রেখেছে জ্যোতিপ্রকাশের পুত্র। পুত্রবধূ পারে না সংসারের কাজকর্ম ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকায়। ছেলে এখন কে জি স্কুলে পড়ে। দু'স্টেশন পেরিয়ে যেতে হয় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে।

জ্যোতিপ্রকাশ মাঝে মাঝে পুরনো দিনের কথা বলেন পদ্মকে। কৈশোর যৌবনের নানা প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ঘটনার কথা। কখনও গোপনীয়তার আগলও সামান্য খুলে যায়। বলে ফেলেন স্ত্রী ছিল চির রোগগ্রস্ত মহিলা। একটি সন্তান প্রসবের পর বছর দশেক বেঁচে ছিলেন। তারও কয়েকবছর পর তখন কলকাতায় অফিস করতে যেতে হত। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। শিয়ালদহ স্টেশনে ফেরার পথে লক্ষ করত ক'টি মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জেনেছেন ওরা খদ্দের ধরার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এক সন্ধ্যায় অফিস-ফেরত দুই বন্ধুর সঙ্গে ঢুকেছিল একটা বার কাম রেস্তোরাঁয়। সেই সন্ধ্যায় বাইরে টিপটিপ বর্ষণ। মদ্যপানের অভ্যাস তার ছিলই। দাঁড়িয়ে-থাকা একটি মেয়ের সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন হোটেলে। জ্যোতিপ্রকাশ মেয়েটিকে বিয়ে করবেন বলেছিলেন। মেয়েটির খুব নিরাসক্ত জবাব, 'সে পরে দেখা যাবে।'

সে রাত্রে জ্যোতিপ্রকাশ ঘুমোতে পারেননি। অপরাধবোধ অসম্ভব কষ্টের মধ্যে রেখেছিল গোটা রাত্রি। তখন জ্যোতিপ্রকাশের পুত্র সবে বি.এ পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ঢুকেছে। দু'চোখে তার ভবিষ্যতের ভাবনা। আলো ঝলমল করছে সামনেটা। দেখতেও সুন্দর। ভেবেছেন অমন সুন্দর ছেলেটির পিতা হয়ে এমন কাজ করেছে কেমন করে। আজ মনে হয় সেটা শুধুই মতিভ্রম? নাকি কোনও কোনও সময়ে নিজের বসে থাকে না চাওয়া।

আজও ভাবেন কেন এমন হল। ভাবাটুকুই সার। আজ আর কোনও পীড়ন অনুভব করেন না। সময় বড় খারাপ জিনিস। ভুলিয়ে দেয় অন্যায়কে। অপরাধকে। আরও কত কি। মানুষ তাই বেঁচে থাকতে পারে।

পদ্ম শোনে। বলে না কিছুই। দু'দিন পরেই জ্যোতিপ্রকাশ এক সূর্যাস্ত মুহূর্তে বলেন, পদ্ম, তুমি আমাকে দাদু বলে ডেকো না। তুমি আমার পুত্রের বয়সী। কাকু বা জ্যেঠু বলো।

বৃদ্ধকে বোঝে, বৃদ্ধদের প্যাটার্ন জানে পদ্ম। তবু মাঝে মাঝে খটকা লাগে, জ্যোতিপ্রকাশের কথাবার্তায়।

বলে, তাহলে জ্যেঠু বলেই ডাকবো কেমন।

তাই সই।

পদ্ম তার জ্যেঠুকে নিয়ে ভোরের আলো গায়ে মেখে মাঠে বেড়ায়। কখনও-সখনও জ্যোতিপ্রকাশ পদ্মর হাত ধরে। যখন উঁচু-নিচু জমিতে হাঁটতে হয়। সমতলে স্বচ্ছন্দ চলাফেরা। পথচারী দু'একজন লক্ষ করলেও কৌতূহল তেমন নেই প্রকাশভঙ্গিতে।

জ্যোতিপ্রকাশ সমুদ্রের কথা বলেন,

সমুদ্র দেখেছ পদ্ম!

না। কে নিয়ে যাবে। অনেক খরচ।

আমার সঙ্গে যাবে। একটু সুস্থ হলেই যাবো।

পদ্মর ভরসা কম। কল্পনা করতেও ভুলে গেছে। তবু নিছক কথা বলতে হবে তাই। কথা শুনতে হবে তাই, এমন ভঙ্গিতে বলল, হঠাৎ সমুদ্রের কথা কেন?

একবার পুরী গিয়েছিলাম একাই। তখন কলেজের ছাত্র। সহপাঠী একটি মেয়েও গিয়েছিল তার আত্মীয়দের সঙ্গে। সমুদ্রের ধারে জ্যোৎস্না, অনেক রাত পর্যন্ত কাটাতাম মেয়েটির সঙ্গে।

এসব গল্পে অনাগ্রহ। তবু অভ্যাসমত জিজ্ঞেস করল,

তারপর?

সেসব আরেকদিন বলবো।

তখন পদ্মর ভেতরটা গুমরোয়। বাবলু মারা যায় সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে। বাবলু তার প্রথম সন্তান। না ভুল। প্রথমটাকে রাজেনের কথা মত নষ্ট করতে হয়েছে। তখন তো ওদের বিয়ে হয়নি। সেটা ছেলে ছিল কি মেয়ে কে জানে। বাবলুর পরে তার কোনও সন্তান হয়নি। দেখতে দেখতে পদ্মর আজ পঞ্চাশ হয়ে গেল। জ্যোতিপ্রকাশ গুন গুন করে গান গায়। খুব চেনা লাগে। রাজেন যেন কোন গানটা গেয়েছিল সমুদ্রের ধারে। না এটা নয়। তখন ওরা সূর্যোদয় দেখছিল। বাবলু ঝিনুক কুড়োচ্ছিল।

চলো মা, বাড়ি যাই।

জ্যোতিপ্রকাশের ডাকে চমকে ওঠে, ও নামে অনেকদিন কেউ ডাকেনি। ওরা ফিরে এল।

আবার বিকেলে জ্যেঠুকে নিয়ে বেরোয়। পাখিদের ঘরে ফেরার তখন সময়। আলো ক্রমশ কমে আসে। হালকা হাওয়ায় বুড়োর ভালো লাগে।

পদ্ম বিরক্ত হয়। বুড়োর পুত্রের টাকা আছে, তাই যত্নে আছেন। রাজেনটা ভাঙা দেহ নিয়ে ছুটছে বাজারে সব্জী বেচতে। গতরের জোর কমলো বলেই তো অ্যাসিড কোম্পানির চাকরিটা গেল। কী আর খেতে পায়! দুপুরে একবার বাড়ি যায়। রেঁধে বেড়ে খেয়ে খাইয়ে বিকেলের আগেই চলে আসে। রাতে বুড়োর বিছানাপত্তর গুছিয়ে মশারি খাটিয়ে আসতে আসতে রাত হয়ে যায়। আবার ভোরে আসা। এসব ওর মনের ক্ষোভ। কখনও অস্পষ্ট বিড়বিড় করে ভেতরের শব্দগুলো বেরিয়ে পড়ে, তখন জ্যোতিপ্রকাশের স্নায়ুতে হালকা ভাল লাগার আমেজ।

ক'টা পাতিহাঁস পুকুর পারে ডানা ঝাপটায়। ঘরে ফেরার ডাক শোনার অপেক্ষায়। মাঝে মাঝে ভাবে কাজটা ছেড়ে দেবে। রাজেনটার যদি বাঁধা মাইনের চাকরি থাকত। কত স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা তো মোটা মাইনের চাকরি করে। আবার বাড়িতে ছাত্র পড়ায়। পেনশন আছে, প্রভিডেন্ট ফান্ড, আরও কত কি। স্কুল-কলেজের পিওন হলেও লাভ। সরকারি অফিসেরও একই ব্যবস্থা। সেখানে নাকি উপরিও আছে নানারকম। পদ্মর অবসাদ লাগে। বড় অনিয়ম। বড্ডো অসমান জীবনযাপনের মান। অসহ্য লাগে। আজ এমন বিষণ্ণ ভাব কেন! জানিস আনন্দই ব্রহ্ম। —সদা আনন্দে থাকবি। দুঃখ গায়ে মাখবি না। মুখখানা অমন ব্যাজার করে থাকবি না। আমার দেখতে ভাল লাগে না।

পদ্ম হালকা হবার জন্য সামান্য হাসে। এটা পদ্মর চাকরি। জ্যোতিপ্রকাশ তার বস্ ও মালিক। অথচ ভেতরে বিরক্তি। তোমার তো বাপু সকালে পায়খানা পরিষ্কার হলেই মেজাজ হালকা। খুশির ভাব। ঘর আছে। ছেলে আছে। পদ্মর জীবনভোর শুধুই লড়াই আর খাটুনি। জ্যেঠু তার কি বোঝেন!

আবার জ্যোতিপ্রকাশের অভিমান হয় মাঝে মাঝে। বুড়ো বয়সে স্ত্রী থাকা একান্তই দরকার। পরমুহূর্তেই মনে হয় এমনটিই বা হবে কেন! শেষপর্যন্ত বুড়োর বুড়ি থাকবে। বুড়ির তবে কে থাকবে। এসব পুরুষদের সুবিধাবাদী মানসিকতা।

একসময় জ্যোতিপ্রকাশের গল্পের ঝুলি ফুরিয়ে যায়। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বিরক্তিকর। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। জ্যেঠু বুঝতে পারেন। বলেন, 'কেবল আমার কথাই বলি। তোমার কথা শোনা হয় না।'

'রাজেন একবার চলে গিয়েছিল একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে। একমাস পরে শরীর খারাপ নিয়ে ফিরে এসেছে পদ্মর কাছে।' জ্যেঠু বলেন,

এমন তো হয়েই থাকে। নতুন কিছু নয়।

তখন অ্যাসিড কারখানার চাকরিটা ছিল। সেই যে শরীর ভাঙল আর ঠিক হল না। 'যত্নআত্তি তো কিছুই করতে পারিনি। মেয়েমানুষটার জন্য দেনা করে ফেলেছিল অনেক।'

জ্যোতিপ্রকাশ অপলকে দেখে পদ্মকে। ওর মুখখানা ভাল করে লক্ষ করেনি কখনও। অসম্ভব কাঠিন্য মুখাবয়বে। অথচ চোখ দুটো বড় বড়, নাকটা টিকালো, একসময় শ্রী ছিল, লাবণ্যও ছিল।

দুঃখ কারও পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকে। ছাড়তে চায় না। সকলেই একটা না একটা দুঃখ বয়ে বেড়ায়। বুঝলে পদ্ম!

কথার মাথামুণ্ড কিছুই বোঝে না পদ্ম। বলে, চলুন এবার ফেরা যাক।

কোন পরিবর্তন ঘটে না প্রাত্যহিক রুটিনের। আবার বেরোন জ্যোতিপ্রকাশ। সঙ্গে পদ্ম। আজ একটু আগেই সন্ধে নামে। মেঘলা আকাশ বিকেল ঢেকে রাখে।

এটা কি মাস?

ভাদ্রর শুরু।

সব থেকে ভাল ঋতু শরৎ। বসন্তকে ঋতুরাজ বলুক।

একঝাঁক বেলে হাঁস উড়ে যায় মথুরা বিলের ধারে। একসময় রাজেন ছুটির দিনে যেত ওখানে। গুলতি দিয়ে বেলে হাঁস মেরে আনতো। পদ্ম রাঁধত। তখন তো ওদের বিয়ের প্রথম পর্ব।

প্রসঙ্গ বদলায় পদ্ম। বলে, পুজো তো এগিয়ে এল। বেড়াতে যাবেন না? কোথাও ক'দিন বেড়িয়ে এলে পারতেন।

গেলে তো সঙ্গে নিয়েই যাব। সেই যাওয়া তো আর হচ্ছে কোথায়! কে ব্যবস্থা করে দেবে!

আমার যাওয়া হবে না। রাজেনকে ফেলে কোথায় যাব? আমি ক'দিন ছুটি পেতাম আপনি গেলে। ঘরে বসে সোয়েটার পাপস বুনতে পারি। বাড়তি দু'টো পয়সা পেতাম।

জ্যেঠুর মনে হয় তবে কি পদ্মর পছন্দ নয় ওর কাছে কাজ করা! কেমন মায়া পড়ে গেছে পদ্মর ওপর। সেদিন বিকেলে শেষ বোঝা যায় না। ওরা তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরে।

জ্যোতিপ্রকাশের বিষণ্ণতা তার নিজস্ব। অথচ গাছতলায় দাঁড়িয়ে স্বস্তির ছায়াটুকুও অস্থায়ী মনে হয় পদ্মর। ওঁর শরীর সুস্থ হয়ে ওঠে। এখন অনেকটা সচল। সেদিন রাত্রেই জ্যেঠুর পুত্রবধূর হুকুম হল ছেড়ে চলে যাবার জন্য।

তোমার আর দরকার হবে না। উনি তো অনেকটা সুস্থ। একাই পারবেন। বাকিটুকু আমি করে নেব।

পদ্মর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। নির্দেশমত পরের দিনই ওর মাইনে মিটিয়ে দেওয়া হল।

তখন দুপুরের রোদ মাঠ পেরিয়ে গাছের পাতায়। মন্দিরের চূড়ায়। পদ্ম জ্যেঠুকে প্রণাম করে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন জ্যোতিপ্রকাশ। এগুলেন পদ্মর পিছু পিছু। পদ্ম হাতটা ধরবার চেষ্টা করল। সরিয়ে নিলেন। পদ্মর মনে হল এ হয়তো অভিমান। নারকেল গাছের ছায়া পড়েছে পুকুরের জলে। পদ্ম মাঠে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকাল। ঝকঝকে নীল আকাশ। সাদা মেঘেরা ভেসে বেড়ায়। 'বসন্ত ঋতুরাজ হতে পারে। আমার শরতই ভাল লাগে।'

শরতে এমনও হয়। অকস্মাৎ ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। ভিজিয়ে দিল পদ্মকে। দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা জ্যোতিপ্রকাশকে। জ্যোতিপ্রকাশ বুঝতে পারেন তাঁর ভেতরেও অঝোর বর্ষণ। চোখ বেঁধে কারা যেন তাঁকে মাঠের মধ্যে দাঁড় করিয়ে চলে গেছে। ও একা এবং একা।

সাদা কফিন

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

এতক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ ছিল সমগ্র শহর। রাস্তায় রাস্তায় প্রতিরোধ তৈরী করা হয়েছে বলে গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ। খুব কচিৎ একটা সাইকেল-রিক্সা ঝড়ের বেগে ছুটে হয়তো বেরিয়ে গেল, শুধু বাতাস কাটা আর পীচের সঙ্গে চাকা ঘর্ষণের শব্দ, হয়তো রিক্সায় কিছু মালপত্র বোঝাই আছে কিংবা খালি, অথচ কখনো একটা গাড়ির দেখা নেই। মাইল, আধ-মাইল দূরে দূরে ইট, ড্রাম, ওল্টানো গাড়ি ইত্যাদি হাতের কাছে যা পাওয়া গেছে তাতেই রাস্তায় প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। ছায়া ছায়া রাস্তা, বড়ো বড়ো মেহগিনি ও শিশু গাছ রাস্তাগুলোকে আরো নির্জন ও নিবিড় করে তুলেছে। জনমানবের গন্ধ নেই রাস্তায়। মনে হঠাৎ এমনও অবান্তর প্রশ্ন জাগে, অবরোধ টিকবে তো? দূর থেকে সেই অবরোধ পাহারা দিচ্ছে মুক্তিবাহিনী।...বারুদের মুখে আগুন লাগল বলে! পরিবেশটা তেমনি বিস্ফোরণমুখী।

জাতীয় সঙ্গীত না বাজিয়ে বেতারের তৃতীয় অধিবেশন বন্ধ হয়ে গেছে।

আমি ভয়ার্ত মনে হন্যে হয়ে একটা রিক্সার কথা ভাবছি। গাড়ি তো পাওয়ার সুযোগ নেই, বাধা ডিঙিয়ে তবু কোনোমতে রিক্সাকে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে। — আমাকে অনেক দূরে, মতিঝিল পেরিয়ে বাসাবো অব্দি যেতে হবে। অদ্দুর হেঁটে যাওয়া, কিংবা হেঁটে যেতে ভয় করছে।

লোকগুলো সব মরে গেল নাকি এক নিমেষে!

আমি অনবরত চিন্তা করছি হেঁটে যাওয়া যাবে কিনা। বন্ধু-বান্ধব সবাই আজ গেল কোথায়? প্রেস-ক্লাব কি বন্ধ? সেখানে যাবো কিনা আবার দ্রুত ভেবে নিলাম। কয়েক মিনিট। কিন্তু যেন কয়েক লক্ষ সেকেণ্ড ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। এইভাবে যেন অনন্ত সময়ের হনন চলল; রাস্তার নিস্তব্ধতায়, ফুটো ফুটো আকাশে, নিরিবিলি এবং নীরব পত্রগুচ্ছে, রাস্তার অন্ধকার লাইটপোস্টে, গির্জার চূড়ার ক্রুশে রাত্রিপাত হচ্ছে প্রবল বেগে; রাত্রিপাত হচ্ছে নিষ্ঠুর এবং চতুর শত্রুর মত নিরবচ্ছিন্ন এক যোগসাজসে।

গত দু'দিন কাজের চাপে বাসামুখো হতে পারি নি আমি, অফিসে রাত কাটিয়েছি, আজ একটা কিছু ঘটতে চলেছে এরকম ইঙ্গিত বেতার অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে আছে। এখন সেই নানান চিন্তার পর্বত-প্রমাণ এক বোঝা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাসামুখো চলছি, সারি সারি ইমারত ফেলে, বন্ধ রেস্তোরাঁ, হ্যাপি মটরিং ছবি, বাসে ওঠার কিউ—হাইকোর্ট ভবনকে মনে হচ্ছে রূপকথার হাজার-দুয়ারী রহস্যময় প্রাসাদ।

সহসা একটা সাইকেল-রিক্সা দ্রুতবেগে আমাকে কেটে চলে যাচ্ছে দেখে আমি চীৎকার করে তার পেছনে ধাওয়া করলাম। সে আরো বেগে, আরো দ্রুত ছুটল। কিন্তু আমায়-যে তাকে ধরতেই হবে! এভাবে আমাকে পাগলের মত ছুটতে দেখে সে কি ভেবে—হয়তো

কিছু না ভেবেই—থামল। খবর ঃ শহরে সৈন্য নেমেছে সাব, সরে পড়ুন, এক্ষুনি এদিকে এসে পড়বে। তাদের আছে কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, আরো কত কি...

বল কি? সৈন্য নেমেছে? কোথায়? কতদূরে? —আমার মাথা গুলিয়ে গেল, এ কি হ'ল, এ যে আমি ভাবতে—তুমি কোনদিকে যাবে ভাই, জলদি আমাকে নিয়ে চল!

ঃ পারব না সাব। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে, পথে পথে বাধা, আপনাকে নিয়ে যাব কী করে! না, আমি নিতে পারব না—হাঁপাতে হাঁপাতে রিক্সাঅলা কথাগুলো বলে ফেলল।

বললাম ঃ তুমি যেখানে যাও আমাকে নিয়ে চল, তোমার সঙ্গেই থাকব আমি। বাধা ডিঙিয়ে দু'জনে রিক্সা টেনে নেব। —তোপখানা সড়ক, মতিঝিল, কমলাপুর ছাড়িয়ে বাসাবো...

এতসব কথা সংক্ষিপ্ততম সময়েই শেষ হয়েছে। রিক্সাঅলা আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে কিংবা করুণাবশতই হোক তুলে নিল; তখন আশ্চর্য তেজোদীপ্ত সেই অচেনা রিক্সাঅলার গামছাবাঁধা মাথাটি আমার সামনে এক দৃপ্ত বিজয়ীর মতো উন্নত এবং উদ্যত। কিন্তু কদ্দুর গিয়েই বাধা। আর পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দিকে গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিল। তক্ষুনি সে রিক্সা ফেলে দৌড় দিল, আমার সঙ্গে একটা কথা বলা কিংবা একবার ফিরেও তাকাল না। নিশ্চল রিক্সা, অপসৃত রিক্সাঅলা, ভৌতিক শহর, সৈন্যগণ, নির্নিমেষে দ্রষ্টব্য অট্টালিকা—প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজ করল। আমিও দৌড়ে প্রেস-ক্লাবের চত্বরে আশ্রয় নিলাম। ভরসা, সেখানে যদি কাউকে পাই! কিন্তু কোনো সাড়া নেই। কিছুক্ষণ পর অনেক খোঁজাখুঁজিতে চেনা দারোয়ানকে পাওয়া গেল, কিন্তু কোনো খবরই সে দিতে পারল না, শুধু এইটুকু জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কোথায় যাবেন? এখন তো কেউ নেই। দরজা খুলে দেব? বরং পালিয়ে যান...।

কেউ-ই নেই! কিন্তু যাব কোথায়? গাড়ির অর্থাৎ সামরিক ট্রাক ইত্যাদির শব্দ একদম এগিয়ে আসছে, ঐ বুঝি দেখা যায়! যদি আসেই—এখানে আশ্রয় নিলাম, পরে যা হবার হবে, আপাতত এখান থেকে নড়ছি না—বুকের ভেতর দুরু দুরু কম্পমান একটি বল যেন অবিশ্রাম লাফাচ্ছে, অবিরাম একটি নৌকা ঢেউ-এর আঘাতে কাঁপছে, কাঁপছে। আমার কি যেন হয়ে গেল, দারোয়ান দরজা খুলে দিয়ে কি যে বলে গেল কিছুই শুনি নি। আমার সামনে-পেছনে একটি মাত্র শব্দ শুনছি—আশ্রয়।

প্রেস-ক্লাবে সাময়িক আশ্রয় নেয়া ভাল মনে করলাম; রাস্তায় যে-কোনো সময় কিছু একটা ঘটে যাবে বলে আমার মন বারবার বলছে, তাই তার চেয়ে মাথা গুঁজবার একটু আশ্রয় চাই। আমি অন্ধকার দরজার দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবার আগেই দুটো মিলিটারি কনভয় শব্দ করে প্রেস-ক্লাবমুখো হয়ে থেমে গেল। আমি একটু মাত্র দেরি না করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ না করে সোজা দোতলায় উঠে গেলাম। আমি জানলার ফাঁক দিয়ে হেডলাইটের তীব্র আলোতে রাস্তা দেখলাম। তোপখানা সড়ক। ধূ ধূ এবং ম্রিয়মাণ।

কনভয় ইউসিসের সামনে। সমস্ত এলাকাটা অন্ধকার, শুধু ইউসিস আর বি.আই.এস.-এর কয়েকটি আলো ছাড়া।

খট্ খট্ শব্দে কয়েকজন ক্রূর সৈন্য নামল। হাতে তাদের স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান। ওরা খানিক ভেবে ইউসিস থেকে একটা তার নিয়ে রাস্তার লাইট পোস্টের তারের সঙ্গে যোগ করে দিল। সমগ্র রাস্তা আলোকিত হয়ে গেল।

সৈন্যদের গতিবিধি সন্ধানী। প্রেস-ক্লাবের দিকেই তাদের দৃষ্টি। তারপর দুটো বড়ো কনভয়। ট্যাঙ্ক...

বাপ্‌স্! এইবার সমস্ত গুলিয়ে দেবে। সমস্তই। আমি জানালা ছেড়ে ঘরের ভেতর চললাম, বিপদ ঘনিয়ে আসল ভেবে। চারদিকে বিদ্‌ঘুটে অন্ধকার, অন্ধকার হাতড়িয়ে চেনা দেয়াল-দরজা ইত্যাদি অনুমান করে বাথরুমের দিকে পৌঁছানোর আগেই দুনিয়া-কাঁপানো শব্দ হল গুড়-গুড়-বুম্, বুম্ বুম্। পলকে একরাশ বাতাস তাড়িয়ে বালি-ইট-প্লাস্টারের গুঁড়োর ঝড় বয়ে গেল, সমস্ত ঘরটি কেঁপে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে আরেকবার ভেঙে চুরমার করে আবার শব্দহীনতায় উধাও হয়ে গেল। আর ভয়-জড়ানো চোখের ফাঁকে দেখলাম উত্তরের দেয়াল ভেদ করে কামানোর গোলা পুব দেয়ালে বাধা খেয়ে ছাদ ফুটো করে চলে গেছে। একটা বিরাট গহ্বর আমার পাশে মূর্তিমান হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল, আমিও চোখ খুলে তাকিয়ে রইলাম আকাশের দিকে। দুই কান রইল নতুন শব্দের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশায়। পায়ের কাছে মেঝে স্তূপ, জঞ্জাল। অন্ধকারে অনুমান করলাম সমস্ত ঘরটির দৃশ্য, বুকের ভেতর একটি একটি পাঁজর নরম হয়ে যাচ্ছে অনবরত, মাথার ভেতর করোটির খাঁজে খাঁজে শিরশির করছে বোধ। তাড়াতাড়ি আবার গোলাবর্ষণের আগে ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচের তলায় নেমে যাওয়া ঠিক করলাম। নেমে যাচ্ছি। সিঁড়ির হাতল মাঝে মাঝে গেছে উড়ে; অন্ধকারে, ভয়ে ভয়ে, আন্দাজে, নামতে নামতে যেন পাতালে নেমে যাচ্ছি। আমি একা মৃত্যুর রাজ্যে চুপিসাড়ে ঢুকে-পড়া একটি প্রাণী নিঃশব্দে ঘোরাঘুরি করছি, আর সেই পুরীর দেয়াল, আসবাবপত্র, দরজা-জানলা, লোহার শিক আমার শরীরে মৃত্যুর নিঃশ্বাস ফেলছে অবিশ্রাম। কাঁপা কাঁপা পায়ে যেন ঠাণ্ডা সাপের স্পর্শ চলছে অবিরাম, অন্ধকারে মৃত্যুর মহড়া শুরু হয়ে গেছে বহুক্ষণ আগেই।

নেমে যেতে যেতে নিচের হলঘরে যখন পৌঁছলাম, দেখি খোলা দরজার সামনে সেই দুরন্ত এবং অগ্নিক্ষরা প্ল্যাকার্ডগুলো ভূতের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। যে-সমস্ত ফেস্টুন দু'দিন আগেও ব্যবহৃত হয়েছে, 'ব্যবহারের পর দরজার সামনে বারান্দায় দেয়ালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, সেই সমস্ত ফেস্টুনের মূর্তিমান বিভীষিকা আমার চোখে পড়ল। রাস্তার স্বল্পালোকে চোখে পড়ল—দু'জন মানুষ একজন আহতকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, নিচে লেখা ঃ আমার ভায়ের তাজা রক্তের বদ্‌লা আমি নেবই নেব—আমিও আমার লাশের ছবি দেখলাম। আরো কয়েকটি আছে, আমি সেই সব প্ল্যাকার্ড সরিয়ে নেয়ার কথা ভাবলাম। সরিয়ে নিলে সৈন্যদের চোখে পড়বে না, তারা এদিকে আসবে না, আমি বাঁচব—আমি বাঁচতে চাই, মৃত্যুর গুহা ছেড়ে আমাকে বাসাবো যেতেই হবে। আবার ভাবলাম, না, যেমন আছে তেমনটি থাক, কাজ নেই ঝামেলা করে, ওরা যদি দেখে ফেলে! বরং এখানে কেউ নেই ভেবে তারা ঢুকবে না, তা'হলে আমি নিরাপদ। এই ভাবে কতোক্ষণ কেটেছে জানি না, আমি শুনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অবিশ্রাম গোলাবর্ষণের শব্দ, পল্টন ময়দানের দিকে দূরে কোথায়—তারপর ভাবলাম কোন দিকে যাব, কোথায় একটা আশ্রয় মিলবে—একটা আশ্রয়, একটু নিভৃত আশ্রয়, যেখানে কোলাহল করা বারণ হয়েছে, মৃত্যুর ডাক এত পৈশাচিক নয়, যেখানে একটু নিঃশব্দে বসে নিজেকে, অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো একান্ত আপন করে ধরা যায়,—সেই একটুকু আশ্রয়। আমি আবার হাতড়ে দেখলাম, কোথায় যাওয়া যায়, আমি আরেকবার উল্টোসিধা ভেবে নিলাম। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেমন ভাবা যায়, চারদিকে গোলাগুলির শব্দে যেমন একজন মানুষ দ্রুত ভাবতে পারে—যার সামান্য একটি গুলি একজনের পক্ষে

যথেষ্ট—সেই দুর্লভ ভাবনার মুহূর্তে, দুর্বলতার অতল স্রোতে ডুবে স্বজন-বান্ধবহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমি সঠিক (?) কর্মসূচী তৈরী করতে চেষ্টা করলাম। দশ রকম চিন্তা-ভাবনা নয়, তারপর একটি স্থির ভাবনা লাফিয়ে লাফিয়ে মস্তিষ্কে খেলা শুরু করে দিল ঃ পেছনের দিকে সংলগ্ন বাথরুমে যাও, মাথা গুঁজে নিজেকে বাঁচাও। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো বড় চিন্তা নয়, যুদ্ধনীতি, গণহত্যার চার্টার কে মানল, কে মানল না, সেই ভাবনাও নয়, এমনকি সৈন্যদের বিরুদ্ধে তীব্র রোষও নয়, শুধু নিজেকে বাঁচাও। একটি নির্নিমেষ ভাবনার, একটি স্থির সিদ্ধান্তের পরও আমি ফেস্টুন-প্লাকার্ডগুলো টানতে গেলাম—অমনি গর্জন, তখুনি বুম্ বুম্ বুম্। মাথা নিচু করে দু'কানে হাত দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মেঝেতে, তারপর সন্তর্পণে প্লেগ রোগে আক্রান্ত ইঁদুরের মতো টেনে টেনে একদম বাথরুমের দরজায়। বাম হাত ও কাঁধের নিচটায় কি যেন জ্বলে উঠল, সেই কথা সম্পূর্ণ ভাবার আগে সব চেয়ে জরুরী কর্মসূচীর মতো যা চোখে পড়ল—দুটো গভীর এবং ব্যাপক গর্ত হাঁ করে আছে পশ্চিম দিকের দেয়ালে, অন্য আরেকটি বাথরুমের খানিক পুবে। সেই গর্তের ওপারে এক অপার শূন্যতা হা হা করে নিঃশব্দ চীৎকার করছে, আমার পায়ের কাছে, পিঠে সুড়কি-চুন-বালির সাম্রাজ্য আধিপত্য বিস্তার করেছে, বাতাস বারুদের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে। হাতে কাঁধে কেমন যেন শির শির করে ঘাম দিচ্ছে, অন্ধকারে সারা দেহে এক তরল স্রোত বয়ে চলেছে। নিম্নমুখী। মাটির দিকে ঘামরক্ত অনবরত ছুটছে, এখন মাটিই বেশি রক্তলোভী। সামনে চলছে এক নিঃশব্দ মিছিল, কোনো কথা নেই, প্রতিবাদহীন প্রেস-ক্লাব, অন্যদিকে সেক্রেটারিয়েট। চার দেয়াল করোটি বের করে নির্বাক—একেকটি ইট খসে মাটির তলায় জমা পড়েছে—কতোদিনে মহাস্থানগড় ও ময়নামতীতে রূপান্তরিত হবে...। ...অনেকক্ষণ বাইরের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে বুকের নিচে কনুই সক্রিয় করে, হাঁটু জোড়া টেনে উঠতে গেলাম। বাঁ হাত নিঃসাড়। এতক্ষণ খেয়ালে আসেনি। দাঁড়ালাম। বাথরুমের দরজার কপাট উড়ে গেছে; অন্ধকারে আন্দাজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ সারলাম, কতক্ষণ আগে সেরেছিলাম মনে নেই, প্যান্টের যথাস্থানে ভেজা ভেজা লাগছে। এতক্ষণে ভালো করে খবর পেলাম আমি এখনো বেঁচে আছি, শৌচাগারের গন্ধে একাত্মতা অনুভব করলাম, আন্ডার-ওয়ার প্রায় ভিজে গেছে। ডান হাত বুলিয়ে অনুভব করলাম বাম বাহুর কাপড় উড়ে গেছে, পিঠেও কাপড় নেই। চট চটে রক্তের ধার নিচে নেমে গেছে, কিন্তু মোটা গেঞ্জির কদ্দূর চুঁইয়েছে এই মুহূর্তে তা খতিয়ে দেখার চেয়ে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। তারপর সেই চিরপরিচিত অথচ নিঃসঙ্গ ঘর ছেড়ে পেছনের উঠোনে দাঁড়ালাম, কিন্তু গাছের নিচে এবং আড়ালে। ততক্ষণে কনভয় এবং ট্যাঙ্ক ঘর্ঘর শব্দে বহুদূর চলে গেছে, আমি অত্যন্ত নরম এবং ভারি গলায় ডাকলাম ঃ কুতুব।

কুতুব, প্রেস-ক্লাবের অত্যন্ত চেনা একজন দারোয়ান। আমার ডাক শুনে সেই ছায়ান্ধকার দিয়ে ছুটে এল। বলল ঃ এ্যাঁ, আপনার গায়ে রক্ত!

ঃ হ্যাঁ, রক্ত। তাই তোমাকে ডাকছি। পারলে ব্যান্ডেজ-জাতীয় একটা কিছু দাও। বাঁধি। এক গ্লাস জল।

কুতুব এক দৌড়ে ছুটে গেল। দূরের একটা বাল্ব থেকে আলোর রেখা পাতার আড়াল ভেদ করে পায়ের কাছে আবছা ছড়িয়ে আছে; কুতুবকে দেখলাম উঠোনের দক্ষিণ প্রান্তে তাদের থাকার ঘরে ঢুকতে। এক, তিন, পাঁচ, সাত মিনিট...। কুতুব আসে না। কুতুব সেই ঘর থেকে আর বেরোয় না। আমার ভয়; আমাকে এক অসম্ভব দুর্বল-

করা ভাবনা চেপে ধরল, আমি কিছু ভাবতে পারার আগে বসে পড়লাম। রক্ত, পূর্বেকার সমস্ত ঘটনা একের পিঠে একে জড়ো হ'ল। পৃথিবীটা একবার প্রলয়-দোলায় আমার সারা শরীরের ওপর দুমড়ে পড়ল। কিন্তু জ্ঞান হারাবার আগে কুতুব এসে আমার কাঁধে হাত রেখে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিল। এক আঁজলা জল, হাতে ব্যান্ডেজ করে দিল ডেটল দিয়ে, পিঠের ক্ষতেও লাগাল। আমি বসে বসে কুতুবের দিকে তাকালাম, কুতুব তাকাল। আমি তার হাত ধরে দাঁড়ালাম। বাঁ হাত ঝিম ধরা, দুর্বল, অসাড়। কিন্তু পালানোর এই উপযুক্ত সময়, সৈন্যরা আবার আসতে পারে।

আমি ভাবনা-চিন্তা ফেলে, ভাবনা-চিন্তার চেয়ে দ্রুত ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে কোথায় থামলাম অন্ধকারে বোঝা গেল না। অনুমান, সেগুনবাগিচার কাছাকাছি আছি, কোনো গলিতে। সেগুনবাগিচায় আলী রেজা থাকে, শান্তিনগরে সুপ্রকাশ, চামেলিবাগে মালতী আর বায়েজিদ থাকে। আমি কার কাছে যাব? বাসাবো যাওয়া একান্তই প্রয়োজন। হাসান এখন কোথায় কার সঙ্গে আছে কে জানে? সেদিকে অবিশ্রাম বৃষ্টির ছাঁচে গোলাবর্ষণ হচ্ছে, কামান কিংবা মর্টারের শব্দ অবিরাম শুনছি; একটি যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যিখানে আমি অবকাশহীন ভাবনায় ভাসছি—চতুর্দিকে আগুনের হলকা, আকাশটা ফর্সা হয়ে গেছে, পথঘাট পরিষ্কার দ্রষ্টব্য, স্বল্প পরিচিত গলিও এখন চিনতে আর কষ্ট নেই। দিকে দিকে সৈনাদের পরিষ্কার-করা রাস্তায় আবার অবরোধ তৈরী করা হচ্ছে। ক্ষিপ্রগতিতে। কতক দামাল ছেলে। বড় রাস্তা জনশূন্য।

সহসা বাতাসে সন্ত্রাস ছড়িয়ে আবার কনভয়গুলো এগিয়ে আসছে—দৃশ্যমান রাস্তা ফেলে তার আগেই আমি ছুটে গেলাম। এবার গির্জায় ঃ প্রভু যিশু, তুমি যুগে যুগে যেমন দুঃখীদের কোলে তুলে নিয়েছ; তুমি নিজেও একজন অত্যাচারিত, দুঃখী, তুমি আমাকে তুলে নাও প্রভু। ক্রুশের একেবারে কাছে গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম, গির্জার দরজায় বিরাট তালা ঝুলছে। হাসান, সুপ্রকাশ, রেজা, মালতী কিংবা কারো কাছে যাওয়া হল না—প্রভু, আমাকে তুলে নাও। আবার ঝড়ের বেগে গোলা ছুটল, ইতিমধ্যে হাতের ব্যান্ডেজ চুঁইয়ে গেছে, পিঠের ক্ষতস্থান ঘামে ভেজা দুপুরের ত্বকের মতো থিক্‌থিকে হয়ে গেছে, কামানের গর্জনও সেই মুহূর্তে রাষ্ট্র করল নিজেকে, নির্লজ্জের মতো। আরো কিছু শব্দ, ধুলো বালি, ছাই শরীরে মেখে পাগলের মতো একটা ঘরে ঢুকলাম; বুম্‌ করে শব্দ হল ছাদে। আমি হাট-করা দরজা বেয়ে ঘরে ঢুকলাম তার আগেই, একটা কাঠের পাটা স্পর্শ করলাম। সেই স্পর্শে হাত বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত শরীরে প্রবেশ করতেই আরামের নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল, স্পর্শটি পরিচিত, একান্ত এবং মনে হ'ল আমার বহু শতাব্দীর পরিচিত বন্ধু। মালতী, জিদ, হাসান, গুণ-এর প্রবল পরাক্রান্ত বন্ধুত্বের কথা মনে পড়ল। আরো নিবিড় করে ওদের বুকে টানলাম, বাইরে লক্ষ-কোটি রাউণ্ড গুলির সুচির ঝড় বইছে, টলছে ঢাকা শহর, বক্ষ, হৃদয়, এবং বাসাবোর একটি কক্ষের একটি কর্কশ কলিং বেল মিষ্টি সুরে অনবরত বাজছে; আমি আস্তে আস্তে ঐ কাঠের বাক্সের আরো কাছে গেলাম, নিবিড় হাত পাতলাম তার গায়ে। কোনো বঞ্চনা নেই, কোনো রকম প্রতিবাদ না করে কাঠের বাক্সটি আমাকে মায়াবী হাতছানি দিয়ে ডাকল, অন্ধকারে সেই আহ্বান সুরভিত হয়ে আমাকে বিহ্বল করে দিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধীরে ধীরে ঐ কাঠের বাক্সে চিৎপাত শুয়ে পড়লাম। লম্বমান। মসৃণ কাঠের ঠাণ্ডা স্পর্শে মনে হ'ল একটি কফিনে আমি শুয়ে আছি। তারপর নিবিড় এক অনুভূতির মতো কফিনের ঢাকনি মৃদু সঙ্গীতের তালে তালে বন্ধ হয়ে গেল, নাকে লাগল হাজার বছরের প্রাচীন কোনো এক কাঠবাক্সের সুগন্ধ। গোলাপ

আর চন্দনের মধুর সুগন্ধ অতিক্রম করে গেল পূর্বের গন্ধকে, যেমন এক বাগান থেকে অন্য ফুলের বাগানে প্রবেশ করলে হয়, আবার প্রাচীন কালের কোনো এক অজানা-অনামা গন্ধ সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিতে লাগল—চারদিকে আর গোলা-বারুদ, যুদ্ধ, হত্যা, ধর্ষণের কোনো চিত্র নেই এবং শব্দও নেই। আছে অনুচ্চকিত মধুর শব্দ-করা এক সঙ্গীত, মধুরতম সমাপ্তি-সঙ্গীত গাইছে পৃথিবী ঃ বালক বয়সের জয়ের আনন্দের মতো সমস্ত শরীর-মন পুলকিত, কৈশোরের স্বপ্নের মতো একটি একটি কুঁড়ি ফুল ফোটাতে ব্যস্ত, যৌবনের স্পর্শের মতো বিভোর এক ঘুম সমস্ত চৈতন্যকে প্লাবিত করে দিচ্ছে—একটি একটি মালতী তাকে চুমুতে চুমুতে খল খল করে ছুটে চলেছে, একটি বকনদী গ্রাম চোখের সুমুখে ফুলের সুবাস ছড়িয়ে বুকে লুটিয়ে পড়ছে, ইছামতী নদীর স্বচ্ছ স্রোত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ধুয়ে দিচ্ছে সমস্ত ম্লানিমা...। সেই মধুরতম সঙ্গীতের আবহে কয়েক শো সৈনিক সেই ঘরে ঢুকে সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানিয়ে সাদা কফিনটি কাঁধে তুলে নিল।

সেই সাদা কফিনের মিছিল চলছে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ধরে। রাস্তার দু'পাশের সারিবদ্ধ অট্টালিকা-ইমারত আধুনিক স্থপতি বিদ্যায় নবরূপ ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে, কখনো তিন দেয়ালে, আবার সমস্ত দেয়াল জুড়ে যেন বায়ু-প্রবাহের সুবিধানুযায়ী অসংখ্য ছোটো বড়ো ছিদ্র, কখনো চুড়োগুলো মসৃণ না হয়ে থ্যাবড়া, কোথাও শুধু কয়েকটি স্তম্ভ দণ্ডায়মান, ছাদহীন অট্টালিকা জ্যোৎস্না-রৌদ্রের অপরূপ স্বপ্নখেলায় বিভোর, কিছুক্ষণ পূর্বেকার মারমুখো মেশিনগান এবং কামানের মুখগুলো সাদা কফিনের সম্মানার্থে অবনত, সৈন্যরা অভিবাদন জানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দু'পাশের অসংখ্য গাছ লাল লাল থোকা থোকা কৃষ্ণচূড়া ছড়াচ্ছে। একটি ধবধবে রাত্রির নিস্তব্ধতা বেয়ে ভেসে চলছে একটি সাদা কফিন।

জঙ্গি আক্রমণ

বলরাম বসাক

(১)

লোকটা মুখ তুলতেই পিয়ালী চমকে উঠল.'কে'?

বাম্বিকে স্কুলবাসে তুলে দিয়ে ফিরে এসেই শুনল কে একজন সোমেন্দুর অফিসের লোক ড্রইংরুমে বসে আছেন। সোমেন্দুর সাথে নয়, একেবারে তাঁর স্ত্রী পিয়ালীর সাথেই দেখা করতে চান।

অদ্ভুত তো। ওর সাথে নয়, ওর স্ত্রীর সাথে দেখা করার দরকারটা তাঁর কেন হল? কী চান ভদ্রলোক? অফিসের ব্যাপার অফিসে। আর সে সব ওর সাথে। আমার সাথে কেন? ভুরু কুঁচকে যায় পিয়ালীর। এসে বসে আছেন ভদ্রলোক দেখা করবেন বলে, তখন কাছে যাওয়াটাই ভদ্রতা। তাই শাড়িটা একটু ঠিকঠাক করে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় চুল, মুখ, চোখ ইত্যাদির দিকে একটু নজর হানতে হল। সাধারণত সোমেন্দু অফিস নিয়েই থাকে। আর পিয়ালী সংসার নিয়ে থাকে। কেউ কারো ডিপার্টমেন্ট নিয়ে মাথা ঘামায় না। ওকে কখনো বাসায় অফিস ম্যাটার্স নিয়ে টুঁ-শব্দটি করতে শোনেনি। তেমনি পিয়ালীও কখনো অফিস সম্পর্কে একটু আধটু মামুলি প্রশ্নও করেনি। দুজনের এই কঠোর সংযম কারো কাছেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। তাছাড়া সোমেন্দু অপ্রয়োজনীয় একটা শব্দও ফস্ করে উচ্চারণ করে না, করতে অভ্যস্ত নয়। অথচ চুপচাপ বসে থাকতেও অভ্যস্ত নয়।

ওর অফিসের কোনো লোককেই চেনে না পিয়ালী। ওদের অফিসের রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রত্যেক বছরেই একটা বার্ষিকী অনুষ্ঠান হয়। তাতে যদি কোনো বিখ্যাত নাট্য সংস্থার নাটক হয় তো পিয়ালীকে নিয়ে যায় সোমেন্দু। তখন হয়তো অফিসের জাঁদরেল দু-চার জনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়, তাতে কিছু সুবিধে হয় না। ওরকম আলাপে কারো মুখ মনে রাখা সম্ভব হয় না। আগ্রহেই ঘাটতি থেকে যায়।

আর তা ছাড়া অফিসের কোনো লোক বাড়িতে কখনো কোনোদিন আসেইনি। লোকটা সোফায় বসে মাথা নিচু করে খাটো সেন্টার টেবিলে অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে রাখছিল। তার মানে অনেকক্ষণ হল এসেছে। বসে বসে বোরড্ হয়ে সিগারেট ধরিয়েছিল। সিগারেটটা শেষ করেও ফেলেছে। মুখটা তুলতেই পিয়ালী চমকে উঠল, কে? এ যে সত্যব্রত!

মুখখানা সেই আগেই মতোই নিরীহ নিষ্পাপ ধরনের। তবে শুকিয়ে চোয়াল বের করে আমের আঁটি হয়ে গেছে। প্রায় সাত বছর পর দেখা। আট বছরও হতে পারে। বেছে বেছে একেবারে সোমেন্দুদের অফিসেই চাকরি নিয়েছে। দুটো চোখের নিচে কালো খাদ। ওটা আট বছর আগে ছিল না। টেনশনে ভুগছে নিশ্চয়ই।

পিয়ালী কতক্ষণ ধরে স্থির তাকিয়ে থেকেছিল ওর দিকে, কতক্ষণ? জানা নেই। ভেতরে যতটুকু ঢুকে ওকে সত্যব্রত বলে সনাক্ত করেছিল ততটুকুর বেশি পা সরেনি। কথা বলতে পারেনি, এসেই ঢুকতে ঢুকতে একটিমাত্র শব্দ 'কে' উচ্চারণ করার পর। কী কথা বলবে! কী রকম যেন করছে বুকটা! পায়ের পাতা এতটা কাঁপবে কেন? এই মুহূর্তে দুর্বলতার লক্ষণগুলো দেখা দেবে কেন? কিছু একটা বলতে গিয়ে মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল কেন? পিয়ালীর কি এই মুহূর্তে প্রেসার শুরু হচ্ছে? বাপ্পির জন্মের পর থেকে অ্যানিমিয়া সেই যে ধরেছে, কিছুতেই ছাড়ছে না। সে কথা পিয়ালী বার বার বলেছে ডক্টর মিস ঘোষালকে। ডক্টর মিস ঘোষাল তখন হেসেছেন, বলেছেন, 'আরেকটি আনুন কোলে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

গলায় যেন ঠাণ্ডা লেগেছে। শব্দ বেরুতে চাইছে না। আসলে পিয়ালী যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছে এতদিন ধরে সত্যব্রতকে ভুলে গিয়ে..না কি সত্যব্রতের কথা বিয়ের পর কোনোদিন বলেনি সোমেন্দুকে—সেটাও একধরনের অপরাধ বোধ হয়...। প্রাক্‌বিবাহ লাভ অ্যাফেয়ার্সের দু-একটা চিহ্ন মানে চিঠিপত্র, প্রেজেন্টেশন, ছবিটবি সত্যব্রতর কাছে থাকলেও থাকতে পারে। পিয়ালী কিন্তু কোনো চিহ্ন রাখেনি। যেদিন সোমেন্দুর সাথে বিয়েটা পাকা হয়ে গেল, সেদিনই সব চিহ্নে আগুন ধরিয়ে সে সব নিশ্চিহ্ন করে, তবেই না বিয়ের পিঁড়িতে বসার মানসিক বাধা অতিক্রম করেছিল।

সত্যব্রত মাথাটা সামান্য তুলল। তুলেই আবার নিচু করল। মুখখানা কালো। গাল চাপ্টা। ভুরুতে পাক ধরেছে। দুটো কাঁধ কেমন পাতলা আর ছোট হয়ে গেছে। সাধারণ একটা বুশ শার্ট, কত পুরনো কে জানে? প্যান্টের রঙ প্রায় উঠে গেছে এদিক ওদিক। বাইরে চটি ছেড়ে রেখে ভেতরে খালি পায়ে ঢুকেছে। পা দুটোর কী ছিরি! মনে হয় ওকে খুব হাঁটতে হয়। তাই গোড়ালিটা জঘন্যভাবে ফাটা-ফাটা । মাথা তুলে তাকিয়েই একটু হাসল। আগের মতোই হাসিটা টিকিয়ে রেখেছে এখনো। শুধু কী যেন একটা নেই হাসির মধ্যে। তবু ঐ হাসি দেখে বুকের ভেতরটা আচমকা দুক্-দুক্ করে উঠল। এখন এই এত বছর পর ঐ হাসি দেখানর কী মানে হয়? কেন এসেছে এত বছর পর? কী চায়? কোন্ মতলবে এসেছে?

চোয়াল শক্ত করলেই ওর মুখের মধ্যে একটা কঠোর কাঠিন্য ভাব ফুটে বের হয়। হয়তো মনের মধ্যে শয়তানি চাপা থাকতে পারে। আগে ছিল মুখখানা তারুণ্যে গোলগাল। চোখ দুটো কী উজ্জ্বল। ঠোঁট দুটো চকচকে কিশোর কচি। সে ঠোঁটে কতো যে চুমু খেয়েছিল....এককালে ঐ গালে গাল রেখে মাঠের নিবিড় সবুজে ডুব দিয়ে থাকা হঠাৎ এখন মনে হচ্ছে সব অবাস্তব। সিনেমাটিক ছবি। অথচ তখন পরিস্থিতিটা মোটেই অবাস্তব ছিল না। চোখে ছিল সত্যকে বিয়ে করার স্বপ্ন। প্রেমের মিষ্টি মিষ্টি আবেশ দিয়ে গড়া—কী যে ভালো লাগত তখন সত্যব্রতকে, কেবলই ওর কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করত। সব সময় ওর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করত, কী দারুণ বন্ধু ছিল তখন, কী দারুণ কর্তব্যবোধ—কী ধৈর্য আর ত্যাগস্বীকার ছিল ওর...। নিঃস্বার্থ অবশ্য ছিল না, পেতে চেয়েছিল একান্ত করে পিয়ালীকে...পাওয়া আর হয়নি।

চাকরি না জোটাতে পেরে। কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা ট্রাভেলিং এজেন্সির ব্যবসা চালাবে বলে কোথায় যে চলে গেল। তারপর আর পাত্তা পাওয়া গেল না। দুটো বছর কেটে গেল। একটা চিঠি না। খবর না। শেষে বিয়ে করতে বাধ্য হল সোমেন্দুর বাড়ির চাপে কিছুটা, কিছুটা নিজের ইচ্ছাতেও। নেগোশিয়েশন ম্যারেজ।

'অবাক হয়ে গেছ খুব?'

'সেটা কি অস্বাভাবিক?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে সত্যব্রত হাসল, কারণ প্রশ্নটাই উত্তর। হাত উল্টিয়ে ঘড়ি দেখল, বলল, অনেক কথা বলার ছিল, কিন্তু হাতে এখন সময় বেশি নেই। তাই শুধু একটা কথা বলে চলে যাই......।'

'সে কি, এখুনি কী যাবে। চা না খেয়ে।'

'না', চা থাক। চা আজকাল বেশী খাই না।'

'একটু মিষ্টি। এতদিন বাদে....'

'মিষ্টিও খাই না, সুগার নিষিদ্ধ।'

'ওহ্ তাহলে' পিয়ালী হেসে ফেলল,'ঝাল নোনতা কিছু.....'

'আর কী বাকি থাকে, তেতো?' বলেই হা হা করে হেসে ফেলল। সেই রকম হাসি আর রসিকতা যা অনেক দিন দেখা হয়নি পিয়ালীর, অনেক দিন শোনা হয়নি। ওপরটা সত্যব্রতর শুকিয়ে গেলেও ভেতরের সরস ভাবটা পাল্টায়নি।

'তেতো' বলে কেন যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনা থেকেই বেরিয়ে এল পিয়ালীর, 'তেতো তুমি ইচ্ছে করেই খেয়েছ খাচ্ছ, ...।'

'ওতেই পিত্তটা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছি' বলেই আবার হা-হা করে হাসল। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। হঠাৎ ভয়ানক ভয়ঙ্কর, অনেকটা যেন হিংস্র হয়ে উঠল চোখ মুখ, বলল,'যে কথাটা বলার জন্যে তোমার কাছে এসেছি, তোমার স্বামীর মানে মিস্টার চক্রবর্তীর আন্ডারে তাঁরই ওয়ার্কশপে...'

'তাই নাকি? কবে, কবে থেকে...? 'পরক্ষণেই আরেক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল পিয়ালী ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে, 'ও কি তোমাকে চেনে? তোমার সঙ্গে যে আমার একসময় সম্পর্ক ছিল সেটা কি ও জানে?'

হেসে ফেলল সত্যব্রত, 'না, মিস্টার চক্রবর্তী জানেন না। আমাকেও চেনেন না।' ভুরু কুঁচকে ঘড়ি আরেকবার দেখল, তিনি অনেক ওপর তলার লোক, তাঁর কাছে আমাদের মতো ওয়ার্কারদের পৌঁছবার সুযোগ নেই' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল। 'হাওড়ার তিন নম্বর ওয়ার্কশপ তিনি ফ্রিস্কুল স্ট্রিট থেকেই কন্ট্রোল করেন, বছরে এক- আধবার এক-আধ ঘণ্টার জন্যে সেখানে যান, ঐটুকু সময়ে তাঁকে দেখতে পাই। তিনি অবশ্য আমাদের দেখতে পান না, মানে খেয়াল করেন না... সম্ভবও নয়....।'

সত্যব্রত ওয়ার্কার। নিম্নশ্রেণীর ওয়ার্কার বোধহয় ভেবে... পিয়ালীর মনটা কেমন করে উঠল। ইস্ কী দুর্ভাগ্য... সেই সত্যব্রতর এই পরিণতি। কোল্ট এন্ড কেস্কার গ্রুপের তিন নম্বর ওয়ার্কশপে কাজ করা সাধারণ একটা ওয়ার্কারের জীবন ওকে গ্রহণ করতে হয়েছে। বি. কম অনার্স পাশ করে ওতো কস্টিংও পড়েছিল। পাশ করেছিল কিনা জানা নেই। একটা ভদ্রগোছের চাকরি জুটল না কোনো ব্যাঙ্কে, বা কমার্সিয়াল ফার্মে? অ্যাকাউন্টসে, ফাইন্যান্সে? ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের অফিসেও অ্যাকাউন্টস সেকশন আছে। সেখানে সোমেন্দু কি সত্যব্রতের জন্যে কিছু একটা করে দিতে পারে? কিন্তু কী যেন বলল ওর কাছে সত্যব্রতের মতো ওয়ার্কারদের পৌঁছানর সুযোগ নেই। অথচ চাকরিটা ওর অধীনেই,.. এর মানে কী?

মানে অত্যন্ত সহজ। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের অফিসে বসেই চ্যাটার্জী, মালহোত্রা আর চক্রবর্তী সাহেবরা গার্ডেনরিচের একনম্বর, বিটি রোডের দুনম্বর আর হাওড়ার তিন নম্বর ওয়ার্কশপ কন্ট্রোল করেন। তবে এঁদের মধ্যে মালহোত্রা সাহেবই নিয়মিতভাবে

ওয়ার্কশপগুলোতে গিয়ে থাকেন বলে তাঁর সাথে ওয়ার্কারদের সরাসরি যোগাযোগ হয়। এদের তিন জনের ওপরে আছেন ক্যালকাটা ব্রাঞ্চের অ্যাসিস্ট্যান্ট জোনাল কো-অরডিনেটর ট্যান্ডন সাহেব—তিনিও ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের অফিসেই বসেন বছরে ছ-মাস। চ্যাটার্জী সাহেবের রিটায়ার করার সময় হল। চক্রবর্তী সাহেব সিনিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজকাল প্রায়ই দুপুরে বাড়ি ফেরে সোমেন্দু কিছুক্ষণের জন্যে। নীচ থেকে গাড়িতে হর্ণ বাজিয়ে ওপরে উঠে আসে। বাড়িতেই লাঞ্চটা সেরে আধঘণ্টাটাক কাটিয়ে ফের অফিসে যায়। ক্যান্টিনের রিচ খাবার পোষায় না। আজকাল পেটে সহ্যও হয় না। তাছাড়া বাপ্পির ছুটি হয় একটায়। তাই বৌ-বাচ্চা নিয়ে লাঞ্চ সারার, একটু ঘরমনস্কতার বা ঘরকুনোমির একটা সুখ সোমেন্দু নষ্ট করতে চায় না। ডাইনিং টেবিলের সামনে এসে বসে হাসতে হাসতে। মাঝে মাঝে বাপ্পির সঙ্গে একটু-আধটু খুনসুটি। আজও হাসিটা ছিল, হঠাৎ থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অফিস-মার্কা গোমড়াটে ভাব সারা মুখে ছেয়ে গেল, বলল, 'কী ব্যাপার?'

ব্যাপারটা চট করে কি বলা যায়? সত্যব্রত চলে যাবার পর ফোন তুলে পিয়ালী তখন বলেছিল, 'খেতে আসছ তো?' তখনই গলার স্বরটা নিজের কানেই বেমানান ঠেকছিল। গলাটা যেন কেউ চেপে ধরেছিল। আর রিসিভারটাও হাতে কাঁপছিল। তারপর দুটো পর্যন্ত ওর জন্যে অপেক্ষা করাটা যেন লাগছিল যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করা...বুকের ভেতরের দুক-দুক শব্দটা যেন কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবে। কিছু একটা কাজের মধ্যে সময়টা কাটানো যেত, কাজও ছিল প্রচুর ঘর-সংসারের, এমব্রয়ডারির একটা কাজ ছিল, রান্নাও একটা করা যেত রেসিপি পড়ে পড়ে .... কোনোকাজেই মন লাগছিল না, শুধু একবার, একটা বাজলে নিচে নেমে রাস্তার মোড় পর্যন্ত হেঁটেএকটু অপেক্ষা করেছিল; কখন যেন গাড়ি এল, গাড়ি থেকে বাপ্পি নামল। দৌড়ে ছুটে এসে পিয়ালীকে জাপটে ধরল, ওর ওয়াটার বটল টিফিন বক্স স্যাচেল সব যেন এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ে যেতে লাগল। পিয়ালীর কোনো কিছুতে মন লাগছিল না... চারদিকটা যেন নাগরদোলার মতো ঘুরপাক খাচ্ছিল। সত্যব্রত চলে যাওয়ার পর থেকেই এই ব্যাপার।

তাই ডাইনিং টেবিলে সোমেন্দুর 'কী ব্যাপার'-এর উত্তরে পিয়ালী চট করে কী করে দেবে? বাপ্পিকে খাবার দিতে দিতে নিজেকে যতটা সম্ভব সহজ করার চেষ্টা করতে লাগল পিয়ালী। সোমেন্দু নিজেই খাবার তুলে নিতে নিতে মুখখানা আরও গোমড়াটে করে ফেলল। বাপ্পি হাতে খাবার নিয়ে ভয়ে ভয়ে মুখে পুরল না। শুধু পিট পিট করে বাপির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

'তোমাদের তিন নম্বর ওয়ার্কশপে কি...' পিয়ালীর গলা কাঁপতে লাগল।

সোমেন্দু চমকে উঠল। দেখল পিয়ালীর চোখের কোণায় একটু জল জল মতো, দেখল হাত ওর কাঁপছে, কান বিশ্বাস করতে চায় না তবু শুনল, 'তোমাদের তিন নম্বর ওয়ার্কশপে কি লক আউট হতে চলেছে?'

'হ্যাঁ, কে বলল। টপ সিক্রেট ডিসিশন। তুমি কী করে জানলে?' তীব্র দৃষ্টি মেলে ধরল সোমেন্দু, চোখ দুটো যেন টর্চের আলো...পিয়ালীর মুখের ওপর পড়েছে... সার্চলাইটের মতো যেন তন্নতন্ন করে খুঁজছে ভেতরটা।

'তুমি কী করে জানলে?' জানার কথা নয়। অফিসের কোনো বিন্দুবিসর্গ বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয় না সোমেন্দু। অথচ—।

'খবরটা একজন দিয়ে গেছে।'

'কে?'

'সত্যব্রত।'

'সে কে'?

'আমার—' বলেই থমকে গেল পিয়ালী। কী বলবে? 'বন্ধু'? 'পরিচিত'? 'এক কলেজে পড়ত...?' সাত আট বছর আগের...তারপর সম্পর্ক রাখেনি? কী বলবে? ততক্ষণে ভাত মুখে পুরে দিয়েছে পিয়ালী। চিবুচ্ছে। তাই তক্ষুণি উত্তর দিতে হচ্ছে না। কিন্তু সোমেন্দুর ধৈর্য নেই—'তোমার চেনা? আমারও কি চেনা?'

পিয়ালী জল খেয়ে ঢোক গিলল। কী যেন দ্রুতগতিতে ভাবল, বলল 'কার চেনা কার অচেনা সে প্রশ্ন পরে; বলেই আরেকবার ঢোক গিলল, তারপর খুব জোরে একটা একটা শ্বাস নিয়ে দমবন্ধ করে বলল, 'তুমি মোটকথা আগষ্ট মাসের ১৫ তারিখে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে যাবে না।'

'কেন?'

'সেদিন তোমাদের ওয়ার্কশপগুলোর ওয়ার্কাররা ঘেরাও-এর কর্মসূচি নিয়েছে।'

'তা নিক।'

'জঙ্গি আক্রমণ হতে পারে।'

'জঙ্গি? সত্য?' বলে চমকে উঠল সোমেন্দু, থমকে রইল ওর চোখ দুটো। কী যেন ভাবতে ভাবতে ধাতস্থ হল এক মুহূর্তের জন্যে, 'ও সত্য ঘোষ, মানে হাওড়া ওয়ার্কশপের সেই জঙ্গি লিডার সত্য! ও এসেছিল তোমার কাছে...আনবিলিভেবল্।'

এক সেকেণ্ডের মধ্যে সোমেন্দুর মুখখানা কালো হয়ে গেল। যেন মুখের ভেতর একটা আলো ছিল, সেটা নিভে গেছে। আর খাচ্ছে না। হাত গুটিয়ে নিয়েছে। চুপচাপ থুম্ মেরে বসে রইল।

(২)

সন্ধেবেলা ডুবে যাবার আগে সূর্য অনেকটা নরম আর খুব শান্ত হয়ে যায়। গাছের ডালপালাগুলো তখন মনের আনন্দে ঢলে পড়ে আর আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। পিয়ালী চিরুনি চালাতে চালাতে সন্ধেবেলায় এই রূপ এক ঝলক লক্ষ করে। পরক্ষণেই চিরুনি থেকে চুল ছাড়াতে ছাড়াতে সত্যব্রতর কথা ভাবে। সাত আট বছর আগেও এই রকম সন্ধের রঙ ওর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। তখনকার সন্ধের লাল সূর্য কত রোম্যান্টিক! আর এখনকার লাল সূর্য যেন অনেকখানি রক্ত। সত্যব্রতকে ট্রেড ইউনিয়নের লিডার হতে হয়েছে—সেই কবে থেকে বেঁচে থাকার লড়াই-এ নেমেছে, লড়তে লড়তে শেষ পর্যন্ত চরম পন্থার দিকেই পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। ওদের ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে একটা জঙ্গি গ্রুপ গড়ে উঠেছে। এই সত্যব্রত নাকি সেই গ্রুপেরই লিডার। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ব্যর্থ হলে ঐ জঙ্গি গ্রুপটা হঠাৎ গোপনে আন্দোলন শুরু করে দেয় আর তার নেতৃত্ব দেয় সত্য ঘোষ। মানে সত্যব্রত। আশ্চর্য সত্যব্রত কী ছিল আর এই সাত আট বছরেই কী হয়ে গেল; আসছে মাসের সাত তারিখে লক আউট হবেই হবে। আন্দোলন হবেই। আর পনের তারিখে যারা আসবে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে অফিস ঘেরাও করতে তাদের মধ্যে লাঠি ছুরি বোম নিয়ে মিলেমিশে থাকবে সত্যব্রতের দল। শান্তিপূর্ণ ঘেরাও চলবে সারাদিন, সারারাত। তারপর দিনও চলতেই থাকবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত। বাধা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাত।

'জঙ্গি আন্দোলনের রাস্তা কেন নিয়েছ?' আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল পিয়ালী। সত্যব্রত তখন চলে যাবে। নিচে নামবে বলে লিফ্‌টের জন্য একটু অপেক্ষা করছিল। আটতলা থেকে লিফ্‌ট তখন নিম্নগামী। পাঁচ তলায় এসে থামবে। এইটুকু সময়ের মধ্যে সত্যব্রত কী উত্তর দেবে, তাই হাসতে লাগল। সেই আগের মতো হাসি, যদিও গাল চ্যাপ্‌টা। ঠোঁট কালো শুকনো, অত বেশি বিড়ি সিগারেট খেয়ে ঐ দশা। পিয়ালীর চোখের ওপর চোখ স্থির রেখে সত্যব্রত বলল, 'তোমাকে হারাতে হল, তারপর মাকেও হারাতে হল, তারপর বাড়ি, দেশের জমিও হারাতে হল, এখন এই সামান্য চাকরিটাও হারাতে বসেছি ....।'

'বিয়ে করেছ'?

'করেছি।' লিফ্‌ট এসে গেল।

'বাচ্চা?' লিফ্‌ট খুলল।

'দুটি। এখন ওদের জন্যই শেষ অস্ত্র...।' বলতে বলতে লিফ্‌টের ভেতর ঢুকল সত্যব্রত। লিফ্‌ট নেমে গেল।

চিরুনি হাতে নিয়ে কখন যে বারান্দার চেয়ারে বসে পড়েছিল পিয়ালী খেয়াল নেই। এতক্ষণে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। এই সময়টায় অন্ধকারে যত তাড়াতাড়ি ডুবে যায় ওপাশের ফ্ল্যাটবাড়িগুলো, তত তাড়াতাড়ি জানালায় জানালায় দপ দপ করে আলো জ্বলে ওঠে। চোখে ভীষণ লাগে। গাঁ গাঁ করে গান বেজে ওঠে ক্যাসেটের পপ কিংবা হিন্দি। অসহ্য লাগলেও বারান্দা থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকটা খোলা। তাই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে তর তর করে একটা হাওয়া আসে। সেই হাওয়ায় বারান্দায় বেগুনি প্যাশান ফুলগুলি দুলতে থাকে। লতানো পাতাগুলি হাততালি দিতে পারলে ভালো হত এমনি ঢঙ করে নাচতে থাকে—। সত্যব্রত এক সময় কবিতা লিখত। ওর কবিতা ছাপা হত লিটল ম্যাগাজিনে। বলত প্রেম মানেই দীর্ঘ অসমাপ্ত ধারাবাহিক একটা কবিতা। আজকাল তো কবিতা লেখে না; ভালোও কি বাসে? এখনও কি পিয়ালীর ওপর অত্যন্ত সঙ্গোপনে টানটা রেখে দিয়েছে সত্যব্রত! তা নইলে কেন খুঁজে খুঁজে বের করল পিয়ালীদের ফ্ল্যাট, কেন এসেছিল সতর্ক করে দিতে, 'তোমার কোনো ক্ষতি বা তোমার বাচ্চার ভবিষ্যৎ নষ্ট যাতে না হয়, মানে তোমার স্বামীর শারীরিক কোনো ক্ষতি হোক তা আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই না। তাই ছুটে এসেছি....।' 'আমার, আমার বম্বির, আমার স্বামীর, আমার ঘর-সংসার, আমার সব কিছুর ওপর ওর একটা ভালো চাওয়া—কোনো অনিষ্ট না হওয়া—এই যে দরদ—একে কী বলবে পিয়ালী? সত্যব্রত মন থেকে এখনো ছেড়ে দেয়নি পিয়ালীকে। কিন্তু রেখেই বা কী লাভ মনের মধ্যে। হয়তো মন থেকে মোছা সম্ভব হয়নি। উঠে দাঁড়াল পিয়ালী। আঙুলের নখের কোণগুলো দেখতে দেখতে ভাবে, হ্যাঁ, আমি কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম ওকে....। বিয়ের পর, বাম্বির জন্মের পর ওর ওপর কোনো টানই ছিল না, একথা সত্যি।'

ভেতরে ঢুকে ঘরের আলো জ্বালতেই চমকে ওঠে পিয়ালী। ঘরের ভেতরে অন্ধকারে চুপ করে বসে ছিল সোমেন্দু। কখন ফিরেছে অফিস থেকে? এত তাড়াতাড়ি? ওরকম অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে কেন? খুব আপসেট হয়ে গেছে মনে হচ্ছে! কপালটা চিন্তার রেখায় চৌচির। এমন নিঃশব্দে এসেছে, গাড়ির শব্দটাও টের পাওয়া যায়নি। যথানিয়মে গাড়িতে হর্নটাও দেয়নি। এরকম কখনো হয় না। অফিসে ঘেরাও আন্দোলন, জঙ্গি আক্রমণ, তিন নম্বর ওয়ার্কশপে লক আউট—সমস্ত কিছুই একটা টেন্‌শন তৈরী

করেছে—সোমেন্দু নিশ্চই সমস্যার সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না। সোমেন্দুর পাশে বসল পিয়ালী। একটা হাত রাখল হাতে, 'তুমি ছুটি নাও না। প্লীজ ছুটি নাও।'

'ছুটি?' বলেই চুপ করে বসে থাকল সোমেন্দু অনেকক্ষণ। তারপর বিড় বিড় করে বলল, 'অবশ্য অনেক ছুটি পাওনা আছে। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'ভাবছি লড়ব।'

'লড়বে? কার সঙ্গে?' আঁৎকে ওঠে পিয়ালী, 'ঐ জঙ্গি ওয়ার্কারদের সঙ্গে?'

হ্যাঁ না কিছু বলে না সোমেন্দু। শুধু ভুরু কুঁচকে বসে থাকে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ায়। এক সময় বিড়বিড় করে বলে,'তবে আমার আসল লড়াই মালহোত্রার সাথে।'

'মালহোত্রা? যাঁর আন্ডারে এক নম্বর ওয়ার্কশপ!'

'হুঁ', জল খেতে খেতে বলল সোমেন্দু, 'রাস্কেল একটা, থার্ড ক্লাস হিপোক্রিট, আমার ওয়ার্কশপে লক আউট করিয়ে ছাড়ল, যদিও প্রডাকশন ফল করছিল না...'

সোমেন্দু কখনো স্ত্রীর কাছে অফিসের বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলত না। কিন্তু আজ এত কথা বলল। বলল মানে বলে ফেলল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তার মানে অনেক কথা ও চেপে রাখে, অথচ বলার জন্যে ব্যগ্র হয়ে থাকে। বলতে পারে না। কেন পারে না? কিন্তু আজ তো সোমেন্দু বলে ফেলল অনেক কথা। তার মধ্যে মালহোত্রার অপকীর্তির কথাই বেশি। মালহোত্রা কত সহজে মন গলাতে পারে ওয়ার্কারদের। তেমনি পারে কর্তাদের ভজাতে। অ্যাসিস্ট্যান্ট জোনাল কো-অরডিনেটর পোষ্ট পাওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। সোমেন্দুর জুনিয়র হওয়া সত্ত্বেও। অফিসে সোমেন্দুর রেকর্ড সবচেয়ে ভালো। ট্যান্ডন সাহেবের কাছে আছে সেই রেকর্ড। কিন্তু ট্যান্ডনকে মালহোত্রা কী ফাঁদে ফেলেছে। পি. আর. ও. মিস রুবি পারেখের ফ্লাটে রোজ যাচ্ছে দুজন। তাই সে সব রেকর্ড চাপা পড়ে আছে ট্যান্ডনের ঘরে লাল ফিতের মধ্যে। ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে বলতে হঠাৎ থামল,বলল, 'বাপ্পি? বাপ্পি কোথায়?' আচমকা এই প্রশ্নে পিয়ালী মুখ তুলল। দেখল সোমেন্দু একটু স্বাভাবিক। 'রীনুদির ফ্লাটে। চাঙ্কির সঙ্গে খেলছে।' উত্তর দিয়ে পিয়ালী উঠে দাঁড়ায়, 'চা খাবে তো?'

'নাহ্। চলো ঘুরে আসি।'

'কোথায়?'

'চলো যেখানে হয়। নন্দনে, রবীন্দ্রসদনে, একাডেমিতে, যেখানে হয়। টিকিট না পেলে হাওয়া খেয়ে আসব।'

ধুপ করে আবার পাশে বসে পড়েপিয়ালী, বলে, 'আজ সকালে কোন দিকে সূর্য উঠেছিল?'

'ব্যস্ ব্যস্', বলেই পিয়ালীর মুখে হাত চাপা দেয়, কাছে টানে। মুখ থেকে হাতটা টেনে নামায় পিয়ালী, 'এখন সাতটা, হাওয়াই খেতে হবে....'

আরও কাছে টেনে আনতে আনতে বলে, 'হাওয়া খেতে খেতে না হয় শুনব...'

'কী শুনবে?'

'তোমার সত্যব্রতর গল্প।'

খচ্ করে উঠল মনের মধ্যে পিয়ালীর। তাকিয়ে থাকে সোমেন্দুর চোখে। অদ্ভুত একটা নিষ্প্রভ দৃষ্টি চোখের মধ্যে। দুই হাতে আগলে ধরেছে সোমেন্দু পিয়ালীর শরীরটাকে। চাপ দিচ্ছে নিজের থলথল শরীরে। ঠোঁটও ঠেকিয়ে দিচ্ছে ঠোঁটে। মুখটা সরিয়ে নেয় পিয়ালী,বলল, 'সে তো এখানে বসেই শুনতে পার—'

ছেড়ে দিল পিয়ালীকে সোমেন্দু, বিড় বিড় করে বলল, 'তোমার লাভার এখন আমার রক্ষাকর্তা।'

‘এক্স লাভার’ ভুরু কুঁচকে সংশোধন করে পিয়ালী।

‘না, এক্স বলো না। এখনও ফিলিং আছে তোমার ওপর’ বলেই সোমেন্দু হঠাৎ যেন চমকে উঠল, বলল, ‘হাসছ না কি?’

‘একটু একটু ’এবারে পিয়ালী দুই হাতে সোমেন্দুকে আগলে ধরল,গালে গাল রাখল, ঘসল,‘যাক্ তোমাকে তাহলে সত্যি-সত্যি ভেতর থেকে অ্যাটাক করেছে।’

‘অ্যাটাক করেছে? কে অ্যাট্যাক্ করবে...?’

‘কে আবার? তোমাদের সেই জঙ্গি ওয়ার্কার...।’

‘জঙ্গি? জঙ্গি আমিও হতে জানি’, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সোমেন্দু, চুমু খেতে গিয়ে, না খেয়ে।

(৩)

পরের ঘটনাগুলি কয়েকদিনের মধ্যেই উর্ধ্বশ্বাসে ঘটে যেতে লাগল। একটা একটা করে বোমা ফেটে যাওয়ার ঘটনা। বিস্ফোরণ হওয়ার একটু আগে যেভাবে অনেকটা দূরে সরে থাকতে হয়, সোমেন্দু ঠিক সেভাবেই এক তারিখ থেকে বাইশ দিনের জন্য ছুটি নিয়ে পিয়ালী, বাপ্পি আর মাকে নিয়ে দূরে সরে থাকল। দূরে বলতে হরিদ্বারে, দেরাদুনে, মুসৌরি ও হৃষিকেশের পর আবার হরিদ্বারে।

অনেক ক্যালকুলেশন করেই সোমেন্দু ছুটি নিয়েছে। কারণ অফিস ঘেরাও-এর কর্মসূচী তখনও সকলের কাছেই অজ্ঞাত। তাই তখনই হাফটাইম ছুটি নিলে কর্তামহলে সোমেন্দুর অনুপস্থিতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে না। তাছাড়া লক আউট চল্‌বে, প্রডাকশন বন্ধ থাকবে, এখন তো আর সোমেন্দুর কোনো দায়িত্ব পালনের প্রশ্ন নেই। ‘অন্য কোনো ওয়ার্কশপের দায়িত্ব এক্ষুনি তো পাচ্ছি না স্যর। এই সুযোগে বাইশটা দিন আর্নড্ লিভ নিচ্ছি, মাকে হরিদ্বার, হৃষিকেশ ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।’ মাকে তীর্থক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ট্যান্ডন সাহেব একটু খুশিই হন।

ছুটি নেওয়ার আরেকটা কারণ—ঐ অফিসারের চেয়ারে বসে এই জঙ্গি আন্দোলন ফেস্ করা বোকামি। কারণ পুলিশের জেনুইন প্রটেকশন মিলবে কি না সন্দেহ। যদি তা পাওয়াও যায়—খানিক আগে সত্যব্রতর মাধ্যমে খবর পেয়েছে সোমেন্দু, তাই তার হাতে যথেষ্ট সময় ছিল আন্দোলন বানচাল করে দেওয়ার মতো আইনী ক্ষেত্রে পুলিস লাগিয়ে, আর বেআইনি ক্ষেত্রে মাসল ম্যান লাগিয়ে—কিন্তু তাতে কর্তাদের লাভ, আর মালহোত্রার লাভ। সোমেন্দুর কী লাভ?

কিন্তু মালহোত্রাই যে এখন আন্দোলন বানচাল করার সুযোগ পাবে এবং কর্তাদের মন জয় করে ফেলবে! চলন্ত ট্রেনের বাইরে তখন সমতল ভেঙে উঁচু নীচু হয়ে যাচ্ছে। পারবে না। সরব জঙ্গি আক্রমণের ভেতরে ভেতরে আছে সোমেন্দুর নীরব জঙ্গি আক্রমণ। ঠোঁট কামড়ে সোমেন্দু জানালার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ভাবে তার নিজেরও একটা ওয়ার্কার গোষ্ঠী আছে। তারাও সত্যব্রতর জঙ্গি দলের মধ্যে মিশে যেতে পারে। সত্যব্রতরা এক হাত এগিয়ে গেলে ওরাও দুহাত এগিয়ে যাবে। দেখা যাক না কী হয়—সব ব্যবস্থাই করে এসেছে সোমেন্দু। ট্রেনের জানালায় বসে দুরন্ত বেগে বিহারের দুটি পাহাড়ের পেছনে চলে যাওয়া দেখে সোমেন্দুর মুখে অদ্ভুত হাসি খেলে গেল—এক ঢিলে দুটি পাখি মরলে পর্বতপ্রমাণ দুটি সমস্যা দুরন্ত গতিতে পেছনে চলে যাবে।

এবং কিছুদিনের মধ্যেই সেইসব ঘটনা ঠিকঠাক ঘটে যেতে লাগল। মুসৌরি ঘুরে সতের তারিখে হরিদ্বারে এসে একটা ষোল তারিখের খবরের কাগজ পাওয়া গেল। ঘটনাগুলো সংবাদপত্রে মুদ্রিত হওয়ার মর্যাদা পেয়েছে। সংবাদ বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায় ঃ—

প্রথম ঘটনা, সাত তারিখে হাওড়ার তিন নম্বর ওয়ার্কশপে লকআউট ঘোষণা। ওয়ার্কশপের গেটে অবস্থান ধর্মঘট।

দ্বিতীয় ঘটনা, আট তারিখ থেকে ওয়ার্কশপের গেটের সামনে ওয়ার্কারদের লাগাতার গণ অনশন।

তৃতীয় ঘটনা, দশ তারিখে গার্ডেনরিচের এক নম্বর ওয়ার্কশপে একদিনের টোকেন স্ট্রাইক। বারো তারিখে বিটি রোডের দুই নম্বর ওয়ার্কশপে একদিনের টোকেন স্ট্রাইক। এ পর্যন্ত আন্দোলন শান্তিপূর্ণ এবং ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে।

চতুর্থ ঘটনা, তিনটি ওয়ার্কশপে গণ অবস্থান, গেট অবরোধ। ছোটখাটো সংঘর্ষ।

পঞ্চম ঘটনা, পনের তারিখে বিনা নোটিশে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের অফিস ঘেরাও। দুপুর থেকে প্ররোচনামূলক বক্তৃতা শুরু।

ষষ্ঠ ঘটনা, বিকেলে পুলিশের লাঠিচার্জ। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের অফিস ভাঙচুর।

সপ্তম ঘটনা, জনতা-পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ।

অষ্টম ঘটনা, ট্যাণ্ডন সাহেবের গাড়ি ভাঙচুর।

নবম ঘটনা, সন্ধের মধ্যেই অবস্থা পুলিশের আয়ত্তে।

তারপর দশম ও একাদশ দুটি ঘটনা আসলে বিশেষ ঘটনা—'এক ঢিলে দুটি পাখি মরল কিনা'র মতো ঘটনা অর্থাৎ সত্য ঘোষ ওরফে সত্যব্রত ঘোষ, পিনু ওরফে পিনাকী মজুমদার ও তারা ওরফে তারিকুল ইসলাম ধৃত, পুলিশ হাজতে এবং জামিন নামঞ্জুর। জামিন পায়নি—মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে খুনের চেষ্টার মামলায় জড়িয়ে গেল ওরা। এই ছুতোয় কর্তারা ওদের চাকরি নট করে দিলেও দিতে পারে।

অন্য বিশেষ ঘটনাটি হল, জোনাল অফিসারের র‍্যাঙ্কে প্রমোশনে প্রার্থী সোমেন্দুর অপ্রতিরোধ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মিস্টার দীপক মালহোত্রা গুরুতরভাবে আহত, সংজ্ঞাহীন, মুমূর্ষু অবস্থায় নার্সিংহোমের ইনটেনসিভ কেয়ারে। বাঁচবার আশা কম।

চোয়াল দাঁত শক্ত করে নিশ্বাস বন্ধ করলে সোমেন্দু। যেন অনেক দিনের চাপা আক্রোশ তাঁর মিটল। তবে তার অনুগতদের মধ্যে পিনু ধরা পড়েছে। ওকে বাঁচাতে হবে। আর কে কে ধরা পড়েছে কাগজে বেরয়নি। সরবে জঙ্গি আন্দোলন চালিয়েছে সত্যব্রত, আর নীরবে জঙ্গি আক্রমণ চালিয়েছে সোমেন্দু নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে।

সোমেন্দুর ঘর-সংসার, তার বাচ্চার ভবিষ্যৎ নিরাপদেই আছে। বাম্বিকে বুকে আঁকড়ে পিয়ালীর চোখে জল, 'সত্যব্রতর বাচ্চা দুটির কী হবে?'

চালি

জীবন সরকার

তুমি না যাবা।

ছলছল চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল পিটুলি। এই বাড়িতে আসার পর ও জানতে পেরেছে ঘটনাটি। লোকেনের বাপের বেলায় ঘটেছিল। মুলিবাঁশের চালি নিয়ে বাপ যাচ্ছিল যোগীঘোপা থেকে গোয়ালপাড়া। পথে ঝড়ে ব্রহ্মপুত্রের জলে পড়ে যায়। বাপ আর ফেরেনি। লোকেন উত্তর দিল, তুমি পাগলা হলা নেকি। না গেলে খাব কী?

না খেয়ে থাকব।

এটা কি ঠিক বলছ?

তুমি না যাবা।

বাবা পড়ে গিয়েছিলেন বলে আমিও পড়ে যাব? এমন হতে পারে না।

তুমি যদি আমার কথা না শোন...

এত চিন্তা করছ কেন। লেখাপড়া জান, এসব বিশ্বাস কর? আমার কিছু হবে না।

যদি অসুখবিসুখ হয়?

হাটে ডাক্তার দেখাব। তোমাকে চিঠি দেব। তুমি কেন বুঝতে চাইছ না। বাড়িতে বসে থাকলে কি টাকা আসবে? বিদেশে চাকরি পেলে যেতাম না?

পিটুলি আর কথা না বলে মাথার ঘোমটা ঠিক করে রান্নাঘরে চলে গেল।

ক-দিন যাবৎ বউ রোজ এতবার মানা করছে, চালিতে না যাওয়ার জন্য। এত বড়ো সংসার মাথায়। কী করে চালায় তাতো বউ জানে না। তাছাড়া কবে কী ঘটনা ঘটেছে সেই ভেবে মানুষ কি ঘরে বসে থাকবে! ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হয়, তাই বলে কি মানুষ ট্রেনে ওঠে না? মানুষ আকাশে যাচ্ছে। হিল্লি দিল্লি করছে। বিপদ হলে তো বাড়ির ভেতরেই ঘটতে পারে। মৃত্যুকে লোকেন ভয় পায় না। একদিন তো মরতে হবেই।

লোকেন কিছুদিন গ্রামের স্কুলে পড়েছিল। সাজপোশাকেও ছিমছাম থাকে, চেহারাটা তো খারাপ নয়। পড়াশোনা করলে এখন কলেজে পড়ত। দুনিয়ার খবর রাখে, আলফার জন্য মিলিটারি নেমেছে তাও জানে। আফসোস, একটা কাজ পেল না কোথাও। গোঁসাইগাও গিয়েছিল একটা বেকারিতে। কিন্তু সেখানে মন টেকেনি। কোকড়াঝাড়ে রহমের দর্জির দোকানেও ছিল কিছুদিন।

ভাইবোনেরা ছোটো। মার পক্ষে বাড়ি জমি দেখাশোনা অসম্ভব—এইসব চিন্তা করে বাড়িতেই থাকবে, এটা ঠিক করে নিয়েছিল। কিন্তু সারাদিন পরিশ্রম করেও দুবেলা ভাত জোটে না, জিনিসপত্রের যা দাম! আর টাকার কি কোনও মূল্য আছে! অভাব অনটন লেগেই আছে। এটা নেই, ওটা নেই। এই নিয়ে মার সঙ্গে খিটির মিটির। বউ-এর সুন্দর-মুখ ভার। লোকেন বুঝতে পারছিল না এই সংসারটা কী করে চালাবে।

· এই সময় যোগীঘোপার সাহাবাবু খবর পাঠাল—চালি নিয়ে যেতে হবে গোঁসাইগাও না গোয়ালঘাটায়। লোকেন খবরটা শুনেই দৌড়ল। ওদের বাড়ি যোগীঘোপা থেকে বেশি দূরে নয়। সাহাবাবু বলল, কীরে নিয়ে যেতে পারবি? তোর বাপ এই কাজটা

করত। তুই পারবি তো? লোকেন কোনও কথা বলছে না দেখে সাহাবাবু আবার বলল, জোয়ান বয়েস, এই সময় যদি না যাস, তাহলে আর কবে যাবি! ট্রেনে পাঠাতে অনেক ঝক্কি। লরিতে অনেক খরচ। তাছাড়া বেশিদূরে তো নয়। তোরা নিয়ে গেলে আমার আর কোনও চিন্তা থাকে না। ভালোই টাকা দেব। খাওয়ার খরচও দেব। ভেবে দেখ যদি যাস। দুই একদিনের মধ্যে যেতে হবে।

লোকেন এতক্ষণ পর বলল—কত বাঁশ যাবে?

লাখ দুই তো হবেই।

কতজন মানুষ লাগবে?

তুই তো বলবি, সেই মতো মালপত্র জোগাড় করতে হবে। আগে পারবি কিনা সেটাই বল।

লোকেন বলল, পারব।

ঠিক আছে। আমি সব ঠিকঠাক করে রাখছি যাতে তোদের কোনও অসুবিধা না হয়।

লোকেন আর দাঁড়াল না। মনে মনে ভাবল, অনেকগুলো টাকা। কাজটা করতে পারলে এই বছর আর চিন্তা করতে হবে না। তাছাড়া এরা মহাজন। এদের নজরে থাকলে কাজও পাওয়া যেতে পারে। এতদিনে তাহলে একটা হিল্লে হল। লোকেন বাড়িতে ফেরার পথে মগাই, নিতাই, মন্টু, হারু, কালাকে খবর দিয়ে দিল।

বাড়িতে এসে বউকে বলতেই বিপত্তি। কিছুতেই রাজি করানো যাচ্ছে না। বাপের ঘটনা শুনে ভয় পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে যেতেই হবে। লোকেন মনে মনে ঠিক করল, টাকা পেলে গোয়াল ঘরটা ঠিক করবে। বাড়িতে কল দেবে। পিটুলিকে জল আনতে অনেক দূর যেতে হয়। পিটুলিকে মেখলা কিনে দেবে। মাকে চাদর। বিয়ে করেছে ঠিকই কিন্তু বাড়ি-ঘরটা টাকার জন্য ঠিকমতো সাজাতে পারেনি। লোকেন ভেবেছিল যাওয়ার দিন বউ আর না করতে পারবে না। ওকে ঠিক বুঝিয়ে দেবে রাত্রিবেলা। মাকে নিয়েই ভয়। বয়েস হয়েছে। এই বয়েসে কিছু করতে পারে না। তাহলেও একদণ্ড চুপচাপ বসে থাকে না, এটা না ওটা করছেই।

লোকেন জমিতে নামছিল গোরু নিয়ে। দ্যাখে মা হাঁস তাড়াতে তাড়াতে আসছে। হাতে একটা লাউ। লাউটা নিয়ে মা নুয়ে পড়েছে। কোমরটা একদম ভেঙে গেছে। মা কাছে আসতেই লোকেন বলল, মা, লাউটা নিয়েছ কেন?

মা লোকেনের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, তোর সঙ্গে কথা আছে।

কী কথা?

চালিতে না গেলে হয় না?

মাত্র ক-দিনের ব্যাপার। টাকার দরকার, তুমি তো জানই।

বাপুই, আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

লোকেন মার দিকে তাকিয়ে রইল। কী উত্তর দেবে কিছুই ভেবে পেল না।

অথচ মা-ই কাজের জন্য কত জায়গায় যেতে বলেছে। পাণ্ডু, গৌহাটি, দিসপুর, জোড়হাট। এমনকী কলকাতাতেও পাঠাতে চেয়েছিল। এবার কিন্তু না করছে। সংসারে অনটন আছে। তা সত্ত্বেও ছেলেকে বাইরে যেতে দিতে চায় না। যদি কোনও অঘটন ঘটে যায়, নতুন বৌমার কী হবে! জলজ্যান্ত মানুষটা গেল আর ফিরল না। তখন তো লোকেন খুব ছোটো। পরেরগুলি তো আরও ছোটো।

ছোটো ছোটো বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কী করে যে সংসার চালিয়েছে তা শুধু শংকরদেবই জানেন। একবেলা ভাত জুটলে অন্যবেলা শাকপাতা খেয়েই থাকতে হত।

সেই দুঃখের সংসারটা এতদূর টেনে এনেছে। আবার নষ্ট হবে মা তা চায় না। লোকেনের দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এই ক-দিন ঠিকমতো খায়নি।

লোকেন দেখল মার শরীর কাঁপছে। বলল—হ মা, আজই যাব। বলেই মাকে একরকম জোর করেই বাড়ির দিকে পাঠিয়ে দিল। যেতে যেতে মা আবার পিছন ফিরে তাকাল। মনে হল এক্ষুনি বুঝি যাবে। লোকেন ভেবেছিল মা অন্তত ব্যাপারটা বুঝবে। কিন্তু মাও না করছে। মা যদি ভেঙে পড়ে তাহলে বউকে সান্ত্বনা দেবে কে?

পাটখেতের কাছে আসতেই ঝোড়ো হাওয়া ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফেটে বৃষ্টি। সর্বনাশ, আকাশ ডাকছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাজ যদি পড়ে তাহলে তো শেষ! কখন কার কী হবে কে জানে। জীবনে যদি বাজি ধরা না যায় তাহলে জীবন আর কী, জীবনটা তো জুয়া। কেউ উঠবে, কেউ পড়বে।

একটু বৃষ্টিতেই খেতে জল জমে গেল। পুকুরের ঘোলাজল নামছে জমিতে। কী ঢল।

কলকল শব্দ চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। জিওল মাছ নামছে। লোকেন সঙ্গে সঙ্গে কাঁচি দিয়ে কোপ বসাল। মাছটা কোপে দু-ফাঁক হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কোমরের গামছাটা নিয়ে মাছ ভরতে লাগল।

লোকেন মাছগুলি নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। পিটুলি লাফিয়ে উঠল মাছগুলি দেখে।

পিটুলির হাসিমুখ দেখে লোকেন একটু শান্তি পেল। এই ক-দিন গোমড়া মুখ করে বসেছিল।

ঘুঘু ডাকার সঙ্গে সঙ্গে লোকেনের ঘুম ভাঙল। সকাল হয়েছে। আকাশ পরিষ্কার। গাছপালা সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে। অনেকদিন পর বৃষ্টিও হয়েছে। শালিক নেমেছে উঠোনে। লোকেন লাফ দিয়ে উঠল। তৈরি হতে হবে। আজকেই যেতে হবে।

বউ রাত্রিবেলা না করেনি, শুধু বুকের মধ্যে মুখ রেখে কেঁদেছে। বাড়িতে এই কদিন কী লাগবে তা সব রেখে গেছে। এতে যদি না হয় তাহলে হরিপদর দোকান থেকে নিয়ে আসবে। এইরকমই বলা আছে।

একটু পরে মগাই, ভোলা, হারু, ওরা সব এল। বাকি সবাই নদীর ঘাটে অপেক্ষা করবে।

লোকজন দেখে কাঁদো কাঁদো গলায় মা বলল, আজকেই যাবি?

হ মা।

মা দেখল ছেলেকে আর রাখা যাবে না। তখন বউকে বলল, ভাত বসাইয়া দে।

পিটুলি বুঝল এই লোকটা নিজে যা মনে করে তাই করবে। কারও কথাই শুনবে না। যদি শুনত তাহলে তলে তলে সব ঠিক করে আসত না। যাবেই যখন আর কান্নাকাটি করে কী লাভ। পিটুলি ঘরে ঢুকে উনুনে আগুন ধরিয়ে দিল। ভাত হতে কতক্ষণ। মগাই-এর কাছে মা গিয়ে দাঁড়াল। মগাই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। বুঝতে পারল কিছু একটা বলবে। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। মা বলল, সাবধানে যাবি, তুই তো পুরানা মানুষ। শুধু গান গাবি না। খবর পাঠাবি।

পাঠাব।

জোয়ার-ভাঁটা দেখে যাবি। দিনকাল ভালো নয়। ডাকাতের ভয় আছে।

বলেই মা চলে গেল অন্য কাজে।

মগাই আর কথা বাড়াল না। চুপচাপ বসে রইল যতক্ষণ না লোকেন তৈরি হয়।

খাওয়া দাওয়ার পর ওরা চলল যোদ্ধার বেশে। আগের দিনে যেমন যুদ্ধে যেত। কিংবা হাতি নিয়ে শিকারে যেত। মা বউ পাশে এসে দাঁড়াল। কারোর মুখেই কোনও কথা নেই। চুপচাপ, চারপাশে গুমোট ভাব।

পিটুলি কাঁদছে। মার চোখেও জল।

এক সময় গ্রামের চেনা পথ শেষ হয়ে গেল ওদের আড়াল করে।

পিটুলি মাকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল।

একটা চিল আকাশে উড়ছে। সেই ভোরবেলা থেকে। পিটুলি দেখল আকাশে মেঘ নেই। আসতে কতক্ষণ। সামনেই বর্ষাকাল। এখনও ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হয়। কিন্তু তেমন নয়। তেমন একটা মারাত্মক না হলেই ভালো। আকাশের কথা আর ভেবে কী হবে।

গোয়ালঘরে গিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করতে লাগল। কাজে থাকলে ওদের কথা মনে আসবে না। এমনি চুপচাপ থাকলে চিন্তা আসবেই। পিটুলি ভাবল পুরুষ মানুষ কি ঘরে বসে থাকে? কাজের জন্য তো বের হতেই হবে। এখন তো তার শক্ত হওয়ার সময়।

ব্রহ্মপুত্র। যোগীঘোপা একটা বন্দর। এখানেই ওরা দাঁড়িয়ে আছে। সাহাবাবু লোক নিয়ে নিজেই তদারকি করছে। চালি তৈরি। চালির ওপর মুলিবাঁশের বেড়া দিয়ে ছই বানানো হয়েছে। ছইয়ের ওপর ছেঁড়া কাঁথা, দুই একটা বালিশ। রাম-দা, লাঠি, লগি। দড়ি, বাদাম (পাল) সব নেওয়া হয়েছে। একটা বল্লম। বলা তো যায় না রাস্তাঘাটে কখন কী হয়। একটা হ্যারিকেন। মগাই দোতারাটাও নিয়েছে। যখন চালি চলবে না তখন গান গাইবে। ট্যাটা নিয়েছে, বড়শি আর ধর্মজাল নিয়েছে। যদি মাছ পাওয়া যায়। তাহলে আর মাছ কিনতে হবে না। লোকেন ঘুরেফিরে সব একবার দেখে নিল।

সাহাবাবু রাস্তাঘাটের খরচ দিয়ে দিয়েছে। ফিরে এলে বাকি টাকা দিয়ে দেবে। ফেরার সময় বাসে করে ফিরবে। তার ভাড়াও দিয়ে দিয়েছে।

চালিতে সকলেই উঠল। মগাই খালিহাতে। লোকেন চেঁচাল—বদর গাজি বদর গাজি। নমস্কার করে নদীর জল চারপাশে ছিটিয়ে দিল। মগাই লগি জলের নিচে ঠেকাল। হারু আর একটা লগি নিয়ে।

চালি পার ছেড়ে মাঝনদীতে নামছে। নদীর জলে বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে। আস্তে আস্তে চালি অনেকটা দূরে চলে গেল। লোকেন হাঁক দিল—সাবধান! যে যার সাবধান! যোগীঘোপার ঘাট একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। এখন আর ঘাট দেখা যায় না। লোকেন আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, বেলা অনেক হল। ভাত বসাইয়া দে।

খড়ি এনেছিস?

হারু রান্না করতে পারে ভালো। তাছাড়া ওর চলনে বলনে মেয়েলি স্বভাব। এইজন্য রান্নার ভার ওকে দেওয়া হয়েছে। হারু টিয়াপাখির মতো মুখটা বাঁকিয়ে উত্তর দিল, এনেছি।

পিটুলি বোধহয় চিঁড়ে কুটতে গেছে পাশের বাড়িতে। গোরুগুলোর অসুবিধা হবে। মা ঠিক মতন ঘাস দিতে পারবে না। পিটুলি তো নতুন। এই বাড়ির হাবভাব এখনও ভালো করে রপ্ত হয়নি।

হারু চেঁচাল, দেখে যাও, মাছ ধরেছি। লোকেন দেখল সত্যি তো, একটা বোয়াল মাছ। বেঁটে হলে কী হবে, হারু মাছ ধরতে ওস্তাদ।

লোকেন বলল, মাছটা রান্না করো।

তাকিয়ে দেখল ভাত বসিয়েছে নিতাই। ছইয়ের নিচে গিয়ে জিনসপত্র আবার ভালো করে দেখে নিল সব ঠিকঠাক এসেছে কী না। এতগুলো লোক নিয়ে যাত্রা, কম কথা নয়। সংসার তো বটে। রামদাটা নিয়ে কোণার দিকে রাখল। দড়িগুলি গুছিয়ে রাখল।

লোকেন দেখল হাওয়া সত্যি আছে। নদীর ঢেউ উথাল পাতাল। নদীর ঢেউ আছড়ে পড়ছে, মগাই লগি রেখে বৈঠা নিয়ে নিশানা ঠিক রাখার চেষ্টা করছে, যাতে একদম নদীর মাঝখানে না যায়। কিনার কিনার দিয়ে চলাই ভালো। নদীতে অশান্ত ঢেউ চালির গায়ে আছড়ে পড়ছে। চালি হেলছে। চালি দুলছে।

বউ এখন স্নান করে রান্নাঘরে। বউ খুব দুঃখ পেয়েছে। আসতে বারণ করেছিল। কচি বয়েস। ওর তো শখ-আহ্লাদ আছে। ফেরার সময় ভালো দেখে একটা মেখলা কিনে নিয়ে যাবে হাট থেকে। সামনেই তো বিহু। মার জন্য একটা শীতের চাদর। হারু চেঁচাল, স্নান করে নে। রান্না হয়ে গেছে। বালতির সঙ্গে দড়ি লাগানো আছে। জলের মধ্যে সেই বালতি ফেলে দিয়ে জল তুলে আনছে হারু। স্নান করে খেতে দিতে হবে সবাইকে।

মগাই জল ঢালতে ঢালতে গান গেয়ে উঠল।

...আমি যাই বিদেশ, বিহুতে আসব। তোমার জন্য আনব খোঁপার ফুল গো। বিদঘুটে চেহারা লোকটার কিন্তু গলাখানা সুরেলা। গান যখন গায়, অবাক হয়ে সকলে শোনে।

যোগীঘোপা অনেকদূরে ফেলে এসেছে। মা গোরুগুলি সামাল দিতে পারছে কি! পিটুলি নিশ্চয়ই চুপিচুপি রান্নাঘরে কাঁদছে। পাগলি কোথাকার? কীসের ভয়! বিদেশে লোক কম যাচ্ছে নাকি?

হই হই করে খাওয়া হল। আহা! কী স্বাদ! টাটকা মাছের ঝোল। মুখে লেগে আছে। সতু চেঁচাল, হুক্কা এনেছিস?

লোকেন উত্তর দিল, হ্যা, সব এনেছি।

বিড়ি পান-সুপারিও আছে। কিছুই ভুল হয়নি। খাওয়ার পর ছইয়ের নিচে শুয়ে পড়ল সবাই। সূর্য মাথার ওপরে। ভয়ানক তার তেজ। আকাশের দিকে তাকানো যায় না। নীল আকাশে সাদা সাদা মেঘগুলো ভেসে যোগীঘোপা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। লোকেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ধড়মড়িয়ে উঠল হারুর ডাকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কালো মেঘের ছায়া। এই একটু আগে কী রোদ্দুর। দুই-এক মিনিটের মধ্যেই সব পালটে গেল। পিটুলিকে নিয়ে মধুর স্বপ্ন দেখছিল সে। স্বপ্ন আর শেষ হল না। মুহূর্তের মধ্যে আকাশ কালো হয়ে গেল। গুমোট গরম। বাতাস থমকে গেল। তার মানে সামনে বিপদ। ঝড় আসতে পারে। লোকেন বলল, যে যার দড়ি দিয়ে কোমরে বাঁধো। বলার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ যেন কালো হয়ে চালিতে নামল। কী রকম ঠাণ্ডা বাতাস ছাড়ল। জল কাঁপছে। যা ভাবা গিয়েছিল, ঝড় উঠল। প্রচণ্ড ঝড়। নদীর ঢেউ সাপের ফণা তুলে আসছে। সাংঘাতিক! চালিটা অনেকটা উঁচুতে উঠে ধপাস করে নামল। আবার উঠল। জল ছিটকে চালির ওপরে আছড়ে পড়ল। ঢেউ যেন হাজার হাজার ফণা তুলে নাচছে। লোকেন, মগাই, ভোলা ওরা হামাগুড়ি দিয়ে চালি ধরে বসে আছে, মনে হচ্ছে এক্ষুনি ওদের জলের নিচে তলিয়ে যেতে হবে।

জল কালো, জল কাঁপছে। হিজল গাছের সমান জলের ঢেউ। একবার উঠছে, একবার পড়ছে। এ যে ঘূর্ণিঝড়! সর্বনাশ, এখন কী হবে! বাতাসের সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল বৃষ্টি। জলের মধ্যে বৃষ্টির তুবড়ি ফুটছে। কী শব্দ তার! বৃষ্টির জলে চারপাশে আবছা ধোঁয়া। কাগজের নৌকার মতো এতবড়ো চালিটা দুলছে। এক্ষুনি বুঝি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আকাশ ফেটে বৃষ্টি। মনে হয়, পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে। বউ-এর কথা শোনেনি। মাও বারণ করেছিল। বাপ ঠিক এমনি ঝড়ের তালে নিজেকে ঠিক না রাখতে পেরে জলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। আর উঠতে পারেনি।

আবার বাজ পড়ল। যেন আকাশ ভেঙে যাচ্ছে। মগাইকে ডাকল লোকেন।

মগাই কাঁপছে। সারা শরীর জলে ভেজা।

কেউ আর বাইরে নেই।

সকলেই ছই-এর নিচে।

চালি থেমে নেই—চলছে।

কেউ কোনও কথা বলছে না।

ঠকঠক করে কাঁপছে। নদীর পার দেখা যায় না।

এতক্ষণ নদীতে দুই একটা নৌকা ও লঞ্চ দেখছিল। ওরা নদীর কিনারে ভিড়িয়েছে। চালিটাকে এখন ভেড়ায় কী করে। তবু লোকেন বলল—চালি কিনারে লাগা।

মগাই সেই কথামত বৈঠা ঘোরাতে শুরু করল। কিন্তু যা ঢেউ। কিনারায় যাওয়া অসম্ভব।

ভোলা পড়ে গেছে, চিৎকার করে উঠল হারু। ও একটু কমজোরি, ওকে নিয়েই ভয় ছিল। লোকেন ছুটল। ভোলা মোটা বলে ডবল দড়ি দিয়ে বাঁধা। কোনও রকমে টেনে তুলল চালিতে।

বৃষ্টির ফোঁটা বিশাল। বৃষ্টি থামছে না। হাওয়া একটু কমেছে। এক সময় বৃষ্টিও কমল। লোকেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল—কাপড় পালটিয়ে ফ্যাল তোরা।

মগাই গান গেয়ে উঠল—রঙ্গিলা বিহুরে। আকাশে সূর্য নেই। তার ফলে সন্ধ্যা নামতে আর বেশি দেরি নেই।

লোকেন বলল, হ্যারিকেনটা ঠিক কর। জলের সঙ্গে চালিও চলছে।

বেশ ক-দিন হল বাড়ি ছাড়া। এই ঝড় যদি গ্রামেও হয় তাহলে তো মা-বউ ভীষণ চিন্তা করবে। সামনেই কোনও বাজার পেলে ভিড়াবে। চিঠি লিখবে। ভালই আছে। কোনও চিন্তার কারণ নেই। ফিরতে আর বেশি দেরি নেই।

ঘুটঘুট্টি অন্ধকার নিয়ে রাত্রি নামল। মগাই দোতারা নিয়ে গান করতে বসল। লোকেন নিজের বালিশটা নিয়ে একটু কাত হল। পিটুলির কথা তক্ষুণি মনে হল। বিছানা পরিষ্কার না করে কিছুতেই শুতে দিত না। বলত—অসভ্য কোথাকার! মাটি পা নিয়ে বিছানায়, একটু সবুর সয় না।

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠত।

মগাই-এর গান শুনতে শুনতে এক সময় লোকেন ঘুমিয়ে পড়ল।

দশ-বারোদিন হয়ে গেল বাড়ি ছেড়েছে। পিটুলি নিশ্চয়ই পথের দিকে তাকিয়ে আছে। কীভাবে সংসার চলছে কে জানে!

জগনা জল মাপছে। একটা লোহার বল দড়ির মাথায় লাগানো। হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেক দূরে ছুঁড়ে দিচ্ছে আর বলছে, এক বাঁও মেলে, দুই বাঁও মেলে না। সুর করে বলতে বলতেই জগনা চিৎকার করে উঠল। এক বাঁও মেলে। তার মানে মাটিতে ঠেকেছে লোহার বল। নদীতে চড়া পড়েছে। হারু চেঁচাল, জলপরী!

কোথায়!

ওই তো বসে আছে।

লোকেন বলল, কোথায়, দেখি।

হারু চোখটা মুছে নিয়ে আবার তাকাল, বলল, কোথায় গেল, ওখানেই তো ছিল।

লোকেন বলল, সব মনের ভয়। মাথা ঠাণ্ডা করে ওরা তাকিয়ে দেখল সত্যি কিছুই নেই। মগাই দোতারাটা রেখে সামনে গেল। ঝপ করে জলের মধ্যে কী যেন একটা পড়ল। আর অমনি মগাই লাফ দিয়ে উঠল। সাপ.. সাপ..!

লোকেন হতভম্ব। ভূত, সাপ—এসব কী!

পিটুলি মানা করেছিল। মা মানা করেছিল। এসব অলুক্ষুণে কী সব দেখছে। লোকেন বলল, আর একটা হ্যারিক্যান লাগা।

চারপাশে শুধু জল আর জল।

জেলে নৌকা, স্টিমার, লঞ্চ কিছুই নেই। মাঝে মাঝে দু-একটা কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছে। মাছ ভেসে যাচ্ছে। ঘরের চালও ভাসছে। প্রচণ্ড ঝড়ে সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেল। ভাঁটার সময় না গেলে জোয়ারের সময় যাওয়া যাবে না। এই জন্য চালি নোঙর করতে বলেনি। আবার যেন গুমোট গরম। সহসা হাওয়া কমে গেল। দূরে

একটা শুশুক ভেসে উঠল ভস করে। কুমির না এলেই হয়! না, এত গভীর জলে কুমির থাকে না। মগাই ঝট করে এক বালতি জল নিয়ে মাথায় ঢালল।

কীরে! এই রাত্রিবেলা জল দিচ্ছিস? সর্দি লাগবে যে!

ভূতের বউ দেখলাম, সিনান করব না।

ভূতের বউ দেখলে বুঝি সিনান করতে হয়?

হো হো করে সকলে হেসে উঠল।

হালুয়া বলল, কীসের গন্ধ পাইরে?

সকলেই বলল, সত্যি তো! দেখ তো!

লোকেন একটু এগিয়ে দেখল একটা মরা মহিষ চালির সঙ্গে আটকে রয়েছে। বিশ্রী গন্ধটা ওই শবের।

লোকেন বলল, মগাই, লগি দিয়ে মহিষটাকে দূরে সরিয়ে দে।

মগাই লগি দিয়ে যেই ঠেলা দিয়ে সরাতে গেল, ধপাস করে জলের মধ্যে পড়ে গেল। জলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। উঠতে পারছে না। কোমরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। মগাই সাঁতার কাটছে। মগাইকে তুলতে গিয়ে মন্টুও পড়ে গেল। চিৎকার করে উঠল—গেলাম গেলাম!

লোকেন এসে ওদের দু-জনকে টেনে তুলল। ওরা ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে, হাঁপাচ্ছে। হারু শেষ পর্যন্ত মহিষটাকে স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়ে দিল।

আবার বাতাস ছাড়ল।

হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি।

শিলও পড়ছে বেশ বড় বড়। বাঁশের চালিতে দপদপ শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ চালিটা শোঁ শোঁ করে ঘুরে যাচ্ছে যে! এ কী সর্বনাশ। ঘূর্ণি! ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেছে। বোঁ বোঁ করে মাথা ঘুরছে। লোকেন চিৎকার করে উঠল—সাবধান। সাবধান!

ঢেউয়ের জল চালির ওপরে ভেসে যাচ্ছে। অনেক জিনিসপত্র জলের সঙ্গে তলিয়ে গেল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে মুলি বাঁশ ভাঙছে। ছই, কাত হয়ে ঘুরে গেল। ওরা তখন বাঁচার জন্য যুদ্ধে নেমেছে। চালিটা গুঁড়িয়ে না যায়। ওরে আটকা চালিটাকে। এখানে লগি মার, ওখানে ঠ্যালা দে। মৃত্যুকে ঠেকা!

লোকেন চিৎকার করে উঠল, মগাই! মগাই! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দাঁড়াতে পারছে না। সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরছে। সঙ্গে এলোপাথাড়ি হাওয়া, বৃষ্টি। লোকেন দেখল পিটুলি কাঁদছে। মা কাঁদছে। হা, কি করবে এখন সে! চোখে ধাঁধা লাগছে। হ্যারিকেনটা দপদপ করে নিভে গেল। জিনিসপত্র সমস্ত কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। হঠাৎ ধলা একটা লগি নিয়ে জলে ঘাই মারল, কিন্তু তল পেল না। মট মট করে লগিটা ভেঙে গেল।

চালিটা ঘুরতে ঘুরতে নদীর মাঝখানে চলে এসেছে। চালিটা কাত হয়ে মড় মড় করে কিছুটা ভেঙে খুলে গেল। বিশাল ঢেউ! জল আছড়ে পড়ছে। একেবারে জলের নিচে চলে যাচ্ছে। শেষের দিকে একদম খুলে গিয়ে দুমড়ে মুচড়ে গেল। কোনওরকমে চালিটা কাত করে ঘূর্ণি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। লম্বা বলে গিলে ভিতরে নিতে পারছে না তাকে। শোঁ শোঁ শব্দ। চালিটা ভেঙে যাচ্ছে। মগাই একটা মোটা দড়ি দিয়ে প্রাণপণে বাঁধবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। ছাড়বার পাত্র নয় মগাই। দু-জনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। বাঁধন দিতে পেরেছে সে চালিতে। আহ, রক্ষা হল, রক্ষা হল। দেখা যাক কে জেতে। আর একটু। আর একটু! বুক ফেটে যাচ্ছে, কবজি ছিঁড়ে যায়। ছেড়ো না জোয়ান। আ! পারছে সে।

লোকেন বলল, ভয় নেই। আর ভয় নেই। সাবাস।

বৃষ্টি একটু কমেছে।

হাতকাটা কালা জল মাপার জন্য দড়ি ছুঁড়ে দিল। সুর করে বলল—এক বাঁও মেলে, দুই বাঁও মেলে না।

তার মানে সামনেই চড়া। বাঁচা গেছে। ঘূর্ণি থেকে বেরিয়ে গেছে। চালিটা চড়ায় কাত হয়ে আটকে গেল। লোকেন বলল, নোঙর ফ্যাল।

হারু জলের মধ্যে ঝাঁপ দিল। কোমর সমান জল। কোনদিকে এসেছে কে জানে। নদীর মাঝখানে যে চড়া তা বোঝাই যায়নি। মগাই, হারু, ভোলা ভোঁদরের মতো অন্ধকারে স্নান করছে। লোকেন ভাবল পিটুলি নিশ্চয়ই একা একা এখন স্নান করছে পুকুরঘাটে। আর তো মাত্র ক-টা দিন।

জগনা চিৎকার করে উঠল—নৌকা। মগাই ঝপ করে জলের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখল, সত্যি নৌকা, না ভূত।

মগাই ডাকল—আয় তো নৌকাটা তুলি। ওরা সকলে মিলে নৌকাটা তুলল। দুজনে গলুই মাথায় উঁচু করে ধরল, একজন নৌকার জল সেঁচতে লাগল।

জল সেঁচতে সেঁচতে হঠাৎ দেখল একটা মানুষের কঙ্কাল। ভয় পেয়ে পড়ে গেল। হারু বুদ্ধি করে নৌকাটা চালির সঙ্গে বেঁধে রাখল, যাতে ভেসে না যায়। বলল, এই নৌকায় বাড়িতে ফিরব। লোকেন দূরে দাঁড়িয়ে নৌকা তোলা দেখছিল, হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল আকাশ ফরসা হচ্ছে। ধ্রুবতারা দেখা যাচ্ছে। তার মানে ভোর হতে আর দেরি নেই।

আবছা আলো জলে চিকচিক করছে—বাতাসের তালে তালে নাচছে।

পুবদিকে লালের আভা।

লোকেন জলের দিকে তাকাল। শুধু জল আর জল। পার দেখা যায় না। অনেকক্ষণ তাকাবার পর বলল, হে-ই-ই! এসে গেছি। এসে গেছি। লোকেনের কাছে সবাই এসে দাঁড়াল। দূরে দেখা যাচ্ছে গোয়ালঘাট। মগাই জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল খুশিতে, সাঁতরে উঠল নৌকাটায়। হঠাৎ নজরে এল কঙ্কালটার হাতে বালা, গলায় সোনার হার। ওর পিছন পিছন লোকেন এল। বাবার কঙ্কালটাও বোধহয় জলের নিচে কোথায় পড়ে রয়েছে। মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। কোনও বাড়ির বউ হয়তো সেজেগুজে নৌকায় যাচ্ছিল বিহু উৎসবে নাচতে।

ধলার ভয়ডর নেই। ওর চোখমুখ দেখেই বোঝা যায় ও ভীষণ লোভী। হার বালা খুলে নিয়ে নিজের লুঙ্গিতে রাখল। লোকেন সব দেখল কিন্তু কিছু বলল না। পিটুলির কথা মনে পড়ল। ওকে নিয়ে একবার যাচ্ছিল নৌকায়, সে কী ভয় তার! ঢেউ দেখে ধলা হার ও বালা ছইয়ের নিচে রাখল। লোকেন এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে গয়নাগুলি নিয়ে জলের মধ্যে ফেলে দিল। মগাই চিৎকার করে উঠল—ফেললি ক্যান?

বলেই নদীতে ঝাঁপ দিল। মগার দেখাদেখি ধলা হারুও নদীতে ঝাঁপ দিল। লোকেন হা-হা করে হাসতে শুরু করল। কিন্তু তার চোখ বেয়ে জলের ধারা নামছে।

হঠাৎ জলের দিকে তাকিয়ে দেখল ভাঁটার টান শুরু হয়ে গেছে— চেঁচিয়ে উঠল, বদর গাজি—বদর।

আওয়াজ শুনে জল থেকে ওরা তড়িঘড়ি করে চালিতে এসে উঠল। চালির মুখ ঘুরল গোয়ালঘাটার ঘাটের দিকে।

টান

শঙ্কর সেনগুপ্ত

রাত এখন ক'টা হবে? একটা, দুটো কিম্বা তিনটে। মলিনা সময় কত ঠাওর করতে পারে না। বেশ খানিকক্ষণ হলো ঘুম ভেঙ্গে গেছে। আজকাল প্রায়ই এমন হয়। ঘুম গাঢ় হয় না। একরাতে দুবার তিনবার ঘুম ভাঙে। আসলে মনে শান্তি নেই। পাশে সুধাময় ঘুমোচ্ছে। সুধাময়েরও ঐ অবস্থা, একবারে রাত ভোর হয়না। সুধাময়ের অবস্থা আরো বেশি খারাপ। কতবার যে ঘুম থেকে ওঠে! মলিনা চোখ বন্ধ করে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করে, না কোনমতেই ঘুম আসছে না। থেকে থেকেই সুজয়ের মুখটা ভেসে আসছে। একগাল দাড়ি হয়েছে। শরীর ক্রমশঃই রোগা হচ্ছে, মাথার চুলেও কিছু কিছু রুপোলী রেখা। অথচ মলিনার শান্তি না থাকার কোনই কারণ ছিল না।

সুধাময়-মলিনার তিন সন্তান। বড় অজয়, কৃতী ইঞ্জিনিয়ার, বোম্বের মেরিন ড্রাইভে বিরাট ফ্ল্যাট নিয়ে আছে। ছোট নিলয়, সেও কলকাতার এক প্রাইভেট কোম্পানির এ্যাকাউন্টসের হর্তাকর্তা-বিধাতা। নিলয় নিউ আলিপুরে বিরাট ফ্ল্যাট নিয়ে আছে।

সুধাময় ছিল এই মফঃস্বল শহরের এক উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের অঙ্কের মাস্টার। সুধাময়-মলিনা দারিদ্র্য কী, জানে। কত কষ্ট করে ছেলেদের বড় করে তুলেছে। সুধাময় মলিনার কোনই কষ্টই থাকার কথা নয়। অজয়-নিলয় কী তাদের মা-বাবাকে দেখে না! না তা নয়; মলিনা ভাবে ছেলেদের ঐ দোষ দেওয়া যায় না। মাস শেষ হবার আগেই পিওন ডাকাডাকি আরম্ভ করে। ছেলেরা চায়ও—মা-বাবা তাদের কাছে এসে থাকুক।

মলিনা সুইচ টিপে আলো জ্বালে। মশারি থেকে সাবধানে বেরিয়ে আসে—যাতে মশা না ঢুকতে পারে এবং সুধাময়ও জেগে না উঠে। টেবিলে-রাখা জলের কেটলি থেকে ঢক্‌ঢক্ করে জল খায়। দরজাটা খুলে বাইরে যায়। আবার ভিতরে আসে। সুধাময় একদিকে কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে। হালে ওর শরীরটা ক্রমশঃই দুর্বল ও ভেঙে পড়েছে। খালি সুজয়ের কথা ভাবে মলিনা, সুধাময়ের ভগ্নচেহারার দিকে তাকিয়ে নিজের ভগ্ন চেহারার কথা ভেবে একটু ম্লান হাসে। সুইচটা অফ করে ঘরটা অন্ধকার করে খুব সন্তর্পণে বিছানায় উঠে আসে ও সুধাময়ের পাশে শুয়ে পড়ে। মলিনার সতর্কতা সত্ত্বেও সুধাময়ের মাথায় হাত লেগে যায়—সুধাময় জেগে যায়।

সুধাময় জেগে বুঝতে পারে, মলিনাও জেগে। হাত দিয়ে মলিনাকে স্পর্শ করে। আস্তে আস্তে বলে—জেগে আছ? মলিনার নিজের উপর রাগ হয়। ওর অসাবধানতার জন্যই সুধাময় জেগে গেল। মলিনা উত্তর দেয়—অনেকক্ষণ। সুধাময় অল্প করে হাসে, মলিনা হাত দিয়ে সুধাময়ের মাথা স্পর্শ করে—ওর কপালে ও মাথায় হাত বুলোতে থাকে। সুধাময় বলে—খালি আমাকে বলো—নিজে যে জেগে বসে আছ? কাল থেকে তুমিও একটি করে কামপোজ খেয়ে শোবে।

একটি চাপা হাসি মলিনাকে পায়—কিন্তু হাসে না, কারণ সুধাময়কে লুকিয়ে কামপোজ ও অনেকদিন আগে থেকেই খাচ্ছে। রাস্তায় কতকগুলো নেড়ী কুকুর ক্রমাগত চিৎকার করছে। সমস্ত পাড়াটা নিঃঝুম। ঘরটায় অন্ধকার থিক্‌থিক্ করছে।

সুধাময়ের চিন্তায় উনিশশো ছেচল্লিশ—এই ঘরটায় এসে উঠেছিল। এখন উনিশশো সাতাত্তর। তিরিশ বছর কাটিয়ে দিল এই বাড়ীটায়। দুটো ঘর ছিল। একটি ঘরে ও আর মলিনা আর পাশের ঘরটায় অজয়-সুজয়-নিলয়। ভাড়া খুবই অল্প ছিল। বাড়িটির কতকগুলো অসুবিধে ছিল। বিশেষ করে ছাত্ররা এসে যখন পড়তো—তখন জায়গার অভাব প্রকট হয়ে উঠতো। যাক্ বাড়ীটা আর ছাড়া যায় নি।

আজ যে কোন মুহূর্তে ছেড়ে দিতে পারে। এখানে থাকার কোনই প্রয়োজন নেই। অজয় কিম্বা নিলয়ের কাছে গিয়ে থাকা যায়। কিন্তু মলিনা—মলিনা কেন পাকাপাকিভাবে থাকতে চায় না?

—আচ্ছা মলিনা—অজয়-নিলয়ের ওখানে পাকাপাকি থাকতে চাও না কেন? তাতে কি ভাল হয় না আমাদের পক্ষে? ওরাও যখন এত করে চাইছে। আর তাছাড়া শরীর তো ক্রমশঃই আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে।

মলিনা শোনে এবং বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। মলিনা মনে মনে হাসে—সুধাময়ের জন্য কষ্ট হয়। মলিনা ভাবে কষ্টটা কার বেশি—ওর না সুধাময়ের, হাঁপিয়ে উঠে—কে বেশি, সুধাময় না মলিনা?

মলিনা চুপ করে থাকতে সুধাময় বলে, অজয় বা নিলয়ের বৌ কি কখনও তোমাকে অসম্মান বা অবহেলা করেছে? বড় বা ছোট বৌমা আমার তো মনে হয়, কেউই খারাপ নয়। আমরা পাকাপাকিভাবে থাকলে ওরা কেউ অসুখী হবে, আমার তা মনে হয় না। দুজনেই বেশ দায়িত্বশীল। আমরা এখানে একা থাকি, ওদেরও দুশ্চিন্তা থাকে। অজয় তো এবার বলছিল ঃ বাবা—আপনারা কি ঐ মফঃস্বল শহরটার মায়া কাটাতেই পারবেন না? কোন্ আকর্ষণে পড়ে আছেন?

মলিনা শোনে—চুপ করে শোনে—ঘরটার মধ্যে অন্ধকার যেন আরো ঘনীভূত—মলিনা সুধাময়কে দেখার চেষ্টা করে, বাইরে নেড়ী কুকুরগুলি চেঁচায় অবিরাম। মলিনা চুপ করে থাকে। সুধাময় বোঝে না। মলিনা কি ঘুমিয়ে পড়লো? কি গো ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

—না, ঘুম আসে কই—মলিনা উত্তর দেয়।

সুধাময় আবার শুরু করে ঃ ওরা কিন্তু বেশ সুখেই আছে। অজয় ও নিলয় দুজনেরই আরো বড় প্রমোশন হয়েছে। আচ্ছা—অজয় কি বোম্বেতে জমি কিনেছে বা কিনবে—এরকম কিছু কি তোমাকে বলেছে?

—না, আমায় সেরকম কিছু বলে নি—তবে বড় বৌমা বলছিল—মা, এখানে জমি রাখলে কি রকম হয়।

—তা, তুমি কী বললে?

মলিনা পাশ ফিরে শোয়, চাদরটা গা থেকে অল্প একটু সরিয়ে দিয়ে বলে ঃ আমি আর কী বলবো? বললাম তোমাদের পছন্দ হলে কিনবে।

সুধাময় মলিনার আপাত নিরুৎসাহের কারণটা পুরো বুঝতে পারে না—ওরা কিন্তু এখন বেশ সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে আছে। অজয়ের নতুন গাড়ীটা বিদেশী, নিলয় যে গাড়ীটা কিনেছে সেটাও নাকি বিদেশী। অজয় বেশ কয়েকদিন আমাকে নিয়ে গাড়ীতে বেড়াতে চেয়েছিল। তুমি তো জানো এই রকম ছিপছিপে গাড়ীতে চড়তে আমার কি রকম অস্বস্তি! একদিন বেরিয়েছিলাম অজয় দুঃখ পেতে পারে ভেবে। জানো অজয়-নিলয়ের বাড়ী গেলে একটি কথা কেবলই মনে হয়।

—কী মনে হয়?

সুধাময় চুপ করে থাকে। মলিনা অস্ফুট কণ্ঠে বলে ঃ কী হলো—কী মনে হয়?

আসলে ওদের ঘরদোর, বাড়ী, হালচাল সমস্ত কিছু দেখলে মনেই হয় না অঙ্কের মাস্টার সুধাময় করের ছেলে ওরা। আমার নিজেরই বিস্ময় লাগে—এই ছেলে দুটি যে এই পাশের ঘরটায় মানুষ হয়েছে, মনেই হয় না।

মলিনার কষ্ট লাগে সুধাময়ের জন্য। অন্ধকারেও একটু ম্লান দুঃখের হাসি মলিনার ঠোঁটে ঝিলিক মারে। মলিনা যদিও সুধাময়ের কথা শুনছিল, আসলে মন ছিল সুজয়ের চিন্তায়। সুজয় এখন কলকাতায়—একটা পরিত্যক্ত নির্জন সেলে—একই ঘরে পেচ্ছাপ, পায়খানা, শোওয়া-বসা, দিন রাত্রি দিন। দীর্ঘ সাত বছর হলো সুজয় এই সেলের মধ্যে। সুধাময় জিজ্ঞেস করে —আচ্ছা তোমার কি কিছু মনে হয় না?

মলিনা সুজয়ের ভাবনায় আবদ্ধ, তবু উত্তর দেয়—তুমি তো এই চেয়েছিলে।

মলিনার উত্তরে সুধাময় একটু বিরক্ত হয়। মলিনা চুপ থাকে না ঃ অজয়-নিলয়ের ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় বাপের ড্রাইভ-করা গাড়ী চড়ে, আর ওরা নিজেরা যেত এখান থেকে পায়ে হেঁটে, আর তুমি কী ভাবে যেতে?

সুধাময় বলে ঃ আমি কীভাবে যেতাম—তা বলছি, কিন্তু তুমি যে বললে আমি এটা চেয়েছিলাম, সেটা ঠিক নয়। মলিনা বোঝে, সুধাময়ের দুর্বল জায়গায় ঘা লেগেছে। মলিনা চুপ করে থাকে। সুধাময় বলতে থাকে ঃ আমি স্কুলে দু'গ্রাম পেরিয়ে খালি পায়ে হেঁটে গেছি। পরের বাড়ীতে গোয়াল ঘর ও বাচ্চাদের দেখাশোনা করে বড় হয়েছি। দারিদ্র্য কী, তা ভালভাবে জেনেছি। লাঞ্ছনা কী, তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। তুমি সাথী হয়ে আসার পরও সেটা দেখেছ। তারপর অজয়, সুজয়, নিলয়, তারই কয়েক বছর পর সাতচল্লিশের ধাক্কা। এসে পড়লাম এই শহরে আর এই বাড়ীতেই। দারিদ্র্য, অপমান, লাঞ্ছনা কাকে বলে আবার নতুন করে বুঝলাম, তুমিও বুঝলে। ভেবেছিলাম, ছেলেগুলিকে মানুষ করতে হবে।

মলিনা ফোড়ন কাটে—ছেলেগুলিকে বোঝালে, লেখাপড়া শেখে যে গাড়ীঘোড়া চড়ে সে। অজয় ও নিলয় তোমার কথা পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করলো, বুঝলো না সুজয়।

মলিনা চুপ করে যায়। সুধাময়ও চুপ। সুধাময় বোঝে, মলিনা ভেতরে কতখানি উত্তেজিত—অবশ্য সুধাময় নিজে আরও বেশি, তবে সুধাময় নিজেকে সংহত করতে পারে। মলিনাও অনেক সময়ই সংহত, তবে সুধাময়ের কাছে সংহত থাকতে চায় না—কারণ ওর তো ওই একটিই জায়গা।

অন্ধকারে সুধাময় মলিনার কপালে হাত বোলায় ঃ মলিনা,—সুধাময় অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করে—তোমার বয়স কত হলো? বাইরে নেড়ি কুকুরগুলো তারস্বরে চিৎকার করছে—কারা যেন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেল। মলিনা পাল্‌টা প্রশ্ন করে ঃ তোমার কত হলো?

—বাহাত্তর।

—আমার উনসত্তর।

আবার চুপ—এবার অনেকক্ষণ। সুধাময় মলিনার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—ঘুমোবার চেষ্টা করো।

—মনে হচ্ছে আর ঘুম আসবে না। মলিনা চাদর গায়ের উপর থেকে সরিয়ে ফেলে দেয়। অন্ধকারে সুধাময়ের গলার স্বর আবার কাঁপতে থাকে ঃ নিউ আলিপুর বা বোম্বে তোমার বেশিদিন ভাল লাগে না—সেটা আমি বুঝি।

মলিনা চুপ থাকে না। —অজয় নিলয় সুখে আছে—এর থেকে আমাদের আর বড় শান্তি কী হতে পারে, কিন্তু কেন জানি ওখানে গিয়ে আমি শান্তি পাই না। ওরা চায় থাকি—এমন

কোন অবহেলাও নয়। আসলে ওদের জীবনটাই যেন কীরকম হয়ে গেছে। অজয়, নিলয় যদিও বরাবর হিসেবী, কিন্তু এখন যেন অনেক অনেক বেশি মাপা। এগুলো যে আমারই গর্ভের, তা ভেবে মাঝে মাঝে অবাক লাগে।

—কেন তোমার তো গর্ব হওয়া উচিত।

মলিনা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলতে থাকে—জানো, অজু রোজ সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে নিজে গাড়ী চালিয়ে ছেলেমেয়ে দুটিকে স্কুলে দিয়ে আসে—এর মধ্যে বৌমাও তৈরী হয়ে নেয়। আমার বড় ছেলের বউ, সেও নাকি এক বিরাট অফিসার। তারপর সাড়ে ন'টার মধ্যে অজু ও বৌমা বেরিয়ে যেত। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিদায় দিতাম—কিন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস, মাঝে মাঝেই বুকের মধ্যে ঝড় হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইত—অথচ আমাকে আটকাতেই হতো—যেন তেন প্রকারে। আমারই সন্তান, আমার দীর্ঘশ্বাসে যদি ওর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়—তা কোনরকমেই হতে পারে না। কিন্তু সুজয়ের কী দোষ? সুজয় কীসে কম ছিল? মেরিন ড্রাইভের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবতাম, সুজয়ের পরিত্যক্ত সেল—অসহ্য পরিস্থিতি! আমাকে মাঝে মাঝেই বলে—জানো মা —বেশি গরম পড়লেই কষ্ট হয়। তখন গামছাটা ভিজিয়ে না রাখলে থাকা যায় না। আর অজয়! আমি একটা মাস থাকলাম বোম্বেতে। বৌমার কথা বাদ দিই—ওতো আর সুজয়কে দ্যাখেনি—অজয় ভুলেও সুজয়ের কথা আমার কাছে বলল না।

মলিনার কান্না বাঁধ ভেঙে ফেলে। বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে উঠে। সুধাময় থামায় না—অন্ধকারে মলিনার গায়ে হাত রাখে। ওর চিন্তায় এখন সুজয়। ওর তিন ছেলের মধ্যে সুজয়ই ছিল সবচেয়ে বেশী ব্রিলিয়ান্ট। অজয় যখন এই শহরের পড়া শেষ করে খড়গপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেল, তখন সুজয় না থাকলে? সুধাময় বুঝতো, ওর ট্যুইশানি করা—কষ্ট করে সংসার চালানো—এ সবই সুজয়ের কাছে অসহ্য ছিল। অজয় যখন খড়গপুরে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তখন সুজয় কলেজের প্রথম বর্ষে। আর নিলয় ক্লাশ টেনে। সুজয় নিজের পড়াশুনা খুবই কম করতো—সারাটা সকাল বেশ কয়েকটা ট্যুইশনি করতো আর অন্যদিকে কলেজ ইউনিয়ন। সুধাময় ভাবে—প্র্যাকটিক্যালি সুজয়ের ট্যুইশানির টাকায় অজয়ের হোস্টেলের খরচ পাঠানো হতো। আর অজয় তো সেটা জানতো। আর একমাসে অজয়ের সময় হলো না ভায়ের কথা মুখ ফুটে মাকে জিজ্ঞেস করার।

একটা দুঃখবোধ সুধাময়কে কাঁপাতে থাকে। সুজয় ছিল অন্য ধাতের—সুধাময়ের কথা শুনতো না। মলিনা এখন কান্না থামিয়েছে। রাত এখন তৃতীয় প্রহর। পাড়ায় এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার চোখে ঘুম নেই। আশেপাশের সমস্ত বাড়ী গভীর নিদ্রায় ভাসছে। মলিনার বেশ গরম লাগছে।

বাবা মা'র গরম লাগে, তাই অজয় বোম্বে থেকে দামী নেটের মশারি কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই ধরনের মশারীতে শোওয়া সুধাময়-মলিনার অভ্যেস নেই—অবশ্য ছেলেদের বাড়ী গেলে অন্য কথা। কিন্তু এই ঘরে এই মশারির মধ্যে ওরা শুয়েছিল, মনেই হয় নি এটি একটি মশারি। কী সুন্দর ফ্যানের হাওয়া মশারির মধ্যে খেলছিল! কিন্তু রাত পুরোটা কাটে নি—দুটোর সময় মলিনা উঠে মশারিটা খুলে ফেলেছিল। সুধাময় বিরক্ত হয়েছিল আরামের ঘুম এইভাবে নষ্ট হওয়াতে। সুধাময় অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে—মলিনা নতুন মশারী গুটিয়ে রেখে অল্প দামের বহুব্যবহৃত মোটা মশারীটা বালিশের তলা থেকে টেনে বার করছে। মলিনার ব্যবহারে প্রথমটায় অবাক হয়েছিল। মলিনা মশারীটা টাঙিয়ে আবার শোয়—ফিস্‌ফিস্ করে বলে—কাল থেকে ও মশারি আর নয়।

—কেন, ও মশারিটা কী করল?

তুমি ছেলেটার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ নি। গত সপ্তাহে যখন দেখতে গেলাম—খেয়াল করেছিলে, ওর সারাটা গায়ে মশার কি বড় বড় কামড়। আমাকে বলছিল—মা, রাত্রের গরম আর মশা ছাড়া কোনটাই বিশেষ কাবু করতে পারে না।

সুধাময় চুপ হয়ে যায়। ওর মনে হতে থাকে—সত্যি, ও তো পিতা, মলিনার মাতৃস্নেহের কাছে ওর পিতৃস্নেহ যেন খালি খালিই পরাভূত হয়, আর শেখে।

সেই থেকে আবার সেই মোটা ও পুরনো মশারি। মলিনার এখন বেশ গরম লাগছে। মশারির বাইরে এসে আলোটা জ্বালায়। মশারিটা খুলে ফেলে। পাখাটা আরো জোরে চালায়।

আশেপাশের কেউ জানে না এখানে সুধাময় কর ও তার বৌয়ের চোখে ঘুম নেই। সুধাময়ও বিছানায় উঠে বসে। রাত তিনটে। মলিনা বাতি নেভায়—খাটে এসে সুধাময়ের পাশে বসে—জিজ্ঞেস করে—কী হলো, উঠে পড়লে যে?

আজ আর ঘুম আসবে না—জানো, একটি স্বপ্ন দেখলাম।

মলিনা চমকে ওঠে ঃ কী স্বপ্ন দেখলে? আমিও প্রথম রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি এবং স্বপ্নটা অদ্ভুত পরিষ্কার। মলিনা ব্যগ্র হয়ে উঠে। কী স্বপ্ন দেখলে?

সুধাময় মলিনার ব্যগ্রতায় অবাক হয় না। ও স্বপ্নটার কথা ভাবে। স্বপ্নটা মলিনাকে এই মুহূর্তে বলা ঠিক হবে কি! অথচ স্বপ্নটা তেমন কিছু নয়। এই রকম স্বপ্ন আরো দু' একদিন দেখেছে। সুধাময়ের ভাবনা আবার অন্যদিকে বইতে থাকে—সুধাময়-মলিনার উচিত নিলয়ের কাছে গিয়ে থাকা। কিন্তু মলিনার ঘোর আপত্তি। সুধাময় আবার ঐ প্রসঙ্গ তুলতে চায় ঃ আচ্ছা মলিনা, নিলয়ের কাছে গিয়ে থাকলে কেমন হয়—ওরাও তো আন্তরিক ভাবেই চায়, আমরা ওখানে গিয়ে থাকি।

মলিনা স্বপ্নটার ব্যাপারে ব্যগ্র ছিল। সুধাময় বিষয়ান্তরে যাওয়াতে ও বুঝল সুধাময় বোঝাপড়া করতে চাইছে, নয়তো স্বপ্নটার সম্বন্ধে বলতে চাইছে। কিন্তু সুধাময়ের বিষয়ান্তরে যাওয়ার ফলে মলিনার একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। এই কথাটাই ও অনেকক্ষণ ধরে মনে করতে চাইছিল, কিন্তু পারছিল না। মলিনা বিছানায় শুয়ে পড়ল। সুধাময় তখনও বালিশ কোলে নিয়ে বসে। মলিনা শুয়ে শুয়ে পাশে-বসা সুধাময়কে দেখতে দেখতে পুরনো সুধাময়ের কথা ভাবছিল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে ঃ আচ্ছা এবার গিয়ে যখন নিলয়ের বাড়ীতে ছিলে তখন কি কিছু হয়েছিল?

সুধাময় কেঁপে উঠে। কেন? মলিনা কেন ও কথা বলে। ওতো মলিনাকে এ ব্যাপারে ভুল করেও মুখ খোলে নি। ও কি কিছু জানতে পারলো? নিলয় বা ওর বৌ কি কিছু বলেছে? না, তা বলবে না। নিলয় জানে ওর মা কত অভিমানী। ইলেকট্রিক ফ্যান ক্রমাগত একটা বিশ্রী শব্দ তুলে চলতে থাকে। সুধাময় ভেবে পায় না, হঠাৎ কেন মলিনা এই প্রশ্ন করল। মলিনার শায়িত দেহটার দিকে তাকিয়ে বলে ঃ আচ্ছা হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?

মলিনা সুধাময়ের অস্বস্তিটা টের পায়। চাপা হাসির দমকে মলিনার দেহ কাঁপতে থাকে। এবার কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর একটা কথা অনেক দিন ধরেই ওর মাথায় ঘুরছে।

এবার গোড়া থেকেই দুজনে ঠিক করেছিল, সুধাময় কলকাতায় নিলয়ের কাছে মাস দুয়েক থাকবে আর মলিনা সেই সময়টা বোম্বেতে অজয়ের কাছে থাকবে। আর মলিনার যদি বোম্বে ভাল না লাগে তাহলে ও কলকাতায় চলে আসবে। এটাই ছিল সুধাময় আর মলিনার মনের কথা।

মলিনার বোম্বে মোটেও ভাল লাগছিল না। তবু ভেবেছিল, যে-সময়টা থাকবে ভেবে এসেছিল সেই সময়টা কাটিয়ে যাবে। কিন্তু মাস না যেতেই হঠাৎ কী হলো, কলকাতা থেকে সুধাময়ের চিঠি পেলো—চলে এসো, আমার এখানে ভাল লাগছে না। চলো, আমরা আমাদের ডেরায় ফিরে যাই। মলিনা তড়িঘড়ি করে কলকাতায় চলে এলো।

ট্রেন শেয়ালদা ছেড়ে ছোট মফঃস্বল শহরটার দিকে রওনা দিতে ঃ কী, ব্যাপারটা কী? প্ল্যানটা হঠাৎ ভেস্তে দিলে!

সুধাময় ট্রেনের জানলায় মুখ রেখে বাইরের অস্তগামী সূর্যের আলোয় মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল। ট্রেনের দুলুনিতে মলিনা সুধাময়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল কিছু শোনার আশায়। চিরদিনের চাপা, মলিনার কথা শুনলো অথচ না শোনার ভান করলো। মলিনা যখন একই কথা পুনরাবৃত্তি করল, তখন স্মিতহাস্যে মুখটা বাইরে থেকে সরিয়ে কামরার ভেতরে এনে বলল ঃ জানো, আমাদের জায়গাটাই ভালো। ওদের ওখানেও সব থেকেও যেন কীসের অভাব। তাছাড়া বুড়োবুড়ির পুরনো আবাসই ভাল।

মলিনা বুঝল, চেপে গেল, বলবে না। বুড়োর গোঁ আছে, যেটা মনে করে বলবে না, সেটা চট করে বলবে না। অনেক অনেকদিন পর হয়ত একদিন মুখ খুলবে। মলিনা শেষ রাতের এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না। সুধাময় মলিনার আকস্মিক প্রশ্নে একটু হতচকিত। স্বপ্নের ব্যাপারটা এড়াতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে যাবে ভাবে নি। একটা কাঁটা অনেকদিন ধরেই বিঁধে রয়েছে। মলিনাকে বলার জন্য ছটফট করেছে। বিশেষ করে মলিনা যখন বলল—অজয় একমাসে একবারও সুজয়ের কথা জিজ্ঞেস করলো না, সুধাময় অনেক অনেক কষ্টে সেদিন নিজেকে সংহত করেছিল, কারণ জানতো, তাতে মলিনা আরো ভেঙে পড়তো। কিন্তু আজ এই সময়ে মলিনা প্রশ্নটা তুলে সুধাময়কে অসহায় করে তুলল। সুধাময় অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। মলিনা বুঝল, বলবে। গোপন কোন কিছু বলতে গেলে ওই রকম অনেকক্ষণ চুপ করে থাকাই ওর স্বভাব। সুধাময় শুয়ে-থাকা মলিনার চুলে বিলি কাটতে থাকে—মলিনা আরো নিশ্চিত হয়, কিছু হয়েছিল। কিছু শোনার আগেই একটা দুঃখ ও ক্রোধ যুগপৎ ওর মনে সচল হয়ে উঠে। কে আঘাত দিল, নিলয় না বৌ। সুধাময় মলিনার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ওর পাশে শুয়ে পড়ে। মলিনার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে থাকে ঃ জানো মলিন, সুধাময় অনেক অনেকদিন পরে মলিনাকে ঐ নামে ডাকল। ঊনসত্তরের মলিনা একবার ঝল্‌কে উঠল। সুধাময় বলে চলে ঃ জানো মলিন, নিলয়, নিলু, নিলু বলে—বাবা, আমিও একটা কাজ করি, হতে পারে বড় পোস্টে। এ বাড়ী থেকে আপনি যদি রোজই জেলে আর কোর্টে মেজদার সাথে দেখা করতে যান, তাহলে আমার বিপদ হতে পারে। মলিন—নিলু কি ভেবেছে ওর বাবাকে সস্তুরে পেয়েছে? আমি কি বুঝি না, কিসে ওর বিপদ হতে পারে আর কিসে নয়! তুই নিলু, সুজয়ের ভাই, এর জন্যে তোকে যদি ধরে নিয়ে যায় তাহলে আমাকে আর তোমাকে তো যেকোন সময় নিয়ে যেতে পারে এবং নিলে করার বা কি আছে! রাজনীতি না করেও যদি সুজয়ের বাবা-মা হওয়ার অপরাধে এ্যারেস্ট করে, হবে তার জন্যে আমরা প্রস্তুত। কিন্তু নিলু, তোর এত ভয় কীসের?

মলিনা চুপ করে শোনে। সুধাময় বলতে থাকে ঃ সুজয়ের ভাই বলে যদি নিয়ে যায়, তাহলে কলকাতার সমাজে তোর যা ইনফ্লুয়েন্স তাতে কয়েক ঘণ্টাও তোকে আটকে রাখতে পারবে না। জানো, আমি যে সুজয়ের কাছে যেতাম, নিলু ভুলেও একদিন জিজ্ঞেস করতো না—বাবা, মেজদা কী বলে? ভুলেও বৌমা একদিনও বলল না, বাবা, আজ কিছু ভালমন্দ রান্না করেছি, মেজদার জন্য নিয়ে যান। তুমি থাকতে তো নিজেই রান্না করে নিয়ে যেতে, বউমা দেখে নি তাতো নয়। আর এদিকে সুজয়টা গেলে পরে খালি নিলয়ের কথা. ওর বৌয়ের কথা, ওর বাচ্চাটার কথা। জিজ্ঞেস করে ঃ বাবা, নিলু কি আমার কথা বলে? আমি বলি ঃ হ্যারে, ওরা সবসময়ই তোর কথা বলে। জানো মলিন, আমি বুঝি, সুজয়ের খুউব ইচ্ছে, নিলয় আর ওর বৌ ওকে একদিন দেখতে যায়—কিন্তু সুজয় মুখে বলে না। মুখে বলার ছেলে ও নয়, আর কেনই বা বলবে? আমি যাই সুজয়কে দেখতে আর নিলু সাবধান

করে ওর নিরাপত্তার ব্যাপারে। মলিন, আমি নিলুর বাবা, না, ও আমার বাবা... সুধাময়ের স্বর ভারি হয়ে আসে, চোখ জলে ভরে উঠে। মলিনা হাত দিয়ে ওর চোখের জল মোছে আর মনে মনে ভাবে—কথাটা চেপে ছিলে এতদিন!

মলিনা স্বপ্নটার কথা ভাবে। সুধাময় এদিকে আস্তে আস্তে অনেকটা শান্ত হয়ে আসে। নিলয়ের কথায় মলিনা আশ্চর্য হয় নি। ও জানে, ওর সবচেয়ে ছোট ছেলে সবচেয়ে বেশি হিসেবী। কিন্তু সুধাময়কে আঘাত না দিলেই পারতো। আসলে মলিনা জানে, ওটা এক নম্বরের ভীতুও। নিলয়ের ব্যাপারটা যাক্। ওরা সুখে ও সোয়াস্তিতে থাকুক। কিন্তু সুধাময় কী স্বপ্ন দেখলো! মলিনা লক্ষ করে, সুধাময় এখন অনেকটা শান্ত। জিজ্ঞেস করে—এবার তোমার স্বপ্নটার কথা বলো।

সুধাময় নিরাসক্ত, ওর মনটা এখন নিলয়ের দিকে। তবু স্বপ্নটার কথা ভাবতেই একটু নড়েচড়ে শুলো ঃ জানো, এই স্বপ্নটা আমি আরো কয়েকদিন দেখেছি। সুজয় যেন ডাকছে—বাবা দরজা খোলো, আমি সুজয়। আর আমি হুড়মুড় করে তাড়াতাড়ি দৌড়ে দরজা খুলেছি। আর সুজয় ঝোলাটা কাঁধে, আমাকে জড়িয়ে ধরে—বাবা চলে এলাম—আমার বুকে সুজয়।

মলিনা চুপ করে শুনছিল। সুধাময় শেষ করতে ও সুরু করে ঃ ঠিক একই স্বপ্ন প্রায় অনেকটা এক—আমিও দেখেছি। আমি শুনলাম, সুজয় ডাকছে। আমি দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি সুজয় দাঁড়িয়ে হাসছে। এমন সময় কতকগুলো লোক, হাতে তাদের রাইফেল—সুজয়কে দেখে অন্ধকার থেকে লাফিয়ে এলো। আর ওদের দেখে সুজয় দৌড়ল। লোকগুলো সুজয়ের পিছু নিল, আমি তাদের পিছনে ছুটলাম, খানিকটা যেতেই একটা নদী। পারের পাশের দৃশ্যগুলো দেখে মনে হচ্ছিল দেশের নদী, মনে হচ্ছিল গোমতীর পার। নদীটার কাছে এসে সুজয় অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকগুলি তাতে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ততক্ষণে আমি নদীর পারে পৌঁছে গেছি। আমাকে দেখে ওরা আরো গনগনে লাল হয়ে উঠল। একজন বলল—মাগীকে মেরে গোমতীতে ভাসিয়ে দাও।

—আচ্ছা এতদিন পরে গোমতী এলো কেন বলতো?

সুধাময় স্বপ্নের শেষ নিয়ে বেশি আগ্রহী—তারপর কী হলো, বলো।

আমাকে মারা নিয়ে ওদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। ওদের মধ্যে একটা লোক বেশ বুদ্ধিমান ও নিষ্ঠুর মনে হলো। বলল—মাগীকে মারা নেই, মাগী থাকলে পাখী আবার আসবে। তারপর নদীর ধার বেয়ে চলে গেল।

চতুর্থ প্রহর শেষ। সূর্য ওঠার আগের আলো এখনও দেখা দেয় নি। সুধাময় মলিনা শুয়ে আছে কখন সূর্য উঠবে। সুধাময়ের বাড়ীর সামনে গাড়ীর আওয়াজ। অনেকগুলি মানুষের ভারী পায়ের দুপদাপ শব্দ। কার আদেশের কণ্ঠ শোনা গেল—টেক পজিশন। তারপরেই সুধাময়ের বাড়ীর কড়া বেজে উঠল। সারা পাড়া আচমকা জেগে উঠতে চাইল। মলিনা সুধাময়ের হাত চেপে ধরে। প্রথমটায় সুধাময় একটু ভয় পেল; পরমুহূর্তেই বুঝল, পুলিশ। নীচুস্বরে মলিনাকে বলল ঃ ওঠো, ওরা এসেছে। মলিনা বিরক্ত—কেন ওরা মাঝে মাঝেই এসে বিরক্ত করে? সুধাময় দরজা খোলে। ও.সি ঢোকে—সুধাময়ের পুরনো ছাত্র। সুধাময়কে মোটামুটি সমীহ করে ঃ স্যার, আমার অপরাধ নেবেন না। কলকাতায় গতকাল রাত্তিরে জেলব্রেক হয়েছে। সুজয়বাবু জেল ভেঙে পালিয়েছেন। আদেশ এসেছে, ইমিডিয়েট তল্লাসির।

মলিনা একলাফে খাট থেকে নেমে এসে সুধাময়ের মুখের দিকে তাকায়। এদিকে পুলিশ তল্লাসি চালায়। মলিনা বলতে থাকে—জানো, স্বপ্নটা কিন্তু এখনও শেষ হয় নি। সেই লোকগুলো নদীর ধার বেয়ে চলে গেলে আমি ঘরে ফিরে এসে দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে সুজয় হাসছে।

কালো দরজা

অশোককুমার সেনগুপ্ত

ভরসন্ধ্যেবেলা আলতার প্রতিশোধের ফিনকিতে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল।

হারান ঘোষ টেবিলে সবেমাত্র খাতা খুলে হিসাবে বসেছে। এদিকে উৎসব-ক্লান্ত বিয়েবাড়িতে এই পঞ্চমদিনে বড় নির্জীব সন্ধ্যা নামছে। হ্যাজাগ জ্বালানো হয়নি, হ্যারিকেনের আলো উঁকি মারছে কেবল। বড় বেমানান মনে হচ্ছে ঘর বারান্দা উঠোন। ঘরের আসবাবপত্র, দেওয়ালের ছবি, আলমারি, খাট, পালঙ্ক সবই যেন উজ্জ্বলতা হারিয়েছে।

হুঁ, ভরত বাগ্দী একুশ টাকা নিয়েছিল। সুদ দিয়েছে তেইশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা। খুব শীঘ্র নাকি পুরোটা শোধ দেবে। তার আগে একজোড়া হাঁসের ডিম আদায় করতে হবে। ধান পুঁতুনি কানাইয়ের মা মিথ্যে বলেছে। খাতায় লেখা পনের টাকা নগদ, কুড়ি সেরি ধান। বাইশে জ্যৈষ্ঠ অগ্রিম নিয়েছে। মেয়েমানুষ বলছে, পাঁচ টাকা। কিন্তু কালির আঁচড় তো মিথ্যে বলে না। দশ টাকা মারার মতলব! সাঙ্ঘাতিক মেয়েমানুষ! তা মানুষ জাতটাই তো সাঙ্ঘাতিক।

সাঙ্ঘাতিক মানুষের একটা অদ্ভুত উদাহরণ মনে আনার সময়ই দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী আলতার বিদ্যুৎ ঝলকেছে। আর হারান ঘোষের কানে ঢুকেছে পতনের শব্দ। খাতা থেকে চোখ ফেরানো মাত্র সে দেখে, হাতের প্রদীপ ছিটকে পড়েছে। মেঝেয় লম্বা পলতে সাদা কেঁচোর মত আগুন-বমি করছে। টান টান পড়ে গিয়েছে যুবতী। মাথার ঘোমটা খসা। উপুড় হয়ে মাংসল পায়ের গোছ শাড়ীর ঢাকনা সরিয়ে দাপাচ্ছে। একটা তীব্র যন্ত্রণাকাতরতা একরাশ কোঁকড়ান চুলের মাথা থেকে পরিব্যাপ্ত হয়ে যেন উত্তপ্ত ভুঁইয়ে খইয়ের মত সাদা শাড়ী-ঢাকা শরীরকে নাচাচ্ছে। চুড়িপরা নিটোল কালো হাত টানটান। মুহূর্তের দেখা এবং উত্তেজিত বিহুল ভয়ার্ত ঘোষ অতি দ্রুত চেয়ার ছেড়ে সরে আসতে গিয়ে হ্যারিকেন উল্টে দেয়। খাতায় কেরোসিন তেল পড়ে। হ্যারিকেন-সমেত খাতা-টেবিলের উপর, লাল আগুনের লক্‌লকে অজস্র শিখা নিয়ে সারা ঘর সন্ধ্যার রঙিন আকাশের মত রাঙিয়ে তোলে। ঘোষ শুধু চিৎকার করে উঠল, 'যাদব! যাদব।' দরজার মুখে যাদব। দেখেই সে জলের বালতি এনে ছুঁড়ে দিল টেবিলে। খাতা-হ্যারিকেন সশব্দে জ্বলন্ত অবস্থায় নিবে গেল। জলের স্রোতটা আলতাকে ভেজাতে যাচ্ছে। ঘরময় নেমে আসছে নির্বাপিত হয়ে-আসা অগ্নিতেজের সঙ্গে অন্ধকার। ঘোষ বলল, 'যাও, হ্যারিকেন নিয়ে এস'। তারপর আগুন নিবিয়ে ফেলল পা দিয়ে। আবছা আঁধারে যেন ছটফট করছে যন্ত্রণাকাতর কোন জীব। তারমধ্যেই হারান শুনল, অনেক গভীর থেকে একেবারে ভিন্ন অপরিচিত একটা স্বর উঠে আসছে, 'হারান! হারান!'

যাদবের হাতে হ্যারিকেনের আলো ঠিক্‌রে পড়ল। মেঝের জলে চকচকে ছটা। শ্রান্ত হয়ে দু'হাত ডানার মত দু'দিকে ফেলে আলতা শুয়ে আছে। বুকের আঁচল নেই। লাল ব্লাউজের উপর উদ্ধত বুকে অবহেলায় কণ্ঠের সোনার হার কাৎ, হাঁটুর ওপর

কাপড় উঠে নগ্ন মাংসল স্তম্ভের মত উরু। ঝটিতি দেখে নিয়েই হারান বলে উঠল, 'যাদব, বাইরে যা।' কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। দরজা বন্ধ করে তারপর সামনে উবু হয়ে বসল সে। দেখল, আলতার ঠোঁট নড়ছে। মুখে প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস। চোখ নিমীলিত। তারপরই যেন কোন গভীর থেকে যেমন ধ্বনি হয়, কাঁপা অথচ ভারী, শব্দ সুর পায়, তেমনি কাঁপা ঠোঁট আলতার, থেমে থেমে বলে, 'তোর নাম করছি বলে ভাবছিস! কিন্তু আমি তো আলতা নই, হারান'।

ঝটিতি হারান আর্তনাদ ক'রে ওঠে, 'কে? কে তুমি?'

সেই প্রচ্ছন্ন হাসির মধ্যে দৈববাণীর মত শব্দ হয়, 'আমার বড় কষ্ট রে! বড় কষ্ট।'

গভীরতর যন্ত্রণাময় ধ্বনি যেন শূলের মত বসে যায় হারানের বুকে। সে আশ্চর্য, বিমূঢ়। এই অলৌকিকত্বের কাছে নতজানু। তার প্রার্থিত অনুভূতি আবার বলে ওঠে, 'কে? কে তুমি?'

একটা হাসি যেন বেজে ওঠে শঙ্খধ্বনির মত। আচমকা কিন্তু বড় মধুর। তারপর বলে, 'তুই যে বলিস, কালী কালী মহাকালী কালিকে কষ্টহারিণী, ধর্মার্থ মোক্ষদে দেবী নারায়ণী নমঃস্তুতে। আমিই সেই রে।'

হারান শিশুর মত শূন্য যেন আঁকড়ে ধরতে চায় কেবল।

আবার সেই গভীরতর ধ্বনি বাজে, 'আমার বড় কষ্ট রে।'

হারান বলে ওঠে, 'কষ্ট! কিসের কষ্ট, মা?'

আলতা মুহূর্তকাল নীরব।

তারপরই বলে, 'আমার সন্তানরা অভুক্ত। তোর ঘরে কত চাল। আবার আমি আসব, হারান। এবার যাই—যাই।'

চেতনার অবশিষ্টটুকু দিয়ে হারান ঘোষ ককিয়ে ওঠে, 'মা! মাগো! জগজ্জননী!'

যখন জাগে, দেখে, পাশেই আলতার উদ্বিগ্ন-কাতর চোখ। কিন্তু বেশীক্ষণ স্থির রাখতে পারে না নিজেকে। কপালে আলতার লাল টিপ চকিতে যেন তৃতীয় নেত্র হয়ে হেসে ওঠে।

বুকের কোটরে ঐশ্বর্যের মত হারান ঘোষ লুকিয়ে রাখে কথাটা। রাত্রি নামে। সারা গাঁ ডুবে যায় শব্দহীনতায়। যাদব ঘরে ফিরে যায় নিছক একটা কৌতূহল নিয়ে।

আলতা ব্যগ্র আর ব্যস্ত প্রশ্ন নিয়ে মুখর হয়, 'প্রদীপটা মা কালীর ছবির সামনে ধরলুম ওমনি কি হয়ে গেল। জ্ঞান হতে দেখি আমি পড়ে আছি। কি হয়েছিল গো?'

হারান ঘোষ কথা বলে না। পিন আটকানো রেকর্ডের মত শব্দটা বাজে, তোর ঘরে কত চাল হারান। কিন্তু কি করব মা! তুমি বলে দাও। হ্যাঁ, দাম চড়বে তাই আটকে রেখেছি। এবার প্রচণ্ড খরা, মাগো। টাকার পাহাড় জমবে আমার!

আলতা বুকের কাছে সরে আসে। ঝটিতি হারান নিজেকে বিশাল পালঙ্কের প্রান্তে টেনে বলে, 'আমাকে ছুঁয়ো না। আমাকে ছুঁয়ো না।'

আলতা অপলকে তাকিয়ে থাকে। ভূতে তার বিস্ময়ের রেখা। বলে, 'বলবে তো কি হয়েছে তোমার? কি হয়েছিল?'

ধরাগলায় হারান ঘোষ বলে ওঠে, 'আলতা, তোমার মধ্যে মা কালী নেমেছিলেন'।

আলতার চোখজোড়া যেন বিশাল হয়ে যায়। তারপর আতঙ্কভরা গলায় বলে ওঠে, 'আমার কি হবে গো!' আশ্রয়ের জন্যে হারানকেই ধরতে চায় বুঝি।

হারান বলে, 'তোমার মুখে মা বললেন, তোর ঘরে কত চাল হারান কিন্তু সন্তানরা আমার অভুক্ত থাকে'।

আলতা বলে ওঠে, 'সত্যি!'

মাথা নাড়ে হারান ঘোষ, 'কি করি, আলতা! আমি এখন কি করি।'

চকিতে আলতা বলে, 'কেন, চাল ছেড়ে দাও। ন্যায্য দামে না হয় বিক্রিই কর।'

ঘোষ উত্তর দেয় না।

সে আমূল নাড়া খেয়েছে শাণিত ওই বাক্যে। বুকের মধ্যে মাথা কুটে মরছে সুপ্ত একটা অস্তিত্ব হঠাৎ জাগরিত হয়ে। সম্পূর্ণ অচেনা সেই তীব্র সংবেদনশীল অস্তিত্ব! বড় মায়াময় এই পৃথিবীতে বড় মায়াময় এই শরীরে সঙ্গোপনে স্বচ্ছন্দে .সে লীন থাকে। জাগলেই সে বিস্ফোরণমুখী আগ্নেয়গিরি। তীব্র উষ্ণ লাভাস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সবকিছু। ঘোষ বিড়বিড় ক'রে বলে, 'আলতা, বড় খরা। চাষের দেখা নেই। শ্রাবণেও আকাশে মেঘ নেই। চারিদিকে হা-অন্ন রব। আমি যদি খিচুড়ি ভোগের ব্যবস্থা করি? লঙ্গরখানা খুলি?'

আলতা ক্লান্তস্বরে বলে, 'তাই কর।' তারপর আস্তে আস্তে তার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে।

ঘুম আসে না আলতার। সারা শরীরে এক সুখ-বিহ্বলতা। বাইরে নিশীথে চরাচর বড় স্তব্ধ, শিয়ালের হাঁক আচমকা বেজে যায়। জ্যোৎস্না জানালা গলে ঘরে লুটোপুটি খাচ্ছে। আলতা বড় অবাক হয়েছে। কে জানত এত দ্রুত তার ভয়ঙ্কর খেলা কাজ দেবে। পরিকল্পনা ঝটিতি এসেছিল তার মাথায়। অবিশ্বাস ছিল। চমৎকার অভিনয় করেছে সে কিন্তু। বড় জ্বালা শরীরে। অর্থ আর সম্পত্তির আঠায় শিকার হয়েছে প্রৌঢ়ের কাছে উনিশের যৌবন। সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় প্রাইমারী স্কুলের বুড়ো শিক্ষকের যুবতী কন্যাকে ঘরে এনেছে। যেন নিষ্প্রাণ এক বস্তু যুবতী। স্বচ্ছন্দে তুলে এনে ঘরে সাজানো যায়। বাগানের ফুলের মত পকেটে ভরে অনায়াসে সৌরভ পান করা যায়। প্রতিবাদহীন অশক্ত সেই বৃদ্ধ মানুষটি মেয়ের হাত ধরে বলেছিলেন, 'তোর বড়দির বিয়েতে পাঁচশ টাকা ধার করেছি আলতা, শোধ দিতে পারি নি। সুদসমেত হাজারের ওপাশে। না করি কেমন করে। তবে সুখী হবি আলতা, তুই সুখী হবি। ঋণগ্রস্ত পিতাকে তুই বাঁচাচ্ছিস, মা!' কথা । মন-ভুলানো বড় বড় কথা প্রাইভেটে স্কুল ফাইন্যাল দেওয়া মেয়ের বুঝতে কষ্ট হয়নি। তার চেয়েও তীব্র কষ্ট সেই যুবকটির জন্যে। পলায়নের চমৎকার আয়োজন যে করেছিল। যেতে পারেনি মেয়ে। বিয়ের পর যেত। কিন্তু প্রৌঢ়ের কামনার শিকার হল ফুলশয্যার রাতেই। একটা ভালবাসাহীন শরীর পেয়েছিল প্রৌঢ়। কিন্তু মাংসলোলুপতায় জন্তুকেও হার মানায়। কেমন চমৎকার গলা করে বলেছিল, 'বুঝলে, মেয়েমানুষের অভাব নেই। কিন্তু আমি একটা ছেলে চাই। তাই বিয়ে। পাশের গাঁয়ের মেয়ে তুমি। জান ত সবই। ওসব ভালবাসাটাসা পোষায় না ছোকরাদের মত। ব্যাঙ্কে আমার চল্লিশ হাজার টাকা আছে। ঘরে আছে ষাট হাজারের কাছাকাছি। হেঁ হেঁ, এ সবই তোমার আমার ছেলের, বুঝলে কি না! কাঠ কাঠ শক্ত যে কেন হচ্ছ। তার পর ধর বাড়ি, আমবাগান, গোলা তো দেখেছ। গয়না বাসনপত্র, আহা সবই তো তোমার গো। কি ভাবছ? লোকে বলে সুদখোর, কঞ্জুস, আঁ পাষণ্ড। হেঁ হেঁ। তা তুমি তো লোক নও গো, বৌ।' একটি বিচরণশীল লোমশ হাতের স্পর্শ, তপ্ত শ্বাস, কামনা-ঘন চাউনি, শরীরে শরীর হাতড়ানোর যন্ত্রণাকাতরতায় সেই মেয়ে শুধু টের পাচ্ছিল সন্ধ্যার আবছায়ায়, শহর থেকে শনিবারের বিকেলে আসা নিতান্তই কেরানী যুবকটির মুখটা হারিয়ে যাচ্ছে। হাতধরার ভালবাসাময় স্পর্শ সরে যাচ্ছে। কিছুতেই এগিয়ে গিয়ে সেই মেয়ে ধরতে পারছে না একখানা হাত। তৃষ্ণাতুর

দু'টি ঠোঁট কাঁপছে। মধুরতম কৈশোরের স্মৃতি ধূসর হয়ে যাচ্ছে। মান-অভিমান, স্বপ্ন, ভবিষ্যতের ছবির উপর নেমে আসছে ঘন কালো চাদর। তার মধ্যেই টের পেয়েছিল মেয়ে, আর পালিয়ে যাওয়া যায় না। গ্রাম্য মেয়ের শরীর-সম্পর্কিত শুচিতা থেকে এই প্রতিরোধ কি না কে জানে! শুধু কান্না নেমেছিল তার বুকে। তারপর নিশ্চেষ্ট তন্দ্রা। দিনের আলোয় আত্মীয়স্বজন, অলঙ্কার-সম্পত্তির মোহ সেই কান্নাকে মোছে নি। বুকের মধ্যে রেখেছিল একটা প্রতিশোধের ফিন্‌কি। হত্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ফিন্‌কিতে বিদ্যুতের স্পর্শ এনে দিল মা কালীর ছবির সামনে সংকল্পটি। শূন্য করে দিতে হবে অর্থপিশাচ মানুষটির অর্থের ভাঁড়ার। শুধু বিশ্বাস জন্মানো। মানুষকে নিয়ে ব্যবসা ওর, মানুষ দিয়ে নয়। দেবীর আদেশ শিরোধার্য করবে। মন্দির কর, দান কর, ইত্যাদিতে সে ভাসাবে ভাঁড়ার। কষ্ট হবে—বড় কষ্ট হবে অর্থপিশাচের। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলবে। ভয়ে আতঙ্কে হিম হবে। তারিয়ে তারিয়ে সুখ ভোগ করবে বন্দিনী মেয়েটির অন্তরাত্মা। কিন্তু অতদূর যেতে হল না। শুধু একটি হাস্যই তীক্ষ্ণ শরাঘাতে মুমূর্ষু করেছে। তবু দ্বন্দ্ব আছে বৈকি। সকালের আলোয় কি অবিশ্বাস করবে! কিন্তু আবার সন্ধ্যা আছে, লালপেড়ে শাড়ীর ঘোমটা-ঢাকা মুখ, চুড়িপরা তার নরম পেলব হাতে কম্পমান প্রদীপশিখাটি আছে। বিজয়িনীর উল্লাস আলতার ঠোঁটের হাসিটুকু মোছে না।

সকালে হারান ঘোষ ভিন্ন মানুষ। সকালের শ্রাবণসূর্য দহনে তৎপর। ঘরে মাহিন্দার অর্থাৎ গো রাখাল, মুনিষ, ঠাকুর, যাদব, কি বলাইয়ের বৌ কাজে ব্যস্ত। গোয়ালের গরু মোষ বাইরে বাঁধা হয়েছে। হারান ঘোষ এসময় সবকিছু তত্ত্বাবধান করে। আজ সবই যেন তুচ্ছ। অথবা তার কোনো গভীর বিষয়ে মগ্নতা—বারান্দার ইজিচেয়ারে এলানো শরীরে ভর করে আছে নেশাগ্রস্তের মত। যাদবের কৌতূহলী মুখ ঘোরাফেরা করছে। প্রশ্ন করার সাহস নেই। বাপের আমল থেকে কাজ করছে যাদব। বুড়ো হয়ে গেল। হারানকে কোলেপিঠে মানুষ করেছে অথচ এখন কথা বলতে ভয় করে।

'যাদব, আমাদের ঘরে বড় ডেকচি আছে, কড়াই আছে না! কোথায় যেন তোলা আছে।' হারানের কাঁচা-পাকা চুল দামী কলপের দৌলতে অমাবস্যার রাত্রিকে হার মানায়। ধুতিখানা লুঙ্গির মত পরা, শরীরে বার্ধক্য নামেনি, বরঞ্চ স্থির যৌবনের সুঠামতা আছে প্রৌঢ় মাংসপেশীতে। চতুষ্কোণ মুখ, সরু গোঁফ, বড় চোখ। চোখ-জোড়ায় একটা আগ্রহী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সতত প্রতিফলিত হয় বস্তুতে, মানুষে, যেন ভেসে থাকে শূন্যে। বলে, 'ক'টা যেন আছে?' যাদব বলে যায় বড় বড় কড়াই, ডেকচির সংখ্যা। হারান যেন শোনে না, 'সবগুলোই নামাতে হবে। আর শোন, তুমি কদমপুরের হরিঠাকুরকে খবর দাও। গোটা কয়েক ঠাকুর চাই আমার। খিচুড়ি হবে। বড় খরা করছে, যাদব। খেতে পাচ্ছে না মানুষ। আমি খিচুড়ি দেব। তুমি খবরটা ছড়িয়ে দাও চারদিকে। বড় বড় উনুন বসানোর ব্যবস্থা কর।'

যাদব এই কয়েকদিন আগে দশ সের চাল চেয়েছিল। দাবড়ে দিয়েছে মানুষটা। এতবড় সংবাদটায় অবিশ্বাস হয় বৈকি। বলে, 'আজ্ঞে!'

ক্লান্তস্বরে হারান বলে, 'যা বললাম, কর।'

সংবাদ ছড়াতে হয় না। কেমন করে যেন টের পেয়ে যায় বাতাস। ঘোষবাড়ীর ইতিহাস বদলে গিয়েছে। তপ্ত মাটি। চাষের মরসুম শুরু হয়নি। বিগত উৎপাদিত ফসল মুষ্টিমেয়ের গোলাজাত। হা-অন্নের দিন চেপে বসে গিয়েছে। ক্ষুৎকাতর মানুষের দঙ্গল ঘুরে মরছে চারপাশ। নাকে উঠে আসে তাদের খিচুড়ির সৌরভ, কয়েক মাইল দূর থেকে। বাটি হাতে

ছুটে আসে। মানুষ নয়, নরকঙ্কাল। সারিবন্দী কঙ্কাল, বাটি হাতে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় শুধু লজ্জা নিবারণ, হামলে পড়ে দরজা গোড়ায়। শৃঙ্খলা রাখা যায় না। গাঁয়ের ছেলেরা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করে কিন্তু কঙ্কালের খটখটে আওয়াজ, ধাক্কা খাওয়ার আর্তনাদ, পরস্পরকে দোষারোপ, অশ্রাব্য গালিগালাজ বন্ধ হয় না। একরাশ মানুষ নামের জীব ইতর জন্তুদের হারিয়ে দিয়ে আহারের জন্য ঝাপটাঝাপটি কামড়াকামড়ি করছে।

হারান ঘোষ স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। মানুষকে সে নতুন ক'রে দেখে। বদল ঘটে গিয়েছে তার দৃষ্টির। সে টের পায়, অন্নের জন্য তীব্র আকুলতা। ক্ষুধার যন্ত্রণা কি ভয়ঙ্কর! একদিন উপোস দেয়। বিকেল বেলায় পেটের নাড়ি-ভুড়ি শব্দ করে কঁকিয়ে কঁকিয়ে। ব্যগ্র হয় দু'হাত। শক্ত করে নিজেকে। কিন্তু পেটের মধ্যে একটা আশ্চর্য জন্তু বারবার হারিয়ে দিয়ে যায়। সন্ধ্যের আবছায়ায় হাতের প্রদীপের উজ্জ্বল শিখায় লালপেড়ে শাড়ী-ঢাকা আলতার হাত কেঁপে ওঠে। যন্ত্রণাকাতর সেই ভঙ্গীতে আলতার যুবতী শরীরটা তপ্ত মাটিতে যেন খইয়ের মত ফোটে। তারপর বের হয় সেই স্বর, 'হারান। হারান। তুই আমার কষ্ট মুছে দিচ্ছিস রে, আঃ! কত আনন্দ আমার হারান!'

হারানের পেটের ভিতর খিমচে ধরে ক্ষুধার যন্ত্রণা। বাবা কোন দিন কষ্ট দেয়নি। মুদির দোকান, সুদের ব্যবসার অর্থে সংসারে স্বচ্ছলতা শরীরে কমনীয়তা এনেছে তার। ভোগবিলাসের জীবন চমৎকার প্রান্তে এনেছে তাকে। সুন্দরী প্রথমপক্ষের আকস্মিক মৃত্যু কষ্ট দিয়েছিল। তারপর সে কষ্ট কোথায়। সন্তান-আকাঙ্ক্ষা পীড়া দিত। এখন মনে হয় না। কিন্তু ক্ষুধা কি জানত না হারান। শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বহমান স্রোত তাকে উন্মাদ করে দেয়। সে ককিয়ে ওঠে, 'মা, মা, বড় খিদে মা।'

আলতার বুকের কোন গভীর থেকে ধ্বনিত হয় শব্দ, 'খা। খা হারান। আমি কষ্ট দেখতে পারি না।' শব্দ যেন মুছে দেয় যন্ত্রণা। হারানের ক্ষুৎকাতরতা চলে যায়। পৃথিবীব্যাপী আদিম যন্ত্রণাকাতরতার পাশে তার যন্ত্রণা কত ক্ষীণ, হারান উপলব্ধি করে। স্থূল অনুভূতির শিকারত্ব থেকে মুক্তি হয়ে যায় যেন তার।

নারাণ মিত্র ঝকঝকে সাইকেল চড়ে এল একদিন। পাশের গাঁয়ের মস্ত মানুষ। জমি, সুদ-বন্ধকী কারবার, ধানচালের ব্যবসাপত্তর। হারান ঘোষ প্রতিদ্বন্দ্বী। শোষণের একচেটিয়া অধিকারকে খর্ব করে। তবু কিনা বন্ধু। আমোদ আহ্লাদ, বিলিতি মদ্যপানের সঙ্গী। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, সোনার ব্যান্ড ঘড়ি, রোগা ছিপছিপে কালো চল্লিশোত্তীর্ণ শরীরে-ভঙ্গীতে অর্থপ্রাচুর্যের মহিমা। বন্ধুর মস্তিষ্কবিকৃতিতে আহ্লাদ হয়েছিল। কিন্তু কোথায় যেন চিড়িক করে উঠেছে একটা সহানুভূতির রেখা। আয়োজন দেখে হতবাক। মাথার উপর সূর্যের অগ্নিবর্ষণ, ব্যস্ত স্বেচ্ছাসেবক, পঙ্গপালের মত মানুষের পাতা পাড়া, খিচুড়ি খাওয়ার হুসহাস শব্দ, ঠাকুরদের খুন্তিনাড়ানো, তেল লঙ্কায় ঝাঁঝালো বাতাস, তার মধ্যে মানুষটা ব্যস্ত ব্যগ্র হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'এই ঘোষ, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' হারানের নগ্ন ঘামভেজা কাঁধ হাতের সোনার আংটি ঝিকিরমিকির ক'রে নারাণ ঝাঁকিয়ে দিল, 'কি করছ সব! এসব কি দ্বিতীয় পক্ষের মতলব? তোমার ভাঁড়ার যে শূন্য করে দেবে! আরে, কত মানুষকে খাওয়াবে তুমি!'

হারান মৃদু হাসল। হাসির মধ্যে কি যে আছে। নারাণের মুহূর্তকাল বাক্যস্ফুট হল না। বদলে গিয়েছে বন্ধু। ওই মুখ ওই চোখ যেন কোন গভীর থেকে তাকে দেখে, তারপর বলে, 'ভাল আছ? কোথায় এসেছিলে?'

একজন স্বেচ্ছাসেবক এসে সামনে দাঁড়ায়, 'আজকে আরও চাল চাই।' হারান ব্যস্তগলায় বলে, 'নিয়ে এস। দেখো, কেউ যেন ফিরে না যায়।' চাপাগলায় বলে, 'পরিতৃপ্তির কেমন শব্দ শুনছ, নারাণ।'

সিল্কের পাঞ্জাবী বাতাসে দোল খায়। তারপর ঝটিতি বলে ওঠে, 'নিজের পায়ে কুড়ুল মারার শব্দ শুনছি।'

কানে যায় না বুঝি হারানের। তদারক করতে হচ্ছে। ওধারে জটলা। সারিবন্দী বসানোর প্রয়োজন। ফিরে এসে দেখে, ঝকঝকে সাইকেল নেই, নারাণ নেই। সময় হয় না খোঁজ নেওয়ার। ঘরের উঠোন খামার জুড়ে মানুষের শব্দ, হাঁকডাক, খিচুড়ির সৌরভ। মুখ। কেবলই মানুষের মুখ।

ছোট বোন সুনন্দার শ্বশুরবাড়ী কাছাকাছি। এককালের জমিদার-ঘর। ঘরের পড়তি দশা। বড় বৌ হয়েছে। দাদার খবর পেয়ে ছুটে আসে। মোটা-সোটা কালো শরীর রঙচঙে শাড়ী-গয়নায় ঝলমল। দাদা পাগল হয়েছে, সংবাদটা শুনে বিশ্বাস হয়নি, এখন হল। ঘরদুয়ারের চেহারা পাল্‌টে গিয়েছে। কবে সে দেখে গিয়েছে, এখন চেনা যায় না। শুধু ভিখারীর দঙ্গল। ছেঁড়া ন্যাকড়া বাটি ছেলে বুড়ো, অন্ধ খঞ্জ।

দাদা 'আয় আয়' করল মধুর স্বরে, তারপর বলল, 'তা হঠাৎ এলি?'

সুনন্দা তীক্ষ্ণগলায় বলল, 'তোমার কি ভীমরতি হয়েছে, দাদা!'

হারান রাগল না। বোনের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আমার খুব কাজ, সুনন্দা। তুই বস, বৌদির সঙ্গে কথা বল।'

কে জানে কি ছিল ওর স্বরে, যেন নিবে এল বারুদটুকু সুনন্দার। তারপর জ্বলল আলতার কাছে, 'তুমি কেমন বৌদি, দাদাকে আটকাতে পারছ না! সব যে শেষ হয়ে এল। সুদ বন্ধকীর সব জিনিস নাকি বিলিয়ে দিয়েছে। খবর কবে পেয়েছি। তুমি ধরে রাখ, শক্ত হও। তোমার তো ভবিষ্যৎ আছে। ছেলেপিলে হলে করবে কি!'

আলতা ধরাগলায় বলল, 'চেষ্টা তো করি, পারি না যে!' একটা যন্ত্রণা লুকানোর চেষ্টায় তার মুখ বেঁকে গেল।

সুনন্দা সকালে এসেছিল, দাদার উপর রাগ করে বিকেলে গেল।

শূন্য হচ্ছে ভাঁড়ার। হাতে প্রদীপের লম্বা শিখা নিয়ে আলতা টের পেতে চায় প্রতিহিংসা চরিতার্থের নিষ্ঠুর সুখ। কেঁপে ওঠে হাত। কিভাবে যেন টের পেয়ে গিয়েছে, মানুষটা যন্ত্রণা-কাতর নয়। 'দেখা দে মা' বলে দু'দিন আকুল হয়েছিল, এখন সময় নেই। মানুষ বাড়ছে। অবসর নেই তার আলতার সন্ধেবেলার চমৎকার এই অভিনয়ের পাশে দাঁড়াবার। আলতা ভেবেছিল, কষ্ট পাবে, বড় কষ্ট পাবে! কোথায় কষ্ট। শূন্য করে দিতে গিয়েছিল যে ভাঁড়ার, হয়ে গিয়েছে তা পূর্ণ। মানুষটার মুখে হর্ষ, দু'চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত, কণ্ঠস্বরে পার্থিব মোহ ছাপিয়ে কোন অনির্দেশের মুগ্ধতার তন্ময়তা। আর আলতা আশ্রয়চ্যুতা, বেদনায় মুষড়ে পড়ছে। বাবা এসেছিলেন, 'হ্যাঁ মা, জামাইয়ের কি হল? সর্বস্বান্ত যে হতে চলেছে মানুষটা। আটকা! কোনক্রমে আটকা!' আলতা এখন আটকাতেই আকুল। দিনে দিনে ওই মানুষটা যেন তাকে মোহবদ্ধ করে তুলেছে। তার অভিনয়ে যেন চরমতম সত্যে উপনীত হয়ে তুচ্ছ করে দিয়েছে প্রতিহিংসা। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আলতা বলেছে, 'তুমি কি করছ গো?'

মানুষটা মাথায় সস্নেহে হাত রেখে... বলেছে, 'মানুষের বড় কষ্ট আলতা। দেখছ তো, কতটুকু পারি মুছে দিতে তার। তবু যতটুকু পারি।'

আলতা নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছে ওই কণ্ঠস্বরের কাছে। তারপরও কথা তুলল দু'দিন। কিন্তু মানুষটার মুখে স্মিত হাসি। আলতার সর্বাঙ্গে আতঙ্ক ছেকে ধরেছে। চালের মজুত ভাণ্ডার শেষ, ঘরের অর্থ শেষ, ব্যাঙ্কের টাকা প্রায় শেষ, গয়নাও বিক্রি হচ্ছে। কিভাবে প্রতিরোধ করে আলতা! এক নিতান্তই নির্বোধ বালিকার ভয়ঙ্কর খেলার পরাজয়ের

গ্লানি নিয়ে সে কি ফেরাতে পারবে মানুষটার বুকে আছড়ে পড়ে সব সত্য স্বীকার করে? কে জানে! হয়ত না। সেই যুবক প্রেমিকটি কত দ্রুত তুচ্ছ হয়ে গেল। এধারেও আসেনি আর। তার জন্যে দুঃখের সময় নেই। বড় দ্রুত বড় হয়ে গিয়েছে আলতা। বড় দ্রুত। এক-একটা দিন যেন বৎসর। এখন নিজের কথা ভাবতে ইচ্ছে করে স্থিরবয়সীর মত। রক্তের মধ্যে গর্ভের উষ্ণ অন্ধকারে তিল তিল করে হয়ত বাড়ছে একটা প্রাণ! রক্তের একটা টিকের মত সেই উপাদানটিতে হয়ত হাড় মাংস মেদ মজ্জার সংযোজন ঘটছে। নিভৃতে, অতি নিভৃতে নিঃসঙ্গে তার আয়োজন পৃথিবীতে প্রকাশের, তবু মনে হয় সে যেন টের পায়। হাতের প্রদীপশিখাটি আরও কাঁপে। আর তার মধ্যে বিদ্যুতের সেই পুরোন ঝলকে যেন নাচিয়ে দিয়ে যায় আলতাকে আবার।

হারান ঘোষ স্তব্ধ হয়ে দেখে, ক্রমে স্থির হয়ে আসছে আলতার শায়িত শরীর। তারপর সেই স্বর, 'হারান, তুই অনেক করলি। এবার থাম!'

হারানের মুখে কোন নতুন রেখা ফোটে না। না বিস্ময়ের, না হতাশার। দু'চোখের দৃষ্টিতে তার যেন আলতা নয়, শায়িতা এই রমণী শরীরের উপরে ভাসমান কোন মূর্তি নয়, যেন অনেক দূরে, ঘরের দেওয়াল ভেদ করে বর্শার তীক্ষ্ণ ফলকের মত দৃষ্টিটা কোন অধরাকে ধরতে ছুটে যাচ্ছে!

'আমার আর আসব না হারান, আর আসব না। তুই এবার থাম্। কাল থেকে সব বন্ধ কর।'

শুধু শোনে হারান। আর কিছুই না। অনেক পরে আলতা জেগে উঠে দেখে, হারান ঘোষ বসে আছে চুপচাপ। গায়ে হাত দিয়ে জাগায় আলতা, 'শুনছ!'

হারান ঘোষ বালকের মত হাসে কেবল।

তিনদিন খিচুড়ি প্রসাদ বন্ধ। এক মহোৎসবের পর শূন্য ক্ষেত্র মরুভূমির মত নিষ্ফল শরীর নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। আলতা পাষাণপ্রতিমা। হারান ঘোষ চমৎকার দক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া গভীর অন্বেষণমুখী ভাস্কর্য। দু'টি মূর্তিই একদিন নাড়া খেল আর এক সন্ধ্যের আবছায়ায়। পরিষ্কার দেখতে পেল হারান ঘোষ, দরজার গোড়ায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণা এক নারীমূর্তি। মাথার উপর নক্ষত্রের আকাশ যেন চাঁদোয়া হয়ে নেমে এসেছে। কটিদেশে মুণ্ডবন্ধনী, বক্ষদেশে মুণ্ডমালা, এলানো মাথার চুল, এক পা বাড়ানো, দীর্ঘ দু'হাতে রক্তপূর্ণ পানপাত্র বাড়িয়ে ধরেছে।

হারান ঘোষ চিৎকার করে উঠল, 'আলতা!' যাদবের হাতে হ্যারিকেন উঁচু হয়ে উঠল, 'কে?'

দরজা গোড়ায় স্পষ্ট গলা উঠে এল, 'আমি ডুমদের মেয়ে বটি বাপ! ঢেক দূর থেকে আসছি। ইখানে নাকি খিচুড়ি দেয়?'

বালকের মত উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল হারান ঘোষ, 'ডোমের মেয়ের মূর্তি ধরে ছলনাময়ী ছলনা করতে এসেছে, আলতা!'

আর তখনই যে রুদ্ধ কালো দরজায় মাথা কুটছিল হারান ঘোষ সেটা দু'পাট খুলে যায়। আলোর অবিরল ধারা নেমে আসে।

লক্ষ্যভেদ

কল্যাণ সেন

দরজা খুলতেই একজন জানতে চাইলো—এটা কি সতেরোর দুই?

হ্যাঁ; ভেতরে আসুন, নিচু গলায় বললাম আমি।

ভদ্রলোক ভেতরে এলেন; ফিকে গোলাপী জামা, লম্বা, কান দুটো বেশ বড়, চেহারায় কেমন ধুলো-মাখানো ভাব।

আপনারই নাম দীপেন দত্ত?

হ্যাঁ, বসুন আপনি। আমার গলায় খুচরো ভদ্রতা।

বসলেন ভদ্রলোক, চোখ ঘুরিয়ে দেখলেন একবার ঘরের ভেতরটা, সিগার ধরালেন। তারপর খাকি রঙের ঢাকনা খুলে লম্বা একটা জিনিস আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন—দেখুন তো এটা; আমার মনে হয়, যে জিনিস আপনি খোঁজ করছিলেন, এটা তার চেয়ে ভালো ছাড়া, খারাপ নয়। ভদ্রলোকের গলা ঠাণ্ডা, একটু গম্ভীর, যেন জলে ভেজানো।

এসব জিনিস হাজার চেষ্টা করলেও এখন পাবেন কিনা সন্দেহ! ভদ্রলোকের কথার সঙ্গে সিগারের কড়া ধোঁয়া আমার নাকে মুখে এসে লাগছে; লম্বা জিনিসটা কোল থেকে আমি হাতে তুলে নিলাম। একটা রাইফেল।

নিন, ভাল করে দেখে টেখে নিন, পরে আবার...

রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে শুরু করলাম, যদিও রাইফেলের 'র'-ও আমি বুঝি না; ছবি ছাড়া ছুঁড়েও কখনো দেখিনি জীবনে। সিনেমাটিনেমায় রাইফেল চলতে দেখলে চোখ বুজে ফেলেছি ভয়ে, তবু এখন রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে বেশ কায়দা করেই দেখতে আরম্ভ করলাম। মসৃণ, ঠাণ্ডা কাঠের বাঁটটায় হাত বোলালাম। এর কলকব্জা কায়দা কানুন কিছুই জানি না, তবু হঠাৎ এক ঝলক গরম হাওয়া যেন ছুটে গেল আমার রক্তের ভেতরে। আঙুল কাঁপলো তিরতির করে; হাত ফস্কে এখন যদি...।

বুঝলেন, এটা হলো ২৭৫ রাইফেল; করবেট সাহেবের নাম জানেন তো? উনি এ জিনিসটা খুব পছন্দ করতেন। এই রাইফেল দিয়েই উনি কুমায়ুনের সেই কুখ্যাত লেপার্ডটাকে কায়দা করেছিলেন। ব্যবহার করে দেখুন, ইট উইল এভার রিমেন ফেথ্‌ফুল টু য়্যু, লাইক এ গুড ওয়াইফ। সিগারের ধোঁয়ার সঙ্গে ভদ্রলোকের লম্বা হাসি ছড়িয়ে গেল সারা ঘরে।

টাকাটা পকেটে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক; দরজার কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন—শুনুন; আমি ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি, খুব রিলায়েবল্‌ দোকান, গুলি ওখান থেকেই কিনবেন; নইলে বাজারে যা সব ভুষিমাল, একটা বেলেহাঁসও ফেলতে পারবেন না ওসব দিয়ে। আর আমার লাইসেন্সটা সারেণ্ডার করে আপনি যাতে পেয়ে যান তাড়াতাড়ি, সে চেষ্টাও আমি করব। আচ্ছা চলি; আমার হাত ঝাঁকিয়ে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

রাইফেলটা চেয়ারের গায়ে চুপচাপ শোয়ানো। কেমন নিরীহ, অহিংস লাগছে চোখে এখন। কিন্তু আমার হাত দিতে ভয় ভয় করছে কেমন; (গুলিটুলি ভরা নেই তো?) এগিয়ে গিয়ে খুব সাবধানে তুলে নিলাম রাইফেলটা; ঘরের ভেতর এখন আবছা আবছা আলো। আয়নার ভেতর রাইফেল হাতে আমি। ২৭৫ রাইফেল কী, কোথায় করবেট সাহেব ঠিক এ রকম একটা রাইফেল দিয়ে বাঘটাঘ মেরেছিলেন; কিছুই জানি না আমি। আয়নার ভেতর এখন পুরনো মাসিক পত্রিকার পাতায় একজন শিকারীর ছবি। কিন্তু আমার কাঁধ চওড়া নয়, বুক চল্লিশ ইঞ্চি নয়, পালোয়ান-মার্কা গোঁফও নেই আমার। আয়নার ভেতরের লোকটিও যেন অবাক হয়ে দেখছে আমাকে। আর ঠিক তখনই মাথার ভেতর একটা কথা লাফিয়ে উঠল, রাইফেলটা নিয়ে আমি কী করবো বা ইচ্ছা হলেই কী করতে পারি আমি? তাড়াতাড়ি রাইফেলটা নামিয়ে দেয়ালের পাশে রেখে দিই; হয়তো আমার মতন আনাড়ির হাতে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে যেতে পারে।

এক বাক্স গুলিও আমাকে প্রেজেন্ট করে গেছেন ভদ্রলোক। টেবিলের ওপর ওই তো চৌকো বাক্সটা; কিন্তু কী করবো আমি গুলি দিয়ে? রাইফেল চালাতেই তো জানি না আমি। রাইফেল কেন, গরুর গাড়ি, সেলাই মেসিন, কাঁচি কিছুই চালাতে জানি না। ভালো বাংলায় যাকে আগ্নেয়াস্ত্র বলে, কখনো তার সাত হাতের মধ্যেও যাইনি। কলেজ জীবনে একবার রাস্তায় গোলমালে পুলিসের ফায়ারিং-এর মধ্যে পড়ে গিয়ে কোনো রকমে পালিয়ে এসে কেঁপেছিলাম ঠকঠক করে। তাহলে দুম করে এ রকম মারাত্মক একটা জিনিস কিনতেই বা গেলাম কেন? শখ?...না, ভেতরে ভেতরে অন্য কিছু নাড়া দিয়েছিলো আমাকে? রাইফেলটা চুপচাপ এখন দেয়ালের গায়ে দাঁড়িয়ে; সেদিকে তাকিয়ে মনে হলো, আমার বাবাও রাইফেল চালাতে জানতেন না, ভাল কীর্তন গাইতে পারতেন, মেঘ দেখলে চোখে নাকি জল আসতো তাঁর। শুনেছি, আমার ঠাকুর্দাও পুতুল-টুতুল গড়তে পারতেন চমৎকার, ঠাকুর্দার তৈরি দুর্গাপ্রতিমা নাকি পুজো হতো তখন। তার মানে, একই আলুনি রক্ত বইছে আমারও শরীরে। আর সেই আমি কিনা ঠিক করলাম রাইফেল কিনতে হবে একটা; ভাবা যায়!

তা আমি রাইফেল চালানো শিখে নেব। যেমন লোকে পাহাড়ে উঠতে শেখে, পকেট মারতে শেখে, চুমু খেতে শেখে, ভণ্ডামি করতে শেখে, ঠিক তেমনি আমিও শিখে নেব গুলি চালানোর নিয়ম। ব্যস। আর কোনো কথা নেই। ঠোঁট সরু করে শিস দিলাম, নিশপিশ করে উঠলো আঙুল। দেয়ালের পাশ থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে জানালায় দাঁড়াই। বাইরের রাস্তা অন্যদিনের মতনই। সেই বাড়ি লোকজন, গাছ, কল থেকে জল পড়ে যাওয়া, সবুজ ছাতার নিচে হলুদ মেয়ে...রাইফেল হাতে জানলায় দাঁড়িয়ে বেশ মজা লাগছে। দেব নাকি গুলি চালিয়ে রোজকার এই পুরনো দৃশ্যটা ফুটো করে? কিন্তু কাল খবরের কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হবে, দিবালোকে ঘরের ভিতর হইতে গুলি চালাইয়া...; খবরে আরও প্রকাশ...; উরি ব্বাস! গা কেঁপে যায় আমার; দরকার নেই। সরে আসি জানলা থেকে।

টেবিলের ড্রয়ার টেনে বিজ্ঞাপনের কাটিংটা বের করে পড়লাম আবার। উৎকৃষ্ট রাইফেল ক্রয় করিতে চাই; সত্বর যোগাযোগ করুন। কিন্তু এখন সমস্ত ব্যাপারটা কেমন ঝাপসা ঠেকছে। অ্যাতো জিনিস থাকতে রাইফেল আমার মাথায় ঢোকালো কে? ইচ্ছে করলে যা খুশি তাই তো কিনতে পারতাম। মাছ-বাক্স, জাপানি ছাতা, ছৌ নাচের মুখোশ, জলদস্যুর ছবিঅলা গল্পের বই, এমন কি ঝলমলে শাড়ি পরানো দোকানের শো-কেসে দাঁড়ানো মহিলাও তো কিনতে পারা যেত; তা না, একটা রাইফেল। অদ্ভুত!

জানলায় হঠাৎ শব্দ উঠলো হাওয়ার; আর সেই শব্দ হঠাৎ ছড়িয়ে পড়লো আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, রোমকূপ কি জেগে উঠলো? বুঝতে পারলাম, একটা রাইফেলের জন্য ভেতরে ভেতরে অনেকদিন ধরে কেউ নিশ্চয়ই খুঁচিয়ে যাচ্ছিলো আমাকে। মাইলের পর মাইল বুনো অন্ধকার টর্চের আলোয় ছিঁড়ে দিয়ে ছুটে যাচ্ছি আমি, কাঁধে রাইফেল, পোশাকে পোড়া বারুদের গন্ধ, সামনে শত্রু...ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কটকট আওয়াজ চারদিকে আগুনের ফুলকি...(আহ্! কী থ্রিল। কী জীবন।...)

না, মাথা বোধহয় গরম হয়ে উঠছে, রাইফেলটা কি ঘুম নষ্ট করে দেবে রাত্তিরের? সত্যিই এসব ভাবনার কোনো মানে নেই। আসলে, আমি তো কুঁজো হয়ে হাঁটি, কবিরাজী ওষুধ খাই পেটের জন্য, ধুতি পরি, ট্রেনে স্যুটকেস তুলে দিয়েছিলাম বলে, একবার এক সুন্দরী মহিলা দু টাকা দিয়েছিলেন হাতে; আর সেই আমি কিনা...!

এই ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবনার মধ্যেই বিজ্ঞাপনের মানেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করলো আমার কাছে। হ্যাঁ, এই আমি ভেবেছিলাম, এই আমি চেয়েছিলাম বহুদিন ধরে। একটা রাইফেল আমার চাই-ই। সব শালাকে এইবার ফাঁদ দেখাবো আমি। রাইফেলটা শক্ত করে ধরে দুনিয়া উলটে দেব আমি! একশোটা লোককে রাইফেল বাগিয়ে বুকে হাঁটাতে পারি, যে কোনো সুন্দরীকে হাসতে বললে হাসবে, কাঁদতে বললে কাঁদবে। এই রাইফেল হাতে থাকলে কারো কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারি চার বছরের ফুটফুটে বাচ্চা, গণেশ উলটে দিতে পারি গয়নার দোকানের। ইয়া। ...তাড়াতাড়ি কাঁধে তুলে নিলাম রাইফেলটা, গরম হয়ে উঠছে হাতের তালু; নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে। ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালাম আয়নায়। ভেতরের নতুন ভদ্রলোককে একখানা স্যালুট করলাম, সঙ্গে সঙ্গে সেও স্যালুট ফিরিয়ে দিয়ে সম্মান জানালো আমাকে।

হাঁটুর ওপর রাইফেলটা রেখে হাত বোলাতে লাগলাম তার গায়ে; যেমন প্রথম সন্তান জন্মালে বাবা পাঁচ জনের চোখ এড়িয়ে আদর করে তাকে, রাইফেলের সারা শরীরে এখন তেমনি বয়ে যাচ্ছে আমার আঙুলের আদর। বাঁটে আবার গাল ছোঁয়ালাম। এইবার কাজ শুরু করতে হবে আমাকে। অন্যদিন এই সময় আমি চেয়ারে বসে পা নাচাই, বোতাম লাগাই জামায়, খবরের কাগজে পড়ি—আজ সন্ধ্যা ছয়টা বারো মিনিট একুশ সেকেণ্ড গতে সূর্যাস্ত; আর আজ বাক্স থেকে গুলি বের করে চালান করে দিলাম রাইফেলের পেটে, (কী করে গুলি ভরতে হয় জানি না কিছুই, আন্দাজে চালাচ্ছি কাজ)। প্রথমেই তাক করলাম ক্যালেণ্ডারের ছবির দিকে; লাল সোয়েটার-পরা সুন্দর একটি ন-দশ বছরের পাহাড়ী-মেয়ে ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে; মোরগের ঝুঁটির মতন লাল তার ঠোঁট। চোখে সহজ সকালের খুশি—রাইফেলের নলটা আমি ঘুরিয়ে নিলাম মেয়েটির মুখের দিকে, আঙুল দিলাম ট্রিগারে; এক... দুই... তিন...

না, এসব ভালো নয়, ঠিক নয় এরকম ছেলেমানুষি রাইফেল নিয়ে। প্র্যাকটিস চাই; চালাতে শিখতে হবে আগে। না হলে নিজের আঙুলই উড়ে বেরিয়ে যাবে গুলিফুলি লেগে। কিন্তু প্র্যাকটিস করবো কোথায়? এই ঘরে? অসম্ভব। এতো আর স্কিপিং করা নয়। বক্সবাবুদের বাড়ির পেছনের পুরনো বাগানে? (কিন্তু রাইফেল নিয়ে রোজ ওখানে গেলে লোকে সন্দেহ করবে না?) সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল; ছাদ। ছাদই সব দিক থেকে ভালো এ ব্যাপারে। বড় একটা জলের ট্যাঙ্কও আছে ছাদে, কত সুবিধে। স্টেশনারি দোকান থেকে কিনে আনতে হবে তিন চার রঙের চক, আর জলের ট্যাঙ্কের গায়ে 'বুলস আই' বানিয়ে দূর থেকে শুয়ে শুয়ে, কখনো হাঁটুর ওপর শরীর ভাঁজ করে বসে, গুলি ছুঁড়তে হবে গুড়ুম! ...গুড়ুম!

...পেছন থেকে আমার অদৃশ্য ট্রেনার চেঁচিয়ে জানাবে—থ্রি আউটার... ওয়ান সেন্টার... নো বুল... স্টার্ট ফায়ারিং এগেন...!

দিনের বেলা রোদের ভেতরেই এসব কাজ করার নিয়ম; কিন্তু ভয় হয়, যদি লোক জানাজানি হয়ে যায়। শালা কাঠি দেবার লোকের কি অভাব আছে? তারপর পুলিসের ফ্যাকড়া; হয়তো রাইফেলটা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েই চলে যাবে। তাই অপেক্ষা করতে হয় আমাকে। মানুষজন সব ফিরে যায়, আকাশ হয়ে ওঠে যেন ঘসা কাচ, আমার হাত-পা কেমন আবছা হয়ে আসে, দুপুরের খাবারের ওপর ঘোরাঘুরি করে কালো পিঁপড়ের দল।

ছাদে চলে এলাম। ট্যাঙ্কের গায়ে গোল এঁকে নিলাম তিন রকম চক দিয়ে। হাত, পা, কোমর, পাছা একটু নাচিয়ে নিলাম খেলোয়াড়দের কায়দায়; রাইফেলটা ধরলাম শক্ত হাতে। কান গরম লাগছে, ঘড়ির শব্দ বুকের ভেতর, শুকিয়ে যাচ্ছে মুখের থুথু। ওপরের লম্বা সরু আকাশে মেঘের গায়ে কি দর্শকেরা বসে বসে হাসছে? হাওয়ায় কাঁপছে নিমগাছের পাতা, আঙুলের মাথায় ঘাম, তিরতির করছে ডগা। দূর থেকে ভেসে এলো শাঁখের শব্দ, চোখ বুজে ফেলি, হাত খুলে পড়ে যায় রাইফেলটা; তবে কি আমি... কিন্তু পরমুহূর্তেই প্রায় চিৎকার করে উঠি আমি, আবার রাইফেলটা তুলে নিয়ে বলি—ইয়েস স্যার, আই অ্যাম রেডি!...

যাহ্, কী বোকা আমি! সব থেকে আগে তো লিস্ট বানাতে হবে একটা। কিছু লোকের নাম, যাদের রাইফেল কা খেল্ দেখাতে চাই আমি। এই জরুরি কাজটাই ভুলে গেছি একদম! লোকে যে আমায় ব্যাদা বলে, দেখছি ঠিকই বলে। রাম ব্যাদা আমি! ছুটে চলে গেলাম নিচে। নোটবুক আর কলম নিয়ে এলাম। এই অন্ধকারে নাম টোকা তো মুশকিল; মোমবাতি জ্বেলে নেব? (চাঁদ-ফাঁদ উঠবে না আজ?) একটা সুখের বাজনা যেন বেজে উঠলো রক্তের ভেতর; নিমগাছের পাতার ঝির ঝির হালকা শব্দ কানে উঠে এসে বলে গেল—এইবার! এইবার!...রাইফেলের নলে মুখ ঘষে শব্দ করলাম। রবার দিয়ে লেখা মুছে ফেলার মতন মুছে ফেলতে হবে পৃথিবীর কিছু লোক। শুরু হলো কাজ। প্রথমেই আমার মনে পড়লো ছেলেবেলার স্কুলের দেবাশিসের কথা; হ্যাঁ আমার ফার্স্ট টার্গেট দেবাশিস ভট্টাচার্য; ক্লাসে সেরা ছাত্র। ওকে দিয়ে স্যাররা আমাকে অঙ্ক ক্লাসে, বাংলা ব্যাকরণ ক্লাসে কানমলা খাওয়াতো; (কী রাগ! কী অপমান!) ড্যাবড্যাব করে দেখতো ক্লাসের অন্য ছেলেরা। কেমন লাগছে রে! দুর্গাপদবাবু আবার জানতে চাইতেন আমার কাছে। কানের সঙ্গে চুলও টানতো দেবাশিস; যেন ওর বাপের সম্পত্তি আমার মাথা, কান সব। আমার লাল-হয়ে-যাওয়া কান দেখে বাড়িতে মা জিজ্ঞেস করতো—কী হয়েছে, পোকাটোকা কামড়েছে নাকি কানে? চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তো আমার; মুখে বলতে পারতাম না কিছু; আমি গাছের কাছে, আকাশের দু-রঙা মেঘের কাছে, চলে যাওয়া ট্রেনের ছায়ার কাছে জোড়হাতে বলতাম, আমার মাথায় বুদ্ধি দাও একটু তোমরা, একটু সাহস দাও, যাতে একদিন ধরে রাখতে পারি দেবাশিসের কান, মুখ; পারিনি কোনোদিন। (একদিন শুধু স্বপ্নে ওর কান মলে দিয়েছিলাম আমি) আমি দুবলা, বোকাসোকা, দেবাশিস এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারে আমাকে। কিন্তু আজ আর স্বপ্ন নয়; রাইফেলের নলের মুখ থেকে এইবার ছিটকে বেরিয়ে আসবে আমার দুঃখ, জ্বালা। ঝুঁকে পড়ে হাতের অভ্যাসেই কোনো রকমে লিখলাম দেবাশিস ভট্টাচার্য; পেশা অধ্যাপনা (সাবজেক্ট জানি না) নিবাস—টবিন রোড, বরানগর। যোগাযোগ করে নেব; বাড়িতে ডেকে এনে খাওয়াবো ওমলেট, চা; তারপর ওকে নিয়ে ছাদে; তারপর...আহা...তার আর পর নেই...ফাইন!

নোটবুকে দু নম্বর নাম লিখলাম মন্টু দা; মন্টু সেন। (ভালো নাম মনে নেই) লম্বা, যেন শুকনো আখ একখানা, অল্প বয়স থেকেই মাথার চুল কেমন সাদাটে। খুব রাজনীতি করতো, জিন্দাবাদ...জিন্দাবাদ চেঁচাতো ভীষণ, সব সময় মন্টু সেন জ্ঞান দিত আমাদের। মিছিল, স্ট্রিট-কালেকসন। স্ট্রাইকে টানতো আমাদের। ভীষণ ভয় করতাম, শ্রদ্ধা করতাম। মনে হতো ভারতবর্ষের সব দুঃখ, সব সমস্যা বুঝি পোরা আছে মন্টুদার রোগা বুকে। সেই মন্টুদা আমার বইপত্তর ঘেঁটে পেয়ে গেল একটা বই (বইটা উদয় পড়তে দিয়ে বলেছিলো পড়ে দেখিস, ঘুমোতে পারবি না দু রাত্তির!) আমার তখন ষোলো পেরনো বয়স, বার বার আয়নায় দেখি নিজেরই অচেনা মুখ, আদর করি হালকা, নরম, গজাতে-শুরু-করা গোঁফ। একসঙ্গে মেয়েদের চলে যেতে দেখলে শব্দহীন সাইরেন বেজে ওঠে বুকের ভেতর। বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মন্টুদা চুলের মুঠি ধরলো আমার, তারপর সে কি কুকুর-ঠেঙানো মার! জানলার শিকে ঠুকে দিচ্ছে মাথা, ঠোঁট ফেটে গলগল করে বেরোচ্ছে রক্ত, দুটো স্টিচ করতে হয়েছিল ঠোঁটে। এখনো এতদিন পরে মন্টুদার তলপেটে লাথি মারা আর ঠোঁটের চিন চিন ব্যথার কষ্টটা যেন ফিরে আসে। তারপর কতদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেয়ালকে শুনিয়ে বলেছি, শালা, মন্টু সেন; তুমি কি আমার দু নম্বর পিতাঠাকুর? বেশ করেছি, ও বই পড়েছি, তুমি গার্জেনি করবার কে? তাছাড়া তোমার কীর্তি কি জানতে কিছু বাকি ছিল আমাদের? অজয় মিত্রকে পুলিসে ধরিয়ে দিয়েছিলো কোন হারামি...। আমরা কি ভুলে গেছি কালীপুজোর রাতে বড়ঝিলের ওদিকের সুজিতের বোবা-কালা বোনকে তুমি..। একদিন এই শহরের কোনো মাঠে, বাসে বা ট্রামে চায়ের দোকানে, চৌমাথার মোড়ে যদি ধরতে পারি তোমার হাড়গিলে ছায়া তো এই রাইফেলের নল সোজা ঢুকিয়ে দেব। বড় বড় করে লিখলাম ২ নম্বর : মন্টু সেন, পেশা—দেশোদ্ধার। নিবাস মল্লিকপুর, চব্বিশ পরগণা।

আকাশ অনেকটা নেমে এসেছে ছাদের কাছাকাছি; কালপুরুষের বাঁকানো কোমরের তলায় পিটপিট করছে দুর্বল একটি তারা। হাওয়া গায়ে লাগে, রাইফেল হাতে, কাঁধে, আবার কাঁধ থেকে ফিরে আসে হাতে। আজ এখনো লোডশেডিং হয়নি তাই কাছে দূরে নানা রকম আলোর মধ্যে শহর কী আশ্চর্য শান্ত, সুখী আর নিরুদ্বেগ। বাড়িরা যেন গল্প করছে বাড়ির সঙ্গে; শিশুরা ঘুমের মধ্যে পেরিয়ে যাচ্ছে তেপান্তরের মাঠ। রাইফেল হাতে আমি প্রস্তুত। একটা বিচ্ছিরি শব্দে গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো আমার, আর সেই শব্দ আমায় মনে করিয়ে দিল তিন নম্বর নাম : মন্মথ বটব্যাল; আমার সেকশন-ইন-চার্জ। আমার সি আর খারাপ লিখে ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করিয়েছিল বেটা। ভবেশবাবুর সাত হাজার টাকা খেয়ে বসে আছে সস্তায় জমি পাইয়ে দেবার টোপ দিয়ে; দু ঠিকানায় দুটো বউ পোষে, তবু মেয়েদের টয়লেটের সামনে ঘোরাঘুরি কমে না বজ্জাতটার। নিয়ে আসবো এই ছাদে, পঞ্চাশ বার হাত তুলে দৌড় করাবো তার পর দুটো গুলি পর পর; ব্যস! কিন্তু হঠাৎই যেন ঠোক্কর খেলাম নিজের সঙ্গে; আরে বটব্যালকে মারবো কি, মাস চার আগে লিভার পচে লোকটা তো পটল তুলেছে। ধ্যাত্তেরি। মাথার ভেতরটা কি ঢিলে হয়ে গেছে আমার?

একটু টনটন করছে হাত; জল খাবো একটু? রাইফেলটা হেলান দিয়ে রেখে দিই; কোনো বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে রেডিওর অস্পষ্ট গান, নিম ফুলের গন্ধ মিশে যাচ্ছে নাকি হাওয়ায়? ওপরে ওই নক্ষত্রদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে কি ভেঙে ভেঙে পড়বে নক্ষত্ররা? সারা আকাশ ভরে যাবে হাততালির শব্দে? আমি কি সেই মানুষ, যে হাত তুললেই নদী ঘুরে যাবে অন্য পথে? চমৎকার!

হরিপদ সাধুখাঁর নামটাও আমার এইমাত্র মনে এলো। অথচ লোকটাকে আমি চিনি না, চোখেও দেখিনি কখনো, কিন্তু কাগজে পড়েছি এই লোকটার ভেজাল তেল খেয়ে চোখ হারিয়েছে কুড়িটি ছেলেমেয়ে। (সেই অন্ধ কুড়িটি ছেলেমেয়ে কী করছে এখন? হা ঈশ্বর!) অন্ধকারে সেই নামটার গায়ে থুথু ছিটোলাম। একটা ইঞ্জিন ভেতরে গর গর করে উঠলো যেন। এখুনি রাইফেল হাতে ছুটে যাবো লোকটার স্ট্র্যান্ড রোডের দোকানে? সিনেমার হীরোর মতন মোটা গলায় বলবো, কুত্তা কে বাচ্চা!... তারপর লণ্ডভণ্ড করে দেব দোকান, চোখ দুটো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করে নেব বদমাইশটার— বল শালা, তেলে ভেজাল দিয়ে জীবন নষ্ট করবি আর? হরিপদ সাধুখাঁ চার নম্বর...মাথার একটা চুল টেনে ছিঁড়ে ভাসিয়ে দিয়ে বলে উঠলাম—তোমার যম তৈরি; ভাগবে কোথায় চাঁদ?...

আর সেই শয়তান কুকুরটাকেই বা ছাড়বো কেন? যখন তখন ঘর খোলা পেয়ে আমার ঘরে ঢোকে, বিছানা পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছিলো একদিন! বৃষ্টির রাতে কুকুরটার তাড়া খেয়ে ভয়ে ছুটতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম রাস্তায়, কারা পেছন থেকে চিৎকার করতে করতে ছুটে এসেছিলো—চোর! চোর! পালাচ্ছে...পালালো! ...এইবার বিস্কুট টিসকুটের লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসবো ঘরে, না ঘরে নয়, ছাদে।

বল, আর তাড়া করবি রাস্তায়? ঘর নোংরা করবি আর?

গুলি খেয়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে একবার শেষ ডাক ডেকে উঠবে কুকুরটা, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে অনেকটা; জল গড়িয়ে পড়বে। লিখলাম: পাড়ার বেওয়ারিশ কুকুর; নাম: অজ্ঞাত।

একবার ঝুঁকে তাকালাম নীচে। না, আমি নিরাপদ। কারো মাথাব্যথা নেই আমার ব্যাপারে। মাঝে মাঝে ছোট বড় শব্দ; চলে যাচ্ছে মানুষ ও আরশোলা। আশ্চর্য! কেউ কি ভাবতে পারছে এখন এই বাড়ির ছাদে জলের ট্যাঙ্কের পাশে রাইফেল আর নোটবুক নিয়ে কী করছি আমি? (এই ভাবেই এক একজনের মাথায় ফিরে আসে ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম; ফিরে আসে? না জ্বলে ওঠে? কেউ একজন উঠে দাঁড়ায় বিরুদ্ধ হাওয়ার মুখোমুখি)।

সুরেশবাবুর দোকানে ভাত খেতে খেতে লক্ষ্য রাখি কে ঝগড়া করছে মাছের সাইজ নিয়ে, ইতরের চোখে কে তাকাচ্ছে মেয়েদের দিকে; কে বদমাইসি করে ভেঙ্গে ফেললো গ্লাস। সব মনে করে রাখি, সব হিসেব রাখি আমি; হঠাৎ উলটোদিকের খেতে-বসা বুড়োকে বলি—গুলি মেরে লোকের বজ্জাতি গুঁড়িয়ে দিলে কেমন হয়?

গুলি? কী বলছেন আপনি?

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল বুঝতে পারি; ছিঃ একি বোকামি করছি আমি, যদি লোকে টের পায়? বুঝে ফেলে? সর্বনাশ তাহলে! পিঠে টোকা দিয়ে সাবধান করার মতন নিজেকে আস্তে আস্তে বলি, ধীরে, দীপেন দত্ত ধীরে।

ক্রমশ ভেজা কাপড়ের মতন নরম আর বিনয়ী হয়ে উঠতে শুরু করি। এক ধরনের ধূর্ত হাসি ঝুলিয়ে রাখি মুখে। মউরি খেতে খেতে বিড়বিড় করে আমার ঠোঁট—একদিন...তারপর একদিন...

বুড়ো রিকশাঅলাকে চড় কষালো একজন, বৃষ্টির মধ্যে ভেসে যায় রিকশাঅলার গামছা, দূরে দাঁড়িয়ে শব্দহীন ভাষায় বলি—শয়তান, দেখছো না, রাইফেল হাতে কে দাঁড়িয়ে? বুড়োকে জল খাওয়াই, গামছাটা তুলে দিতে দিতে বলি, ঠিক আছে, দেখবো আমি...

ধুতি আরও ময়লা হয়, হাতের নখ বেড়ে যায়, ইচ্ছে করেই ক্যাবলার মতন হাঁটি। অফিসে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াই বকুলবাগান থেকে গরানহাটা। দেখি, মানুষ মানুষের চোখে ধুলো ছিটিয়ে উঠে পড়ছে গাড়িতে, পিয়ন রাস্তায় ফেলে দিল চিঠি, ডাক্তার রোগীকে হাতে রাখার জন্য আসল ওষুধ দিচ্ছে না। মাষ্টার ক্লাসে ঝাড়ছে পচা নোটবইয়ের বুলি। সিগারেট ধরিয়ে রাধাচূড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অল্প অল্প হাসি আমি। আমি কিছুই ভুলছি না, ভুলবো না, ভুলতে পারি না...আমার হাতে আছে ২৭৫ রাইফেল। আমার হাত তৈরি হয়ে আসছে ক্রমশ।

চারু মার্কেটের সামনে দোতলা থেকে পানের পিচ ফেলে কেউ জামা নষ্ট করে দেয় আমার।

দাদা, ছেড়ে দেবেন না,. ওপরে চলে যান; যতসব ছোটলোক! দেখে না কিছু? আমি হাত তুলে থামাই; কিন্তু দেখে রাখি বাড়ির নম্বর; খুব শিগগির একদিন ভোরবেলা আমি আসবো, উঠে যাব দোতলায়, দরজা জুড়ে দৈত্যের মতন আমার শরীর...মশারির ভেতর থেকে তুলে আনবো লোকটাকে; তখনো হয়তো লোকটার চোখে তিরিশ ভাগ ঘুম, শরীরে বউয়ের গন্ধ, তলপেটে বাড়তি চাপ।

দুপুর ফুরিয়ে গেলে আবার চলে আসি ছাদে। তিন রঙের চকে গোল গোল বৃত্ত এঁকে শুরু করি প্র্যাকটিস। সামান্য শব্দ হয়, অনেকটা ধোঁয়া হয়ে চোখ মুখ ঢেকে যায় বলে বুঝি না প্রগ্রেস ঠিক কেমন। তবু প্র্যাকটিস চালিয়ে যাই, ফাঁকি দিই না। একদিন স্বপ্নে দেখলাম রাইফেলটা দিয়ে বিরাট একটা বাঘ মেরে তারই পিঠে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছি আমি, বাঘের মুখটা আমার চেনা কোনো মানুষের মতন; কিন্তু ঠিক যে কার...। বঙ্কুবাবুদের সেই পুরনো বাগানে সত্যিই রাইফেল চালিয়ে একদিন ফেলে দিলাম কাঁঠাল গাছের পাতা; কী আনন্দ! হয়েছে তাহলে। ইচ্ছে হলো চুমু খাই রাইফেলের শরীরে। ক্রমশ হাত আর আঙুল পাকা হয় আমার। উলটো দিকের বাড়ির কার্নিশে বসে-থাকা একঝাঁক পাখি লক্ষ্য করে ফায়ার করি, পালটা একটা ধাক্কা এসে লাগে বুকে, দেখতে পাই পাখিগুলো উড়ে যাচ্ছে ভয় পেয়ে। (আশ্চর্য! একটাও মরলো না অতগুলো পাখির?)

বাসের দোতলার জানলা থেকে চোখে পড়ে বউবাজারের ফুটপাথে বাঁশের লাঠির দু মাথায় খাঁচার ভেতর সুন্দর সুন্দর পাখি নিয়ে বিক্রির আশায় দাঁড়িয়ে আছে ফেরিঅলা; খয়েরি, ছাই-ছাই, হলুদ আর লাল বুটি গায়ে পাখিরা ঠোঁট ঘষছে খাঁচার লোহায়। চোখ শক্ত হয়ে ওঠে, মনে পড়ে ২৭৫ রাইফেলের কথা। কেন তোমরা ধরা পড়েছো শহরের বদ আর লোভী ওই লোকটার হাতে? ঠিক আছে, এখুনি আমি আসছি; তারপর তোমাদের ফিরিয়ে দেব তোমাদের প্রিয়, পরিচিত আকাশ; আবার গাছের ডালে ফিরে যাবে তোমরা... একটু অপেক্ষা করো।

ঘরে বসে বসে আমি রচনা করি এক জরুরি ইস্তাহার। ঠিক করে রাখি রেল স্টেশনের মুখে, খেলার মাঠের সামনে, নাচঘরে, গড়িয়াহাটার লাল, নীল সবুজ মানুষের হাতে হাতে আমি বিলি করবো সেই ইস্তাহার; আমি সব দেখছি, লক্ষ্য করছি সব; ভয়ঙ্কর হিসেব জমা হচ্ছে আমার নোটবুকে। তোমাদের পালিয়ে বাঁচা, তোমাদের সব চালাকির শেষ এবার। যারা কর্কশ শব্দে ভরে দিচ্ছো শহর, গ্রাহ্য করছো না হাসপাতালের সামনের 'সাইলেন্স', দিনরাত যারা জ্বালিয়ে রাখছো দূষিত আলো, আলকাতরার অক্ষর দিয়ে নোংরা করে দিচ্ছো দেয়াল, নির্বিচারে কেটে ফেলছো গাছ, বস্তা বস্তা টাকা পচিয়ে ফেলছো গোপন ঘরে, ঘুমোচ্ছো অফিসের চেয়ারে, গাছতলায় দাঁড়ানো অন্ধের

হাত ধরতে ভুলে যাচ্ছো যারা...সাবধান...তোমরা! তোমাদের সকলের চোখ কালো কাপড়ে বেঁধে আমি নিয়ে আসবো ময়দানে।

ঘরের ভেতর আলোর সঙ্গে মিশে যায় কুয়াশা; আয়নায় যেন অন্যলোক। ক্যালেণ্ডারের মেয়েটিও কি মুখ ঘুরিয়ে নেয় আমাকে দেখে? টেবিলের ওপর চুপচাপ রাইফেলটা শুয়ে আছে দেখে হঠাৎ ফাতনায় যেন টান পড়ে আমার ভেতরে; কেঁপে উঠি, গরগর করে ওঠে শান্ত, ঘুমে ভরে থাকা মাথা। মনে পড়ে, আরও কত দরকারী কাজ বাকি আছে এখনো। আমি যাব রাজভবনে; রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে। বলবো, হে আমাদের মাননীয় পালক মহাশয়, দয়া করে আমার কথা শুনুন—রেড রোডের বদলে আমরা ওখানে চাই উঁচুনিচু পায়ে-চলা মেঠো পথ—যেখানে দিন শেষ হলে পথের ধারে ফুটবে ঝিঙাফুল, যেখানে গাঢ় লাল জামা গায়ে একটি সরল কিশোরী বাড়ি ফিরবার আগে তার চিকন গলায় ডাকতে থাকবে তার আদরের ছাগল শিশুটিকে, অন্ধকারে গাছ ভরে থাকবে অজস্র জোনাকিতে। আপনি আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিন আরও অনেক বেশি সূর্যাস্তের, যার নিচে চুপ করে বসে থাকবো আমরা; যেন ঘুমের আগে দেখি আমাদের জানলায় এসে বসেছে সেই লিটল সোয়ালো...এইসব দাবী আমাদের। আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এর সবগুলো মেনে নিতে হবে আপনাকে। পাগল ভাববেন না আমাকে, চেষ্টা করবেন না পুলিস ডাকতে; হাসবেন না; দেখছেন তো, খালি হাতে আসিনি আমি; আপনাদের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সব আরামগুলি ছুঁড়ে ঝাঁঝরা করে দিতে খুব বেশি সময় লাগবে না আমার। কি, দেরি হবে না তো আমাদের দাবীগুলো মানতে?...

বিজনসেতু থেকে নেমে এসে একদিন দেখতে পাই, সাইকেল রিকশায় টেনে তোলা হচ্ছে নীল ফ্রক একটি কিশোরীকে; সঙ্গে একজন বেঁটে লোক আর মোটা নাক এক মহিলা। চারপাশে ছোটখাট ভিড়, কথাবার্তা...মেয়েটির চোখে জলের আবছা দাগ; দেখতে পাই বাঁ পায়ে লোহার একটা আংটা পরানো রয়েছে।

কী হয়েছে? কীসের গোলমাল?

আর বলবেন না মশাই; আমার দাদার মেয়ে, বদ্ধ পাগল একেবারে; কী করে যেন বাড়ি থেকে কাল পালিয়েছিলো; থানা পুলিস, ছুটোছুটি, হয়রানির একশেষ। আজ সকালে খবর পাওয়া গেল, এখানে এক দোকানে ঢুকে বসে আছে; তা যেতে কি চায়?

ভালো করে আবার মেয়েটির মুখের দিকে তাকাই; ওর কান্নাভেজা চোখ আমায় বলে দেয়—বিশ্বাস করো না তুমি; এদের সব মিথ্যে, সব বানানো। এরা ভীষণ কষ্ট দেয় আমাকে, বেঁধে রাখে অন্ধকার ঘরে। মেরে ফেলতে চায় আমাকে; দেখছো না আমার পায়ে শেকল?

মুহূর্তে ঝিনঝিন শব্দ হয় আমার সারা শরীরে; ব্যাস! সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। রিকশার পেছন পেছন এখন শুধু বাড়িটা চিনে আসতে হবে আমাকে। ২৭৫ রাইফেলে গুলি ভরে আমি তারপর ওদের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবো; ভয় নেই তোমার, তোমাকে ঠিক ওই অন্ধকার ঘর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো আমি। মুছিয়ে দেব তোমার চোখের জল। সমস্ত পৃথিবী লিখে দেব তোমার নামে। তারপর ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে কোনো জ্যোৎস্না-রাতে আমরা ছুটে যাবো অনেকদূর; কোথাও লুকিয়ে পড়ে তুমি জোর গলায় বলে উঠবে—রে...ডি...ই...ই আমরা দুজন খুঁজে নেবো সেই নদীটি, যার নাম অঞ্জনা, তারপর...ধৈর্য ধরো একটু, আমি আসছি তৈরি হয়ে।

রাইফেলটা পাশে নিয়ে শুই রাতে। ঘুম ভেঙে যায় ইঁদুরের জ্বালাতনে। উঠে আলো জ্বালিয়ে নোটবুকের পাতা পড়ি; পায়চারি করি কাঁধে রাইফেল নিয়ে। বাইরে দিন যায়, দিন আসে। সুখ-দুঃখের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মানুষের চামড়া পুরনো হয়। ছাদে উঠে যাই, শুয়ে পড়ি জলের ট্যাঙ্কের কাছাকাছি; ট্রিগার টানতেই...

হঠাৎ একদিন দরজার কড়া খুব জোরে নড়ে ওঠে। দরজা খুলে দেখি আমার পুরনো বন্ধু বিপ্রদাস।

কীরে, এরকম ডুব মেরে বসে আছিস ঘরে? তোর অফিসে গিয়ে শুনলাম, তুই ছুটিতে; চেহারাই বা এরকম ভূতের মতন কেন হয়েছে তোর? ব্যাপার কী? অসুখ টসুক কিছু হয়নি তো?

আমি ছোট করে হাসি। ওকে নিয়ে চলে আসি ছাদে।

দ্যাখ তো জিনিসটা; ২৭৫ রাইফেল; কিনেছি এটা; (বিপ্রদাস দারুণ এন সি সি করতো কলেজ জীবনে; এখনো নাকি মালদহের কোন স্কুল না কলেজে ট্রেনিং দেয় ছেলেদের)।

ভালো তো রাইফেলটা। করবেট সাহেবের নাকি খুব ফেবারিট ছিল এই রাইফেল?

বিপ্রদাস সরু চোখে আমাকে দেখে, তারপর শক্ত হাতে রাইফেলটা তুলে নিয়ে চলে যায় কার্নিশের কাছে; নাড়াচাড়া করে, টুকটাক শব্দ হয় রাইফেলটায়।

হঠাৎ হো-হো গা-কাঁপানো হাসিতে আমাকে অবাক করে দিয়ে রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে মাটিতে। ডাহা ঠকান তোকে ঠকিয়ে গেছে লোকটা; রামবুদ্ধু তুই; এটা ২৭৫ রাইফেল? করবেট সাহেব ব্যবহার করতেন? এটা তো মেলায় টেলায় কাঠের গায়ে বেলুন সেঁটে যা দিয়ে গুলি ছোঁড়া হয়, সেই মাল। বিপ্রদাসের লম্বা শরীর বিশ্রী দেখায় হাসিতে, এক নম্বর গাড়ল না হলে এ জিনিস কেউ...।

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি অনেকক্ষণ।

আর তোর হঠাৎ রাইফেলের শখ হলো কেন? আসল জিনিস তো তুই তুলতেই পারবি না ঠিকমতন। তুই কিনবি দামী সেন্ট, পুরনো ডাকটিকিট, বা মাউথঅর্গান.... ভীষণ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসতেই থাকে বিপ্রদাস। আর ওর হাসিতে কেমন ওলোটপালোট হয়ে যেতে থাকে সমস্ত ছাদ; ওলোটপালোট হয়ে যেতে থাকে আকাশ। রাইফেলটা তুলে নিয়ে একটু দূরে বিপ্রদাস এখন কেমন ঝাপসা; আমি সেদিকে তাকিয়ে থাকি; তবু আমার কেমন ঘুম পায়, মাথার ভেতরে ট্রিগারের শব্দ ঢাকা পড়ে যায়, থেমে যায় পাতলা অন্ধকারে।

এই, এই শুনছিস? বোধহয় বিপ্রদাস আমাকে ডাকে; নাকি নিজেই ডেকে উঠলাম নিজেকে? আকাশে কালপুরুষের কোমর; নিমফুলের গন্ধ, শাঁখ বাজছে দূরে কোথাও। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে আমার। হাত ঘুরিয়ে আমি পুরনো ভঙ্গিতে সামনের অন্ধকারের দিকে চেঁচিয়ে বলি—গুড়ুম! ...গুড়ুম!...

কিন্তু বিপ্রদাস, জলের ট্যাঙ্কের গায়ে চক দিয়ে আঁকা বৃত্ত, আমার রাইফেল, কেউ তা শুনতে পায় না।

দ্বিপাদভূমি

কালীকুমার চক্রবর্তী

দুপায়ে দাঁড়াবার জায়গা, দ্বিপাদভূমি, মানে একটু থিতু হওয়া। তোমরা যাকে বল মিনিমাম নীড়, অর্থাৎ সুতপা, অন্ন-বস্ত্র-গৃহের আকাঙ্ক্ষা, এই আকাঙ্ক্ষা আমার ছোটবেলার। শুধু আমার কেন? এই পৃথিবীর সবারই এই বাসনা।

তাই দৌড়টা ম্যারাথন হবে। থামলে চলবে না। না হলে জয়সীমার শেষপ্রান্তে যাওয়া যাবে না। তো আমি ছুটছি, জয়সীমার শেষপ্রান্তে পা রাখার জন্য ছুটছি।

ত্রিপাদভূমির এপিসোড পুরাণে নিশ্চয়ই পড়েছ। ত্রিভুবনে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা বলিরাজ। এ নিয়ে ছিল তার দারুণ অহঙ্কার। চ্যালেঞ্জ জানাত দেবতাদের। ব্রহ্মা বললেন, তার দর্প চূর্ণ করা চাই। স্বয়ং বিষ্ণু অবতার সেজে নেমে এলেন মর্তে।

তুমি তো শ্রেষ্ঠ দাতা, আমাকে কিছু দান কর।

বলুন কি আপনার আকাঙ্ক্ষা?

এক পা রাখার জমি চাই।

মানে? এক পা রেখেছি স্বর্গ-মর্তে। বাকি পা কোথায় রাখি?

জায়গা না পেলে আমার মাথায় রাখুন।

বিষ্ণু অবতার পা রাখলেন। তাঁর পদভারে বলিরাজ তলিয়ে গেলেন পাতালে। চূর্ণ হল অতি দানের দর্প।

এসব গাল-গপ্পো সুতপা। সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে প্রচার করা। আমার মধ্যে দেবত্ব নেই। অবতার হবার ইমেজও নেই। বাঁচার প্রয়োজনে আমার দ্বিপাদভূমির অন্বেষণ। কোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নয়, আমার দ্বিপাদভূমি দরকার টিকে থাকার জন্য। পাচ্ছি না। এবং এই না পাওয়ার যন্ত্রণায় আমি অস্থির।

আমি বাবলু। বাবলু বাইন। তোমাকে গোড়া থেকেই জানিয়েছি, দ্বিপাদভূমির দখলের প্রতিজ্ঞার কথা। তাই দেশ থেকে দেশে ছুটছি। এক আস্তানা থেকে আরেক আস্তানায়। কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছি না দ্বিপাদভূমি।

এজন্য আমি মরিয়া, মৃত্যু বাজি। জানি তুমি ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে লাগাতে আলতোভাবে জিজ্ঞেস করবে, কেন মরিয়া?

এক ফালি জমি চাই। জীবনে দাঁড়াতে চাই। প্রতিষ্ঠিত হতে চাই।

সে তো সবাই চায়, তুমি উত্তর ছুঁড়ে দেবে জানি।

আমি খেপে গিয়ে বলব, আমি তো পাচ্ছি না। জান তো জমির জন্য মানুষ খুন হয়? শুনে আঁতকে উঠবে। দু'চোখে বিস্ময়ের আধফোটা টগর ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করবে, তুমি খুন করবে?

জিজ্ঞেস করার অধিকার তোমার আছে। তোমার আমার পরিচয় প্রায় দশ বছরের। তাই হয়তো ভেবে নিয়েছ এই অধিকার তোমার জন্মে গেছে স্বাভাবিকভাবে।

না, সুতপা, না। অধিকার এভাবে জন্মায় না। সারা জীবন মেলামেশা করলেও না। ওটা ভেতরের ব্যাপার। বোঝাবুঝির মধ্য দিয়ে কেড়ে নিতে হয়। তা কি পেরেছ? সৌমেনকে বিয়ে করার পরেও এ কথা বলবে?

মনে আছে তো সেদিনের কথা? ইনডোর স্টেডিয়ামের এক ভিজে দুপুরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা। আগে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ মেঘলা। বাতাস ভিজে ভিজে। ভেতরে আফ্রো-এশিয় সম্মেলন চলছে, ম্যান্ডেলার বক্তব্য হচ্ছে।

আমি সিগারেট খেতে বাইরে এসেছি। আমার পেছন থেকে তুমি এলে। এখানে চা-স্টল কোথায় বলুন তো? বলেই হঠাৎ হোঁচট খেলে। টাল সামলাতে আমার হাত ধরে ফেললে। আমি 'ওকি হোঁচট খেলেন' বলেই তাকালাম। মনে হল দর্শন করলাম। দেব-দেবী নয়, এক মানবীকে দর্শন করলাম।

লম্বায় তুমি পাঁচ ফুট দুই-টুই হবে। মেদহীন শরীর। পরনে হাল্কা হলুদ শাড়ি। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। হাতে একটা ঘড়ি। কোনো গহনা-টহনার বালাই নেই। উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণের গোল মুখে দু'টো মায়াবী চোখ। গভীর, অতল।

না, মানে একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে...বলে একটু হাসলে।

সেই হাসিই আমাকে ডুবিয়েছে সুতপা। দ্বিপাদভূমি খোঁজার প্রতিজ্ঞাকে টলিয়ে দিয়েছে। আমি বিড়বিড় করে বলি, ওদিকে চলুন, ওদিকে চা'র স্টল আছে, বলে বাঁয়ে ঘুরলাম।

চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলে, আপনি কোন্ সংগঠনের প্রতিনিধি? আমি তোমার দুচোখের অতল দিঘির পাড়ে চোখ রেখে বলি, কেন বলুন তো?

না, এমনি। আমি মহিলা সংগঠনের ডেলিগেট।

তাই নাকি? আমি সরকারি কর্মচারি সংগঠনের।

সরকারি কর্মচারিরা হার্টলেস হয় কেন বলুন তো?

সে কি? হার্ট না থাকলে মানুষ বাঁচে নাকি?

ধ্যাৎ, হার্ট মানে হৃৎপিণ্ড নয়, হৃদয়।

কোনো নির্দিষ্ট সরকারি কর্মচারি সম্বন্ধে বলেন তো ঠিক আছে, তবে সবাই কি...

না, না। সকলের কথা বলছি নাকি?

বলে তুমি এমনভাবে তাকালে যেন আমি দারুণ অপরাধ করে ফেলেছি। তোমার দুই ভুরুর মাঝখানে একটা সংশয়-ফড়িং লাফিয়ে বসল। সেই শুরু, তাই না সুতপা?

প্রায় রোজ যোগাযোগ হত। সিনেমা, থিয়েটার, শিল্প-প্রদর্শনীতে তুমি আর আমি। কোনো কোনোদিন উদ্দেশ্যহীন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতাম, ইডেন গার্ডেন, বাবুঘাট, বোটানিকস্ বা বেলুড়মঠের নির্জন পটভূমিতে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে বুঝতে চাইতাম। ক্রমশঃ বিচরণক্ষেত্র বিস্তৃত হতে থাকে — জয়রামবাটি, হুগলিচার্চ, নবদ্বীপ অব্দি চলে যেতাম।

দশবছর কম সময় নয়। পরস্পরকে দেখেছি আমরা। ঘুরেছি, মনের দরজা খুলতে চেয়েছি। কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থেকেই গেল। আমরা পরস্পরকে কতটা চিনেছি? মনে হয় পুরোপুরি চেনা হয়নি। বাইরের অবয়বটাকে চিনেছি মাত্র। বাইরের 'আমি' কি আমার সব? বাইরের 'তুমি' কি তোমার সব? মানুষের সেটাই প্রকৃত পরিচয়?

ভেতরে আমি অন্য মানুষ হতে পারি। খুনি হতে পারি। চিট্ হতে পারি। জেলখাটা কনভিক্ট হতে পারি। লেডি কিলার হতে পারি। দশটা মেয়ের মতো তোমাকে ঘোরাতেও তো পারি।

তুমি ভেতরে এক বাইরে আরেক মানুষ হতে পার। ঘর বাঁধার জন্য, আমি যাকে দ্বিপাদভূমি বলছি, সেই নিশ্চিত আঁটো-সাটো সংসারের জন্য আমাকে মিথ্যে বলছ না তার গ্যারান্টি কোথায়? তুমিও এক ডজন ছেলেকে খেলিয়ে খেলিয়ে একটাকে ডাঙায় তুলতে চাও না তার প্রমাণ কোথায়?

কি বললে? বিশ্বাস? তুমি কি খুব বিশ্বাস কর আমাকে? এটা ঠিক যে মানুষকে অনেক ব্যাপারে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে হয়। না হলে সংসারটা জঙ্গল হয়ে যেত।

কিন্তু এটাও তো ঠিক, যে লোকটাকে এতদিন ধরে আমার মা'র কথামতো বাবা বলে জেনে এসেছি, যদি জানি সে আমার বাবা নয়। আমার বাবা অন্য লোক। আমার মা যদি সমাজের ভয়ে নিজের চরিত্র পবিত্র রাখতে আসল সত্য উদ্‌ঘাটন না করে, তাহলে কি আমার আসল পরিচয় পাওয়া যাবে? যাবে না, কোনো দিন যাবে না।

তাই বিশ্বাসে বেঁচে থাকি। তুমিও সেই বিশ্বাসে বেঁচে আছো। মেনে নিতেই হবে মানুষই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। এখানে যুক্তি, তর্ক, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের খুব বেশি প্রয়োজন নেই।

সৌমেনের কথাই ধরা যাক। তোমার বন্ধু সৌমেন। পোশাক-আশাকে ফিটফাট। হিরোয়িক হ্যান্ডসাম। কথাবার্তায় বুদ্ধির দীপ্তি। হ্যাঁ-কে না, না-কে হ্যাঁ করতে তার খরচ হয় কয়েকটা মাত্র উচ্চ হাসি।

এক বইমেলায় পরিচয় করিয়ে দিলে ওর সঙ্গে। মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বললে, এ হচ্ছে বাবলু বাইন, সরকারি কর্মচারি আন্দোলনের সংগঠক। আর এ হচ্ছে সৌমেন, বিজনেস ওয়ার্ল্ডের ম্যাগনেট।

শুনে মৃদু হেসে সৌমেন বলে, আই সী, গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ, গ্যারান্টেড্ লাইফ এন্ড গ্যারান্টেড্ মুভমেন্ট অফ ওপ্রেশড্ এমপ্লয়িজ।

মানে কি হল? হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করি।

বুঝলেন না? জীবনটা গ্যারান্টেড্ অথচ শোষণ মুক্তির জন্য লড়ছেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সরকারি কর্মচারিরাও শোষিত। তারা সামাজিক মানুষ। আর্থ-সামাজিক যে শোষণ তার মধ্য থেকে সরকারি কর্মচারিরা বেরিয়ে আসতে পারছে?

উরিব্বাস। এ যে রাজনীতি, মুচকি হাসে সৌমেন।

কোথায় রাজনীতি নেই? আপনি যে রাজনীতিকে এড়িয়ে যাবার ভান করছেন এটাও রাজনীতি।

মানে?

মানে ভেতরে ভেতরে আপনি অন্য রাজনীতির ধারক-বাহক।

অ্যাই বাবলু, সৌমেন বোর ফিল করছি আমি। চল কোথাও বসা যাক। ওই রেস্টুরেন্টে চল, বলে তুমি সুতপা কেমন কায়দা করে আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে। কেন বল তো? তোমার ভেতরটা পাল্টাচ্ছে, তাই না?

চিকেন পাকোড়া আর কফি খেতে খেতে তুমি সৌমেনকে হাইলাইট করছিলে। ওর বাবা ডাকসাইটে ডাক্তার। স্পেশাল রেফারেন্স ছাড়া পেশেন্ট দেখেন না। ঢাকুরিয়ায় বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ি। তিন চারটে লেটেস্ট মডেলের গাড়ি। সৌমেনেরও নাকি ফিয়েট আছে একটা, মটোর সাইকেল দু'টো।

আমি সব নির্বিকারভাবে শুনে গেছি সুতপা। কোনো মন্তব্য করিনি। কারণ তোমার সেই মায়াবী চোখের দুই পাড়ে তখন বাদামি পলিরেখা জমতে শুরু করেছে।

অনেকদিন তোমার দেখা নেই। তোমাদের মহিলা সংগঠনের অফিসে গিয়ে শুনলাম সেখানে যাচ্ছো না বহুদিন। বাড়িতে গিয়ে ফিরে এসেছি দু'দিন। দরজায় তালা দেওয়া। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক বললেন, রাত সাড়ে আটটার পর আসবেন। সুতপা আর তার বাবা ওই সময়ে আসে।

কিন্তু দেখা হয়ে গেল ঠিক। আচমকা। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে তোমরা বসে। আমি দরজার কাছে আসতেই তোমার ঠোঁটে শিস্-স্-স্ শব্দ হল। তাকিয়ে হেসে উঠি। হাত উপরে তুলে তোমরা ডাকলে। পাশে গিয়ে বসতেই সৌমেন বেয়ারাকে মাটন কবিরাজি ও কফির অর্ডার দিল।

সেদিনই কথা প্রসঙ্গে বুঝতে পারলাম সৌমেন এক জাতি এক দেশ তত্ত্বের সমর্থক। মনুর উপাসক। ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি বলতে নাকি হিন্দুত্ব বোঝাবে।

আপনার কথা মানতে পারছি না সৌমেনবাবু, আমি দৃঢ়ভাবে বলি, বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু সংস্কৃতির মিশ্রণে গড়ে উঠেছে ভারত। এ কথায় খেপে যায় সৌমেন। আমাকে সরাসরি আক্রমণ করে, আপনি তো বলবেনই, কারণ আপনার নামের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে আর্য-অনার্যের রক্ত। বাইন তো সিডিউল্ড্ কাস্ট্।

আমি প্রতিবাদী গলায় বলি, সিডউল্ড্ কাস্ট্ মানে জানেন তো? বিশেষ তালিকা-ভুক্ত জাতকে বলে সিডউল্ড্ কাস্ট্। এর মধ্যে রক্তের ব্যাপার নেই। অনগ্রসরতার ব্যাপার। তাহলে আপনি ভট্টাচার্য, আপনিও তো তালিকাভুক্ত পূজারি ব্রাহ্মণ। প্রজাদের শোষণের জন্য শাসকরা এইসব তৈরি করেছিল।

আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি তাহলে কমিউনিস্টদের চামচে?

আজ্ঞে না, ইতিহাসের চামচে, অ্যানথ্রোপলজির চামচে।

সৌমেন নয়, সেদিন আমি তোমাকে চিনতে পারি নি সুতপা। সেই আফ্রো-এশিয় সম্মেলনে দেখা তোমার সঙ্গে আজকের 'তুমি'র কোনো মিল নেই। সৌমেন পরিষ্কার। ও সরাসরি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থক এটা প্রমাণ করে দিয়েছে। তুমি কিন্তু সৌমেনের কথার প্রতিবাদ করনি। একটা নির্লিপ্তির প্রলেপ ছিল তোমার চোখে মুখে।

আমি কি বুঝলাম সুতপা? তোমার অবচেতন মনে দ্বিপাদভূমি দখল করার লড়াই নয়, পরাগ মিলনের মোহ ওড়াওড়ি করছে মৌমাছির ডানায় ভর দিয়ে। মৌচাক বাঁধার কালে পরাগ সংমিলনের কাতরতা দেখা দিচ্ছে।

এত বলার দরকার ছিল না। বলতে হল আমার অতীত তমসাবৃত বলে, আমি পোড়-খাওয়া বলে, বহু আঘাতে জর্জরিত বলে।

আমি বাবলু। বাবলু বাইন। মা'র মতে আমার বাবা সুধাংশু বাইন, যিনি নাকি দেশ স্বাধীন হবার সময় নিখোঁজ হয়ে যান। আমি ও মা বড়মামার হাত ধরে চলে আসি ভারতে, স্বাধীন ভারতে। মামার ধারণা ছিল এ আজাদী ঝুটা নেহি। সামনে ঝুলছে আজাদীর পাস্তয়া।

এদেশে আমরা রিফুজি, এদেশিদের ভাষায় রিপু, অর্থাৎ ঝুট-ঝামেলা এবং পরগাছা, সরকারের গলগ্রহ। উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে নাজেহাল সরকার।

ওদেশ থেকে কাতারে কাতারে গ্রামফেড্ ছাগল মানে ডাঁশা যুবতী, হোক না নিরন্ন, শরীরে মাংস আছে বলে জলের দামে বিক্রি হয়ে যেতে তো অসুবিধা নেই? কসাইদের হাতে জবাই হবার আগে তাই তারা আকাশে ধ্বনি তোলে—এক মুঠো চাল দেবেন মা, কোলের দুধের পোলা না খাইয়া মইরা...

গল্প শুনতে খুবই রোমান্টিক মনে হয় সুতপা? বাস্তুচ্যুত মানুষেরা অকারণ প্রশ্ন করে,
আমরা কারা?
বাস্তুহারা।
বাস্তুহারা করল কারা?
গদির উপর আছে যারা।
গদির উপর আছে কারা?
এরপর উত্তর মেলে না। এর মুখ ও দেখে, ওর মুখ দেখে এ, এবং নটে গাছটি মুড়লো। একটা দেশ গড়ার যুগে এমন কষ্ট থাকেই। উল্টোভাবে চিন্তা করলে দেশবরেণ্য নেতাদের আত্মত্যাগের কথা ভাবলে কি দাঁড়াচ্ছে বলতো সুতপা?— বাপ্‌রে, ভাবা যায়! দু'শ বছর আমরা পরাধীন ছিলাম, আমাদের কেউ কেউ যদি ইংরেজদের তেলিয়েছিল, তবুও তো স্বাধীনতা পেলাম, তেলানো লোকগুলো অনেকেই আমরা গদিতে বসাতে পারলাম, হিপ্‌ হিপ্‌ হুর রে...
তো সুতপা আমি অনাথ আশ্রমে। সেখানেও বড় পিছিল ভূমি। আমাদের ঘরের কেয়ারটেকার নিতাইদা, বড় কড়া ধাতের মানুষ এবং অনাথ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণে দারুণ স্বার্থত্যাগী, একদিন আমার সামনেই আমার মা'কে গালাগাল করে,—লজ্জা করে না তোমার? বেজন্মাদের সঙ্গে তোমার ছেলেকে এই আশ্রমে রেখেছ? নাকি তোমার ছেলেও সেই দলের? মুসলমানের ছেলে পেটে ধরনি তো?
এ কথায় কেঁদে কেটে কেয়ার টেকারের (মা'র মতে স্বয়ং ভগবান) পায়ে লুটিয়ে পড়ে মা।
লোকটা তখন শ্লেষ্মাজড়ানো গলায় কুঁই কুঁই করে ওঠে, আরে অ্যাই মেয়ে, তোমাকে বলিনি। এখানে এরকম অনেক বেজন্মা আছে। লোকটার হাত মা'র পিঠ থেকে সরতেই চায় না। মা উঠে দাঁড়িয়ে গেলেও। আমার মা'ও তো নারী সুতপা। চিরন্তনী নারী। নারী প্রগতির আড়ালে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী মধুর বুলির আড়ালে অনেক পুরুষ মাংসের গন্ধ পায় যে, এখনও এই একবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালেও।
আমাদের বুকের ভেতরে অনেক স্বঘোষিত অভিভাবক ধমকে ওঠে, খামোশ, চুপ, চুপ, সব নারী মায়ের জাত।
এধরনের বুলি কাদের তৈরি খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে আবার বুকের গভীর গহন থেকে কোন্‌ নিন্দুক চীৎকার করে ওঠে, মনু'র যুগের পণ্ডিতদের বুলি এইসব। সম্পত্তি সৃষ্টির জন্মমুহূর্ত থেকে নারীরা পুরুষের কব্‌জায়। নিন্দুকের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর চলে, তাহলে নারীস্তুতি কেন চাদ্দিকে?
স্তুতির আড়ালে শোষণ চলবে বলে।
তার মানে?
নারী শুধু সন্তান প্রসব, লালন-পালন...
তবে যে বলে অর্ধেক আকাশ তুমি নারী,
বইতে আছে, থাকবে চিরকাল।
এসব আমার ছোটবেলার জারিত অভিজ্ঞতা। আঠার'র পর থেকে ভাবনাগুলো উলসে উঠেছে। জানি তুমি বলবে, ধুস্‌, এসব পেশিমিস্টের কথা।
আমি জানি প্রকৃতিগত কারণে নারীরা নারী, পুরুষরা পুরুষ। জয় করতে হয়। দুঃখ-শোক অতিক্রম করতে হয়। তবেই তো মানুষ হয়ে ওঠে লড়াকু মানুষ। ব্যক্তিস্বার্থকে সমষ্টিগত স্বার্থের ভেতর নিয়ে গিয়ে...

তোমার এই বক্তব্যকেও ঠিক ঠিক মানতে পারছি না সুতপা। তুমি শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী আওড়াবে, তাই না? সেখানেও কিন্তু দ্বিপাদভূমি দখলের কথা নেই। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন কথার অর্থ কি? কাজ করলে তার ফলে অধিকার রাখব না কেন? প্রত্যেক অ্যাকশনের তো রিঅ্যাকশন আছে। আমিও তো আমার কৃতকাজের জন্য ফল দাবি করতে পারি। সবাই পারে।

আমি যুবক। শরীরে তেজ, মনে জোর আছে। চোখে স্বপ্ন, বুকে বল আছে। আমি নদী সাঁতরাতে পারি। পাহাড় ডিঙাতে পারি। সাপের গর্তে হাত দিতে পারি। জীবন দিতে পারি, জীবন নিতে পারি। কারণ আমার বয়স আঠারো। এই বয়সই তো ঝুঁকি নেবার বয়স।

আশ্রমের খাতা থেকে আমার নাম কাটা যায়। এদেশের আইন বলে, আঠারোতে ছেলেরা স্বাবলম্বী। এই পৃথিবী তোমার চারণক্ষেত্র। চরে খাও।

আশ্রম থেকে আমি চলে যাব। আমি তৈরি। কিন্তু ঝামেলা খুকুমাসিকে নিয়ে। আশ্রমের দিদিমণি খুকুমাসি। আমাকে নিজের ছেলে ভাবে। আমাকে নিয়ে পুতুল খেলে।

খবর শুনে খুকুমাসী হাসতে পারে না। আমাকে নিয়ে খেলতে পারে না। আদর করতে পারে না। শুধু ঢোক গেলে। দুচোখে মোটা জলের ধারা নামায়। ভারী গলায় বলে, যেখানেই থাকিস, চিঠি দিবি, যোগাযোগ রাখবি।

আমি দুঃখ পাচ্ছি, ব্যথা পাচ্ছি এমন ভাব দেখাতে গিয়ে থমকে যাই। আমার ভেতর থেকে কে যেন গেয়ে ওঠে, অমলকান্তি এক টুকরো রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।

রোদ্দুর মানে শাণিত জীবন। দ্বিপাদভূমিতে দাঁড়িয়ে মানুষের মর্যাদায় বেঁচে থাকা। কিন্তু পারলাম কই সুতপা? মা'র কাছে কুপার্স ক্যাম্পে গিয়ে দেখি তার শরীরে দাগ ফেলেছে বয়সের কামড়। বাত, অ্যাজমা, হাইপ্রেসারে মা কাবু।

কোঁকাতে কোঁকাতে মা বলে, দেবুর কাছে যা, এখানে কি খাবি?

আমার মামাতো ভাই দেবুদা। ভাগ্যবিশ্বাসী মানুষ। দু'হাতের ছ'টি আংটি নাচিয়ে বলে, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। এখন আপাততঃ তিনটে টিউশন কর। পরে আরো খুঁজে দেব।

জান তো আমি দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চাই। স্ট্রাগল ফর দি এ্যাকজিসটেন্স। লড়াই করে টিকে থাকার প্রতিজ্ঞায় মরিয়া। তাই দেবুদার ভাগ্য-টাগ্য কথার উত্তরে বলতে পারি নি, স্টপ্, স্টপ্, ভাগ্য নয়, বলং বলং বাহুবলম্। চুপচাপ থাকি আমি।

ছাত্র পড়াই। ছাত্রী পড়াই। একই গদ্। পুরনো বিশ্বাসের, অন্ধ বিশ্বাসের উপর লেখা বইপত্তর নিয়ে ঘাঁটি। কোনো যুক্তি নেই, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। ভাববাদে ভেসে যেতে থাকি। গড্ডালিকা প্রবাহে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাসিয়ে নিয়ে চলি। মিথ্যা সাহিত্য, মিথ্যা ইতিহাস, মিথ্যা দর্শন, —সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। সিরাজ দেশপ্রেমিক, মিরজাফর বিশ্বাসঘাতক, ভগবান আহার করেন, নিদ্রা যান, এই সৃষ্টি চালান, পীর বাবাজীর মাহাত্ম্য—এইসব কথা ছাত্র-ছাত্রীরা গিলে যায়।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। প্রশ্ন করা যাবে না। নট্ টু কোশ্চেন হোয়াই। এটাই শিক্ষার ধারা। বিশ্বাসের ভিত্। জীবনপ্রবাহ। যুক্তিহীন মনে হলেও মেনে নিতে হবে।

কিন্তু আমি তো পারছি না। বিচারবুদ্ধিহীন কাজকে সমর্থন করতে পারছি না। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতরে প্রশ্ন করার এবং উত্তর খোঁজার প্রবণতা জাগিয়ে দিই।

বিকেলে কলেজ স্ট্রিটে যাই, বসন্ত কেবিনে। এখানে অনেকে আসে। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সিনেমা আর্টিস্ট, রাজনৈতিক নেতাদের ভীড়ে একেবারে চাঁদের হাট। আড্ডা চলে। মগজ খোলে। সময় ছোটে। বর্তমান সময়ের শেকড়-বাকড় ধরে টান দি। বসন্ত কেবিন গরমা-গরম ঃ—

আমি ডাক্তার হব।

আমি ইঞ্জিনিয়ার।

আমি আই-পি-এস লেখক।

আমি নেতা ঔপন্যাসিক।

আমি দলে ভীড়ব।

দল মানে? দল কি?

দল মানে গোষ্ঠী।

গোষ্ঠী ছাড়া উত্থান নেই। লেখক গোষ্ঠী, রাজনৈতিক গোষ্ঠী, আমলা গোষ্ঠী, পত্রিকা গোষ্ঠী। গোষ্ঠী ছাড়া পিঠ চাপড়ানি নেই। গোষ্ঠী ছাড়া মুদ্রা নেই, মুদ্রা ছাড়া সুনাম নেই। বিশেষ সুনাম ছাড়া নেতা হয় না, লেখক হয় না, পত্রিকা হয় না।

এই কথায় দেখ সুতপা, ভীড়ের ভেতর থেকে, সংসারের জনারণ্য থেকে কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে, তাহলে আমরা কি কনিষ্ক? আমি এদিক তাকাই, ওদিক তাকাই। প্রতিবাদী কাউকে দেখতে পাই না। ঘাড় উঁচিয়ে কাউকে রুখে দাঁড়াতে দেখি না। শুধু শব্দের ঢলে হাসি ভেসে যায়, হাসির ছড়া—হা হা হা, হি হি হি, হো হো হো, চিঁহি চিঁহি।

বসন্ত কেবিন ফেটে যাবে। বিভ্রান্ত আমি উঠে দাঁড়াই। হাঁটতে থাকি। ভাবতে থাকি আকাশ পাতাল।

আকাশে মেঘ। মেঘের তলায় জল। জলে প্রাণী, উপরে তরঙ্গ। তরঙ্গের উপর বাতাস। বাতাসে ধুলোবালি, জীবাণু। জীবাণুতে রোগ। রোগে মৃত্যু। আবার জীবন। প্রবাহ। প্রবাহ আসে। চলে যায়। অনন্তকাল। এই নিয়ে মানুষের জয়যাত্রা। ইতিহাসের পরিক্রমা। বিজ্ঞানের অগ্রগমন, যুক্তির বিশ্লেষণ।

এসব ভাবনার ভেতরই আমার কাজ চলে। সন্ধ্যায় গোপাকে পড়াতে যাই। গোপার মা-বাবা আছে। মা সংসার দেখে। বাবা অফিস সামলায়। গোপার বাবাকে দাদা, মাকে বৌদি ডাকি। কল্যাণদা আর কণাবৌদি। কেন যেন মনে হয় কণাবৌদি দুঃখী, কল্যাণদা অসুখী।

অনেক রাতে ফেরে কল্যাণদা। অনেক রাত অব্দি সুরেশবাবুর সঙ্গে গল্প করে কণাবৌদি। মনে হয় কণাবৌদি কিছু খোঁজে, কল্যাণদা কিছু খোঁজে।

তাড়াতাড়ি ফিরলে কল্যাণদা একেকদিন গোপার ঘরে আসে। আমাকে জিজ্ঞেস করে, কেমন প্রোগ্রেস হচ্ছে বাবলু? খারাপ নয়? গোপা টাস্কগুলো সুইফট্‌লি গ্রিপে আনতে পারে। আনাই তো উচিত। এখন হাই কম্পিটিশনের যুগ। ফাইট করতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে হাই-স্পীডে।

বলতে বলতে কল্যাণদার চোখ দু'টো স্বপ্নাতুর হয়ে ওঠে। কম্প্যুটার সময়কে গ্রাস করার জন্য উসখুস করছে যেন কল্যাণদা। মেয়েকে নিয়ে তার অনেক আশা। সামাজিক স্টেটাসে ওঠার কামনা।

কণাবৌদিও মাঝে মাঝে এঘরে আসে। গল্প শোনায়। গল্প শোনে।

কোথায় থাকো?

কার সঙ্গে থাকো?

অ্যালোন ফিল কর না?

ওয়াশিং মেশিনটা কিনে ফেললাম।

এখন গোপার ইচ্ছা মারুতি কার।

আমার পছন্দ কিন্তু কন্টেসা।

কণাবৌদির এত সংলাপ। ওগুলো বাতাসে ওড়ে। আকাশে ভাসে। ভাসতে ভাসতে আমার মুখে নামে। চোখে চোখ রাখে। কি যেন খোঁজে। পায় না। দেয়ালে দৃষ্টি ফেরায়। ছবি দেখে। দু'জনের ছবি। কল্যাণদা আর কণাবৌদির। পাশাপাশি তারা। এখানে সুরেশবাবু নেই।

বুঝলে সুতপা, কল্যাণদা কণাবৌদিরা নেশায় পাগল, পাওয়ার নেশা, দুপায়ে দাঁড়াবার নেশা, দ্বিপাদভূমির নেশা। ফ্রিজ, টিভি, এয়ার কুলার, ওয়াশিং মেসিন, কন্টেসার জগৎ নিয়ে ওরা উদ্দাম, অথচ নিঃসঙ্গ অসহায়। সময়ের ঘূর্ণি সমুদ্রে যেন দু'টো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। মুক্ত বাণিজ্যের হাওয়ায় ফুরফুর করছে, আবার বিশ্বায়নের কামড়ে ছটফটাচ্ছে। ভোগবিলাসে ডুবে থেকেও দ্বিপাদভূমি খোঁজার জন্য হাঁসফাঁস করছে। এ কিসের দ্বিপাদভূমি জান? শান্তির, স্বস্তির।

আমি রাস্তায় নামি। সন্ধ্যা নামছে নম্র পায়ে। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের দিকে একটি মিছিল চলে যাচ্ছে। জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত, সাধু, পুরোহিত-পূজারিদের মিছিল। ওরা রামজন্মস্থানে মন্দির বানাতে চায়। আজকাল সবাই মিছিল করে। যৌনকর্মী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আমলা, ব্যবসায়ী, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, উকিল, মোক্তাররা প্রতিবাদের মিছিল করে। মিছিল মানে দাবি। কিছু পাওয়ার দাবি, চাওয়ার দাবি।

ধীর পায়ে চৌমাথায় আসি। চৌমাথায় এক নেতা বক্তৃতা দিচ্ছে। কিছু লোকজন এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। বক্তৃতা শুনছে, শুনছে না। নেতার হাত জোরে উঠছে, পড়ছে। বন্ধুগণ...কেলেঙ্কারির পর কেলেঙ্কারি...মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে...বিশাল হিন্দু সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে...

পাবলিক খাচ্ছে ভাল। কলকাতার কথা, বা তার পাবলিকের কথা আর বোলোনা সুতপা। একটা আঙুল আকাশে তুলে তুমি যদি উপরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাক, চাদ্দিক থেকে পাবলিক গিজগিজ করে এসে ঘিরে ধরবে তোমায়। আকাশে কিছু খুঁজতে হাঁ হয়ে থাকবে।

তো সেই পাবলিক এই নেতার বক্তৃতা শুনছে। এই নেতার দলের লোকেরাও যে কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে তা খতিয়ে দেখছে না পাবলিক। তোমার জুলিয়াস সিজার মনে আছে? যে পাবলিক সিজারের বক্তৃতা শুনে হাততালি দেয়, তার জয়ধ্বনি করে, সেই পাবলিকই তো ব্রুটাসের বক্তৃতায় খেপে গিয়ে সিজারকে খুন করে ফেলে। পাবলিক-আবেগে চলে বলেই তো এটা সম্ভব।

এই পাবলিককে তৈরি করে কে বলো তো? সচেতন করে তোলে কারা? বা কারা খেপিয়ে দেয়? খবরের কাগজওয়ালারাই তো? তারা যেমনভাবে নাড়ায়, অধিকাংশ পাবলিক সেইভাবে নাড়া খায়। রেডিও, টিভি বা সাহিত্য টাহিত্য পাবলিককে দোল্ দেয়, বোল দেয়। নিজের লুকনো স্বার্থ সিদ্ধি করার কায়দা। এটা তাদের করতেই হয়।

আবার আসি আমাদের কথায়।

আমি যশোর রোডের অ্যাসফল্ট্ দাপিয়ে তোমার হাত ধরে কি গান গাইতাম মনে আছে সুতপা? জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না, তুমি বাঁ হাতে চিমটি কেটে বলতে, কি নাটকের মহড়া দিচ্ছ বাবলু?

গলা কাঁপিয়ে বলি আমি, আসলে ভালবাসা খুবই সেন্সেটিভ তো, সব সময় তাড়া করে। চলো সুতপা, আমরা ঘর বাঁধি।

তুমি হাসতে হাসতে বললে, বাবলু, আবেগে চলবে না। ভাববে, কোনো কিছু করার আগে ভেবে দেখবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে তোমার সামান্য চাকরির উপর ভরসা করে, রাস্তায় দাঁড়াবার কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু তোমার মা-বাবা যে তোমার জন্য বর খুঁজছে। খুঁজুক। আমার পছন্দ করা ছেলে ছাড়া বিয়ে করব না আমি।

ভেবেছিলাম দারুণ মনের জোর তোমার। আমার জন্য মা-বাবাকে প্রত্যাখ্যান? খুব কম মেয়েই পারে। কিন্তু ছ'মাস পরে বুঝলাম আবেগে আমি চলি না, চলেছ তুমি।

ঝড়ের বেগে এক সন্ধ্যায় তুমি আমার হাউজিং ফ্ল্যাটে এলে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, বাবলু, অনেক ভেবে দেখলাম। সৌমেনকে বিয়ে করা ছাড়া আমার পথ নেই।

সে কি! কেন সুতপা?

সৌমেন আমাকে বাধ্য করিয়েছে।

মানে?

আর কোনো কথা না বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। আজও আমি বুঝতে পারি নি সৌমেনকে কেন বিয়ে করতে বাধ্য হলে? নানাদিক দিয়ে আমি ভেবে দেখেছি। কোনো উত্তর পাইনি। একবার ভেবেছি হয়তো সৌমেনের বাচ্চা তোমার পেটে? কিন্তু আজও তো তুমি নিঃসন্তানা সুতপা।

পরে ভেবেছি এটা তোমার ভাবাবেগ। আবেগ অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজন। ক্ষুদিরামের প্রাণ দেবার মতো আবেগ, নকশাল আন্দোলনে হাজার হাজার যুবকের বন্দুকের নলের সামনে বুক চিতিয়ে দেবার আবেগ আজও মহত্বময়। কিন্তু তোমার এই ঘটনা তো সেই আবেগের নয় সুতপা। তলে তলে তুমি জীবনের গ্যারান্টি খুঁজেছ। সৌমেনকে সেই জন্য তোমার বিয়ে করা।

এভাবে আমার দ্বিপাদ রাখার ভূমি সরে যায় পায়ের তলা থেকে। তুমি মুখে এক, কাজে আরেক বুলি আউড়ে সরে গেলে দূরে, নিরাপত্তার জন্য, ভোগ-বিলাসের মোহে।

পেছনে ফেলে-আসা নেতার গলা শোনা যাচ্ছে মাইকে, অনেক দূর থেকে— বন্ধুগণ, আমি মূল্যবোধের রাজনীতির জন্য প্রাণ দিতে পারি। এই নেতা সেই নেতা সুতপা, যিনি আই-এ-এস অফিসারের জামার কলার চেপে ধরেছিলেন, আই-পি-এস অফিসারের গালে কালি মাখিয়েছিলেন, থানার ওসির চেয়ারে ছাগল তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু নারীকে তন্দুরে ফেলে খুন বা কুমিরের পেটে ছুঁড়ে দেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেন নি। মূল্যবোধের রাজনীতি বুঝি অদ্দুর অব্দি হাত বাড়ায় না। সেই রাজনীতিরও আছে আরেক সূক্ষ্ম রাজনীতি।

ওই রাজনীতির সঙ্গে তোমার ক্রিয়াকর্মের কদ্দুর তফাৎ সুতপা? সম্ভবত তফাৎ নেই। তুমিও এই নেতার মতো নিজের কোলে ঝোল টানতে সুদক্ষ।

এই পরিস্থিতির ভেতর আমি একক একলব্য, এক মনে এখনও খোঁজ করে চলেছি দ্বিপাদভূমি। কিন্তু পাচ্ছি কই? চাদ্দিকে যে ফাঁদ পাতা। একটু বেসামাল হলেই রক্ষে নেই। বাধ্য হয়ে আমাকে নিয়ে পালাতে থাকি।

পোঁ পোঁ পোঁ, গাড়ির হর্ন

টুং টাং, টুং টাং, রিক্সার ঘন্টি

ঘটাং ঘট, ঘটাং ঘট, ট্রামের আওয়াজ

হেই খবরদার হেই, ঝাঁকাওয়ালা

যাবেন? একেবারে নতুন।

একটা লোক সামনে। ইসারা দেয়। চোখে তার আলতা রং। আমি দ্রুত গলি পার হই। বলতে গেলে সাঁতরাই। চোর বদমাশ, পুলিস-দারোগা, কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক, ছাত্র-শিক্ষক, কেরানি চাপরাশিদের ভীড় ঠেলে এগিয়ে যাই। এখানে আনন্দ করে, আনন্দ করায়। আনন্দের সংস্পর্শে সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস। তিন পুরুষ ধ্বংস। আসলে নাকি ভালোবাসা। ভালোবাসা-বাসি। ভালোবাসা। তার মানে নিরাপদ আশ্রয়। সবাই বলছে আশ্রয় চাই। আশ্রয় দাও।

আসল ব্যাপার আরো ভেতরে। এক বিশ্ব এক মেরুর কৌশল এটা। একটা জাতিকে চারদিক থেকে দুর্বল, অসুস্থ করে দিতে পারলে, অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে পারলে, অথবা ভোগবিলাসে মজিয়ে রাখতে পারলে, ব্যক্তিস্বাধীনতার গালভরা কথা দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারলে কেল্লা ফতে।

বাপ ছেলেকে দেখবে না। ছেলে বাপকে দেখবে না। স্বামী স্ত্রী নয়, লিভ্ টুগেদার। দয়া-মায়া বলে ভাবালুতাকে খুন করা হবে।

কণাবৌদি ও কল্যাণদার কথা ভাব তো সুতপা। টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেসিন, কনটেসার আরামের মধ্যেও তারা সুখ পাচ্ছে না, শান্তি পাচ্ছে না। কল্যাণদাকে অনেক রাতে বাড়ি ফিরতে হয়, কণাবৌদিকে অনেক রাত অব্দি সুরেশবাবুকে সঙ্গ দিতে হয়। কল্যাণদাকে অন্যভাবে টাকা রোজগার করতে হয়। কণাবৌদিকে অন্যভাবে মনের খোরাক মেটাতে হয়।

সুতপা তুমি? তোমার ব্যাপারটাও তো সেই রকম। সৌমেন অফিস, বাড়ি, নারী এবং সম্পদের নেশায় নাকি মশগুল। তুমি নাকি অ্যাডজাস্ট্ করতে পারছ না। প্রতিবাদ করলে নাকি গায়ে হাত তোলে। রিভলবার দিয়ে খুন করতে চায়।

লিখেছ তুমি ডিভোর্স স্যুট ফাইল করেছ। সৌমেন নাকি বিশ্বাসী চরিত্রের পুরুষ নয়, ভোগবাদী জীবন ওকে গ্রাস করেছে। তুমি সুখী হতে চেয়েছিলে। একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্য চেয়েছিলে। কিন্তু নিষ্ঠুর বেনিয়া জীবনকে নাকি ঘৃণা কর।

আসলে অড্ কম্বিনেশন সুতপা। তোমার আর সৌমেনের মিলন ছিল অড্। তা যে টেকে না। এবং স্বাভাবিকভাবে টেকেও নি। তাছাড়া সৌমেনের এটা কাঁচা পয়সার নেশা। সেই নেশা সৌমেনকে কেন, অনেককেই অন্য মানুষ করে দেয়।

সৌমেন তো টাকার পালঙ্কে শুয়ে থাকবেই। পুলিশ মস্তান রাজনৈতিক দল আমলারা ওর হাতের মুঠোতে থাকবে। অন্যান্য প্রোপার্টির মতো তুমিও ওর প্রোপার্টি বলে দুঃখ করেছ।

একটু ভুল হল সুতপা। সম্পত্তি আঁকড়ে রাখে মানুষ। তোমাকে তো সে আঁকড়ে রাখে নি। উপহার দিয়েছে মুক্ত জীবন। ইচ্ছে করলে তো সৌমেনের মতো তোমার জীবনকে তুলে নিতে পারতে হাতের মুঠোতে। ওর মতো তুমিও দশজন পুরুষ নিয়ে...

কিন্তু পার নি। মন সায় দেয় নি। রুচিতে বেধেছে। এসব ঘৃণা কর তুমি। লিখেছ একদিন বামপন্থী রাজনীতি করতে, বেনিয়া জীবনের বিরুদ্ধে তোমার জেহাদ ছিল। তাই ছিন্ন করতে হল সৌমেনের সম্পর্ক।

বামপন্থী আদর্শ কি এখনও তোমার ভেতরে বর্তমান সুতপা? শোষক-শোষিতের প্রাথমিক শর্তগুলো সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা আছে তো? মালিক আর শ্রমিকের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে মনে হয় তোমার সঠিক ধারণা ছিল না। না হলে সৌমেনের ঝা-চকচকে বাড়ি,

মোহরের হাঁড়ি অথবা তার অনিন্দ্যকান্তি চেহারা দেখে ভুলে গেলে কেমন করে? মুখে বামপন্থী সবাই হতে পারে, ওই পন্থাকে কিন্তু নিজের মধ্যে জারিত করে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে ক'জন?

এসব ভাবতে ভাবতে গলি পেরিয়ে আমি রাস্তায়। রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথে। ফুটপাথ অন্ধকার। অন্ধকারে অনেকে শুয়ে। সার সার মানুষ। মেয়ে, ছেলে, ভিখারী-ভিখারিণী, রিক্সাওয়ালা-ঝাঁকাওয়ালা, কুকুর, বেড়াল। আঃ-আ-আ অ্যাটকুড়ের ব্যাটা! কে? কে? চোর-চোর-চো...আমি ততক্ষণে দূরে কর্পোরেশনের আলোর নিচে। অন্ধকারে কাকে বুঝি মাড়িয়ে এলাম।

অন্ধকারে রিপু, কাম, দেহ। দেহে রোগ-মৃত্যু-জন্ম। জন্মে দুঃখ। কণাবৌদির দুঃখ, কল্যাণদার দুঃখ, তোমার দুঃখ, আমার দুঃখ, রাম-শ্যাম-যদু-মধুর দুঃখ।

আমি বাবলু বাইন। সিডিউলড্ কাস্ট। তুমি বর্ণহিন্দু সুতপা। দশ বছর দেখেছ আমায়। কাস্ট নিয়ে তোমার কোনো সেন্টিমেন্ট নেই। আমারও নেই। এ ব্যাপারে ডকুমেন্টারি এভিডেন্স আছে। তা হল তোমার বিতর্ক। সৌমেনের সঙ্গে। এখনও কিছু সংলাপ ভেতরে ধরা :—

জাত আবার কি? মানুষের তৈরি ফাঁদ, রেগে তুমি বলেছিলে। সৌমেন রাগে নি, শান্তভাবে বলেছিল, জাত না থাকলে সমাজে ল-অ্যাণ্ড-অর্ডার থাকে না। পণ্ডিতেরা শুধু শুধু জাত তৈরি করেনি। আমি বলেছিলাম, প্রজাদের শোষণ করার জন্য তখনকার শাসকরা পণ্ডিতদের দিয়ে জাত বানিয়েছিল ধর্মের আবরণ দিয়ে। ঠিক তাই, বলে তুমি আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট্ করেছিলে।

সেদিনই বুঝেছিলাম, তুমি জাত-পাতের ঊর্ধ্বে। কিন্তু ভাবালুতার ঊর্ধ্বে নও।

আমাদের পাড়ায় আমার এক বন্ধুর ছেলে যে ভাবালুতায় একটা বাচ্চাসহ সুইপারের মেয়েকে বিয়ে করল, সেই একই ভাবালুতায় এক বছর পরে তাকে তাড়িয়ে দিল। এটা কি সুতপা? ভালবাসা, নাকি নারী নিগ্রহ? ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যায় সেক্স-তাড়িত চিত্তবিভ্রম বলবে না এটাকে?

জানি এইসব ব্যাপারে তুমি সহমত পোষণ করবে। কিন্তু পারনি। মার্ক্সীয় তত্ত্বকে নিজের ভেতরে জারিত করে নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে। তাই সৌমেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হলে। পারলে না দ্বিপাদভূমিতে শক্তভাবে দাঁড়াতে।

আমিও পারিনি সুতপা। আমি ভাবি কেন পারলাম না? ভাবতে ভাবতে পার্কের বেঞ্চে গিয়ে শুয়ে পড়ি। আকাশ দেখি। আকাশটা ঝুলে পড়েছে। চারপাশটা মশারির মতো ঝোলানো। মশারিটা ফুলের, ফুল দিয়ে সাজানো। বিভ্রম চলে যেতেই বুঝলাম ওগুলো ফুল নয়, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র, যা দেখে মানুষ বিস্ময়ে অনেক কিছু ভাবে—সৃষ্টিকর্তা, ভগবান, একটা শক্তি।

ক্লান্তি নামে শরীরে। মাথা ঝিমঝিম করে। শরীরে ব্যথা, পা অবশ। শুধু ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা চিন্‌চিন্ করে। অফিস ছুটির পর অনেক হেঁটেছি। মহামিছিল ছিল। জাতীয় সংহতির মিছিল। অফিসের অনেকে মিছিলে যায় না। লজ্জা পায়। বাড়তি ঝামেলা ভাবে। ওই সময়ে তারা টিউশানি করতে পারত। টাকা কামাত। সংসারে সচ্ছলতা আনত।

অফিসে এখন সহজিয়া বাতাস। কাজ না করলে শাস্তি নেই। কামাই করলে কেউ বলার নেই। জান সুতপা, আজকাল আমাদের অটোমেটিক মাইনে হয়। প্রমোশন হয়। মাগ্‌গী ভাতা বাড়ে। পে-কমিশন বসে। কলিগরা জল খায়, চা খায়, খবরের কাগজ পড়ে, সিগারেট ধরায়, পাবলিককে অন্যদিন আসার জন্য নির্দেশ দেয়।

সমিতির নেতৃত্ব জ্বালাময়ী ভাষণ দেয়, ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করুন, সময়ে আসুন, সময়ে বাড়ি যান। চিফ সেক্রেটারি সার্কুলার দেয়, কাজ না করলে শাস্তি হবে, কাজের হিসেব দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ জানান, কষ্ট করে গ্রাম থেকে জনগণ কাজের জন্য আসে, কিছু না পারুন অন্তত একটু কথা বলুন। কথা শুনুন।

আমার বিবেকে বাধে। কিছু বলতে চাইলে ওরা থামিয়ে দেয়, দেখেন না ট্রেনে, বাসে, ব্যাঙ্কে, অন্য অফিসে আমি বুরবাক বনে যাই। এটা কি উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে নয় সুতপা?

অবাক লাগে। পৃথিবীটা কেমন পাল্টে যাচ্ছে। আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে। উপকার করলে প্রতিদান চাইছে অন্যভাবে।

আর অফিসারদের কথা? আমলাদের কথা? কত কাঠখড় পুড়িয়ে ওরা অফিসার হয়েছে না? ওদের ক্ষমতা খর্ব করা হল কেন? ওরাই তো অফিস বস্। গোপন রিপোর্টে অধীনস্থ কর্মচারির ইনক্রিমেন্ট বন্ধ, সাসপেণ্ড, বরখাস্ত প্রমোশন ট্রান্সফার করতে পারবে না কেন? তাহলে উচ্ছন্নে যাক প্রশাসন, গোল্লায় যাক আইন-টাইন। বরং নিজেদের আখের গুছাতে পারলে...

তাহলে আমি দ্বিপাদভূমি পাব কোথায়? এক টুকরো শক্ত সবল মাটি? তুমিই বা পাবে কিভাবে? আমরা যে ব্যবস্থায় আছি, যে পরিবেশ বা অবস্থানে আছি, তাতে দ্বিপাদভূমিতে পা রাখার সুযোগ নেই, পরিস্থিতি নেই, কারো সমর্থন নেই, সমষ্টিগত আওয়াজ নেই। এটা মধ্য-সুখভোগীদের লীলাক্ষেত্র।

যদি কিছু মনে না কর সুতপা তাহলে একটা প্রস্তাব রাখি। চল যাই গ্রামের দেশে। চাকরি-বাকরি ছেড়ে-ছুড়ে, যা টাকা-পয়সা পাব, বা তোমার গহনাপত্তর যা আছে, তা দিয়ে গ্রামে গড়ে তুলি দ্বিপাদ রাখার একটা ভূমিস্থল।

দেখবে আমাদের চামড়া খুলে গেছে। লজ্জা খসে গেছে। অহংকার টুটে গেছে। আমরা নিরাভরণ হয়ে মুক্ত পৃথিবী তৈরির কাজে একনিষ্ঠ হতে পারব। যাবে সুতপা? সব ছেড়ে-ছুড়ে শহীদুল মনোরঞ্জনদের গ্রামে গিয়ে আবার নতুনভাবে...

বেলোয়ারি

সমরেশ মজুমদার

মেয়েটি বিষণ্ণ কিন্তু মলিন নয়, বলল, 'তুমি আমাকে ভালবাস না।' ছেলেটি, এই অবস্থায় ছেলেরা যেমন হয়, কিছুটা নার্ভাস আবার প্রতিবাদে সোচ্চার অথচ মুখে কোনও শব্দ ঠিকঠাক যোগায় না, শুধু চাহনিতে বোঝাল, কথাটা ঠিক নয়।

মেয়েটি পায়ে-পায়ে সরে এল ছেলেটির নিশ্বাসের কাছে, 'তা হলে আমার আঁচল এমন বিবর্ণ কেন? কেন সব রং হারিয়ে গেল, অথচ তোমার চোখে পড়ল না!'

ছেলেটি বলল, 'এই কথা! আমি পৃথিবীর সব ফুল এনে দিচ্ছি, তারা রঙের সঙ্গে গন্ধও দেবে।'

মেয়েটি ধীরে-ধীরে মাথা দোলাল, যেমন করে বাতাস না-বইলেও দেবদারুর পাতা কাঁপে, 'সে তো আমি নিজেই আনতে পারি। পৃথিবীর ফুলেরা তো ছটফট করছে আমার স্পর্শ পেতে, সে আমি চাই না।'

ছেলেটি এ-বার যেন কিছুটা নিঃস্ব, তার ঝুলিতে অন্যতর বিস্ময় নেই, যা মেয়েটিকে নির্বাক করে দেবে। মেয়েটি মুখ তুলল, তার বুকের ঈষৎ বাইরে যেমন করে সূর্য ওঠার আগে পাখিরা প্রথম ডাক দেয়, 'ওই বুকে যদি এত ভালবাসা তা হলে আকাশটার দিকে তাকাও। ও কেন আমার আঁচলের চেয়ে সুন্দর হবে? পারো না ছোট-ছোট হিরের মতো সবকটা তারাকে ওর কাছ থেকে কেড়ে এনে আমার আঁচলে ঢেলে দিতে? আমি ওদের বেঁধে রাখব এখানে, বন্ধন সুন্দর করব।'

ছেলেটি এ-বার হাসল। যেন এক-লক্ষ ঢেউ আর সামুদ্রিক ঝড় ডিঙ্গিয়ে, তার নৌকা সদ্য মাটি ছুঁয়েছে। বলল, 'উহুঁ, আমি কখনও ভাবতে পারি না তোমার আঁচল কুণ্ঠিত হয়ে আছে ভারে।'

মেয়েটি বলল, 'বেশ, আমি ওই ছোট-ছোট তারাদের আমার আঁচলে বসিয়ে দেব এমন করে যেন পূর্ণিমার আকাশ হার মানে।'

মেয়েটির বুক এ-বার অঞ্জলির মতো ছেলেটির হৃদয় স্পর্শ করছে। ছেলেটি মাথা নাড়ল, 'না অত ছোটয়, যা কিনা টুকরো-টুকরো, মন ভরবে না আমার। যদি এনে দিতেই হয় তা হলে চাঁদটাকেই পেড়ে আনব আকাশ থেকে। বসিয়ে দেব তোমার আঁচলে'।

মেয়েটি বলল, 'যার বুক জুড়ে এমন চাঁদ তার অন্য চাঁদে কী দরকার?' ছেলেটি দু-হাতের বেড়ে নিজেকে সমর্পণ করার মুহূর্তে বলল, 'তবে যে বলছিলে আমি তোমায় ভালবাসি না!'

মেয়েটি গ্রহণ পূর্ণ করল, 'আমি যে আবার নতুন করে ভালবাসলাম, তা-ই'।

তিস্তা বলল, 'কী রকম বোকা-বোকা ব্যাপার সব'।

সুব্রত কিন্তু আচ্ছন্ন ছিল। তিস্তার কথা কানে যেতেই মুখ তুলল, 'বোকা বলছ কেন? প্রেমের স্বাভাবিক এই অভিব্যক্তি তোমার পছন্দ হয়নি?'

'স্বাভাবিক?' তিস্তার চশমার কাচ চক-চক করে উঠল, 'তোমরা ছেলেরা একটু নরম কথা পেলেই গলে যাও। তাই তোমাদের প্রেমে পড়তে সময় লাগে না।'

সুব্রত কথার সুতো সোজা করতে চাইল, 'যা-ই বলো, ছেলে-মেয়ে দুটো কিন্তু খুব ভাল অভিনয় করেছে। এই নেপালি গানটাকে নাটক করা খুব সোজা নয়।' কথাটা শেষ করে সুব্রত আর একবার তিস্তার দিকে তাকাল। লম্বা, ঈষৎ ডিম্বাটে মুখ, ফেঁপে ফুলে-থাকা কাঁধ-ছোঁয়া চুল নলেগাঁও জঙ্গলের মতো কালো, হাঁটে যখন, তখন সুব্রতর বুকে শিউলি ঝরার শব্দ হয়। এখন এখানে শীত দাঁত শানায় ভোর রাতে, দিনভর একটা ওম ছড়ানো থাকে। না-গরম না-শীত। পাহাড়গুলো যেন মেজে-ঘসে চমৎকার ফিটফাট হয়ে আছে। বিয়ের ক-দিন আগে থেকে মেয়েরা যেমন নিজেদের সাজায়। তাই এই সন্ধে-পার-হব-হব সময়টায় কুয়াশা নেই, মেঘ নেই এবং তিস্তার শরীরে কোনও পশমের বাড়তি আবরণ নেই। হাল্কা-নীল শাড়ি আর সাদা ব্লাউজে ওর ভরাট শরীর বর্ষার নদীর মতো। বুকের দিকে তাকালেই মুখ খোলার আগে টইটম্বুর গ্রান্ডিফ্লোরার কথা মনে আসে। তিস্তার পাশে হাঁটলেই সুব্রত অবশ হয়ে যায়। মাত্র আটমাসের আলাপ। আটমাস ধরে একটার-পর-একটা ঘর তুলতে-তুলতে সম্পূর্ণ হয়েছে বুনন, শুধু বোতাম বসানো বাকি।

বাজার-এলাকা ছাড়ালেই পৃথিবীটা শূন্য। তখন কোনও মানুষকে আর মানুষ বলেই মনে হয় না। সুব্রত হাত বাড়িয়ে তিস্তার আঙুল তুলে নিল। এত নরম, যেন রক্তের চলাচল অনুভব করা যায়। তিস্তা বলল, 'কী হচ্ছে কী?'

'কেন?'

'কেউ দেখে ফেলবে।'

'ফেলুক।'

'আহা, তোমার আর কী! আমাকে মেয়ে-কলেজে পড়াতে হয়।'

'এত রাত্রে কেউ তোমাকে দ্যাখার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই।' তিস্তা অবশ্য হাত সরিয়ে নেয়নি, কিন্তু নিজের আঙুল নিষ্ক্রিয় রেখেছিল। এইরকম নিরাসক্ত তিস্তাই হতে পারে। আটমাসের প্রতিটি দিনে সুব্রত বুঝেছে সে যতটা তিস্তাকে কামনা করে, তার চেয়ে কম তিস্তা তাকে ভালবাসে না। অনেক ছোট-বড় প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে এইকরম ভাবতে পারার। অথচ তিস্তা যেন সেই আখরোটের মতো, যা হিরের চেয়েও শক্ত। সুব্রতর হাজার উচ্ছ্বাস ওকে শুধু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়, আপ্লুত করে না। এখন তো বিবাহের দিন মোটামুটি স্থির। এখনও তার স্বাধীনতা শুধু হাত ধরায়, কখনও-কখনও চুম্বনে। শেষেরটিতে বড় আপত্তি তিস্তার। অথচ মাঝে-মাঝেই তিস্তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের হাড় করে নেবার বাসনা তীব্র হয় সুব্রতর। ওর বুকের রং গন্ধ স্বাদ আকণ্ঠ গ্রহণ করার জন্য আকুলিবিকুলি চলে রক্তে। একবার ওর খোলা কোমরের নরম খাঁজে আঙুল রেখেছিল সুব্রত। চমকে সরে গিয়েছিল তিস্তা, বলেছিল, 'এমন কোরো না।'

'কেন?'

'আমাদের সঙ্গে সারমেয়র কী তফাৎ থাকবে তা হলে?'

স্তম্ভিত সুব্রত কোনও রকমে বলতে পেরেছিল, 'কী আশ্চর্য, যাকে ভালবাসি তাকে মনের মতো করে আদর করতে পারব না?'

'যাকে ভালবাস বলে মনে হয় তার শরীর কি শুধু ভোগের জন্যেই?'

'ভোগ বলছ কেন?'

'সুব্রত, সংযত হলে সবকিছুই স্থির থাকে। প্লিজ। এ-বিষয়ে কথা বলতে আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমরা অন্য-কিছু নিয়ে কথা বলি, এসো।' তিস্তা মুখ নামিয়েছিল। নামিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিল বুক নিংড়ে।

কিন্তু, সেই-যে প্রবাদ, মাটির পাত্র একসময় পাষাণকে ক্ষইয়ে দেয়, সুব্রত তিস্তার নরম এবং উষ্ণ ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে পেরেছিল একদিন। এবং ওইসময় তাকে সতর্ক থাকতে হত যাতে একটুও বাড়াবাড়ি না-হয়, যা কিনা অমানুষ করে তেমন-কোনও আচরণ না-হয়ে যায়। তিস্তার চারদিকে বাঁধ, সেই বাঁধের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত জলের মতো বয়ে যেতে হয় সুব্রতকে।

আজও হাঁটতে-হাঁটতে এই কথাগুলো চট-চট করছিল সুব্রতর মনে। ওর হাতে তিস্তার আঙুল। আর মাথার ওপর প্রতিপদের চাঁদ হ্যারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষায়। বাঁক পেরোতেই ওদের পা শ্লথ হল। একটু এগিয়ে রাস্তার কার্নিশ ঘেঁষে দাঁড়াল ওরা। পেছনে পাহাড়, সামনে অতলান্ত খাদ। সেই খাদ ডিঙিয়ে ছোট-ছোট পাহাড়কে টিলার মতো দ্যাখায় এখান থেকে। ডিমের খোলের মতো জোছনায় মাখামাখি চৌদিক। সেই টিলাগুলোকে বেড় দিয়ে দুটো নদী এসে মিলেছে সামনে। চকচকে নয়, কেমন ফ্যাকাসে, সাদা দেখাচ্ছে তাদের শরীর।

কবে কখন কোন পাহাড়ের বরফ গলে ঝরনা, ঝরনা জড়ো হয়ে বড় ধারা নেমেছিল একদিন। বড় পাথর ভেঙে নুড়ি করে-করে উত্তাল হয়ে ছুটে আসছিল নিচে। সহসা পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল কোনও কঠিন বাধা, ধারা বিভক্ত হল। দুই বিনুনির মতো দু-দিকে চলে গেল তারা। এ জানে না ওর খবর, ও পায় না একে। তারপর অনেক পথ ডিঙিয়ে আচমকা ওইখানে এসে দেখা হল দু-জনের। একজন আর-একজনকে দেখে লাস্যভরে বলে উঠল, 'থিস্তা?' এই পাহাড়ি শব্দটির সরল অর্থ, 'এতদিন কোথায় ছিলে?' সেই থেকে যাকে শুধনো হল, যার শরীর একটু গভীর, তার নাম হয়ে গেল তিস্তা। আর যে শুধাল, যার শরীরে দেখার আনন্দে রং বেজেছে, তার নাম রাখা হল রঙ্গিত। একজনের জল সাদা, অন্যজনের জল ঘোলা, পুরুষ এবং প্রকৃতির যেমনটি হয়। রঙ্গিতকে গ্রাস করে নিল তিস্তা।

এ-গল্প এখানে এসে নানান মুখে শোনা। সুব্রতরও যেমন, তিস্তারও তাই। এই পথে হেঁটে গেলে দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে, নিচের ঝাপসা নদীদুটো দেখতে ভারি ভাল লাগে। একদিন সুব্রত বলেছিল, 'চলো, রাস্তা খুঁজে নিয়ে ওদের কাছ থেকে ঘুরে আসি। তিস্তা মাথা নেড়েছিল, 'না। দূরে আছে বলেই ওরা রহস্যময়, কাছে গেলে হয়তো আর-পাঁচটা নদীর মতো সাধারণ হয়ে যাবে।'

আপত্তি করেছিল সুব্রত, 'বিশ্বাস করি না, তিস্তা কখনওই সাধারণ হতে পারে না।'

'কেন নয়? তারও গঠন অন্য-পাঁচজনের মতনই। ভালবাসা দিয়েই তো আমরা রহস্যময় করে তুলি।' বলে হেসে ফেলেছিল তিস্তা।

চমকে ফিরে তাকিয়েছিল সুব্রত, কিন্তু মন মানেনি। মনে-মনে জেনেছিল তিস্তার রহস্য কখনও শেষ হবার নয়। আকাশের মতো—সমুদ্র নয়, কারণ তারও তল আছে।

আজ প্রতিপদের জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে রঙ্গিত-তিস্তার সঙ্গমের দিকে তাকিয়ে সুব্রত ওর কাঁধ স্পর্শ করল। একটু কি কাঁপুনি জমল তিস্তার শরীরে?

তিস্তা নিচু গলায় বলল, 'তুমি ঠিক ওইরকম, রঙ্গিতের মতো।'

সুব্রতর কণ্ঠ গভীর হল, 'তোমায় বড় আদর করতে ইচ্ছে করছে।'

তিস্তা তাকাল। চশমাও মাঝে-মাঝে গয়নার মতো সুন্দর করে কাউকে। আর ওইসময় ইঞ্জিনের শব্দ বাজল পাহাড়ে। একটা গাড়ি নামছে ওপর থেকে। চকিতে সরে গেল তিস্তা, বলল 'কী যে করো!'

সুব্রত মনে-মনে বলল, আর কটা দিন, তিরিশদিনে যদি মাস হয়—।

ওরা চুপচাপ ওপরে উঠে আসছিল। প্রথম-প্রথম এইরকম চড়াই ভাঙতে অসুবিধে হত সুব্রতর। এই শহরে তিস্তার বাস অবশ্য কিছু আগে থেকে। ওর কলেজ বাসস্থান থেকে মিনিট-দশেক হাঁটলেই। এই শহরে এখন বাড়ি পাওয়া মুশকিল। চন্দ্রালোক হাউসের পিছনে ছোট্ট বাংলো বাড়িটা পেয়ে সুবিধে হয়েছে তিস্তার। ওর এক সহকর্মিনীর সঙ্গে একত্রে থাকার সুবিধে অনেক। মহিলা বয়স্কা, এবং, বোধহয়, শুচিবাইগ্রস্ত। এই আটমাসে একটিবারের জন্যে সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি সুব্রত। তিস্তা জানিয়েছে মহিলা আত্মীয় না-হলে কারও প্রবেশ পছন্দ করে না। একজন স্বাধীনচেতা অধ্যাপিকার এই মানসিকতা কী করে মেনে নেয় তিস্তা, সুব্রত জানে না। মহিলাকে দেখে তার পুরুষ-বিদ্বেষী বলেই মনে হয়। কিন্তু ওইটুকু বাদ দিলে তিস্তা ওখানে বেশ আরামে থাকে। শীতের ছুটি পড়লেই চলে যায় বরানগরে। বাপ-মায়ের বড় আদুরে মেয়ে সে। ভবানীপুর থেকে সুব্রতর বাড়ির লোক সেখানে গিয়ে শেষ তথ্যটি জেনে এসেছে।

সুব্রতর চাকরি সরকারি হাসপাতালে। ডাক্তার হিসেবে খ্যাতি জমেছে বেশ। প্রেমে পড়ার সময় পায়নি এতকাল পড়াশোনা এবং কাজের চাপে। এই পাহাড়ি শহরে এসে যার ঢেউ সব এলোমেলো করে দিল, সে ওই তিস্তা। বরানগরের মেয়ের নাম পাহাড়ি নদীর সঙ্গে মিলিয়ে যিনি রেখেছিলেন তিনি অবশ্যই রসিক। এই আটমাস ধরে হিসেবটা একটু-একটু করে মিলিয়ে আনছিল সুব্রত। এখন চূড়ান্ত ক্ষণের অপেক্ষা।

তিস্তার বাড়ি যদি এই পাহাড়ে, তা হলে সুব্রতর ওই পাহাড়ে। মাঝখানে রাস্তাটা চিরে গেছে দু-দিকে। অফিসের সূত্রেই পাওয়া একতলা প্রায়-কাচের বাড়িটা এখন একটু-একটু করে সেজে উঠেছে। সামনের ছোট বাগানে বীরবাহাদুর রকমারি ফুলের আসর সাজিয়েছে। দুটো কর্পূরগাছের ফাঁক দিয়ে ভ্যালিটাকে অনেকখানি চোখের সামনে ধরা যায়। বর্ষার মেঘগুলো নেমে আসে সেখানে। ভোরে আকাশ যখনও মেঘে মুখ ধোয়নি, তখন কাঞ্চনজঙ্ঘাকে তাজমহলের চেয়ে সুন্দর দ্যাখায়। আর আছে সুব্রতর প্রিয় ফুল গ্রান্ডিফ্লোরা। বিরাট কুঁড়ি যখন পূর্ণ হয়ে একটু-একটু করে মুখ খুলতে থাকে, তখন বীরবাহাদুর হাতের নাগালে যাকে পায় তাকেই সুতো দিয়ে বেঁধে আসে। মুখ বন্ধ, তাই পেটপোয়াতি মেয়ের মতো আদুরে হয়ে যায় ফুলগুলো। রাত বাড়লেই ওদের শরীর থেকে গন্ধ চুঁইয়ে পড়ে সমস্ত বাগানে, ঘরে-ঘরে। এই বাড়ি এখন যেটুকু অসম্পূর্ণ, তা তিস্তা এলেই পূর্ণতা পাবে।

তিস্তা অবশ্য এখানে এসেছে। রোদ-জড়ানো বিকেলে বাগানের-মধ্যে-ঢুকে-যাওয়া বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে বীরবাহাদুরের হাতের চা খেয়ে গেছে। ঘরে ঢোকেনি। সুব্রত অনুরোধ করলে হাত তুলে থামিয়েছিল, 'সবই যদি এখন জেনে যাই, তা হলে অধিকার নিয়ে যখন আসব, তখন জানার যে কিছু থাকবে না।'

সুব্রত বলেছিল, 'অধিকার কি এখন নেই?'

তিস্তা বলেছিল, 'চোরের মতো।'

কথা বাড়ায়নি সুব্রত। তিস্তার জিভে একধরনের বাঁকা ছুরি আছে, ঢুকে যাওয়ার আগে তার অস্তিত্ব বোঝা গেলে অসাড় হয়ে যেতে হয়।

এই শহরের প্রশংসা করেছিল তিস্তা। মানুষের লোভ সীমিত, চুরিচামারি হয় না বড়-একটা। মেয়েদের বেইজ্জত করার ঘটনা শোনা যায় না। যা-কিছু অসংলগ্ন তা ঘটে ট্যুরিস্টরা এলে। কলকাতার কোনও ছেলে এখানকার মেয়েদের অসম্মান করলে পাহাড়ের মানুষরা তাকে ছিঁড়ে ফেলে, এ-রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল কিছুদিন আগে। তিস্তা বলেছিল, 'ঠিক হয়েছে। বরাহের উপযুক্ত শাস্তি।'

সুব্রত বিস্মিত 'বরাহ?'

তিস্তা কঠিন গলায় জবাব দিয়েছিল, 'তা-ই। সমস্ত কলকাতাটাই তো এখন বরাহনগর। তা থেকে মাঝে-মাঝে এইসব বরাহ ছিটকে আসে।'

মনে করিয়ে দিয়েছিল সুব্রত, 'তোমার বাড়ি কিন্তু বরাহনগরে।'

'তাই তো আমি এতটা বলতে পারি।' তিস্তা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

পিচের রাস্তাটা ছেড়ে অনেকটা নিচে নামতে হয় তিস্তাকে। দু-পাশে বড়-বড় গাছের সারি। বিকেল হলেই জায়গাটায় অন্ধকার নামে। যদিও আকাশে চাঁদ, তবু এখানে জ্যোৎস্না ঢোকেনি। ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে জ্বালল তিস্তা। সুব্রত রোজ এখান থেকেই ফিরে যায়। আজ আরও কয়েক-পা হাঁটতে ইচ্ছে করছিল, বলল, 'দরজা অবধি পৌঁছে দিই?'

তিস্তা বলল, 'তোমাকে আবার উঠতে হবে।'

'তা হোক।'

সুব্রতর হাত থেকে অনেকক্ষণ আঙুল সরিয়ে নিয়েছে তিস্তা। শেষবার স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছিল সুব্রতর। তিস্তা রাজি হল না, কিন্তু মুখে কোনও কথাও বলল না। মোড় ঘুরে থামবিহীন লনটার সামনে আসতেই চোখে পড়ল, বাংলোটা নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনও জানলায় আলোর ছিটে লেগে নেই। চট করে হানাবাড়ির মতো মনে হয়।

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, 'এত অন্ধকার কেন?'

তিস্তা বলল, 'আমাকেই আলো জ্বালতে হবে।'

'কেন, তিনি কোথায়?'

'ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছেন। আজ রাত্রে শিলিগুড়িতে থাকবেন।'

'সে কী! তুমি একা থাকবে নাকি এত বড় বাড়িতে?'

'কেন? এটা তো আর বরাহনগর নয়। তা ছাড়া কাঞ্চি আছে ও-পাশে।' কিন্তু সুব্রতর এটা ভাল লাগছিল না। এই শহরে কোনও ঘটনা ঘটেনি মানে এই নয় যে কখনও ঘটবে না। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা কী হতে পারে? তিস্তা সুব্রতর বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাবে না, আবার সুব্রতকে এখানে পাহারাও রাখবে না। দরজা খুলে তিস্তা ঘুরে দাঁড়াল। তার বাঁ-হাত সুইচে, কিন্তু আলো জ্বলছে না। এখানে লোডশেডিং হয় না বলা চলে। তিস্তা বিরক্ত গলায় বলল, 'আলোটার আবার কী হল আজকে।'

'মেইন সুইচটা কোথায়?'

'কেন?'

'ফিউজ তারটা পাল্টাতে হতে পারে।'

'তুমি এ-সব জানো?'

সুব্রত উত্তর দিল না। তিস্তার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে ঘরের দেওয়ালে আলো ফেলতে লাগল। পাশের ঘরে সেটাকে পাওয়া গেল। লক নামিয়ে আঙুল দিয়ে স্ক্রু খুলে দেখল, সন্দেহটা ঠিক। এখন তার পাওয়া যায় কোথায়? সে তিস্তাকে কথাটা বলতে এক-টুকরো জোগাড় হল। ঠিকঠাক করে দিতেই আলো জ্বলে উঠল চোখ ধাঁধিয়ে। তিস্তা বলল, 'ধন্যবাদ।'

সুব্রত বলল, 'শুকনো ধন্যবাদে চিড়ে ভেজে না। চা খাওয়াতে হবে।'
তিস্তা বিব্রত গলায় জবাব দিল, 'এত রাত্রে চা খেতে হবে না।'
'এমনকিছু রাত হয়নি।'
ঠিক সেই মুহূর্তে চটির শব্দ পাওয়া গেল, 'কৌন?'
দ্রুত সুব্রতকে ও-পাশের ঘরে ঠেলে দিল তিস্তা, 'কে? কাঞ্ছি?'
'জি মেমসাব।'
'তোমার খাওয়া হয়ে গেছে?'
'জি।'
'শুয়ে পড়ো তুমি।'
এই ঘরে চমৎকার জ্যোৎস্না কিলবিল করছে। এটাই যে তিস্তার শোওয়ার ঘর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। টেবিলে যে ফ্রেমের ছবিতে তিস্তা হাসছে তা চাঁদের আলোতেও বোঝা যায়। কিছুক্ষণ বাদেই তিস্তা এল, বেশ নার্ভাস গলায় বলল, 'এটা কী করলে বলো তো? যদি দেখে ফেলত!'
'আফটার অল তোমাদের ঝি। ওকে ভয় করার কী আছে?'
'মিসেস সোম জেনে যেতেন। ব্যস হয়ে যেত।'
'পাস্ট ইজ পাস্ট। এখন চা খাওয়াও।'
'দোহাই, প্লিজ, আজ আর বায়না কোরো না। বিয়ের পর তুমি যত চাও, তত চা করে দেব।' দ্রুত এগিয়ে এসে তিস্তা যেন অনুনয় এবং প্রতিজ্ঞা করল।
মজা লাগছিল সুব্রতর। এই প্রথম তিস্তাকে সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে এমন। সে দু-হাতে ওকে জড়িয়ে বুকে টানল, 'তা হলে অন্য-কিছু খাওয়াও।' তিস্তার যেন উভয়সংকট। কোনওরকমে বলল, 'তুমি একটা যাচ্ছেতাই। তাড়াতাড়ি খাও।'
সুব্রত তিস্তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। উষ্ণ, জবাফুলের কেশরের মতো গভীর নরম স্বাদ। ঠোঁট সরাচ্ছিল না সুব্রত। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হাসফাঁস করতে লাগল তিস্তা। কিন্তু সুব্রত তার কাঁধ দু-হাতে আঁকড়ে রেখেছে, মুখের চাপে মুখ। কোনওরকমে ঠোঁট সরিয়ে তিস্তা বলল, 'রাক্ষস। এ-ভাবে কেউ চুমু খায়?'
'কীভাবে খায়?' তিস্তার শরীরের গন্ধ এবং ঠোঁটের স্বাদ সুব্রতকে ক্রমশ উষ্ণ করে তুলছিল। সে তিস্তার গলায় ঠোঁট রেখে শুধাল, 'এইভাবে'?
দু-হাতে ওর শরীরের কাঁপন অনুভব করল সুব্রত, তিস্তা অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'জানি না।'
'তিস্তা, তোমায় না-পেলে আমি মরে যাব।'
'লক্ষ্মীটি, অধৈর্য হোয়ো না, আর-কটা দিন অপেক্ষা করো, প্লিজ।'
'কেন, এখন নয় কেন?'
'এখন যদি সব নিয়ে নাও, তা হলে বিয়ের পর আমি তোমাকে কী দেব? আমি তো আর নতুন থাকব না।' দু-হাতে সুব্রতর মাথা নিজের বুক থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে হেরে যাচ্ছিল তিস্তা।
'আমাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। যে-দিন আমরা ভালবেসেছি সে-দিনই তো বিয়ে। এতদিন আমাদের কালরাত্রি গেল।' দু-চোখে শুধু তিস্তা আর তিস্তা। ওর বুকের গভীর খাদে ঠোঁট ডুবিয়ে দিতে চাইছিল সুব্রত। জামার ধাতব বাঁধনকে বড় নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল তার।

'এই, আমার জামা ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

'যাক। বদলে একহাজার জামা দেব।'

বাইরের আবরণ যখন ঘুচল, তখনও ভেতরের আগল সুকঠিন। সুব্রত আনাড়ির মতো তার জট খুলতে ব্যস্ত। একটু-একটু করে তিস্তার শরীর শিথিল হয়ে এসেছে। শেষবার বলল, 'তুমি বাড়ি ফিরবে না?'

'ফিরব।'

'না।'

'মানে?'

'এই রাত্রে এ-সব করে তুমি ফিরে যেতে পারবে না।' খুব স্পষ্ট এবং দৃঢ় গলায় উচ্চারণ করল তিস্তা। চমকে মুখ তুলল সুব্রত। এ কোন তিস্তাকে দেখছে সে। মুহূর্তের জন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল, 'কিন্তু বীরবাহাদুর'।

'আমি কিছু জানি না। আমাকে জাগিয়ে তুমি চলে যেতে পারবে না।'

মুহূর্তে যেন হাজারদুয়ারির সবকটি দরজা হাট করে খুলে গেল। কিংবা, এমনও বলা যায়, সমুদ্রের দ্যাখা পেয়ে নদী যেমন অদ্ভুত শান্ত এবং ভরাট হয়, তেমনি সুব্রতর দুই হাতের বাঁধনে তিস্তা টল-টল করছিল। বুকের বন্ধনী মুক্ত করতে বিব্রত যখন সুব্রত, তখন তিস্তা কপট গলায় জানাল, 'তুমি সত্যি আনাড়ি।'

'ছিলাম। কাল থেকে থাকব না।' সুব্রত দেখল অভ্যস্ত হাতে তিস্তা বন্ধন-মুক্ত হল। চোখের সামনে পাকা বেলের স্বর্ণাভা, আধারচ্যুতির জন্যে কিছুটা নিম্নমুখী, কিন্তু চমৎকার। সুব্রত শিশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সেখানে। জননীর মতো তাকে আশ্রয় দিল তিস্তা। তার শরীর কাঁপছে, ঈষৎ বেঁকে সে মুখ নামাল সুব্রতর ঘাড়ে। 'আমাকে মুক্ত করে নিজে সেজেগুজে বসে আছ।'

পাউডার, না অন্য গন্ধ, সুব্রত জানে না, কিন্তু মুখ তুলতে ইচ্ছে না-হলেও, সে তুলল। তিস্তা বলল, 'না এখন থাক।'

শৈশবে মায়ের স্মৃতি অথবা পথে-ঘাটে দেখা সুন্দরীর বক্ষ এতদিন যে-আকর্ষণ করত, তা এখন হাত এবং মুখের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ। সুব্রত জানছিল সুখ কাকে বলে। পৃথিবীতে কতরকমের সুখ রয়েছে, কিন্তু এই সুখ চিরকালের না-হলেও চিরকালই মানুষেরা পেয়ে এসেছে।

তিস্তা বলল, 'আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি গো।'

সুব্রত জবাব দিল বুক এবং পেটের জমিতে মাথা রেখে, 'আমিও।'

'তুমি আমাকে কী দেবে?'

'জানি না। তবে তারা কিংবা চাঁদ পেড়ে আনতে পারব না।'

হাসল তিস্তা, 'তুমি আমাকে তোমার মতো একজনকে দিয়ো।'

'এটা একটু বোকা-বোকা কথা হল না?'

সুব্রতর গলায় এখন সেই ঠাট্টা। তিস্তা আদুরে হল, 'হোক, আর কেউ তো শুনছে না।'

সুব্রতর মনে হল, সন্ধেবেলার ওই চরিত্রদুটোর সংলাপ কি তিস্তার কথাই, অন্য সবাই শুনছিল বলে বোকা-বোকা হয়ে গিয়েছিল? তিস্তার হৃৎপিণ্ড এখন সুব্রতর কানে শব্দ তুলল, ঠিক-ঠিক।

আয়োজন সম্পূর্ণ। জ্যোৎস্নার আলো এখন মশারির মতো মোহিনী।

তিস্তা ডাকল, 'এসো।' তিস্তা এখন একটু-একটু করে গলে গলে শেষ ঢেউয়ের প্রতীক্ষায়। মাতাল, মদ না-খেয়েও মানুষ যখন সবচেয়ে বেশি মাতাল হয়, তেমনি, সুব্রত নিজেকে মুক্ত করে বিলিয়ে দিতে এবং গ্রহণ করতে হাত বাড়াল।

তিস্তা চাপা গলায় বলল, 'পর্দাটা টেনে দাও। জ্যোৎস্নাটা বড্ড জ্বালাচ্ছে।'

সে-কথায় কান নেই সুব্রতর। তিস্তার শরীর থেকে শেষ আবরণ সরিয়ে ফেলে সে যখন তীব্রতর হল সেই মুহূর্তেই নজর স্থির হল। ও কী! পলকেই সমস্ত শরীর স্থির। যেন আচমকা বরফ ঘষে দিয়েছে কেউ। নিজের অজ্ঞাতেই শিরারা শিথিল হয়ে যাচ্ছে। তিস্তা অসহিষ্ণু হল, 'কী হল, এসো?'

সুব্রত চোখ বন্ধ করল। তার শরীর ততক্ষণে তলানিতে এসে ঠেকেছে। চোখের পাতায়, এমনকী এই বন্ধ চোখেও, বিশ্বচরাচর জুড়ে, এখন তিস্তার নরম তলপেট। সেখানে সরু-সরু ক্রিমির মত সাদা-সাদা দাগ জ্যোৎস্নায় ঠাস হয়ে আছে। ওপর থেকে নিচে ফাটা-ফাটা হয়ে আছে জঠর।

তিস্তার গলা কানে এল, 'কী হল?'

চোখ খুলল সুব্রত। ওই শরীর তার নয়। কোনও ডাক এই মুহূর্তে শরীরকে চাকর করতে পারছে না। এতদিন যে-তিস্তাকে সে কামনা করে এসেছে এখন চেষ্টা করলেও তাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা তার নেই। সাদা দাগগুলো কিলবিল করছে সামনে। বরাহনগরের মেয়ের চুপচাপ প্রতারণাকে উপেক্ষা করার সাধ্য তার শরীরেই নেই। বুকের মধ্যে টনটন করছিল সুব্রতর।

আর তখনই তিস্তা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দ্রুত কাপড় সংযত করে বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদে চলল একটানা।

সুব্রতর মনে হল, তিস্তা তার বুকের কান্নাটাকেও চুরি করে নিয়ে কাঁদছে।